

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

সংবাদপত্রে প্রতিফলন

দ্বিতীয় খণ্ড

(অস্ত্র সমর্পণ পরে)

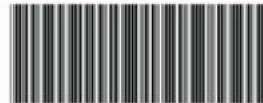
পপি দেবী থাপা

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
(অস্ত্র সমর্পণ পরে)
দ্বিতীয় খণ্ড

পপি দেবী থাপা



978-984-35-5730-8



978-984-35-5730-8



পিআইবি



প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
তৃতীয় খণ্ড
(অস্ত্র সমর্পণ পর্ব)

পপি দেবী থাপা



প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০



পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন
তৃতীয় খণ্ড (অস্ত্র সমর্পণ পর্ব)

প্রকাশক	জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রচ্ছদ	সোহেল আশরাফ খান
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
কম্পিউটার বিন্যাস	ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
বানান সমন্বয়	রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান মো. লুৎফর রহমান
মুদ্রণ	প্রগতি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ২২/১ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
গ্রন্থস্বত্ব	পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য	৬০০.০০ টাকা মাত্র

PARBATTYA CHATTOGRAM SHANTICHUKTI: SONGBADPOTRE PROTIFALAN
TRITIO KHONDO (OSTRO SOMORPON PORBO)

Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.

Price : 600 Taka. ■ \$06 Only

ISBN : 978-984-35-5730-8

Phone : 9361424, 9330081-84, Fax : 880-02-48317458

E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; <http://www.pib.gov.bd>

বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
তৃতীয় খণ্ড
(অস্ত্র সমর্পণ পর্ব)

সম্পাদক

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. কামরুল হক
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ), অতিরিক্ত দায়িত্ব
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংকলন ও গ্রন্থনা

পপি দেবী থাপা
গবেষক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

মহাপরিচালকের কথা

অশান্তি, হিংসা, হানাহানি, সংঘাত, সন্ত্রাস, শাসন-শোষণ, বঞ্চনার বিপরীতে শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ আর মানবিকতার উন্মোচন অব্যাহত হোক—এমন চাওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি তা না হয়, তবে সংকটের মাত্রা ও পরিধি তীব্রতর হতে বাধ্য। হয়েছেও তাই। সংঘাতে-সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়েছে জনপদ। ঝরেছে অব্যাহত ধারায় রক্ত। বিপর্যস্ত জীবন, বিপন্নতায় আক্রান্ত যুগের পর যুগ। সবুজ পাহাড়, বন-বনান্ত, নদী-নালা, ঝরনার ধারায় রক্তের বহত স্রোত মানবজীবনকে করেছে অশান্ত। সংকট তীব্রতর হয়ে উঠে যখন সমাধানের দরজাগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চলটিতে জনজীবন স্বাভাবিক পথ ও পছন্দ হারিয়ে সংঘাতের তীব্রতায় দিগ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বিদেশি শক্তির ইন্ধনও ছিল এই সশস্ত্র অবস্থানের নেপথ্যে। আর তা থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ এই অঞ্চলে অশান্তি, হানাহানি অব্যাহত থাকলে যারা ফায়দা নেবে, তারা মত্ত হয়ে উঠেছিল।

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহে ত্রুটি, নিষ্ঠুরতার সীমারেখার দোলাচলে ছিল বহমান। সময়গুলো ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে বৈষম্যমূলক। পশ্চাত্তপদতার যে সার্বিক অবস্থা তা বিদ্যমান ছিল। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ দূরে থাক, নিজ অঞ্চলেও ছিল একধরনের বিচ্ছিন্নতা। পার্বত্য ভূমিতে নিজস্ব সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার পথ ও পছন্দ নিয়ে নিজেরাও সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছেন, এমনটাও নয়।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল হিসাবে পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। তিনটি জেলার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চল। সমতলবাসী আর পাহাড়ি জনপদের বাসিন্দাদের জীবনপ্রবাহ, সাংস্কৃতিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ভিন্নতর ধারায় প্রবহমান। মোগল যুগে তেমন প্রবাহ তৈরি না হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলকে তাদের করায়ত্ত করে। একই সঙ্গে তাদের সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আলাদা শাসন পদ্ধতি চালু করেছিল। সেসময়ই স্পষ্ট হয় যে, পার্বত্য জনপদের সংকট সমতলের সংকটের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা চালু হয়। পার্বত্যবাসীর মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এর ফলে একটি গোষ্ঠী দেশ ছেড়ে চলে যায় প্রতিবেশী দেশে। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য চালু করা শাসনব্যবস্থায় পাকিস্তানি শাসকরা বেশকিছু পরিবর্তন আনে। যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অধিবাসীদের মধ্যে। কাণ্ডাই লেকে বাঁধ নির্মাণ করে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের

ফলাফল—লাখ খানেক অধিবাসী বাস্তুহারা হয়। যথাযথ পুনর্বাসন হয়নি তাদের। অর্ধলাখ অধিবাসী দেশ ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হিসাবে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি শাসকরা পার্বত্য অঞ্চলে ভারতের মিজো, নাগা, মনিপুরি বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণশিবির গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতায় এরা মাঝেমাঝেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে হামলা চালাত।

আর বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে উপজাতিদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। তাদের নেতারা পাকিস্তানিদের গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে উপজাতিদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করা সম্ভব হয়নি। যদিও অনেক নেতা ও কর্মী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর দেশ হানাদারমুক্ত হলেও স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি আলবদর, রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনীসহ পাকিস্তানপন্থিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। তাদের উৎখাতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী অব্যাহত অভিযান চালিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সংকট নতুন করে দানা বাঁধে। গড়ে উঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তি, হানাহানি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জাভা শাসক জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত সমস্যার সমাধান দূরে থাক বরং পরিস্থিতিতে ঘোলাটে করে তোলে। যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থান পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা অংশ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। হয়ে যায় শরণার্থী। সেই সঙ্গে চলে শান্তিবাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলা। শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়।

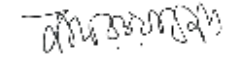
টানা পনেরো বছরের সামরিক শাসনকালে পার্বত্য অঞ্চলে গোলযোগ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। ব্যাপক হারে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকজনকে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া বিভেদ দূর করেনি। বরং রেষারেষি এবং বিভেদের মাত্রা হয়েছে তীব্রতর। ব্যাপক হারে বিভিন্ন জেলার ছিন্নমূলদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি অধিক হারে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত করা হয়। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রায়ই সংঘাতের ঘটনা ঘটে আসছিল। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিরিশি সালের পর শান্তির নামে আলোচনা চালানো হলেও ফলপ্রসূ হয়নি। সামরিক জাভা শাসক এরশাদের ৬টি এবং জিয়ার উত্তরসূরি খালেদা সরকার ১৩টি বৈঠক করেও কোনো সুফল আনতে পারেনি। বরং পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। শাসক পক্ষের সদিচ্ছার অভাবে এবং অশান্তি জিইয়ে রাখার অভিপ্রায়ে বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের কোনো

পহুই সামনে আনা যায়নি। বরং অবিশ্বাস, অসন্তোষ, সহিংসতার মাত্রা বেড়েছে। কোনোদিন এর সমাধান হবে না বরং সশস্ত্র পহুই অব্যাহত থাকবে—এমনটাই উভয় পক্ষের বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়। খোলা দূরে থাক, বরং জট আরও বেড়ে যায়। কিন্তু পৃথিবী তো আর এক জায়গায় স্থির থাকে না। পরিবর্তন তো ঘটেই। পার্বত্যবাসীর জীবনে অমানিশার অন্ধকার যে একদিন দূর হবে, সে আভাসটুকু মিলছিল যখন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে সফর করেন। পার্বত্যবাসীর সঙ্গে মতবিনিময়কালেই তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অর্থাৎ পাঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট-পরবর্তী ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক সেখানে অশান্তি আর হানাহানির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সম্প্রীতি, সৌহারদের কোনো অবস্থানই অক্ষুণ্ণ রাখেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তি দূরীভূত করার কথা তিনি ছিয়ানুবই সালে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগেই ঘোষণা করেছিলেন। একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পরই গুরু হয় পার্বত্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ। বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটিতে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরাও ছিলেন। বিএনপির দুই সদস্যের নাম কমিটিতে থাকলেও তারা কোনো ভূমিকা নেননি। বরং এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিরোধিতার আশ্রয় নেয়। পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সাতটি বৈঠকের পর শান্তির আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সই হয়েছিল ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি। দীর্ঘদিনের অশান্তির বিপরীতে এই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাটি অকল্পনীয়, অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। শেখ হাসিনা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। যদিও তৎকালীন বিরোধী দল ও তাদের নেত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, শান্তিচুক্তি হলে চট্টগ্রামসহ ফেনী ভারতের অংশ হয়ে যাবে। কিন্তু তার সেই ভাষ্য প্রলাপের তালিকায় রয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের চলে আসা পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই চুক্তি এক অনন্য নজির, সেই সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। চুক্তি সইয়ের পরবর্তী এই ছাব্বিশ বছরে পার্বত্যাঞ্চলের যে সমৃদ্ধি তাও শান্তিচুক্তিরই সুফল। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাসে একটি অন্যতম বড়ো ঘটনা—অর্জন। এই পুরো প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করতে গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার কথাও আলাদা করে বলতে হয়, যার স্বীকৃতি ওঠে এসেছে স্বয়ং জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্ত লারমার কণ্ঠেও।

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ পর্যন্ত এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর এই সংকলন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সন্নিবেশিত করেছে। নিয়মিত প্রতিবেদনের পাশাপাশি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলামগুলো যুক্ত হয়ে গ্রন্থটিকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। যেখানে পাঠক পাবেন শান্তিচুক্তিকে ঘিরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মহলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। থাকছে শান্তিচুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের মতামত, পাশাপাশি শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলির চিত্র উঠে এসেছে এ গ্রন্থে। কেবল সংবাদ নয়—সংবাদ বিশ্লেষণ, ইতিহাস, দ্বন্দ্বের কারণগুলোর গভীর অনুসন্ধান, শান্তিচুক্তিকে ঘিরে বিভিন্ন পক্ষের মতামতের একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারেন। গ্রন্থটি পাঠকের সামনে শান্তিচুক্তিকে ঘিরে তৎকালীন রাজনীতিরও একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস।

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন (প্রথম খণ্ড)’ ও ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন (দ্বিতীয় খণ্ড)’ গ্রন্থের ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হলো ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন; তৃতীয় খণ্ড (অস্ত্র সমর্পণ পর্ব)’ শীর্ষক এই গ্রন্থ। গ্রন্থটির আধেয় সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পাঁচটি পত্রিকা: (১) সংবাদ, (২) দৈনিক ইত্তেফাক, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ ও (৫) দ্য বাংলাদেশ অবজারভার। গ্রন্থটি প্রণয়নে নিরলস পরিশ্রমের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর গবেষক পপি দেবী থাপাকে ধন্যবাদ। বিশ্বাস এই যে, যাদের জন্য এই প্রকাশনা, সেই আগ্রহী পাঠক, গবেষকদের প্রয়োজন পূরণে গ্রন্থটি সক্ষম হবে।

জয় বাংলা।



জাফর ওয়াজেদ

মহাপরিচালক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

ভূমিকা

পার্বত্য জীবনপ্রবাহে ইতিহাসের পরতে পরতে অস্তিত্বের টানা পোড়েন। নিজ জাতিসত্তা, সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সবুজ পাহাড়ে রক্তের লেপন। বঞ্চিত, রক্তস্রোতে ভাসা প্রাণ যুগে যুগে প্রজন্মের চেতনায় জাগিয়েছে বিপ্লব। ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের জনজীবনকে করেছে বিপর্যস্ত। অশান্ত, অনিশ্চিত জীবনধারা তাদের রেখেছিল পশ্চাৎপদতা, বিদ্বেষ আর বিচ্ছিন্নতার আবর্তে। সময়ে তীব্র হওয়া সংকটের শিকড় ক্রমেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছিল মাটির গভীরে, যার গণ্ডি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ছুঁয়েছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গন।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতে উত্তপ্ত-অস্থির পার্বত্য চট্টগ্রামে থমকে গিয়েছিল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, উন্নয়ন-অগ্রগতি। এ অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের জীবনচার, অর্থনৈতিক বিন্যাস ও সংস্কৃতি সমতলের অধিবাসীদের তুলনায় ভিন্নতর। যে কারণে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ রাজশক্তি পর্যন্ত এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্রোহ-অসন্তোষকে গভীর ও নানা মাত্রিক বিবেচনায় নিয়ে শাসন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এরপর ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এ নিয়ে দেখা দেয় বিভক্তি। অধিকারের ব্যাপারে শঙ্কিত একটি গ্রুপ চলে যায় ভারতে। পাকিস্তানি সামরিক জাভা শাসকরা কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করে স্থানীয় জনমত উপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, উন্নয়ন প্রকল্পের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় অধিবাসীদের বিষয়টিও তেমন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। এসব ঘটনায় উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে বিপুলসংখ্যক নিরীহ সরল উপজাতি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দিতে পারেনি। অবশ্য অনেক উপজাতি নেতা এর বিরোধিতা করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর উপজাতি নেতাদের কিছু দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে সংকট নতুন রূপ লাভ করে। এ সময়ে সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দাবি আদায়ে গঠন করে তাদের সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী। সদ্য স্বাধীন দেশে সবাইকে নিয়ে একযোগে এগিয়ে চলার যে অঙ্গীকার, সেই প্রতিশ্রুতি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় পাহাড়ি

জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কমে আসে দূরত্ব। তাদের নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বাকশালে যোগদান সেই সাক্ষ্যই দেয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সে প্রচেষ্টা যায় থমকে। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে বাঙালি পুনর্বাসনের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে সেনা ও নিরাপত্তাবাহিনী প্রেরণ করে। তাতে কোনো সফল তো মেলেইনি, বেড়ে যায় জাতিগত বিদ্বেষ, সংকট হয় আরও ঘনীভূত। তীব্র হয় অশান্তি, হানাহানি, সহিংসতা। অপর সামরিক শাসক এরশাদ শাসনামলে ৬টি, পরবর্তী সময়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি শাসনামলে ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সমাধানের দুয়ার খোলেনি, আসেনি প্রত্যাশিত শান্তি। অবিশ্বাস, আত্মহীনতা জমে হয়েছে পাহাড়সম। যে বৈঠকগুলো সম্পর্কে উপজাতীয় নেতাদের মূল্যায়ন ছিল— ‘লোক দেখানো, তাতে ছিল আন্তরিকতার অভাব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছাও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।’

সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তির দ্বীপশিখা জ্বালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালের জুনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত সমস্যা সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানকল্পে ১৯৯৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি। কমিটিতে সরকারদলীয় সদস্যদের পাশাপাশি বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও বিএনপিদলীয় দুই সংসদ সদস্য শেষ পর্যন্ত কমিটির কাজে অংশগ্রহণ করেননি। সংঘাত, হানাহানি, বিভেদের দিনগুলো পেছনে ফেলে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এই কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপে অংশ নেয়। জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর, খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে। এরই ধারাবাহিকতায় আরও ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। ১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকায় শুরু হওয়া সর্বশেষ অর্থাৎ সপ্তম বৈঠকে চূড়ান্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে ২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি।

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা যেমন অপরিহার্য, তেমনই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রশ্নটিও ছিল জড়িত। এসবকিছু বিবেচনায় নিয়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হয়েছেন রাজনৈতিক সমাধান ও শান্তি স্থাপনের পথে। তাঁরই সুযোগ্য নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর

ক্ষমতায় এসে মাত্র ১৭ মাসের মাথায় দীর্ঘ দুই দশকের সশস্ত্র সংঘাতের যবনিকাপাত ঘটে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ১৯৯৭’ স্বাক্ষরের মাধ্যমে। যার প্রাথমিক বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয় শান্তিবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে। চুক্তি স্বাক্ষরের ২৬ বছর পরও আজ পার্বত্যঞ্চলে যে শান্তির সুবাতাস ও উন্নয়নের ছোঁয়া, তা এই শান্তিচুক্তিরই ফল। সময়ের সঙ্গে এ চুক্তির তাৎপর্য জাতীয় জীবনে উদ্ভাসিত হবে বহুমাত্রিকতায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিঃসন্দেহে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-অর্জন।

বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামজুড়ে দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় চলে আসা অস্থিরতা, রক্তপাত ও হানাহানি বন্ধে এ শান্তিচুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জমিট বরফ গলিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ চুক্তি বিশ্বের এক অনন্য নজির। সংগত কারণেই শান্তি প্রক্রিয়ার গুরু থেকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র সমর্পণ পর্যন্ত পুরোটা সময়ে এ সংক্রান্ত যে কোনো ঘটনা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে গুরুত্বসহকারে।

গবেষক, আত্মহী পাঠক যাতে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী সময় থেকে চার পর্বে (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২২ ফেব্রুয়ারি ও ৫ মার্চ ১৯৯৮) সংঘটিত অস্ত্র সমর্পণ পর্যন্ত শান্তিচুক্তি সংক্রান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য সহজে খুঁজে পেতে পারেন, সেজন্য আমাদের এই সংকলনগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে শুধু সংবাদ নয়, তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝাতে পক্ষ-বিপক্ষের সংবাদের পাশাপাশি পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলামগুলোও গুরুত্বানুসারে সংযোজিত হয়েছে। আধেয় সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পাঁচটি পত্রিকা: (১) সংবাদ, (২) দৈনিক ইত্তেফাক, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ, (৫) দ্য বাংলাদেশ অবজারভার। দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও বানানে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পুরোনো এইসব সংবাদপত্রগুলো থেকে একেবারেই পাঠোদ্ধার সম্ভব না হওয়া কিছু শব্দের ক্ষেত্রে ত্রিবিদ্যুচিহ্ন (...) ব্যবহার করা হয়েছে। এই খণ্ডে থাকছে চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে অস্ত্রসমর্পণ পর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সংবাদ। পাশাপাশি নানামাত্রিক বিশ্লেষণ, সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়, আন্তর্জাতিক মহলের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিও যুক্ত হয়েছে। বিশ্বাস করি- গ্রন্থটি পাঠক, গবেষকসহ এ বিষয়ে আত্মহীজনের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে।

পপি দেবী থাপা
গবেষক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সূচিপত্র

পটভূমি	১৫-২৪
সংবাদ	২৫-১৮৬
দৈনিক ইণ্ডেফাক	১৮৭-৩৮৪
ভোরের কাগজ	৩৮৫-৫৩০
দৈনিক জনকণ্ঠ	৫৩১-৬৩৪
দ্য বাংলাদেশ অবজারভার	৬৩৫-৭৪০
চিত্রে অস্ত্র সমর্পণ	৭৪১-৭৫৫

পটভূমি

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, মঙ্গলবার সকাল ১০টা ২৪ মিনিট। ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্মলগ্ন। মুহূর্তটি ঐতিহাসিক পার্বত্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের। শিল্পী শাহাবুদ্দিনের স্বাধীনতার পতাকা আর অ, আ, ক, খ বর্ণমালা আঁকা তৈলচিত্রের নিচে রাখা টেবিলের একপ্রান্তে বসেছিলেন দুই নেতা-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্ত্রিয় লারমা (সম্ভ লারমা)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বসেছিলেন অপর চেয়ারটিতে। মুখোমুখি দুই সারির একটিতে মন্ত্রিসভার সদস্য, অপর সারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনসংহতির নেতা ও স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে। মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য অপেক্ষা প্রধানমন্ত্রীসহ সবার। মুখে স্মিত হাসি বিজয়ের। বিশেষ দুটি কলম হাতে তুলে নিলেন দুই নেতা-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও সম্ভ লারমা। পনেরো পৃষ্ঠার চূড়ান্ত চুক্তির দুটি ফাইলে বাংলায় পরপর স্বাক্ষর করলেন দুইজন। একজন ফাইল তুলে দিলেন আরেকজনের হাতে। চারদিকে উচ্ছ্বাস আর অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। উপস্থিত সবার হৃদয়জুড়ে মঙ্গল আর শান্তির প্রার্থনা। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসা বিভেদ, হানাহানি, জাতিগত সংঘাতের দিনগুলো পেছনে ফেলে নতুন পথ চলার শুরু। যে পথ শান্তির, যে পথ কল্যাণের। মুহূর্তটি সৃষ্টির কারিকর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালের জুনে ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র ১৭ মাসের মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিরোধী পক্ষগুলো মিলল মিলনমোহনায়। মাত্র ১৭ মাস সময়ের মধ্যে এ ধরনের একটি সম্মানজনক সাংবিধানিক সমাধান, তা অনেক অতি আশাবাদীরও ছিল কল্পনার বাইরে। অথচ এই হিরণ্য মুহূর্তে সেটিই বাস্তবতা। এখানে সবাই মিলেছে হৃদয়ে হৃদয়ে। শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়ের।

দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসা বন-বনানী, পাহাড়-পর্বত আর সবুজে ঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের শিকড়ের সন্ধানে আমাদের আলো ফেলতে হবে সুদূর অতীতের গর্ভে। সৃষ্ট সংকট, সংঘাতে গড়াতে নিয়েছে দীর্ঘ সময়। প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের হিংস্রতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে রচিত হয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সংকট রূপ নিয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি গড়ে ওঠার ইতিহাসে দৃষ্টি ফেলে আমরা দেখি, চাকমা রাজা মংছুই ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) থেকে বিতাড়িত হয়ে রামু, টেকনাফ

প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় নেন। পরে মারমারা এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় মোগলরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে এবং বাংলায় মোগল শাসকদের কাছে এ অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে। ওই সময় থেকেই সমতল ভূমির বাঙালিরা চাকমা রাজা দেওয়ান বক্স খান ও পরবর্তী শাসক রানি কালিন্দীর আমন্ত্রণে এই অঞ্চলে আসেন। ১৭৬০-এর ১৫ অক্টোবর বাংলার নওয়াব মীর কাসেম খান পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। তবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইংরেজদেরও বাধার মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে ১৭৭৭-১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকমা যোদ্ধারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত চাকমা রাজা জানবক্স খাঁ ১৭৮৭ সালে ইংরেজ বড়োলাটের কাছে গিয়ে শান্তি কামনা করে আনুগত্যের ঘোষণা দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসকদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে, তবে ব্রিটিশরা এলাকাটির প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করে। ১৮৬০ সালের ৩০০২নং প্রজ্ঞাপন বলে চট্টগ্রাম জেলার মূল পার্বত্য অংশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একজন সুপারিনটেনডেন্টের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ইংরেজ রাজশক্তি এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্রোহ-অসন্তোষকে গভীর ও নানামাত্রিক বিবেচনায় নিয়ে তাদের শাসনের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করে। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০-এই একশ বছরে ইংরেজ তার নিজস্ব অবস্থানকে সংহত করেছে। যুদ্ধবিগ্রহের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ১৯০০ সালের ১ মে তারা জারি করে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন অ্যাক্ট’ (CHT Regulation Act 1900)। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নন-রেগুলেটেড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯০০-এর অ্যাক্টের ৩৪, ৫১ ও ৫২ ধারায় এই এলাকার উপজাতিদের অধিকার ও স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ৩৪ ধারা অনুযায়ী বহিরাগত অ-উপজাতিদের জন্য জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ; ৫১ ধারায় অ-উপজাতি কোনো ব্যক্তি উপজাতিদের অধিকার ও স্বার্থবিরোধী কোনো তৎপরতায় লিপ্ত হলে তাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিস্কার করা যাবে। অন্যদিকে ৫২ ধারায় বলা আছে, কোনো অ-উপজাতি শুধু জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়েই ওই এলাকায় প্রবেশ বা বসবাস করতে পারবে।

১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area হিসাবে ঘোষণা করে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করায় উপজাতিদের একটা অংশ এর বিরোধিতা করে। তারা ভারতের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিল। পার্বত্য

চট্টগ্রাম জনসমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হলে তাদের অধিকার সংরক্ষিত হবে কি না, এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। সমিতি রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের অফিসে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বোমাং রাজপরিবারের কিছু নেতা এর প্রতিবাদে বান্দরবানে বর্মী পতাকা উত্তোলন করে।

দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১ আগস্ট বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে। তারা ভারতীয় পতাকা নামানোর জন্য বিক্ষুব্ধদের ওপর বল প্রয়োগ করে এবং সেখানে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে। পাকিস্তানে উপজাতিদের অধিকার সংরক্ষিত হবে কি না, তা নিয়ে উপজাতি নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমা কলহে লিপ্ত হন। অধিকারের ব্যাপারে শঙ্কিত একটি বড়ো গ্রুপ তাদের ভূমি পরিত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এ সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংবিধানিক বিশেষ মর্যাদা খর্ব হতে থাকে। পার্বত্যবাসীদের রাজনৈতিকভাবে বঞ্চনা শুরু হয়। এ সময় পার্বত্যঞ্চল স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীরবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৮৮১’ বাতিল করে। সরকারের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হন জেলা প্রশাসক। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার এক সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area-এর পরিবর্তে উপজাতীয় এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৬৪তে উপজাতীয় এলাকার বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করে রেগুলেশন ১৯০০ চালু রাখা হয়। তবে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট ওই রেগুলেশনের ৫১ ধারাকে Ultra-Vires বা রীতিবিরুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩৪নং ধারারও সংশোধন করা হয়। এর ফলে জেলা প্রশাসক কোনো অ-উপজাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিস্কার করার ক্ষমতা হারান এবং যেসব অ-উপজাতি ১৫ বছর বা এর বেশি সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন, তাদের জমি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দেও অবশ্য ৫২ ধারার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এলাকার জনগণের মতামত এবং তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সম্মতি বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা হয়নি। এমনকি উন্নয়ন পরিকল্পনাও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বা অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। বরং কোনো কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ ও কাঠের ওপর নির্ভর করে চন্দ্রঘোনায় পেপার মিল (কর্ণফুলী) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রকল্পসহ

অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে পাহাড়িরা চাকরিবাকরির সুযোগ-সুবিধা প্রায় পায়নি বললেই চলে। ষাটের দশকে কাগুইয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রায় ৫৪ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বাঁধ নির্মাণের ফলে ব্যাপক ফসলহানিসহ ওই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনের ঘরবাড়ি তলিয়ে যায়। পাহাড়িদের জীবনধারণের অবলম্বন কৃষি অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। কাগুই বাঁধের কারণে ৯৯ হাজার ৯৭৭ জন লোক বাস্তুহারা হয়ে যায়। এতে তলিয়ে যায় চাষযোগ্য জমির ৫৪ শতাংশ। পথে নেমে পড়ে ওই এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়িরা। এমনকি জমি অধিগ্রহণ করে পাহাড়িদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়নি। ব্যবস্থা করা হয়নি পুনর্বাসনের। জানা যায়, ওই সময়ে উপযুক্ত পুনর্বাসনের অভাবে প্রায় ৫০ হাজার উপজাতি নর-নারী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়, তৎকালীন বার্মা তথা আজকের মিয়ানমারেও আশ্রয় নেয় অনেকেই। কর্ণফুলী পেপার মিলস প্রতিষ্ঠাকালে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ঘোষণা থাকলেও পাহাড়িরা চরম বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে বিপুলসংখ্যক নিরীহ সরল উপজাতি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দিতে পারেনি। এমনকি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ আসনগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যায়। অবশ্য অনেক উপজাতি নেতা এর বিরোধিতা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর বাঙালি জাতীয়তার পরিচয়ে পরিচিত হতে পাহাড়িরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে উপজাতিদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে। বঙ্গবন্ধু তাদের আশ্বাস দেন যে, তারা সরকারি চাকরিতে তাদের যথাযোগ্য অংশ পাবে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি’ গঠিত হয় (মতান্তরে ২৪ জুন ১৯৭২)। ওই সময়ে গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়িদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ৪ দফা দাবিনামা পেশ করে। সেগুলো হচ্ছে: (১) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা এবং তার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ রাখা, (২) উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ন্যায় সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে (৩) উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা এবং (৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের

জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে। বঙ্গবন্ধু এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলধারায় মিশে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধুর এ প্রস্তাবের মর্মার্থ তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির। তৎকালীন বিরোধীদলগুলোর অনেকেই এ সুযোগ গ্রহণ করে মেতে ওঠে অপপ্রচারে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি গঠিত হয় জনসংহতি সমিতির সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের শেষদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অভিবাসী প্রেরণ বন্ধ এবং অবৈধভাবে পাহাড়িদের দখল করা জমিজমা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। উপজাতিদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন এবং বৈশিষ্ট্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বলে ঘোষণা দেন। বাকশাল কমিটিতে উপজাতি নেতাদের সম্মানজনক পদ দেন। যাতে তারা নিজেদের সমস্যা তুলে ধরতে পারেন। বোমাং চিফ মং ও প্রফ চৌধুরীকে বান্দরবান এবং মং চিফ মং প্রফ সাইনকে খাগড়াছড়ি জেলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। তিন জেলার বাকশাল সেক্রেটারি নিয়োগ দেওয়া হয় তিনজন উপজাতি নেতাকে। এমনকি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কথায় আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়ে বাকশালে যোগদান করেন।

১৯৭৩ সালে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখারূপে যে শান্তিবাহিনীর জন্ম হয়, বঙ্গবন্ধুর গঠনমূলক কাজের দরুন ওই বাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু যখনই পাহাড়িদের বুঝতে এবং কাছে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং উপজাতিরা বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, ঠিক তখনই ঘাতকের বুলেটে বঙ্গবন্ধু শহিদ হন। আবার পুরো পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সরকার এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজিত সমস্যাকে কেবল অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি হিসাবে চিহ্নিত করেন। রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগ করে উপজাতীয় জীবনবিন্যাস, আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৬ সালে গঠন করেন ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড’। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাঙালি বসতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা, এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে জিয়া সরকার পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক হারে বাঙালি পুনর্বাসন শুরু করে। পাশাপাশি তাদের জানমাল রক্ষার অজুহাতে বেশি পরিমাণ সৈন্য ও নিরাপত্তাবাহিনী প্রেরণ করে। সেসময় উপজাতিদের

আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তাতে কিছুই লাভ হয়নি। সহিংসতা ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। জোরদার হয় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী। সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। ১৯৮০ সালের ২৯ জুলাই একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দেখা করে। একই বছরের ২৫ মার্চ বাঙালি-পাহাড়ি দাঙ্গায় বহুলোক হতাহত হয়। ১৯৮১ সালে পুনর্বাসিত বাঙালিদের পাহাড়ে জমি ও টাকা দেওয়া শুরু হয়। ১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি ট্রাইবাল কনভেনশন বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে জনসংহতি সমিতির আটদিনব্যাপী দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্টি মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী—এ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন থেকে শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। একই বছরের ১ অক্টোবর ক্ষমতা দখলকারী অপর সামরিক শাসক এরশাদ শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করতে পারেনি। ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের হামলায় মানবেন্দ্র লারমা তার ৮ সহযোগীসহ নিহত হন। ১৯৮৪ সালের ১৯ জানুয়ারি রাঙামাটির মারিশ্যা এলাকায় বহুল আলোচিত শেল ওয়েল কোম্পানির ৫ জন বিশেষজ্ঞকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহরণের ঘটনা ঘটে। পরে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৮৪ সালের ১০ মে পার্বত্য এলাকার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ৩১ মে বরকলে ১০০ জন অ-উপজাতিকে শান্তিবাহিনী হত্যা করে। ২৮ নভেম্বর ২ জন উন্নয়ন বোর্ডের সদস্যকে অপহরণ করে শান্তিবাহিনী। ১৯৮৫ সালের ২৯ জুন প্রীতি গ্রুপের ২৩ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে প্রকাশ্য জীবনে ফিরে আসে। ওই বছরের ২১ অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার পুজগাং এলাকায় সর্বপ্রথম সরকার ও জনসংহতি বৈঠকে বসে। সরকার প্রথম এক মাসের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ১৯৮৬ সালের ২৪ মে। ১৯৮৭ সালের ১৭ আগস্ট পার্বত্য সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও বাংলাদেশে আসেন। ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জেলা পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরের ডিসেম্বরে পানছড়ি থানার পুজগাংয়ে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বৈঠক। ১৯৮৮ সালের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি তৃতীয় এবং ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ বৈঠক, ১৯ জুন পঞ্চম এবং ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর এরশাদ শাসনামলে মোট ছয়টি বৈঠকের শেষ বৈঠকটিও সমাধান ছাড়াই শেষ হয়। বৈঠকগুলো থেকে কাক্ষিত ফল না আসায় পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি, সংঘাত থাকে অব্যাহত।

ক্ষমতার পটপরিবর্তনে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯২ সালের ১০ জুলাই পার্বত্য সংকট নিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে। ১ আগস্ট জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। এ সময় থেকে দফায় দফায় অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়। কখনো জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে, কখনো সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যৌথভাবে এই অস্ত্রবিরতি পালিত হয়। বিএনপি সরকারের আমলে অলি আহমদের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে শুরু হয় ১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর। জনসংহতির পক্ষে জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভলারমা) বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের ৫ মে পর্যন্ত খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে বিএনপি সরকারের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সাতটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের কমিটির একটি সাব-কমিটি গঠিত হলে ওই কমিটির সঙ্গে খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক হয় ১৯৯৪ সালের ৪ জুন। সাব-কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে মোট ছয়টি বৈঠক করে। ১৯৯৫ সালের ২৫ অক্টোবর বিএনপি সরকারের আমলে কোনো সমাধান ছাড়াই মেননের সাব-কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ ও সরকারের সঙ্গে ত্রয়োদশ বৈঠক শেষ হয়। বৈঠকগুলোর সময় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টি যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তেমনই প্রতিপক্ষের আত্মহীনতার বিষয়টিও সামনে এসেছে। পাশাপাশি সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল চলমান। শেষ পর্যন্ত আসেনি কাজিফত ফল।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ২৩ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সংকট সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানকল্পে ৩০ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। কমিটিতে সরকার, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও বিএনপির দুই সংসদ সদস্য এই কমিটির কাজে শেষ পর্যন্ত অংশ নেননি। এই কমিটিই পরে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপের প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠকটি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে ২১ ডিসেম্বর শুরু হয়। প্রথম বৈঠকে সরকারের পক্ষে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সংসদ সদস্য

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কল্লরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার এবং সম্ভলারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির পক্ষে রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্দু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তেৎপল ত্রিপুরা আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়া যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, মথুরালাল চাকমা, কে শৈ অং মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমা, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, মহাপরিচালক সিএম মোহসীন, বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন এবং খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সম্ভলারমা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত থাকায় দুইদিন মুলতুবি থাকার পর ২৪ ডিসেম্বর বৈঠক আবার শুরু হয়। প্রথম বৈঠকে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিরা তাদের সংশোধিত পাঁচ দফা দাবিনামা পেশ করেন এবং অতীতের সরকারগুলো কীভাবে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে একের পর এক ঘটনার জন্ম দিতে থাকে, তার চিত্র তুলে ধরেন। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে টানা সোয়া তিন ঘণ্টা বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সাংবাদিকদের বলেন, সমাধান আসন্ন। তার ভাষায়, ‘ডেফিনিটলি আই অ্যাম হোপফুল’। জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ উল্লসিত মুখে জানানেন, ‘আমরা আনন্দিত, বৈঠক ফলপ্রসূ। ২৪ ডিসেম্বর থেকে প্রয়োজনে চলবে ম্যারাকন বৈঠক।’ প্রথম বৈঠকের এই ফলাফলকে ব্যতিক্রমধর্মী বলাই যায়। বিগত বছরগুলোয় সরকার নিয়োজিত কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির যতগুলো বৈঠক হয়েছে, তার কোনোটাতেই এই বৈঠকটির মতো সৌহার্দ, আন্তরিকতা ও আশাবাদের অভিব্যক্তি দেখা যায়নি। বৈঠক চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে টেলিফোনে খোঁজখবর নেন এবং জনসংহতি সমিতির নেতাদের ঢাকায় এসে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর আন্তরিকতা আহ্বার সংকট কাটাতে ভূমিকা রেখেছে ব্যাপক। যার প্রতিফলন আমরা দেখব দ্বিতীয় বৈঠকে।

দ্বিতীয় বৈঠকের চমক ছিল এর স্থান। বিরোধের দুই যুগের মধ্যে সরকারের সঙ্গে বৈঠক করতে সম্ভলারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির নেতাদের প্রথমবারের মতো ঢাকায় আগমন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে উভয়পক্ষের তিনদিনব্যাপী দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ২৫-২৭ জানুয়ারি। ঢাকা পর্যন্ত তাদের আসতে সম্মত হওয়ার বিষয়টিকে তখনই আহ্বার সংকট কেটে যাওয়ার লক্ষণ মনে করা হচ্ছিল। এরশাদ আমলের বৈঠকগুলোতে তারা এমনকি ছবি তুলতে দিতেও রাজি ছিলেন না। আওয়ামী

লীগ সরকারের সঙ্গে প্রথম দফা বৈঠক খাগড়াছড়িতে হলেও এর পরের সব বৈঠক হয়েছে ঢাকায়। সরকার ও জনসংহতি সমিতির তৃতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ১২-১৩ মার্চ। ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৪র্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১১-১৪ মে। বৈঠক শেষে উভয়পক্ষ ঘোষণা করে আলোচনায় সব বিষয়ে তারা একমত হয়েছেন এবং শীঘ্রই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করবেন। পাঁচদিনব্যাপী চলা পঞ্চম বৈঠকটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ১৪-১৮ জুলাই। ষষ্ঠ বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির নেতা সম্ভ লারমার কণ্ঠে শান্তিচুক্তি নিয়ে পরিষ্কার বার্তা আসে। ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সরকারি কমিটি ও জনসংহতি সমিতির চারদিনের ষষ্ঠ বৈঠক শেষে সম্ভ লারমা সাংবাদিকদের জানান, তারা খসড়া শান্তিচুক্তি প্রণয়ন করেছেন। সর্বশেষ ও সপ্তম বৈঠকের আলোচনা ঢাকায় শুরু হয় ২৬ নভেম্বর। শুরু থেকেই মনে হচ্ছিল জনসংহতি সমিতির নেতারা একটি চূড়ান্ত সমাধানের প্রস্তুতি নিয়েই ঢাকায় এসেছেন। সপ্তম দফা বৈঠকের প্রথম দিনে বৈঠক হয়েছে ৪ ঘণ্টা। দুপুর আড়াইটায় শুরু হয়ে শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। ধারাবাহিক আলোচনা-আলোচনার মাধ্যমে অমীমাংসিত সব বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপিত হয়। বৈঠক সমাপ্ত হয় ৩০ নভেম্বর রাত ১টা ২০ মিনিটে। এরপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ-১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আনন্দঘন পরিবেশে সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি।

এই অর্জনের পথ মসৃণ ছিল না কখনোই। সেখানে বসবাসরত বাঙালি ও উপজাতিসহ বিবদমান পক্ষগুলোর দীর্ঘদিনের জমাট ক্ষোভ প্রশমনে নিতে হয়েছে কার্যকর উদ্যোগ। আলোচনা চলাকালেও পাহাড়ের পরিস্থিতিতে অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বারবার। স্বার্থান্বেষী মহল শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পাহাড়ে রক্ত ঝরিয়েছে, চালিয়েছে নানা অপচেষ্টা। তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর বড়ো একটি অংশ শান্তি প্রক্রিয়াকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, হরতালের মতো কর্মসূচি দেওয়াসহ ‘অশান্তিবাহিনী’ গঠনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ আনা হয়েছে দেশ বিক্রির। দেশের অভ্যন্তরে এই প্রবল বিরোধিতা মোকাবিলায় শান্তিচুক্তির পক্ষে জনমত গঠনের পাশাপাশি সরকারকে আন্তর্জাতিক মহলের মতামতকেও বিবেচনায় নিতে হয়েছে গুরুত্বের সঙ্গে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সংকট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচিত ছিল দীর্ঘ সময় ধরে। সংগত কারণেই পুরো প্রক্রিয়াটিকে তারা রেখেছিলেন আতশকাচের নিচে। ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বসবাসের

পরিস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত নিতে হয়েছে কূটনৈতিক উদ্যোগ। সবকিছু মোকাবিলা করেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার মাত্র ১৭ মাসের মাথায় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। শান্তি আলোচনা শুরুর পর থেকেই সব বিরোধিতার বিপরীতে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে আসছিলেন, কোনো অপচেষ্টাই শান্তির এই পথচলাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। যেমনটা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নরনারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।’ সেই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেই শান্তিচুক্তিবিষয়ক আলোচনার পুরোটা পথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্রসর হয়েছেন দৃঢ়তার সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে-পার্বত্য শান্তিচুক্তি। এই চুক্তির অন্যতম অর্জন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ। বিশ্বে এমন চুক্তির নজির তেমন নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস বইছে। জনজীবন সংঘাতবিমুক্ত। এমন ধারা থাক অব্যাহত, চিরায়ত-এই প্রত্যাশায়। চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে অস্ত্র সমর্পণ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আধেয় নিয়ে এই প্রকাশনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন; তৃতীয় খণ্ড (অস্ত্র সমর্পণ পর্ব)-এ থাকছে (১) সংবাদ, (২) দৈনিক ইত্তেফাক, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ ও (৫) দ্য বাংলাদেশ অবজারভার থেকে সংগৃহীত আধেয়।

তথ্যসূত্র: সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, দ্য বাংলাদেশ অবজারভার।

ଅଂବାଦ

সংবাদ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
ত্রিপুরা রাজ্য সরকার
শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে

আগরতলা, ৩রা ডিসেম্বর (পিটিআই)।- ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে মঙ্গলবার সই হওয়া শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। রাজ্য সরকার বলেছে, এই চুক্তি সইয়ের ফলে ২৩ বছরের পুরনো উপজাতীয় সমস্যাই কেবল শেষ হবে না অধিকন্তু এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় চাকমা শরণার্থীদের উপযুক্ত পুনর্বাসনকেও নিশ্চিত করবে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব বলেন, শান্তিচুক্তি চাকমা শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও তাদের সমস্যাবলি সমাধানে অনেক সহায়ক হবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কেশব মজুমদার বলেন, শান্তিচুক্তি সই কেবল বাংলাদেশের জন্যই নয়, ভারতের জন্যও এটি মঙ্গলজনক। তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এটি সাহায্য করবে।

মানবাধিকার হিউম্যানিটি প্রটেকশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট মৃণাল চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত।

সংবাদ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত রূপ নিল যেভাবে-
সংবাদ নেপথ্য
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত শান্তিচুক্তি সই হওয়ার নেপথ্য নায়ক ছিলেন দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এদের একজন চাকমা রাজা, অপরজন সরকারের নীতিনির্ধারণী পরিষদের একজন প্রতিমন্ত্রী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির যা ফয়সালা হওয়ার তা হয়েছে গত রোববার রাতেই। ঐদিন রাত ১টা পর্যন্ত বৈঠক চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে। একান্ত আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে এ বৈঠকে যোগ দেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর। তবে বৈঠকের সূত্রমতে, আওয়ামী লীগের কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত জনসংহতি সমিতিতে জানাতেই তিনি বৈঠকে

যোগ দেন। পরে জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় কমিটির মূল আলোচনায় তিনিও যোগ দেন। বৈঠকে তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জনসংহতি সমিতিতে বোঝাতে সক্ষম হন।

জনসংহতি সমিতির নেতারা আলোচনায় চাকমা রাজা দেবশীষ রায়কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। সরকার এ সমস্যা সম্পর্কে এবং সমস্যার সঠিক ব্যাপারগুলো নিয়ে রাজা দেবশীষ রায়কে আলোচনায় যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। রোববার সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে রাজাকে বৈঠকস্থল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় নিয়ে আসা হয়। খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে রাজা দেবশীষ রায় হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি গোপনে অতি সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করা চুক্তির খসড়া দেখেন।

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছেন, জনসংহতি সমিতি মূলত ভূমি বিষয়ে যে দফাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতে রাজা দেবশীষ রায়কে অনুরোধ করেছিল। রাজা দেবশীষ রায় চুক্তি সম্পর্কে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিলে সন্তু লারমাসহ জনসংহতি সমিতির অন্যান্য সদস্য চুক্তি করতে সম্মত হন।

বৈঠকের অন্য একটি সূত্র বলছেন : সন্তু লারমা এ বৈঠকে শান্তিচুক্তি সই করার ব্যাপারে প্রথম দিন থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তবে পাহাড়িদের স্বার্থহানি ঘটে এমন কিছু করতে চাননি। সরকারও এ ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার। রাষ্ট্রের পরিপন্থী যেন কিছু না করা হয় এ ব্যাপারে আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে।

জনসংহতি সমিতি স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে ঢাকার বিশিষ্ট আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এভাবেই চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত সম্পাদিত হয়।

সংবাদ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্যঞ্চলের প্রশাসন
ও কাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু

সাগর সরওয়ার ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্যঞ্চলের প্রশাসন ও কাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (জেলা পরিষদ) সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, এছাড়াও খুব শিগগিরই গঠন করা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম

বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় গঠন সংক্রান্ত সুপারিশমালা খুব শিগগিরই রাষ্ট্রপতির দপ্তরে পাঠানো হবে বলে সূত্র জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া গেলেই গঠন করা হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সূত্র বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনকেই আরো ঘষামাজা করে এই মন্ত্রণালয় গঠনের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ পার্বত্য (জেলা পরিষদ)গুলো এখন যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই থাকবে বলে জানা গেছে। সূত্র জানিয়েছেন, শিগগিরই পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। এ নির্বাচন হবে জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় কমিটির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করা হবে। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের চেয়ারম্যান কে হবেন এ বিষয়টি এখনো ঠিক হয়নি। তবে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় (সম্ভ) কে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের চেয়ারম্যান করতে চায় সরকার। সম্ভ লারমাকে এ ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যে মন্ত্রণালয় গঠনের জন্য চুক্তিতে বলা হয়েছে, তাতে একজন উপজাতীয়কে মন্ত্রী করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সরকারের উচ্চপদস্থ সূত্র বলছেন, সাংসদ কল্লরঞ্জন চাকমাকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব রয়েছে। অন্যদিকে যেহেতু সাংসদ কল্লরঞ্জন শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান, তাই চেয়ারম্যানের পরিবর্তন করা হবে। রাষ্ট্রপতির সাংসদ দীপংকর তালুকদারকে এই টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান করা হতে পারে বলে জানা গেছে। আঞ্চলিক পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কে হবেন তা এখনো ঠিক হয়নি। চুক্তিতে একজন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার ব্যক্তিকে নির্বাহী কর্মকর্তা করার প্রস্তাব রয়েছে। একজন উপজাতীয়কে এ পদে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা থাকলেও কোন উপজাতীয় যুগ্ম সচিব নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সচিবের নাম শোনা যাচ্ছে। সরকারের উচ্চপদস্থ সূত্র বলছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বোমাং সার্কেল এবং মং সার্কেলের প্রধান নিয়ে যে মামলা চলছে, তা এখন শেষ পর্যায়ে। সরকার দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী। কারণ প্রণীত চুক্তিমেতে, তিন সার্কেল প্রধানকে অনেক দায়দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

সংবাদ

৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি : পার্বত্যঞ্চলের নেতাদের প্রতিক্রিয়া

মঙ্গলবার শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতাঃ শান্তি চুক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে যোগাযোগ কমিটির প্রধান হংসধ্বজ চাকমা সংবাদকে বলেন, শান্তি চুক্তির সফলতা দেখছি। আজ ৩ দিনে অনেকের কথাই মনে পড়ছে। যোগাযোগ কমিটি গঠনে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজের কথা তিনি কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তির ফলে আজ দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটেছে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর এখন তা বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। আমি শিগগিরই চুক্তির বাস্তবায়ন কামনা করছি।

এ প্রতিবেদককে হংসধ্বজ চাকমা আরও বলেন, আমি আজ খুবই আনন্দিত। দীর্ঘ বৈঠকের আলোচনা-আলোচনা শেষে আজ দু'পক্ষই সমঝোতায় পৌঁছে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যা পার্বত্যবাসীদের জন্য একটি শান্তির মাইলফলক।

খাগড়াছড়ির স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমি খুবই আনন্দিত।

খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও নাগরিক কমিটির সদস্য-সচিব মোহাম্মদ জাহেদুল আলম বলেন, 'বিজয়ের এ মাসে শান্তি চুক্তি আরও একটি বিজয় সূচিত হয়েছে।' শান্তি চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে তিনি জানান।

পাহাড়ি বুদ্ধিজীবী, প্রবীণ শিক্ষক অনন্ত বিহারী খীসা বলেন, কি কি বিষয়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে তা না জেনে মন্তব্য করা ঠিক নয়। তিনি চুক্তি হওয়াতে ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সাবেক বিএনপি সভাপতি আবুল কাসেম বলেন, চুক্তিতে কি আছে জানি না। সকলের গ্রহণযোগ্য চুক্তি হলে তাকে স্বাগত জানাই। তিনি এ অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসবে বলে মনে করেন।

রাঙ্গামাটি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা : রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, পার্বত্য এলাকার আপামর জনসাধারণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তবে রূপদানের বাস্তব প্রয়াসে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সহি হওয়ায় পরিষদ ও জেলাবাসীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শান্তিবাহিনীর সাবেক সক্রিয় নেতা ও রাঙ্গামাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান মনি স্বপন দেওয়ান লিখিত বিবৃতিতে বলেন, পার্বত্য শান্তি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হওয়ার ব্যাপারে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও জনগণের প্রতি সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বান্দরবান থেকে নিজস্ব সংবাদদাতাঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান খোয়াই চ প্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, শান্তি চুক্তি

সইয়ের সংবাদ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। সম্পাদিত শান্তি চুক্তির ব্যাপারে বান্দরবান জেলা সদরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নেতৃবৃন্দ এবং রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, এই শান্তি চুক্তি পার্বত্যবাসীর জন্য শান্তির মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

সাবেক চেয়ারম্যানঃ জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মংক্যচিং চৌধুরী পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, চুক্তির সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে। শান্তি বিরাজ করবে এবং উন্নয়ন কাজও ত্বরান্বিত হবে।

সংবাদ

৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

গণতন্ত্রী পার্টির প্রতিক্রিয়া

পাহাড়ি-বাঙালিরা শান্তিপূর্ণভাবে বাস করবে

পার্বত্য শান্তিচুক্তি সই হওয়ায় গণতন্ত্রী পার্টি সন্তোষ প্রকাশ করেছে। গতকাল বুধবার এক সভা পার্টির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রেজাউল করিম লেবু, ফকির আবদুর রশিদ, প্রদ্যুৎ রায়, জেডএ ওয়াহেদ, শরাফত আলী হিরা, ডাঃ এস সিকদার, বাবুল দে, এডভোকেট আবদুল গফুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভার এক প্রস্তাবে বলা হয়, শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পাহাড়ি বাঙালিরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম হবে। এছাড়া পার্বত্য এলাকাও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সভার প্রস্তাবে শান্তিচুক্তি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তির অপচেষ্টা ও চক্রান্ত সম্পর্কে সরকার ও দেশবাসীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানানো হয়। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

আমরাও চাই শান্তিচুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হোক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শান্তিচুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের সহিংসতা ও সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে সংবিধানের অধীনেই শান্তিচুক্তি সই হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রপতির কাছে চুক্তির কপি পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে শান্তিচুক্তি আলোচনার জন্য তা সংসদে পাঠাতে পারেন। আমরা চাই শান্তি চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হোক, এই আলোচনা যাতে সংসদে হয়, সে ব্যাপারে আমরা রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানাব।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় দৈনিক ও বার্তা সংস্থাসমূহের সম্পাদকদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিয়ে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেছেন। তিনি বলেন, শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বৃটিশ আমল থেকে পার্বত্যঞ্চল বিশেষ অঞ্চল হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অতীতের সরকারগুলো পার্বত্যঞ্চলের সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিলেও সফল হয়নি। ১৯৮৯ সালে পার্বত্যঞ্চলে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। বর্তমান সরকার দক্ষতার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী চুক্তির ব্যাপারে যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা না হয়, সে জন্য সংবাদপত্রসহ সব মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান বিরোধীদল বিএনপি শান্তিচুক্তি মানছে না এবং চুক্তি সম্পর্কে ১৮ দফা দিয়েছে— এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এই প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু বিরোধিতার কারণেই তারা বিরোধিতা করছে। বিএনপি'র শাসনামলে এই ধরনের চুক্তির প্রস্তাবনা এবং সেটি মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তারা এটি পিছিয়ে দেয়।

তিনি বলেন, শান্তিচুক্তিতে জাতি আনন্দিত। এক্ষেত্রে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য ও কর্মসূচি দুর্ভাগ্যজনক। তারা পানিচুক্তিরও সমালোচনা করেছে। দেশবাসীর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা কাজ করেছে। তাদের কোন পয়েন্ট নেই। বিএনপি প্রতিনিয়ত ইস্যু পরিবর্তন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী কয়েক বছর আগে শান্তিবাহিনী হটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশিরভাগ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। বাকি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সময় হঠাৎ করে অস্ত্রবিরতি করা হয়। এর কারণ কি ছিল, সেই প্রশ্ন রয়ে গেছে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর অনেক ক্ষতি হয়েছে। সেনাবাহিনীর আর ক্ষতি হতে দেয়া যায় না। একদিকে শান্তি বাহিনীর গুলি, অন্যদিকে ম্যালেরিয়া এবং মশার কামড়। এই অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকবে। বাঙালিরা উপ-জাতিদের সঙ্গে যাতে মিলেমিশে থাকতে পারে সে জন্যই এই চুক্তি হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, বন ও পরিবেশমন্ত্রী বেগম সাজেদা চৌধুরী, খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, সংসদে সরকারি দলের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নান এমপি ও আমির হোসেন আমু এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর লায়স শান্তি পুরস্কার গ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে রক্তক্ষরণকে চিরদিনের জন্য মুছে দিতে চাই। এজন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থকে বড় করে না দেখে দেশের, জাতির এবং মানবতার স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লায়স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ৩১৫-এ২ ডিস্ট্রিক-এর পক্ষ থেকে ‘লায়স শান্তি পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর সৈয়দ মোদাশ্শের আলী। বক্তব্য রাখেন লায়ন মোসলেম আলী খান, লায়ন আনোয়ার হোসেন খান, লায়ন বদিউল ইসলাম, লায়ন এম.এ হাসান প্রমুখ।

পার্বত্য শান্তিচুক্তির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একই দেশের অধিবাসী হয়ে কেন রক্তারক্তি, হানাহানি হবে। বাঙালি, পাহাড়ি কিংবা সেনাবাহিনীর সদস্যরা কেন লাশ হয়ে ঘরে ফিরবে? তিনি বলেন, আমরা এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য চুক্তি করেছি। চুক্তি নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হতে পারে; কিন্তু দেশের স্বার্থে সংকীর্ণ দলীয় মানসিকতার পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

প্রধানমন্ত্রী লায়স ক্লাবের সম্মাননার জবাবে বলেন, যে সম্মান আমাকে দেয়া হয়েছে, আমি মনে করি এ সম্মান জনগণের প্রাপ্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শান্তি পুরস্কারস্বরূপ প্রধানমন্ত্রীকে সোনা ও রূপার তৈরি একটি ক্রেস্ট তুলে দেন লায়ন সৈয়দ মোদাশ্শের আলী এবং এক লাখ টাকার চেক দেন লায়ন ফরিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন লায়ন আনোয়ার হোসেন খান।

সম্মাননাপত্র পাঠকালে সৈয়দ মোদাশ্শের আলী বলেন, ‘৮১ সালে দেশে ফেরার পর শেখ হাসিনা প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশোধের বাণী শোনাননি, তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়েছিলেন।

সংবাদ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

যুক্তরাষ্ট্র শান্তি চুক্তির প্রশংসা করেছে

যুক্তরাষ্ট্র গতকাল বৃহস্পতিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির প্রশংসা করেছে। খবর বাসস’র। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগের বরাত দিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের একজন মুখপাত্র বলেন, যুক্তরাষ্ট্র শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানায়।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এটা স্বীকার করে যে, চুক্তির অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে তার শর্ত ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত থাকতেই পারে। তিনি আরো বলেন : আমরা আশাবাদী যে, সকলপক্ষের সদিচ্ছায় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হবে এবং এতে পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান ঘটবে। মুখপাত্র বলেন, দু’যুগেরও বেশি ধরে এই বিরোধে বহু লোক প্রাণ হারায়।

সংবাদ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

কূটনীতিক ও আইনবিদদের মন্তব্য

শান্তি চুক্তির সঙ্গে সংবিধানের বিরোধ নেই

■ বহু দেশের জন্য এটি হবে মডেল

মোস্তফা কামাল ৯ দেশের বিশিষ্ট কূটনীতিক ও আইনজীবীরা পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে ঐতিহাসিক চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, এ চুক্তি গৃহযুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নিরসনে বিশ্বের বহু দেশের কাছে ‘মডেল’ হিসেবে চিহ্নিত হবে। তারা বলেন, চুক্তিটি পুরোপুরি সংবিধানসম্মত হয়েছে এবং সংবিধানের সাথে এর কোন বিরোধ নেই।

গত ২রা ডিসেম্বর সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শান্তিচুক্তি সই হওয়ার পর এ বিষয়ে কূটনীতিক ও আইনজীবীরা ‘সংবাদ’-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই মত জানান। চুক্তি প্রসঙ্গে তাদের দেয়া বিশ্লেষণ এখানে তুলে ধরা হল।

ফখরুদ্দিন আহমেদঃ সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমেদ পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে ঐতিহাসিক চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন : চুক্তিটি অত্যন্ত ইতিবাচক। এ চুক্তি শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করবে এবং এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যা দূরীভূত হবে। তিনি বলেন : এই চুক্তি শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের দরবারে একটি ‘মডেল’ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

তিনি আরো বলেন, আমি মনে করি চুক্তিটি দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। তিনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, দেশ শান্তির দিকে এগুচ্ছে। শান্তি প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিষয়টিকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা করা উচিত, রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা উচিত।

তিনি বলেন, এখন যাতে পাহাড়ি-বাঙালি শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে এবং পাহাড়িরা সমান মর্যাদায় বসবাস করতে পারে তা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা উচিত।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শান্তিচুক্তির প্রক্রিয়া বিএনপি আমলেই শুরু হয়েছিল। এই সরকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এবং অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছে। সফলতার পেছনে বিএনপিরও অবদান রয়েছে। কারণ বিএনপি আলোচনা শুরু না করলে এই সরকার এত দ্রুত চুক্তি করতে পারত না।

ফখরুদ্দিন আহমেদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, চুক্তি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ সম্ভব হবে। তিনি বলেন, চুক্তিতে সংবিধান পরিপন্থী কিছুই চোখে পড়েনি। কাজেই মামলা করলেও চুক্তির কোন ক্ষতি হবে না বলে আমার ধারণা।

ফারুক চৌধুরীঃ সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক চৌধুরী বলেছেন : ‘সাবাস শেখ হাসিনা।’ দেশের জন্য অত্যন্ত ভাল একটি কাজ আপনার সরকার করল। যাদের কঠিন পরিশ্রমে এই চুক্তিটি সই হল তাদের সবাইকে বিশেষ করে সন্ত লারমা ও আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই বিষয়টির সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব এবং ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে আমি এক সময় নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলাম। আমি এক কথায় এটাই বলব যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা সংখ্যালঘু পাহাড়িদের ওপর বছরের পর বছর যে অন্যায়-অবিচার করেছি তা এই চুক্তি-উদ্ভূত পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে চিরতরে অবসান ঘটুক।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, এই চুক্তিটি কার্যকর করা হলে বাংলাদেশ আরো সংহত হবে, শক্তিশালী হবে, শান্তিপূর্ণ হবে, সুন্দর হবে। ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। এই ডিসেম্বরেও আমাদের বিজয় ঘটেছে। যারা স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব গেল গেল বলে রব তুলেছেন, বিধাতা তাদের ক্ষমা করুন। তারা স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব মোটেই হারাননি। হয়তো বা অন্য কিছু হারিয়েছেন।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামঃ বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, চুক্তিটি সংবিধানসম্মত হয়েছে এবং এর কাঠামো স্থানীয় সরকারের কাঠামো অনুযায়ী হয়েছে। অর্থাৎ সংবিধানের ৯, ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে বিষয়টি সন্নিবেশিত আছে।

৩ জেলার ব্যাপারে ১৯৮৯ সালে যে আইন করা হয়েছিল এবং সে আইনে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল সে ক্ষমতাই দেয়ার কথা চুক্তিতে রয়েছে। বাড়তি কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তবে আরো গণতন্ত্রীকরণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আঞ্চলিক একটি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। তবে সে পরিষদকে রুলস রেগুলেশন করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র ‘কো-অর্ডিনেট’ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এজন্য একজন মন্ত্রী থাকবে বলে বলা হয়েছে। জিয়াউর রহমানের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত একজন উপদেষ্টা নেয়া হয়েছিল। তখন বিনিতা রায় উপদেষ্টা ছিলেন। তারপর ছিলেন অংশু প্রা চৌধুরী।

এরশাদ সরকারের সময়ও উপেন্দ্র চাকমাকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল। এই সরকার যা করেছে তা হল গত তিন সরকারের প্রচেষ্টাকে সফল রূপ দিয়েছে। চুক্তিতে নীতিগত কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন— আলি আহমদ যার ভিত্তিতে সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন সেই একই নীতিতে সরকার অগ্রসর হয়েছে। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম চুক্তিটিকে সমঝোতা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এটি বাস্তবায়নের জন্য সংসদকেই দায়িত্ব নিতে হবে। সংসদ কতগুলো ‘এমেন্ডমেন্ট’ নিয়ে কার্যকর করবে।

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, মামলা করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে তা হতে হবে যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক। মামলা করলে আদালত যখন চুক্তির পক্ষে বলবে তখন সংশয় আরো কেটে যাবে। তিনি বলেন, রাস্তায় না গিয়ে যদি কেউ কোর্টে যায়— ভালো। জনগণের দুর্ভোগ না বাড়ানোই যুক্তিযুক্ত হবে। তিনি অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, অবশ্যই চুক্তিটি সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। অন্যথায় বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

সংবাদ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

চুক্তির ৪টি ধারায় আপত্তি : জাপার দাবি

শান্তি চুক্তি সংসদে পাস করতে হবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়ামের সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির কিছু অংশের সমালোচনা করে বলা হয়েছেঃ এই চুক্তির কতিপয় বিষয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদে পাস করা না হলে জাতীয় পার্টি চুক্তি সমর্থন করবে না এবং এই প্রক্রিয়ার সাথে থাকবে না।

গতকাল বৃহস্পতিবার এইচ এম এরশাদের সভাপতিত্বে তার বারিধারাস্থ কার্যালয়ে এই প্রেসিডিয়ামের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পার্বত্য

চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি পর্যালোচনা করা হয়। জাপান সূত্র জানায়, প্রেসিডিয়াম সদস্যরা এই চুক্তি জাতীয় সংসদে কোন আলোচনা না করেই স্বাক্ষর করার তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় সদস্যরা চুক্তির ৪টি পয়েন্টে বিরোধিতা করেছেন। এগুলো হচ্ছেঃ

(১) সংবিধানে দেশের অখণ্ডতা ও একক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের ‘কনসেন্ট’ বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী। আঞ্চলিক পরিষদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

(২) পার্বত্য অঞ্চলে ১০ লাখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪ লাখ বাংলা ভাষাভাষী ও সংখ্যালঘু অন্য উপজাতি রয়েছে। তাদের স্বার্থ রক্ষা ও জীবনযাপন নিশ্চিত করার কথা এই চুক্তিতে বলা হয়নি।

(৩) বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ভূমি ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে একটি স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের যে ক্ষমতা রাখা প্রয়োজন তা খর্ব করা হয়েছে।

(৪) বনাঞ্চল ও বিভিন্ন সম্পদের রয়্যালটির অংশবিশেষ আঞ্চলিক পরিষদকে দেয়ার যে বিধান রাখা হয়েছে তাতেও সরকারের ক্ষমতাকে খাটো করা হয়েছে।

সভায় বলা হয়, এই বিষয়গুলোর পরিবর্তন না করা হলে জাপা চুক্তিকে সমর্থন দিতে পারে না। প্রেসিডিয়ামের সভায় জাপার মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, নাজিউর রহমান মঞ্জুসহ অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন বলে সূত্র জানায়।

ধানমন্ডিতে সভা

প্রেসিডিয়াম সভার সিদ্ধান্তের পর গতকাল বিকেলে জাপা চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ ধানমন্ডি থানা জাপার সম্মেলনে তার বক্তব্যে বলেন, আমরা শান্তিচুক্তির প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাই; কিন্তু বর্তমান চুক্তিকে সমর্থন করি না। তিনি বলেন, শান্তিচুক্তির গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে তা প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ জাতীয় সংসদে পাস করতে হবে। গতকাল রায়েরবাজার হাইস্কুল মাঠে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ধানমন্ডি থানা জাপার সভাপতি আমজাদ হোসেন মিয়ান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন জাপার মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, অতিরিক্ত মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জু, কাজী ফিরোজ রশীদ, মাহবুবুল হক দোলন, জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল, আবদুস সালাম প্রমুখ।

জাতীয় পার্টি

জাতীয় পার্টির মহাসচিব যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু যথায়থ মর্যাদায় সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য সকল পর্যায়ের শাখা

কমিটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ঢাকা মহানগর জাতীয় পার্টি বিকেল ৫টায় কলাবাগানস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। জাতীয় ছাত্রসমাজ ও তরুণ পার্টি সকাল ৮টায় মরহুমের মাজারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবে।

গণফোরাম

গণফোরাম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল ৮টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমায়েত হয়ে মরহুমের কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবে।

সংবাদ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্যঞ্চল উন্নয়নে সাহায্য দিতে রাজি দাতাগোষ্ঠী (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশস্থ দাতা দেশ ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। গতকাল শেরে বাংলানগরস্থ এনইসি ভবনে আয়োজিত এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। দাতাগোষ্ঠী এই মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে হাসপাতাল, স্কুল ও রাস্তাঘাট তৈরির জন্য অর্থ দিতে সম্মত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি’র প্রতিনিধিরা প্রণীত চুক্তির বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসনগুলোকে অবিলম্বে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রস্তাব প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। আগামী ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর কাছ থেকে এসব প্রস্তাবলি নিয়ে সরকার পরে দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে আবার বৈঠকে বসবে।

গতকাল এ বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আগত প্রতিনিধিদের বলেন, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে খুব শিগগিরই সকল শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে। সরকার আশা করছে তারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। তিনি বলেন, শান্তির পথে যেসব পাহাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বড় ও মাঝারি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হবে। দাতা দেশ ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এসব কাজে তাদের আর্থিক সাহায্য দেয়ার কথা বলেছে বলে বৈঠকের একটি সূত্র জানিয়েছেন।

দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওগুলোর অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানালে

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা নিজেরাই পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবো।

দাতাগোষ্ঠী ও দেশের প্রতিনিধিরা প্রণীত চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। এ বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপানের রাষ্ট্রদূত, কানাডার হাইকমিশনার ছাড়াও বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মশিউর রহমান, অর্থ সচিব ডঃ আকবর আলী খান, প্লানিং কমিশনের সদস্য কাজী শামসুল আলম এবং বিশেষ সম্পর্ক বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

জনসংহতি সমিতি নেতা

শান্তিবাহিনী সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে

খাগড়াছড়ি, ৪ঠা ডিসেম্বর (বাসস)।—পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পার্বত্য এলাকায় প্রায় দু'দশক ধরে যে সহিংস তৎপরতা চালাচ্ছে, তা ছেড়ে এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জনসংহতি সমিতির এক উর্ধ্বতন নেতা আজ জানান, গত সেপ্টেম্বর মাসে ষষ্ঠ দফা বৈঠকের পর জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সশস্ত্র ক্যাডারদের গোপন আস্তানাগুলোকে গুটিয়ে ফেলতে বলে।

জনসংহতি নেতৃবৃন্দ এখন অস্ত্রসমর্পণ ও বিদ্রোহ অবসানে চুক্তির শর্ত পূরণের ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছেন।

সংবাদ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ

শান্তিচুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বান

মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ (মুসপ) কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী এমপি এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ পিণ্টু এক বিবৃতিতে শান্তিচুক্তিবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য দেশবাসী তথা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

সংবাদ

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম

অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩ মাস বাড়ছে

॥ সাগর সরওয়ার ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আরো ৩ মাস বাড়ছে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে এ পর্যায়ের অস্ত্রবিরতির মেয়াদ।

সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছেন, জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের জাতীয় কমিটির চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসন গঠন করা এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সরকারের বেশ কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। সরকার একারণে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়াতে চায়।

সরকারের জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে চুক্তি সইয়ের ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা পাঠানোর কথা। এরপর সকল সদস্যের অস্ত্র জমাদানের দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছেন, এই ৪৫ দিনের পরও আরো অনেকটা সময় লাগবে অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপারে। সরকার সকল দিক বিবেচনা করে আরো ৩ মাস অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়াতে চায়।

সূত্র বলছেন, আগামী দিন দশেকের মধ্যেই এ প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি চিঠি যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানো হবে। প্রণীত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে যেসকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবেন সরকার তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেউ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলা হয়েছে এ চুক্তিতে। সূত্র বলছেন, বর্তমানেও যে কোন শান্তি বাহিনী সদস্য আত্মসমর্পণ করতে পারেন। সে সুযোগ রয়েছে। তবে এ পর্যায়ে কোন সদস্য আত্মসমর্পণ না করার কোন লক্ষণ নেই, কারণ সমিতির দেয়া তালিকা মতো আত্মসমর্পণ করলে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছেন, ৪৫ দিন পর জনসংহতি সমিতির পক্ষে প্রথমে একটি টোকেন অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেয়া হতে পারে। ৩ মাস অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হলে সরকার এবং জনসংহতি সমিতি উভয়েরই সুবিধা হবে বলে জানা গেছে।

পার্বত্যঞ্চলে শান্তি চুক্তিতে তিন সার্কলের রাজাদের অধিকতর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে বোমাং এবং মং সার্কলের রাজা নিয়ে। কেবলমাত্র চাকমা সার্কলের রাজা নিজ দায়িত্বে আছেন। বোমাং সার্কলের রাজা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে যে মামলা চলছে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। মং সার্কলের রাজার পদ নিয়ে সংকট চলছে। সরকার দ্রুত রাজার শূন্য পদ পূরণ করবে বলে সূত্র জানিয়েছেন। এ দুই সার্কলের রাজার পদ পূরণ না করলে ভূমি ও স্থানীয় প্রশাসন নিয়ে নানা ধরনের ঝামেলা হতে পারে বলে সূত্র বলছেন।

সংবাদ

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

প্রধানমন্ত্রীকে শান্তিচুক্তির

জন্য রাজা ত্রিদিব রায়ের অভিনন্দন

সাবেক চাকমা নেতা রাজা ত্রিদিব রায় সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইসলামাবাদ হতে প্রাপ্ত এক বার্তার বরাতে দিয়ে বাসস গতকাল শুক্রবার এ খবর দিয়েছে।

শান্তিচুক্তির জন্য রাজা ত্রিদিব রায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্ত্রিয় লারমাকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সংবাদ

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বাংলাদেশ সরকারকে শান্তিচুক্তির জন্য

অস্ট্রেলিয়ার অভিনন্দন

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির জন্য অস্ট্রেলিয়া গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। খবর বাসস'র।

অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাউনার অটোয়া থেকে পাঠানো এক বার্তায় আশা প্রকাশ করে বলেন যে, এই চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার স্থায়ী ও স্থিতিশীল সমাধান বয়ে আনবে। তিনি এই চুক্তির সাফল্য নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণের জন্য সকল পক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সম্প্রীতি সমাবেশে বক্তব্য

স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিই শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সম্প্রীতি সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, যারা শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে তারা দেশের উন্নতি চায় না। স্বাধীনতা বিরোধীরাই এই চুক্তির বিপক্ষে রয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন। বক্তারা সরকারের প্রতি অবিলম্বে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান জানান। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদারের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, আমির হোসেন আমু, জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদ, বামফ্রন্ট নেতা মোরশেদ আলী, নাট্যকার মামুনুর রশিদ এবং নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ও গোলাম কুদ্দুস। গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি হওয়ার ফলে অংশীদারিত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার কায়ম হচ্ছে। সংসদে এ চুক্তি নিয়ে যখন আলোচনা হবে, তখন এ হরতাল ডাকার কোন অর্থ নেই। হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এ হরতাল ডাকা হয়েছে। তিনি বলেন, এ অঞ্চলে শান্তি আসলে দেশে আরো বিদেশী পুঁজি আসবে। ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। তিনি বলেন, সরকারের জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে, তা সংবিধানের মধ্য থেকেই করা হয়েছে। এতে দেশের সার্বভৌমত্ব কিছুই ক্ষুণ্ণ হয়নি।

জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির যারা বিরোধিতা করছে, তারা চায় সবসময় এ অঞ্চলে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করুক। কারণ, এতে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা, মাদক এবং চোরাচালান নির্বিল্পে করা যায়। শান্তিচুক্তি হলে এসব সম্ভব হবেনা বলেই তারা শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে। তিনি এ চুক্তি করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

বামফ্রন্ট নেতা মোরশেদ আলী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করছে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পাহাড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, দেশে অশান্তির বীজ বুনেছিলো। তাদেরকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে।

মামুনুর রশিদ বলেন, আমরা এই শান্তিচুক্তির জন্য গর্ব করতে পারি। শান্তির পক্ষে চুক্তি একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এটি পথ দেখিয়ে দিয়েছে শান্তির ঠিকানার। এখন এ চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভাপতির ভাষণে রামেন্দু মজুমদার বলেন, এ চুক্তি হওয়ায় দেশবাসী আনন্দিত। দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে থাকা সমস্যার যে সমাধান হচ্ছে— এ চুক্তি তাই প্রমাণ করেছে। তিনি অপপ্রচারে জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শান্তিচুক্তির যারা বিরোধিতা করছে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

সংবাদ

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করুন: আ'লীগ

আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে বিএনপি ও মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবির চক্রের মনগড়া কাল্পনিক অভিযোগ ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। একই সাথে আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা পরিহার করে জাতীয় সংসদে ফিরে এসে সংসদকে সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু করা ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল বিরোধীদের ভূমিকা পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় গণভবনে অনুষ্ঠিত দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সভার প্রস্তাবে এই আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সইয়ের পূর্বাপর পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয় ঃ বাইরের হস্তক্ষেপ বা কারো মধ্যস্থতা ছাড়াই একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নৃ-জাতিগত সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক এই সমাধান সমকালীন বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। এই চুক্তি কেবল বাংলাদেশ নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

সংবাদ

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্যঞ্চলে শান্তি চুক্তি

খালেদার ১৮ দফা আপত্তির জবাবে শেখ হাসিনার ব্যাখ্যা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী যে ১৮ দফা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার জবাব দিয়েছে সরকার।

গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার আপত্তিওয়ারী জবাব তুলে ধরেন। পাঠকের সুবিধার্থে বিএনপি'র বক্তব্যের পাশাপাশি সরকারের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

বিএনপি'র বক্তব্য: এই চুক্তির মাধ্যমে এই সরকার বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল হতে স্বাধীন সার্বভৌম এককেন্দ্রিক ক্ষমতা প্রত্যাহার করে এটি দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েছে এবং স্বাধীনতার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে।

সরকারের ব্যাখ্যা: অভিযোগটি সর্বতোভাবে সত্যবিবর্জিত এবং অপপ্রচার। অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিকও বটে। কেননা, সংবিধানের আওতায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আস্থা রেখেই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিএনপি: এই চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 'বিষবৃক্ষ' রোপিত হয়েছে।

সরকার: এটি একটি অস্পষ্ট (Vague) অনির্দিষ্ট ও অপপ্রচারমূলক অভিযোগ। বরং এ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও জাতিসত্তার মধ্যে বিরাজমান বিভেদ দূরীভূত হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান ঘটবে। শান্তিবাহিনীর বৈরী তৎপরতা বন্ধ হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্য ও উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় উপজাতিদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বিএনপি: চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

সরকার: এ বিষয়টা পূর্ব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য জিইয়ে রেখে বেআইনি ফায়দা লোটোর অপকৌশল ও অপপ্রয়াস মাত্র।

বিএনপি: সংবিধানের ১নং ধারায় বলা আছে, বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। সুতরাং সংবিধানে পৃথক কোন আঞ্চলিক পরিষদ বা প্রদেশ করার বিধান নেই। চুক্তির 'গ' অধ্যায়ের ১নং পঙ্ক্তিতে যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের ১নং ধারার পরিপন্থী।

সরকার: বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। সংবিধান সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে এমন কেউ এ বক্তব্য রাখতে পারেন না। আঞ্চলিক পরিষদ মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি স্থানীয় পরিষদের সমন্বয়কারী সংস্থা। যা আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী তো নয়ই, বরং সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৯ ও ১১ অনুচ্ছেদ, তৃতীয় ভাগের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ ও চতুর্থ ভাগের তৃতীয়

পরিচ্ছেদের ৫৯(১) ও ৬০ অনুচ্ছেদের পরিপূরক। সুতরাং অভিযোগটি বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি অপকৌশলমাত্র।

বিএনপি: বাংলাদেশের সংবিধানে অঞ্চলভিত্তিক মন্ত্রী নিয়োগের কোন বিধান নেই। চুক্তির মাধ্যমে একটি বিশেষ অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রী নিয়োগ ও মন্ত্রণালয় সৃষ্টি এবং তাকে সহায়তা করার জন্য নির্দিষ্ট ঐ অঞ্চলভিত্তিক উপদেষ্টা পরিষদ এবং তার অধীনে একটি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নির্বাহী ও সর্বময় ক্ষমতার প্রয়োগ বাংলাদেশ সরকারের বিপরীতে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের শামিল বিধায় এই চুক্তি অবৈধ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকার: সংবিধানে মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল শর্তাবলি রয়েছে তা কোনক্রমেই কোন অঞ্চলভিত্তিক মন্ত্রী নিয়োগের পথে অন্তরায় নয়। বিশ্বের অনেক উন্নত ও গণতান্ত্রিক দেশে উপজাতি, আদিবাসী ও অঞ্চলবিশেষের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন ও মন্ত্রী নিয়োগের বিধান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যুক্তরাজ্যে স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড বিষয়ক মন্ত্রী আছেন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রী রয়েছেন। এমনকি মরহুম রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান চাকমা রাজমাতা বিনীতা রায়কে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী) নিয়োগ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত সংবিধানের নবম ভাগের ১ম পরিচ্ছেদের ১৩৬ অনুচ্ছেদের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে যে মন্ত্রণালয় গঠন ও পুনর্গঠনের বিষয়টি সম্পূর্ণ সংবিধানসম্মত। বর্তমানে যে ‘বিশেষ কার্যাদি বিভাগ’ রয়েছে— যা বিএনপি শাসনামলেও পূর্ণরূপে কর্মরত ছিল তা কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য বিশেষ অঞ্চল বিষয়ক একটি কর্ম বিভাগ বা মন্ত্রণালয়। অতএব বিএনপি’র এ বিষয়ক বক্তব্য কার্যত তাদের কৃতকর্মকাণ্ডের বিপরীত অবস্থান এবং পরস্পরবিরোধী।

বিএনপি: এই চুক্তি বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করতে গিয়ে পাল্টা বৈষম্য সৃষ্টি করেছে যা সংবিধানের ২৯নং ধারার পরিপন্থী।

সরকার: তাদের এ বক্তব্যটি সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী তো নয়ই, বরং ২৮(৪) অনুচ্ছেদের পরিপূরক। এ বক্তব্যে তাঁরা “তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করতে গিয়ে” কথা কয়টি উল্লেখ করে কার্যত বিশেষ বিধান প্রণয়নের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাই স্বীকার করে নিয়েছেন। বস্তুত অনগ্রসর শ্রেণী গোষ্ঠীর জন্য কোন বিধানই ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হতে পারে না। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, উপজাতি এবং জেলা কোটা— এই বিশেষ বিধানের অধীনেই কার্যকর আছে এবং এ কোটা পদ্ধতি সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী

একথা কেউ কখনো বলেননি বা বলার অবকাশও নেই। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কোন বিশেষ বিধান করা হলে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এমনটি ভাবা অবাস্তব।

বিএনপি: চুক্তির ‘গ’ খণ্ডের ১৩ ধারার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় এবং জাতীয় সংসদের প্রধান ক্ষমতা খর্ব করার সুস্পষ্ট চক্রান্ত। জাতীয় সংসদের সম্মান এবং সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করার এই প্রচেষ্টা দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকার: এটা কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীত। প্রকৃতপক্ষে যেকোন আইনের খসড়া সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে মন্ত্রণালয়, আন্তঃমন্ত্রণালয়, আইন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট মহল এবং মন্ত্রিসভা প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এমনকি, সংসদে আইনের খসড়া উপস্থাপনের পরও কমিটি পর্যায়ে তা যাচাই বাছাই আলোচনা পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, আইন প্রণয়নে এ সকল কর্মকাণ্ড সংসদের সার্বভৌমত্ব খর্ব করে। এমনকি সংসদও যেকোন আইন প্রণয়নের পূর্বে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করতে পারে। বর্তমান সংসদেও বিএনপি’র সংসদ সদস্যগণ প্রায়শই বিভিন্ন আইনের খসড়া জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। সুতরাং তাদের এ বক্তব্যটি স্ববিরোধী।

বিএনপি: সংবিধানের ৩৬ ধারা বলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার, বাংলাদেশের যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন একটি মৌলিক অধিকার। চুক্তির ‘গ’ অধ্যায়ের ২৬নং পংক্তি সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার লংঘন করেছে।

সরকার: বক্তব্যটি যেভাবে উত্থাপন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাতপ্রসূত। সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সর্বত্র চলাফেরা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।” বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ‘খ’ অধ্যায়ের ২৬নং পঙ্ক্তিতে বা চুক্তির অন্য কোথাও এমন কিছু নেই যা সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদ বা অন্য কোন অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। ৩৬ অনুচ্ছেদের বক্তব্য পাঠকালে সর্বদায় একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, “জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ—” বলে যে কথা কয়টি রয়েছে তা গুরুত্বহীন নয়।

বিএনপি: সংবিধানের ৪২(১) ধারার অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিব্যবস্থা করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। চুক্তির ২৬নং পণ্ডিত বাংলাদেশের নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার খর্ব করেছে।

সরকার: এ অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যাচার এবং বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। তাদের ৮ দফায় যা বলা হয়েছে এটিও অনুরূপ একটি বক্তব্য। কেননা, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২(১) এ আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে “কথা কয়টি দিয়ে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিব্যবস্থা করিবার” অধিকারকে শর্তাধীন করা হয়েছে। অধিকন্তু চুক্তির কোথাও অবাধ চলাচল বা সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি। আইনের অধীনে কতিপয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তা যথারীতি বহাল রাখা হয়েছে।

বিএনপি: বাংলাদেশ সরকারের যে কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি অধিগ্রহণ, ইজারা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর রয়েছে সে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে এই সরকার এই চুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে সমর্পণ করেছে। এতে সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।

সরকার: বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্যের অপলাপ মাত্র। এ বক্তব্যের সাথে চুক্তির কোন ধারা উপধারা বা বক্তব্যের কোন মিল নেই। তাদের অভিযোগের ৯নং ধারা সম্পর্কে আমরা যে বক্তব্য রেখেছি- ১০নং অভিযোগ সম্পর্কেও আমাদের বক্তব্য একই রকম। চুক্তির কোথাও ভূমি বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়নি। দেশের অন্যত্র ভূমি ব্যবস্থাপনায় সরকারের যে কর্তৃত্ব রয়েছে এ ক্ষেত্রেও তাই রয়েছে। কোনরূপ ছাড় দেয়া হয়নি। পার্বত্য জেলাসমূহে কর আদায়ের পদ্ধতি পূর্বে যা ছিল বর্তমানেও তাই রয়েছে।

বিএনপি: এই চুক্তির মাধ্যমে ঐ দেশের নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলাভাষী নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার হরণ করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। তাদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সীমিত করে চাকরি, জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদিতে বাধা সৃষ্টি করে। এ দেশের সাধারণ নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে।

সরকার: এ বক্তব্যটিও একটি মিথ্যা বিবৃতি। কেননা, এ চুক্তির মাধ্যমে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়নি। বাঙালিদের কোন নাগরিক অধিকারও ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এর নির্দেশানুসারে কতিপয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। তাদের চাকরি জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই কারো কোন মৌলিক অধিকারহরণ করা হয়নি।

বিএনপি: জেলা প্রশাসক পদ বিলুপ্তি ও কমিশনারের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্য সীমিতকরণ ও সমস্ত সরকারি, আধা সরকারি কর্মচারী, পুলিশ শান্তি-

শৃংখলা রক্ষা বাহিনীদের সরকারের অধীনে না রেখে বস্ত্ত পার্বত্য পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। এতে একই দেশে দু’টি ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থার জটিলতা সৃষ্টি এবং সরকারি/আধা-সরকারি কর্মচারীদের মর্যাদা নিম্নমুখী করা হয়েছে। সরকারি প্রশাসনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেশের বাকি অংশেও জটিলতা বৃদ্ধি করবে।

সরকার: এ বক্তব্যটি সর্বৈব মিথ্যা ভাষণ। জেলা প্রশাসক পদ বিলুপ্ত করা হয়নি বা কমিশনারের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্যও সীমিত করা হয়নি। আমরা দেশের প্রত্যেক জেলা-উপজেলা পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা নিচ্ছি। এসব পরিষদ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ নিজ আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এবং সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে। বিবেচ্য ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। একটি সমতল জেলায় জেলা পরিষদের পাশাপাশি যেমন জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন, তেমনি পার্বত্য জেলা পরিষদের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকও থাকবেন এবং তিনি তার ওপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাবেন। কমিশনারের দায়িত্ব কর্তব্য বা ক্ষমতা কোন অংশেই খর্ব বা সীমিত করা হয়নি। শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণের বিষয়ে কমিশনারের পরিবর্তে একজন বিচারপতি শপথ পাঠ করাবেন। এতে কমিশনারের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য কি করে খর্ব করা হল তা আদৌ বোধগম্য নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না বা তিনি কোন উপজাতির সদস্য সে সম্পর্কে সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে সার্কেল চিফের ওপর দেয়া হয়েছে এবং এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এতে জেলা প্রশাসকের পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে মর্মে যারা উচ্চকিত হচ্ছেন, তারা বস্ত্তপক্ষেই বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে যাচ্ছেন মাত্র।

বিএনপি: উপজাতীয় মন্ত্রী নিয়োগ এই চুক্তিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ওপর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর movement (চলাচল) সীমিতকরণ এবং তাদের পার্বত্য পরিষদের পরোক্ষভাবে অধীনস্থকরণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য সম্মান এবং মর্যাদাহানিকর।

সরকার: বিএনপি উত্থাপিত ৫নং অভিযোগও এ অভিযোগটি কার্যত একই অভিযোগ। মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ওপর কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হয়নি। এ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য তাদের অভিযোগনামার ৫নং ধারার উত্তরে যা বলেছি সেটাই এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিএনপি: সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর movement (চলাচল) সীমিতকরণ এবং তাদেরকে পরোক্ষভাবে পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থকরণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য সম্মান এবং মর্যাদাহানিকর।

সরকার: অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন। সামরিক, আধা-সামরিক বা শান্তি-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন বাহিনীর চলাচলের ওপরই কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি বা সীমিতকরণ করা হয়নি। সামরিক, আধাসামরিক বাহিনী বা শান্তি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীসমূহ সর্বদাই তাদের নির্দিষ্ট বিধিবিধানের আওতায় চলাচল করে থাকেন। যুদ্ধকালীন অবস্থা বা সিভিল কর্তৃত্বের সহায়ক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় তাদের যে চলাচল শান্তিকালীন বা স্বাভাবিক সময়ে তাদের চলাচলে সর্বদাই পার্থক্য থাকে। যেকোন আইনানুগ সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল সর্বদাই ও সর্বসময়েই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম করা হয়নি।

বিএনপি: এ অঞ্চলের প্রোটেক্টেড বনাঞ্চলসহ বহু জমির ওপর সরকারের অধিকার থাকা সত্ত্বেও চুক্তিতে বহু স্থানে এই সরকারি স্বার্থ তথা সমগ্র দেশের জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দেয়া হয়েছে। এমনকি সরকারের নতুন জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতাও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সরকার: এ বক্তব্যটি সর্বৈব মিথ্যাচার এবং অপপ্রচার। চুক্তির কোথাও এমন কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে নতুন জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতাও পূর্ববর্তী রয়েছে।

বিএনপি: সরকার কর্তৃক নানা ধরনের ট্যাক্স, খাজনা, টোল আদায়ের ক্ষমতা প্রত্যাহার, ভূমি, পুলিশ, পর্যটন, বিচারের, বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প স্থাপনের অনুমতি সংরক্ষণ, খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পরে লাভের কমিশন ব্যবস্থায় ইত্যাদি বহু বিষয়ে সরকার নিজস্ব অধিকার, ক্ষমতা ও রাজকোষে অর্থ উপার্জন সঙ্কুচিত করেছে।

সরকার: এটি একটি উদ্ভট কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। চুক্তির কোথাও এমন কথা নেই।

বিএনপি: সরকার সহিংসতাবাদীদের পুরস্কার দিতে রাজি হয়েছে, নগদ অর্থ দান, জীবিকার ব্যবস্থার এবং মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছে- অন্যদিকে নিরীহ অউপজাতীয়দের মধ্যে যাদের স্বজন নিহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সরকার: প্রত্যাশন প্রত্যাশীদেরকে পূর্বের সরকারসমূহও নগদ অর্থ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, জীবিকার ব্যবস্থা প্রদান করেছে। বর্তমান চুক্তিতেও তাই

আছে। পূর্ববর্তী সরকারসমূহের সময়ে কোনরূপ স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছাড়াই প্রত্যাশন প্রার্থীদের মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। চুক্তিতে সে ব্যবস্থাই অব্যাহত রাখা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, পূর্বে শান্তি স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান ব্যতিরেকেই আলোচ্য ব্যবস্থাসমূহ নেয়া হয়েছিল আর বর্তমানে শান্তি স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান করে এ সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য তাদের পূর্বকৃত কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিএনপি: পরিষদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া জমি, পাহাড় বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সরকার নিজস্ব ক্ষমতা পরিষদের কাছে সমর্পণ করেছে।

সরকার: অভিযোগের ১৫নং ধারায় যা বলা হয়েছে এ ধারাটি তার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট। তারা একটি কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে ধরেছেন।

সংবাদ

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

রংপুরে এরশাদ

শান্তি চুক্তি সমর্থন করি

তবে কিছু সংশোধন দরকার

রংপুর, ৭ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- জাপা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রংপুর সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় বলেছেন, বিএনপি নেত্রী না বুঝে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় পার্টি মনে করে, এই ‘শান্তি চুক্তি’ একান্ত জরুরি ছিল। আমরা এই চুক্তি সমর্থন করি; তবে কিছু বিষয়ে সংশোধনী আনা প্রয়োজন।

এরশাদ বলেন, শান্তি চুক্তিতে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উজাতীয় অঞ্চল, এটি সংশোধন করে তিনি উপজাতীয় ও বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করার দাবি জানান।

এরশাদ বলেন, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ও অঞ্চলসমূহে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে তার চেয়েও বিপজ্জনক ছিল শান্তিবাহিনীর এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামী সংসদ অধিবেশনে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে এই চুক্তির কিছু বিষয়ে সংশোধনী আনা হবে। যদি সংসদে তাদের এই সংশোধনী বিল পাস করা না হয় তাহলে এর প্রতিবাদে ‘ওয়াকআউট’ করবেন।

তিনি বলেন, আগ্রপোতা-দহগ্রাম ছিটমহল নিয়ে 'তিনবিঘা করিডোর' চুক্তি করে বিএনপি প্রথম দেশের কোন ভূখণ্ডের ওপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ বিদেশের হাতে তুলে দিয়েছে।

সংবাদ

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়

সংবিধানের খণ্ডিত ব্যাখ্যা দিয়ে

বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিএনপি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ৥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন : শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিএনপি সংবিধানের খণ্ডিত ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের ভূখণ্ডের প্রতি আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে শান্তিচুক্তি সই হয়েছে। এ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। গতকাল রোববার বিকেলে গণভবনে সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়-কালে শান্তিচুক্তি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একথা বলেছেন। তিনি বলেন : খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দিয়ে চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেছিল। অলির নেতৃত্বাধীন কমিটি ভারতে গিয়ে ১৩ বার বৈঠক করেছিল। আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে ওই কমিটিকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিএনপি সেই চুক্তি সম্পাদন করতে পারেনি।

আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিচুক্তি সই করেছে। এই চুক্তি সম্পাদনে বিএনপি কোন সহযোগিতা করেনি। বরং তাদের সদস্যদের কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে দেয়া হয়নি। বিএনপি সংবিধানের খণ্ডিত ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে।

শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিএনপির ১৮ দফা অভিযোগের প্রতিটির ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তি স্থাপনে তাদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের সফলতা তাদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। ভারতের সাথে দীর্ঘমেয়াদি পানি চুক্তির ক্ষেত্রেও তাদের বিরোধিতার মূল কারণ হচ্ছে তাদের ব্যর্থতার বিপরীতে আমাদের সাফল্য, তেমনিভাবে বর্তমান চুক্তির ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থান একই। ভিত্তিহীন, মিথ্যাচার, অপব্যাখ্যা, কাল্পনিক বক্তব্য, বিভ্রান্তি এবং কূট-কৌশলের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে তারা জনগণকে ধোঁকা দিতে চান, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের পথকে কন্ট্রাকার্ন করতে চান, বাধা ত্রস্ত করতে চান। সর্বোপরি তারা চান অবৈধ ও বেআইনি অস্ত্র ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী আর সন্ত্রাসীদের সহায়তা করতে। শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান

কোনক্রমেই দেশপ্রেমিক অবস্থান নয়। তাদের অবস্থান স্থিতিশীলতার পক্ষে নয়। নিজেদের ব্যর্থতা আর আমাদের সফলতা তাদের মনোজগতে এক ধরনের বিকারগ্রস্ততার জন্ম দিয়েছে। আর তাদের মনোবৈকল্যের যন্ত্রণা তারা দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। আমরা তাদেরকে যুক্তির পথে, গঠনমূলক পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাই। আমরা তাদেরকে স্থিতিশীলতার সপক্ষে, শান্তির সপক্ষে অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানাই। আমাদের আহ্বান আসুন, সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করি। আসুন, সকলে মিলে দেশ গড়ি। হিংসা, ঘেঁষ, সন্ত্রাস আর অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করা যায় না। বরং এসব নেতিবাচক ক্রিয়াকর্ম সর্বদা অন্ধকারের শক্তিকে মদদ যুগিয়ে থাকে।

'বিএনপি একের পর এক হরতাল দিয়ে চলেছে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি'-এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন : হরতাল সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করব না। তাদের কোন সুনির্দিষ্ট ইস্যু নেই, ইস্যুও পাণ্টে যাচ্ছে। তাদের হরতাল আহ্বান কতটা যুক্তিযুক্ত তা জনগণই বিচার করবে।

'শান্তিচুক্তি পার্বত্যঞ্চলে শান্তি নিশ্চিত করবে কিনা'-এই প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন : উভয় পক্ষেরই শান্তি প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে। কোন কোন দল পার্বত্যঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত করার উস্কানি দিচ্ছেন। তাদের উস্কানি সফল হবে না। সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সদস্য সুলতান মোহাম্মদ মনসুর ও আখতারুজ্জামান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এস, এ সামাদ, তথ্য সচিব আকমল হোসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জাওয়াদুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তিচুক্তির প্রতি সমর্থন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির প্রতি সংহতি ও সমর্থন ঘোষণা করে বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিসহ বেশকিছু সংগঠন গতকাল রোববার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশিদ আলম পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে

বলেছেনঃ এতে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে। শিক্ষক নেতারা এই চুক্তির বিরোধীমহলের অরাজকতা ও উত্তেজনা সৃষ্টির অপপ্রয়াস সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বলেছে : পার্বত্য শান্তিচুক্তি একদিকে পাহাড়ি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যদিকে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ঐক্য ও সংহতি জোরদার করবে। কোন কোন মহল জনগণকে বিভ্রান্ত করে শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে মত ব্যক্ত করে পরিষদ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণকে শান্তি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার আহ্বান জানায়।

সংবাদ

১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা

হবে সংসদে : প্রধানমন্ত্রী

কূটনৈতিক বার্তা পরিবেশক ৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সংসদে ব্যাপক আলোচনা হবে। কারণ বিরোধীদল শান্তিচুক্তির ব্যাপারে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, অপপ্রচার চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শান্তিচুক্তির জন্য সংসদে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের উল্লেখ করে বলেন, আমরা বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিরোধীদল বলেছে, তারা নাকি সংসদে আসবেই না। প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিরোধীদল শান্তি চায় না বলেই তারা অশান্তি সৃষ্টির পায়তারা করছে। তিনি বলেন, যারা অস্ত্র, মাদকদ্রব্য এবং সোনা চোরাচালানির সঙ্গে যুক্ত তারাই শান্তিচুক্তি সহ্য করতে পারছে না। আর বিরোধীদল তো সবকিছুতে বিরোধিতা করছে। তারা আন্দোলনের কোন ইস্যু পাচ্ছে না এবং তারা কি চায় তা তারা নিজেরাও জানে না।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে তেহরানে অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানশেষে দেশে ফেরার পর বিমানবন্দরের ভিডিআইপি লাউঞ্জে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া, শিক্ষামন্ত্রী এ.এম.এইচ.কে সাদেক, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদল বিএনপি ৫

বছর ক্ষমতায় থেকে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি আনতে পারেনি। অথচ আমরা মাত্র ১৭ মাসের মধ্যেই শান্তিচুক্তি করতে সক্ষম হয়েছি। প্রধানমন্ত্রী ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকের উল্লেখ করে বলেন, তারা সকলেই শান্তিচুক্তি ও ভারতের সঙ্গে পানি বণ্টন চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিএনপি'র ব্যর্থতার গ্লানি তাদেরকেই বইতে হবে। প্রধানমন্ত্রী একটি পত্রিকার প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেন, সেখানে বলা হয়েছে ৩ জেলার জেলা প্রশাসক তুলে দেয়া হবে। কিন্তু শান্তিচুক্তির কোথায় একথা উল্লেখ আছে তা তিনি জানতে চান। তিনি এধরনের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, শান্তিচুক্তির আগে পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের নেতারা জনসাধারণকে সচেতন করেছেন। তাদেরকে নিয়ে আনন্দ মিছিল করেছেন।

তিনি বলেন, জনগণ শান্তিচুক্তির ব্যাপারে বিভ্রান্ত ছিল না; কিন্তু বিরোধীদল প্রচার চালিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।

তিনি অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর বিরোধীদলকে সংসদে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ দিয়েছি। শান্তিচুক্তি নিয়েও আলোচনা করতে চেয়েছি। কিন্তু তারা ক্ষমতায় থাকাকালে আমাদেরকে কোন বিষয় নিয়েই আলোচনার সুযোগ দেয়নি। তিনি বলেন, বিরোধীদল আন্দোলন প্রশ্নে আমাদেরকে অনুসরণ করতে চায়। এটা তাদের জন্য বড় ভুল। কারণ আমরা তাদের মতো ভোট চুরি করিনি, দুর্নীতি সন্ত্রাস করছি না। তিনি বলেন, কোন সন্ত্রাসী, হত্যাকারী গ্রেফতার হলেই বলা হয় রাজনৈতিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তারা আন্দোলনের কোন ইস্যু পাচ্ছে না। অযথা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এরশাদ এবং খালেদা জিয়া সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিতে যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাও জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। তিনি বলেন, বিএনপি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলে, অথচ পার্বত্য অঞ্চলে গেলেই বাঙালি হয়ে যান। কিন্তু তারা তো আগেই পার্বত্য অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদলের অপপ্রচার সাময়িকভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করলেও বেশিদিন তা টিকে থাকবে না। সত্যের জয় হবেই।

শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে এরশাদের সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এরশাদকে কে না চেনে। তিনি তো সকালে এককথা আর বিকেলে আরেক কথা বলেন। তিনি যেন চুক্তিটি ভাল করে পড়ে মতামত দেন।

তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও তো চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তো কিছু বলেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা একই ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়ে কেন হানাহানি, রক্তপাত করব? কেন আমাদের দেশের জনগণ অন্য দেশে শরণার্থী হয়ে থাকবে? তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের ব্যাপক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে।

সংবাদ

১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সকলেই যখন শান্তি চায়

বিরোধীদল কেন অশান্তি চাচ্ছে, বুঝি না : প্রধানমন্ত্রী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধীদলকে অশান্তির পথ পরিত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সকলেই যখন শান্তি চায় তখন বিরোধীদল কেন অশান্তি সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, আজ আমরা মুক্ত পরিবেশে বিজয় উৎসব পালন করছি; কিন্তু বিরোধীদলের অশান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস সকলের মনে কাঁটার মতো বিঁধছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ৪ দিনব্যাপী বিজয় উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কবি শামসুর রাহমান, জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম ও নাসির উদ্দিন ইউসুফ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস এবং জোটের ঘোষণা পাঠ করেন হাসান আরিফ।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছি। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তি সফলভাবে সম্পাদন করেছি; কিন্তু বিরোধীদল ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ব্যর্থতার দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সাংস্কৃতিক জোটের ‘একাত্তরের বিজয়গাথা ছড়িয়ে দাও সবার প্রাণে’ শ্লোগানের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে একাত্তরের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা মুক্তমনে বিজয় উৎসব

পালন করতে পারছি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর এ বিজয়ের ইতিহাসকে মুছে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে সাংস্কৃতিক জোটের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, দেশের সংস্কৃতি আরো উজ্জ্বল ও বিকাশের জন্য সকলের কর্তব্য রয়েছে।

তিনি সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু করা প্রয়োজন তা করার জন্য আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই আমরা সোনার বাংলা বলয়, সোনারগাঁওয়ে রূপসী বাংলা এবং শিখা চিরন্তনের স্থলে স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছি এবং উপজাতীয়দের সংস্কৃতি বিকাশে আমরা ইতোমধ্যেই পদক্ষেপ নিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা কাজ করছি। যাতে বাংলার মানুষ উন্নত জীবনের অধিকার পায় এবং কারো করুণার ওপর বেঁচে থাকতে না হয়। তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে এ জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ।

কবি শামসুর রাহমান বলেন, এখন সরকারের বক্তব্য হচ্ছে দেশকে সঠিক পথে চালিত করা এবং মনের মতো করে গড়ে তোলা। সরকারের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। এ আস্থা থেকে বিচ্যুতি হলে সরকারের জন্য তা গৌরবজনক হবে না।

তিনি বলেন, আমরা চাই সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকুক এবং আমাদেরকে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাক। তিনি বলেন, সরকারের শাস্তিচুক্তিকে নস্যাত করার জন্য মৌলবাদী ও আধা মৌলবাদীরা জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যও তিনি সরকারকে অনুরোধ জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি, বিজয়ী হয়েছি; আসুন আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে বিজয়কে সুসংহত করি।

রামেন্দু মজুমদার দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গণকবর ভাস্কর্যগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সংরক্ষণ এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, এদেশের ইতিহাসে শিল্পী সমাজের বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। তারা স্বৈরশাসন এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে রাজপথে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। তিনি পার্বত্য চুক্তিকে অসাধারণ চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে পৌঁছেলে রামেন্দু মজুমদার ও নাসির উদ্দিন ইউসুফ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এরপর প্রধানমন্ত্রী শহীদদের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতা শেষে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিজয় উৎসবের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী, কবি সৈয়দ শামসুল হকসহ দেশের বিশিষ্ট কবি, লেখক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ

১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

কেউ পরামর্শ দেন অস্ত্র তুলে দিতে, কেউ লিফলেট ছড়াতে

পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি বাস্তবায়নের

আগেই আঘাত হানতে হবে : খালেদা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ৯ জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি বাস্তবায়ন করতে দেয়া যাবে না। চুক্তি বাস্তবায়নের আগেই আঘাত হানতে হবে। এজন্যে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে হবে। গণঅভ্যুত্থানের জন্য সকল পেশাজীবীকে এগিয়ে আসতে হবে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

গতকাল শনিবার রাতে মিন্টো রোডস্থ সরকারি বাসভবনে শিক্ষক, সাংবাদিক, কৃষিবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন পেশার লোকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন। বেগম জিয়া বলেন, এমন চুক্তি করার ম্যাণ্ডেট জনগণ তাদের দেয়নি। এজন্য তাদের আবার ম্যাণ্ডেট নিতে হবে।

এই চুক্তি সংবিধানবিরোধী, মানবতাবিরোধী, দেশের স্বার্থবিরোধী। এতে দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। একের পর এক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হবে। এই চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে চাই না, আলোচনা করে বৈধতা দিতে পারি না। চুক্তি বাতিল করতে হবে। তারপর কিভাবে শান্তি আসবে তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বেগম জিয়া বলেন, সরকার একের পর এক ইস্যু তৈরি করলেও সরকার পতনের ইস্যু হয় একটিই। সেই ইস্যু সরকার নিজেই তুলে দিয়েছে। তাই সরকারকে এখনো সতর্ক করে দেব-চুক্তি বাতিল করা হোক।

তিনি বলেন, যারা আজ ক্ষমতায় তারা জনগণের ভোটে আসেনি। '৯৬ সালে তাদের বসানো হয়েছে কিছু কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য। তবে

ক্ষমতাসীনরা বুঝতে পারছে না, তারা চুক্তি করে খুশি। মনে করছে তাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। যারা তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে তারা আরো কিছু কাজ করিয়ে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেবে। তাদেরও ক্ষমতায় রাখবে না। কারণ যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, জাতির সাথে বেইমানি করে তাদের কেউ বিশ্বাস করে না।

বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, সারাদেশের মানুষ এটাকে 'কালো চুক্তি' বললেও ক্ষমতাসীনরা বলছে শান্তিচুক্তি। তারা উদাসীন, অন্ধ। সেজন্যে কোথায় সংবিধান লংঘন হয়েছে বুঝেও বুঝছে না। সংবিধান রক্ষা ও দেশের ভূখণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখার শপথ নীলেও তারা সে পথে নেই।

চুক্তির ফলে দেশবাসী আজ উদ্বিগ্ন। দেশ আমাদের কাছে বড়। দেশ না থাকলে সংবিধানও থাকবে না। তবে কালকেই আন্দোলন করে ফেলে দেয়া দরকার- এটা ঠিক নয়। এভাবে হবে না। চুক্তির ফলে আমরা কি হারাতে যাচ্ছি তা জনগণকে বোঝাতে হবে। না হলে যারা ষড়যন্ত্র করছে তারাই সফল হবে। যারা বলছে গণঅভ্যুত্থান হবে না-- তারা সঠিক বলছে না, গণঅভ্যুত্থান হবে। সরকার একের পর এক ইস্যু দিয়েছে। সেগুলো নিয়ে আন্দোলন করেছে। জনগণকে সচেতন করেছে। এর আগেও তাদের পতন হয়েছিল একটি ইস্যুতে। এবারও সেই ইস্যু দিয়েছে। তবে এ নিয়ে আরো গোলটেবিল, আরো আলোচনা করতে হবে। গ্রামে-গঞ্জে মানুষকে বোঝাতে হবে।

দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, চুক্তি অবশ্যই বাতিল করতে হবে। এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। উৎখাত ছাড়া চুক্তি বাতিল হবে না। তিনি মতবিনিময়ে অংশগ্রহণকারীদের যার যার উদ্যোগে লিফলেট তৈরি করে প্রচার চালানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পত্রিকা আমাদের নেই। আর্থিক ক্ষমতাও সীমিত।

মতবিনিময়ে অংশ নেন লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী, প্রকৌশলী এল কে সিদ্দিকী, মনিরুজ্জামান মিয়া, এমাজউদ্দিন আহমেদ, কৃষিবিদ শাহ মোঃ ফারুক, অধ্যাপক আফতাব আহমেদ, সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খান, গিয়াস কামাল চৌধুরী, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, সাদেক খান, আমানউল্লাহ কবির, শিক্ষকদের মধ্যে আফতাব আহমেদ, মাহবুবউল্লাহ, গোলাম আলী ফকির, নূরুল হুদা, আমিনুল ইসলাম, জগলুল হায়দার, জসিমউদ্দিন আহমেদ, ডাঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম, ডাক্তার এম এ রশিদ, অভিনেতা আরিফুল হক প্রমুখ।

সবাই এক সুরে চুক্তির বিরোধিতা করেন এবং কেউ কেউ চুক্তির বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। সবাই আন্দোলনের পক্ষে মত দেন।

এনায়েতুল্লাহ খান ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক দল বাদ দিয়ে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলগুলোর সাথে আন্দোলনের পক্ষে মত দেন। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন ও আফতাব আহমেদসহ দু'একজন তার কড়া সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন।

কেউ কেউ খালেদা জিয়াকে আরো কঠোর হবার পরামর্শ দেন। কঠিন কর্মসূচির পক্ষে মত দেন। মনিরুজ্জামান মিয়াসহ কয়েকজন সহজবোধ্য ভাষায় লিফলেট সারাদেশে প্রচারের দাবি জানান। কেউ কেউ বিএনপি সমর্থিত পত্রিকা উন্নয়নের দাবি জানান। কেউ বলেন, খালেদা জিয়ার গণসংযোগ বাড়তে হবে। কৃষিবিদ নূরুল হুদা আরেকটা 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দাবি করেন। গিয়াস কামাল চৌধুরী নিজেকে ফেনীর লোক পরিচয় দিয়ে বলেন, কেউ আন্দোলন শুরু না করলে আমরা ফেনী থেকেই পেটানো শুরু করবো। সাংবাদিক সাদেক খান মত দেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিদের অস্ত্র দিয়ে বা অন্য কোনভাবে সহায়তা দেয়ার জন্য। অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ বলেন, আন্দোলনের সময় চলে যাচ্ছে। এমন হরতাল দিতে হবে, যাতে সরকারের পতন হয়। অভিনেতা আরিফুল হক বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালিদের অবস্থা ভয়াবহ। তারা '৭১- এর মত আরেকটি ঘোষণার অপেক্ষায়। যুদ্ধ ছাড়া জাতির মুক্তি নেই।

মতবিনিময় সন্ধ্যা সোয়া ৭টা থেকে রাত ১০টা ২০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

সংবাদ

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে ৪টি আইনের খসড়া বিল তৈরি

মহিদুল ইসলাম রাজু/সাগর সরওয়ার ৯ পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নতুন আইন ও পুরাতন আইনের সংশোধনী মিলিয়ে ৪টি খসড়া বিল তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জরুরি ভিত্তিতে এসব খসড়া বিল তৈরি করেছে। খসড়া বিলগুলো শিগগিরই মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হবার পর এসব বিল জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশনেই উপস্থাপিত হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' শিরোনামের নতুন আইনের খসড়া বিল প্রস্তুত করেছে। এছাড়া চুক্তির আলোকে রাষ্ট্রাধিকার পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয়

সরকার আইন ১৯৮৯ সংশোধন করে তিনটি পৃথক সংশোধনী খসড়া বিল তৈরি করা হয়েছে। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর জরুরি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ততোধিক জরুরি ভিত্তিতে এসব খসড়া বিল তৈরি করেছে। এ জন্য ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে সরকারি ছুটির দিনেও এই মন্ত্রণালয়ের ড্রাফটিং বিভাগ বিশেষ ব্যবস্থায় খোলা ছিল। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সংসদ) আবুল বাশার ভূঁইয়াসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ১৬ই ডিসেম্বর অতিরিক্ত কাজ করে খসড়া বিলগুলোর কাজ শেষ করেন। সূত্র মতে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এই ৪টি আইন ছাড়া আর কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। চুক্তির অপরাপর শর্তাবলি সরকারের নির্বাহী আদেশ দিয়েই পূরণ করা সম্ভব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের খসড়া বিল : পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে তৈরি এ খসড়া বিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের গঠন, নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই নতুন আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ হবে চেয়ারম্যানসহ ২২ সদস্যের। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের (পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ) নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ, চেয়ারম্যান অবশ্যই একজন উপজাতীয় হবেন। আঞ্চলিক পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয় ও এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অউপজাতীয় হবেন। পরিষদের গঠন হচ্ছে : চেয়ারম্যান একজন, সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) ১২ জন, সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) ২ জন, সদস্য অউপজাতীয় (পুরুষ) ৬ জন ও সদস্য অউপজাতীয় (মহিলা) ১ জন। উপজাতীয় পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গা উপজাতি হতে, অপর ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে। অউপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে প্রত্যেক জেলা হতে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হতে ১ জন ও অন্যান্য উপজাতি হতে ১ জন নির্বাচিত হবেন। মহিলা সদস্যদের আসনগুলো হবে সংরক্ষিত আসন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন, তাদেরও ভোটাধিকার থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের মতোই হবে।

খসড়া বিলে যা বলা হয়েছে : পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী

কর্মকর্তা থাকবেন, এ পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন। আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধন করাসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও এগুলোর ওপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। এছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বা কোনরূপ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে। আঞ্চলিক পরিষদ এলাকার পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। পরিষদ ভারি শিল্পের লাইসেন্স দিতে পারবে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে ওই পরিষদের উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারবে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবে। তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে, এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আঞ্চলিক পরিষদ সরকারের কাছে আবেদন বা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবে।

আঞ্চলিক পরিষদের আয়ের উৎস সম্পর্কে খসড়া বিলে বলা হয়েছে : এই পরিষদের তহবিল গঠনের উৎস হবে—পার্বত্য তিন জেলা পরিষদের তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ, আঞ্চলিক পরিষদের ওপর ন্যস্ত ও পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা, সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান, কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, পরিষদের নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা, পরিষদের প্রাপ্ত যেকোন অর্থ ও সরকারের নির্দেশে পরিষদের ওপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

পার্বত্য জেলা পরিষদ খসড়া বিল : পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের জন্য ১৯৮৯ সালের প্রণীত পৃথক অথচ অনুরূপ আইন, তিনটিতে সংশোধনী সন্নিবেশিত করে তিনটি পৃথক সংশোধনী খসড়া বিল তৈরি করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। চুক্তির আলোকে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নাম পরিবর্তন করে খসড়া বিলে পার্বত্য জেলা পরিষদ করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, এই খসড়া বিলগুলোতে ১৯৮৯ সালে এরশাদ শাসনামলে প্রণীত আইনগুলোর ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে আনীত এসব সংশোধনী অনুযায়ী আগের আইন তিনটির থেকে হেরফের ঘটেছে খুবই সামান্য। খসড়া সংশোধনী বিলে আনীত অন্যান্য মূল সংশোধনীগুলো হচ্ছে : পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠনের ক্ষেত্রে পরিষদের সদস্য সংখ্যা আগের মতোই ৩১ জন হবে। তবে পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে, এদের ১ জন হবে অউপজাতীয়। তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের (ডিসি) নাম পরিবর্তন হয়ে হবে, ‘সার্কেল চিফ’ (সিসি)। পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ ৩ বছরের স্থলে হবে ৫ বছর।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, একজন উপজাতিকে ওই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ, চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার কমিটি গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন, ল্যান্ড কমিশন গঠন, শরণার্থীদের পুনর্বাসন, শান্তিবাহিনীর অস্ত্রধারী সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির জন্য কোন প্রকার আইন করার প্রয়োজন নেই। এসব কাজ সম্পন্ন হবে সরকারের নির্বাহী আদেশে।

সংবাদ

১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্থিতিশীলতা
প্রতিষ্ঠা করবেঃ কফি আনান

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এবং বাংলাদেশের সকলের মধ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অধিকতর উন্নতি বয়ে আনবে।

নিউইয়র্ক থেকে বাসস জানায়, জাতিসংঘ মহাসচিব বুধবার এক বিবৃতিতে এই প্রশংসা করেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষে মহাসচিবের মুখপাত্র জাতিসংঘ সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতিটি দেন। বিবৃতিতে কফি আনান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) সঙ্গে সরকারের শান্তিচুক্তি হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় প্রায় ২৫ বছর ধরে বিরাজমান দ্বন্দ্ব অবসানের লক্ষ্যে এই চুক্তি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এই চুক্তিতে সশস্ত্র তৎপরতার অবসান, পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ

গঠন ও শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চুক্তি সই করায় তিনি সরকার ও পিসিজেএসএসকে অভিনন্দনও জানান।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র বলেন, ইরানের রাজধানী তেহরানে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কফি আনানের বৈঠককালেও শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়।

সংবাদ

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে

উপেন্দ্র-হাসিনাত বৈঠক সোমবার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পরবর্তী পর্যায়ের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবাসনের তারিখসহ শরণার্থী প্রত্যাবাসনের অন্যান্য বিষয় ঠিকঠাক করতে বৈঠকে বসেছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসিনাত আবদুল্লাহ এবং শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছেন। এ বৈঠকের সম্ভাব্য দিন ঠিক করা হয়েছে আগামী সোমবার। সূত্র জানিয়েছেন, এ বৈঠকটি হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া সীমান্তবর্তী যেকোন স্থানে।

সূত্র জানান সরকার পরবর্তী পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসন খুব শিগগিরই শুরু করতে আগ্রহী। সরকার চায় একনাগাড়ে শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন করুক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কয়েক মাস আগে বৈঠককালে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন একনাগাড়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের; কিন্তু তা হয়নি। ৫ম দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসনে প্রায় ১৩ হাজার শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। ত্রিপুরায় এখনও প্রায় ৩৭ হাজার পাহাড়ি শরণার্থী রয়েছে।

সংবাদ

২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শরণার্থী পুনর্বাসনে ৪৩ কোটি টাকা বাজেট

সাগর সরওয়ার ৯ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ৪৩ কোটি টাকার একটি বাজেট তৈরি করা হয়েছে। সরকারের বিশেষ সম্পর্ক বিভাগের তৈরি করা এ বাজেটে শরণার্থীদের খাদ্য সাহায্যের জন্য ১২ হাজার মেট্রিক টন চালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রণীত বাজেটটি এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ত্রিপুরায় অবস্থানরত পাহাড়ি নেতাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ই নভেম্বর '৯৭ বিশেষ সম্পর্ক বিভাগের একটি প্রজ্ঞাপনে সুযোগ-সুবিধা সংবলিত '২০ দফা প্যাকেজ' ঘোষণা করা হয়। সেই ঘোষিত প্রজ্ঞাপনের জন্য সমগ্র দিক বিবেচনা করে ঐ বাজেট তৈরি করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এ তথ্য দিয়েছেন।

সূত্রমতে, ঘোষিত ২০ দফা বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন ও টাক্ষ ফোর্সের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাওয়া হয়েছে ৪২ কোটি ৬৬ লাখ ৬৭ হাজার টাকা এবং খাদ্যের জন্য ১২ হাজার ২শ' ৬৯.২৭ মেট্রিক টন চালের কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য মোট প্রয়োজন ৩৮ কোটি ৪০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে গৃহনির্মাণ ও কৃষি অনুদান পরিবার প্রতি ১৫ হাজার টাকা হারে ১১ হাজার ৬শ' ৪৪টি পরিবারকে প্রদানের জন্য ১৭ কোটি ৪৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩য় পর্যায় পুনর্বাসন শুরুর পূর্ববর্তী সময়ে ১৯৯৪ সালে ১ম পর্যায় থেকে আনুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাগত ১ হাজার ৭শ' ৯২টি পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা হারে ৮৯ লাখ ৬০ হাজার টাকার প্রয়োজনীয়তার কথাও বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। ডেউটিন ক্রয়ের অনুদানের জন্য বলা হয়েছে ৬ কোটি ৯৮ লাখ ৬৪ হাজার টাকা, গাভী ক্রয়ের জন্য ১ কোটি ২৪ লাখ ২৯ হাজার টাকা, হালের গরু ক্রয়ের জন্য ৮ কোটি ১৫ লাখ ১০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৩ কোটি ৬৬ লাখ ৩২ হাজার টাকা দরকার বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য মোট ১ কোটি ৪ লাখ ৬০ হাজার ৭৬ টাকা প্রয়োজনের কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্র জানান, এ অংকের মধ্যে অভ্যর্থনা কেন্দ্রে শরণার্থীদের এক বেলা খাওয়া বাবদ ৮ লাখ ৩২ হাজার ৭শ' ৫৫ টাকা, থানা ট্রানজিট ক্যাম্পে এক বেলা খাওয়া ও সকালের নাস্তা বাবদ ৬ লাখ ৬৬ হাজার ২শ' টাকা এবং শরণার্থীদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া বাবদ ৫০ লাখ টাকার কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। একই হিসেবের মধ্যে থানা পর্যায়ের চাল বিতরণের পরিবহন ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ লাখ টাকা।

সূত্র জানান, প্রত্যাগত শরণার্থীদের খাদ্য সাহায্য হিসেবে ১২ হাজার ২শ' ৬৯.২৭ মেট্রিক টন চালের প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হিসেবে মোট ১১ হাজার ৬শ' ৪৪টি পরিবারের ৫৫ হাজার ৫১৭ জন সদস্যের মধ্যে ৭০% প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৩০% অপ্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতি সপ্তাহে যথাক্রমে ৫ কেজি ও আড়াই কেজি হারে ১ বছরের রেশন দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছেন, বাজেটে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শরণার্থীদের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়নে সহায়তা ও পর্যবেক্ষণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং শরণার্থী নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত ‘টাস্ক ফোর্স’ - এর চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপির অফিস ও অন্যান্য কাজের জন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ৪০ লাখ টাকা।

একই সূত্র জানিয়েছেন, শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নিকট থেকে প্রতি পরিবারের জন্য ১ বছর মেয়াদের ডাল, লবণ ও সয়াবিন তেল পাওয়া যাবে। এছাড়া ঘোষিত ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধাবলির শর্তমতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আনুমানিক ১০ লাখ টাকা ঋণ, ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ ও অন্যান্য সরকারি ব্যাংকের ঋণ মওকুফ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করার ব্যাপারে এ বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে বলে সূত্র জানান। সূত্র জানিয়েছেন, ‘১৪৫-সাহায্য’ খাতের অধীনে প্রত্যাশিত ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় পরিবারের জন্য এ পর্যন্ত ৩৪ কোটি ৫৯ লাখ ৭৫ হাজার ২শ’ ৯৪ টাকা এবং ৬ হাজার ৯শ’ ৫৪ মের্টিক টন চাল পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট চাহিদা রয়েছে ৮ কোটি ৬ লাখ ১১ হাজার ৭শ ৮৩ টাকা এবং ৫ হাজার ৩শ’ ১৫ মের্টিক টন চাল। এই অতিরিক্ত হিসেবের টাকা ও চাল বরাদ্দের আদেশ দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে বলেও সূত্র জানিয়েছেন।

সংবাদ

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

নাসিমের প্রতিক্রিয়া

পার্বত্য ইস্যু নিয়ে আমরা সংসদেই আলোচনা করব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি প্রশ্নে সরকারি ও বিরোধীদলের গোলটেবিল বৈঠক ডাকার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে বিএনপি’র প্রস্তাবের ব্যাপারে সরকারি দল আওয়ামী লীগ স্পষ্টতই নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রভাবশালী মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম গতকাল রোববার গভীর রাতে এ ব্যাপারে ‘সংবাদ’কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, রাষ্ট্রীয় যেকোন বিষয়ে আলোচনার সর্বোত্তম জায়গা হলো জাতীয় সংসদ। পার্বত্য ইস্যু নিয়ে আমরা সংসদেই আলোচনা করব। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম এটাই। এখানে গোলটেবিল বৈঠকের কি আছে বুঝতে পারছি না। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে, বেতার-টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে, দেশবাসী সরকারিদল ও বিরোধীদলের যুক্তি-তর্ক শুনবে-দেখবে, এটাই আমরা চাই।

রাষ্ট্রপতি যদি গোলটেবিল বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নেন, সেক্ষেত্রে কি করবেন-প্রশ্নের জবাবে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও গণপূর্ত, গৃহায়নমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, এটি একটি ধারণাগত প্রশ্ন, এটার জবাব দেয়া যায় না। তিনি বলেন, যতটা বুঝি, কোন বিষয়ে বিরোধীদলকে কথা বলতে হলে সরকারের সাথে সরাসরি বলতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটানোর অবকাশ নেই।

দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান পার্বত্য জেলাসমূহে সফরে থাকায় তার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

সংবাদ

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সোডাক আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক

পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা করতেই

শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করা হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সোসাইটি ফর ডেভলপম্যান্ট এন্ড কো-অপারেশন (সোডাক) আয়োজিত “পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি : আইনগত ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত” শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার জন্যই একটি গোষ্ঠী শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে। তারা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান : পরবর্তী নির্বাচনে জেতার জন্য পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে ব্যবহার করবেন না। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ মিলনায়তনে গতকাল রোববার বিকেলে আয়োজিত এ গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। অন্যদের মধ্যে আলোচনা করেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, সৈয়দ শফিক আহমেদ, হাসানুল হক ইনু, এমএম রেজাউল করিম, ডঃ হারুন-অর-রশিদ, অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মোঃ আমিনুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল করিম, হাসনা খান, মঞ্জুরুল ইসলাম প্রমুখ।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, জাতি পার্বত্যঞ্চলে শান্তি ফিরে আসুক এটা সব সময় চেয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হওয়ায় এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ চুক্তিটি হয়েছে রাজনৈতিকভাবে। এর ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল এরশাদ সরকারের আমলে। খালেদা জিয়া সরকার একটি জাতীয় কমিটি করে এ প্রক্রিয়ার গতি আরো সচল করেন। সেই ধারাবাহিকতায়ই এ সরকার পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছে। তিনি বলেন, যেহেতু জাতীয় সংসদের সদস্যরা মিলে তৈরি করা একটি কমিটি

চুক্তি করেছে, তাই বলা যায়, এ চুক্তির অবশ্যই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আমিরুল ইসলাম আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি আমাদের নিজস্ব সমস্যা। কিন্তু এক সময় এ সমস্যাটির সঙ্গে ভারতকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এতে পাকিস্তানের স্পষ্ট হাত ছিলো বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার জন্যই একটি গোষ্ঠী এ শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছে। তিনি বলেন, বলা হচ্ছে জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদে বাঙালিদের কর্তৃত্ব থাকবে না। কথাটি অযৌক্তিক। পরিষদের বাঙালি রাজনীতিবিদরাই তো সদস্য হবেন। তাই তাদের ‘কার্ড প্লে’ করতে পারবেন। তখন সেটাই হবে মুখ্য বিষয়।

গোলটেবিল বৈঠকে জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু বলেন, এক জাতিসত্তার মানুষ অন্য জাতিসত্তাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দেবে, এটা ই স্বাভাবিক। যারা এর বিরোধিতা করেছে তারা তাদের দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই এ কাজ করেছে।

এম এম রেজাউল করিম বলেন, পার্বত্য এলাকায় পূর্ণ শান্তি স্থাপন করেই উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। সেখানকার স্থানীয় বাঙালিদের স্বার্থ যেনো কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এ চুক্তি করা উচিত ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এম আমিনুল ইসলাম বলেন পাকিস্তান সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এ সমস্যা সৃষ্টি করে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে কৌন্দল বাড়ানো। ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে তখন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পূর্ববর্তী সরকারের আমলেও সেই দলগুলোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়।

সৈয়দ শফিক আহমেদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। সেই সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ সভাপতির ভাষণে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি সই হওয়ার পর যে সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা কারো কাম্য নয়। সংঘাতের পথে নয়, শান্তির পথেই সব সমাধান।

সংবাদ

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সংবিধানবিরোধী চুক্তি

করার সাধ্য আ'লীগের নেই ৪ মতিন

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে পুরোপুরি সংবিধানসম্মত অভিহিত করে বলেছেন, সংবিধানবিরোধী কোন চুক্তি

সই করার সাধ্য আওয়ামী লীগ সরকারের নেই। তিনি এই চুক্তির বিরোধিতাকারীদের প্রতি এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় সংসদে তুলে ধরা ও সংবিধানের রক্ষক সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবার আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যবস্থা নেয়া-আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৃষিবিদ্যাকর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে গতকাল রোববার কৃষি ব্যাংক ভবন চত্বরে আয়োজিত কর্মচারী মহা সমাবেশে বক্তৃতাকালে আইনমন্ত্রী খসরু এই মত ব্যক্ত করেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে সাংসদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার, কৃষি ব্যাংক পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ মীর্জা আবদুল জলিল ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুস সালাম খান বক্তৃতা করেন। খবর তথ্য বিবরণী।

সংবাদ

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

মন্ত্রিসভা শান্তিচুক্তি অনুমোদন করেছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মন্ত্রিসভা শান্তিচুক্তি অনুমোদন করেছে। গত ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এই চুক্তি সই হয়। গতকাল সোমবার সচিবালয়ের মন্ত্রিসভা কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে শান্তিচুক্তি অনুমোদন করা হয়। বৈঠকে মন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সচিবরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

১লা জানুয়ারি থেকে দেশে ফিরবে

শরণার্থীরা ৯ যৌথ বৈঠকে সিদ্ধান্ত

সরওয়ার/সাদেকুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ফিরে: ভারতের ত্রিপুরা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শরণার্থীদের একনাগাড়ে দেশে প্রত্যাবাসনের কাজ ১লা জানুয়ারি থেকে আবার শুরু হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কিট হাউজে শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্স এবং জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির বৈঠক শেষে এক যৌথ প্রেস ব্রিফিং-এ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসিনাত আবদুল্লাহ্ একথা বলেন। এ সময় শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল বিকেল তিনটা থেকে সোয়া ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং প্রত্যাগমন নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে দু'পক্ষ এ পর্যন্ত ভারতের ত্রিপুরা থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, এবারই প্রথম শরণার্থী নেতাদেরকে সবচেয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে দেখা গেছে।

সূত্র জানান, এ বৈঠকে দু'পক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা করা হয় শরণার্থী বিষয় ছাড়াও সম্পাদিত শান্তি চুক্তি নিয়ে। শান্তি চুক্তি সই হওয়ায় শরণার্থী নেতারা ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে। তারা বলেন, যেহেতু পার্বত্যঞ্চলে শান্তি ফিরে আসছে তাই ভারতের ত্রিপুরায় শরণার্থী হয়ে থাকার কোন অর্থ নেই। আমরা আমাদের নিজ দেশে যত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি ততই মঙ্গল।

বৈঠকে শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার পর সরকারের ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির ব্যাপারে শরণার্থী নেতারা বলেন, তারা খুব খুশি। বৈঠকে জানানো হয়, ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্প এখন প্রায় ৩০ হাজার শরণার্থী রয়েছে। তারা দেশে ফেরার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে ত্রিপুরার কাঁঠালছড়ি ক্যাম্পের শরণার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাঠিয়ে দেয়া হবে। তারপর ১লা জানুয়ারি থেকে তারা রামগড় সীমান্ত-পথ দিয়ে দেশে ফিরতে শুরু করবে। দু'পক্ষ এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে যে কাঁঠালছড়ি শরণার্থী ক্যাম্পের সকল শরণার্থী দেশে ফিরে আসার পর অন্য ক্যাম্পগুলোর শরণার্থীরা পর্যায়ক্রমে দেশে ফিরবে। বৈঠকের সূত্র জানান, শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্স এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতি চায় একটি ক্যাম্পের সকল শরণার্থী একবারে দেশে ফিরে আসুক। এতে সকলের পুনর্বাসন কাজ সহজ হবে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় এখন ৬টি শরণার্থী ক্যাম্প রয়েছে।

সূত্র জানান, শরণার্থী নেতারা প্রস্তাব করেছেন, বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে যে সকল ছাত্রছাত্রী এস এস সি পরীক্ষা দিতে চায় তাদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। সরকারপক্ষের নেতারা এ ব্যাপারে বলেন, তারা রাজি। শিক্ষা একটি প্রধান ব্যাপার। তাই ওখান থেকে যারা বাংলাদেশে এসে পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের পরীক্ষা দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

প্রেস ব্রিফিং-এ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বলেন, শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসবে অব্যাহত গতিতে। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা বলেন, এবারের বৈঠকটি শরণার্থী প্রত্যাগমনের ধারাবাহিকতা থেকেই হয়েছে। এ বৈঠকটি আগে হলে বাকি শরণার্থীরা আরো আগে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে

শুরু করত। তিনি বলেন, প্রত্যাগমন এবং পুনর্বাসনে আমরা সন্তুষ্ট। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি সকলের শেষে আসব। তিনি এ পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। যারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা তো আমাদের দেশে ফিরে আসছি। সকলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে চাই।

গতকাল দুপুর ১২টায় শরণার্থী নেতারা আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। শরণার্থী নেতাদের মধ্যে ছিলেন রঞ্জিত নারায়ণ ত্রিপুরা, জাদোরা মগ, রবীন্দ্রলাল চাকমা এবং দয়াল চাকমা। তাদেরকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা, স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক মশিউর রহমান এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডিসি ও এসপি।

গতকালের বৈঠকে সরকার পক্ষে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ি জেলার বিদায়ী ডিসি মোহাম্মদ ইসমাইল ও বর্তমান ডিসি জাফরুল ইসলাম, স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সহকারী সচিব জুলফিকার আলী প্রমুখ। বিকেল সাড়ে ৪টায় শরণার্থী নেতারা ত্রিপুরার উদ্দেশে রওনা দেন।

সংবাদ

২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সেনা সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সবার

সহযোগিতা চাই : প্রধানমন্ত্রী

রাজেন্দ্রপুর (গাজীপুর), ২৪শে ডিসেম্বর (বাসস)।— প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতা নস্যাত করার যেকোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী গতকাল বুধবার সকালে সিন্ধুথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এয়ারডিফেন্স আর্টিলারি ব্রিগেডের শীতকালীন মহড়া উপলক্ষে আয়োজিত দরবারে অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। নতুন সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমানও এ উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন।

শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন, সেনাবাহিনী দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্যে সততা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করবে। তিনি তাদের প্রতি কোনরকম গুজব ও মিথ্যা প্রচারণায় কান না

দেবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণ শান্তি চায়। শেখ হাসিনা দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের একটি অংশে যুদ্ধের মতো অবস্থা বিরাজ করুক কেউ তা চায় না। এতে মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি আলাদা অংশ এবং সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ মানুষের জন্যে এক নিষিদ্ধ এলাকা। শেখ হাসিনা বলেন, একশ্রেণীর লোক শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করেছে। তিনি বলেন, এর কারণ কি তা তারাই ভাল জানেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, তারা ক্রমান্বয়ে সংঘাতের পথ পরিহার করবেন এবং বাস্তবতাকে মেনে নেবেন। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, বিদেশী রাষ্ট্রগুলো এ চুক্তির প্রশংসা করেছে। তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মাহবুব আলম। এ সময় সংসদ সদস্য রহমত আলী, কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান, শেখ হেলালউদ্দিন, আখতারুজ্জামান, আহসান উল্লাহ মাস্টার এবং মেহের আফরোজ চুমকি উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

উস্কানি, বোমাবাজি, অপপ্রচার উপেক্ষা করে রাষ্ট্রাধিপত্যে সম্মতি অভিযাত্রা

সুনীল কান্তি দে ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তিবিরোধীদের প্রবল উস্কানি ও বোমাবাজির পরও গতকাল রাষ্ট্রাধিপত্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিযাত্রা শান্তি সম্মতি অভিযাত্রার প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, পার্বত্যঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে যে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল তা চিরতরে নিরসনের জন্য পার্বত্য শান্তি চুক্তি সই করা হয়েছে। এটিকে সংবিধান ও মানবাধিকারবিরোধী বলে যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা কখনও সাধারণ মানুষের বন্ধু হতে পারে না। আপনারা তাদের সম্পর্কে সজাগ থাকুন এবং যেকোন মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্মতি বজায় রেখে পাহাড়ি-বাঙালি ঐক্য গড়ে তুলুন।

রাষ্ট্রাধিপত্য পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং ময়দানের উন্মুক্ত মঞ্চের সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি শিল্পী আসাদুজ্জামান নূর-এর সভাপতিত্বে এই আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অভিনেতা ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতা সৈয়দ হাসান ইমাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর, অভিনেতা খালেদ খান, সাংস্কৃতিক জোটের সমন্বয়কারী গোলাম কুদ্দুস, অভিনেতা ও নাট্যকার মামুনুর রশীদ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র

কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক আফজাল হোসেন, রাষ্ট্রাধিপত্য পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, স্থানীয় সরকার পরিষদের পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান, রাষ্ট্রাধিপত্য বন সংরক্ষক গোলাম কুদ্দুস, অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আশুতোষ বড়ুয়া ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য জসীমউদ্দিন বাবুল। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার আহকাম উল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান আরিফ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যেই মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই পার্বত্যঞ্চলে বসবাসকারী সকল মানুষের মঙ্গল বয়ে আনার উদ্দেশ্যে সই করা পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে আমরা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়েছি। তিনি বলেন, যারা পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিরোধিতা করে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও হিংসা সৃষ্টি করতে চায় তাদের চিনে রাখতে হবে।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ বলেন, পাহাড়ি-বাঙালি ভেদাভেদ সৃষ্টি করে গত দু'ঘণ্টা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি জিইয়ে রেখেছিল তারা এই আজ পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে চলেছে। তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

অভিনেতা খালেদ খান বলেন, আমরা সংস্কৃতিকর্মী, আমাদের কোন উচ্চাশা নেই। আমরা চাই বাংলাদেশের অন্যতম অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চিরস্থায়ী হোক।

অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর তার বক্তব্যে বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু '৭১-এ বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, একান্তরে স্বাধীনতা পেয়েছি, এবার মুক্তিকে নিশ্চিত করতে হবে। তাই পার্বত্যঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালিদের মুক্তি ও শান্তি নিশ্চিত করতে যে শান্তি চুক্তি সই হয়েছে তা বাস্তবায়িত হওয়ার মতো শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতেই আমাদের আসা। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অপপ্রচার ও বোমাবাজিকে মানুষ পাল্লা দেয়নি

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের এই অনুষ্ঠানে না আসার আহ্বান জানিয়ে গত ২৪শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রাধিপত্যে সফররত ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ

রাঙ্গামাটির মানুষের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তা বিফল হয়েছে। গতকাল পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং ময়দান ছিল লোকে লোকারণ্য। বিকেল আড়াইটা থেকে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন এলাকা হতে নরনারীরা ছুটে আসছিলেন অনুষ্ঠানস্থলের দিকে। বিকেল সাড়ে তিনটার মধ্যে সমস্ত মাঠ মানুষে ভরে যায়। তারা বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় বসে-দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানের বক্তা ও শিল্পীদের বক্তব্য, সঙ্গীত ও কবিতা পাঠ শ্রবণ করেন। আলোচনা সভার এক পর্যায়ে মঞ্চে দুই কনায় কে বা কারা দু'টি ত্রেকার ফটানোর ফলে প্রথমে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, তখন বক্তৃতা করছিলেন মামুনুর রশীদ। তিনি এবং অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর দু'জনেই মাইকে ঘোষণায় বলেন, যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় তারাই এটা করেছে, আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। সাথে সাথে অনুষ্ঠানস্থলে নেমে আসে পিনপতন নিস্তব্ধতা। এরপরও আড়াই ঘণ্টা ধরে অনুষ্ঠান চলে।

আলোচনা সভার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ফকির সাহাবুদ্দিন, কল্পনা লালা, খুরশীদ আলম, বিপুল ভট্টাচার্য, আশরাফ উদাস, কুদ্দুস বয়াতী, রনি চাকমা, ও নাজনীন আনোয়ার। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে শোনান আহকাম উল্লাহ।

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, আজ শুক্রবার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সদস্যরা খাগড়াছড়ি যাচ্ছেন।

সংবাদ

২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করুন

গত ২৪শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার লতিবান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তি চুক্তির পক্ষে প্রচারকালে শান্তি বাহিনীর ২ জন সদস্যকে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে আহত করার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ খীসা। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিদেশী মদদপুষ্ট কিছু উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দল এই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করেছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির এসব বিরোধীকে তাদের অবস্থান থেকে সরে এসে দেশের স্বার্থে ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে : মেলকার্ট

নেদারল্যান্ডের সমাজকল্যাণ ও কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রী এপিড্রিউ মেলকার্ট বলেছেন, তার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

বাসস জানায়, বাংলাদেশে সপ্তাহব্যাপী সফরশেষে গতকাল শুক্রবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেলকার্ট বলেন, শান্তি চুক্তি বাংলাদেশে, বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনার সূচনা করেছে। তিনি বলেন, ওলন্দাজ সরকার এ ব্যাপারে সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

এপিড্রিউ মেলকার্ট বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আর সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে না এবং এটাই হবে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তিনি বলেন, নেদারল্যান্ড ইতোমধ্যেই ৩টি চলমান প্রকল্পে সাহায্য দিয়ে আসছে। এগুলো হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পানীয় জল বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প। তিনি বলেন, অন্যান্য প্রকল্পেও সহযোগিতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। ওলন্দাজ মন্ত্রী যথাযথ সহযোগিতার অন্যান্য উপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সংবাদ

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৫৫০ জন বিশিষ্ট নাগরিকের ঘোষণা

শান্তি চুক্তি বিরোধীদের

তৎপরতা রুখে দাঁড়ান

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পক্ষে দেশের ৫৫০ জন বিশিষ্ট নাগরিক গতকাল এক বিবৃতিতে চুক্তিবিরোধীদের সাম্প্রদায়িক তৎপরতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, সংবিধানের ধারা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পাদিত এই চুক্তি দেশে এবং বিদেশে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হলেও বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী দলগুলো এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে গোটা দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে।

তারা বলেন, আমরা দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং

আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধাবস্থা জারি থাকুক তা কখনো সমর্থন করতে পারি না। শান্তিচুক্তি বা সরকারের যেকোন কার্যক্রমের সমালোচনা করা যাবে, কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি পরিহার করে, গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়ে একের পর এক ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি প্রদান কোন সুস্থ নাগরিকই অনুমোদন করবেন না। আমরা মনে করি, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যেকোন মতবিরোধ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জাতীয় সংসদে বসে নিষ্পত্তি করবেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, যে মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সেই আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনের পরিপন্থী যেকোন প্রয়াস আমরা প্রতিহত করবো।

বিবৃতিতে বলা হয়, শতাব্দী প্রাচীন জটিল ও বহুমাত্রিক এথনিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। এই শান্তিচুক্তির ফলে চট্টগ্রামের সশস্ত্র সংঘাতের মাধ্যমে সৃষ্ট অশান্ত পরিবেশ শান্ত ও স্বাভাবিক হওয়ার পথ সুগম হয়েছে। একই সঙ্গে এই এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং পর্যটন শিল্পের ব্যাপক বিস্তারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, দেশের একটি অঞ্চলে অশান্তি ও যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রেখে সারা দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা অথবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা কখনও সম্ভব নয়। গত আঠারো বছর ধরে পার্বত্য এলাকার যুদ্ধাবস্থা, সামরিক তৎপরতা, বিপুল সংখ্যক পাহাড়ি সম্প্রদায়ের উদ্বাস্ত হয়ে দেশত্যাগ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে, গোটা জাতিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মানবাধিকার লংঘনের কাঠগড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলীতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিরাজমান এথনিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হবে।

শান্তি ও স্থিতিশীলতা যেকোন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রধান বিরোধীদল একান্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে সারাদেশে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির এক ধ্বংসাত্মক আন্দোলন শুরু করেছে। উপর্যুপরি হরতাল আন্দোলন, সড়ক অবরোধ, ব্রিজ ও কালভার্টের ক্ষতি করা, জনগণের সম্পদ ধ্বংস করা, হত্যা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও হানাহানির অপচেষ্টা করছে।

তাদের এই সকল কার্যক্রম শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়াকে যেমন ব্যাহত করেছে, একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিদের ভীতসন্ত্রস্ত করেছে। পার্বত্য এলাকায় উপর্যুপরি হরতাল ও অবরোধ পাহাড়ি বাঙালি নির্বিশেষে নিরীহ মানুষদের সীমাহীন দুর্ভোগের ভেতর ঠেলে দিয়েছে। শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে গিয়ে তারা বলছে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন হলে পার্বত্য এলাকার বাঙালিদের ভোটের অধিকার থাকবে না, তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হবে এবং তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ হারাবে। বিনোদন এবং তাদের সহযোগী একান্তরের ঘাতক দালালদের এই সকল বক্তব্য শুধুমাত্র নির্লজ্জ মিথ্যাচারই নয়—একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

একান্তরে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করতে গিয়ে তিরিশ লাখ বাঙালি হত্যার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে এবং নিজেরাও গণহত্যা ও নারী নির্যাতনসহ যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কাজে অংশ নিয়েছে তারা আজ বাঙালিদের দরদী সেজে স্বাধীনতা ও সংবিধান রক্ষার কথা বলছে। একান্তর সালে যারা পাকিস্তানি সামরিক জাভার দোসর ছিল, এখনও তারা পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি প্রতিহত করে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জন ধ্বংস করে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি ও যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখা এই ষড়যন্ত্রেরই অন্তর্গত।

বিবৃতিদাতার মধ্যে রয়েছেন : বেগম সুফিয়া কামাল, কথাশিল্পী শওকত ওসমান, বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, বিচারপতি কে, এম সোবহান, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সঙ্গীতশিল্পী কলিম শরাফী, ডঃ মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, কবি শামসুর রাহমান, শিক্ষাবিদ মেহের কবীর, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, সৈয়দ হাসান ইমাম, এডভোকেট গাজীউল হক, মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত (বীরউত্তম), এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী, শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন, শিল্পী আবুল বাসেত, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, সাংবাদিক রোকনুজ্জামান খান, ডঃ ময়হারুল ইসলাম, অধ্যাপক অনুপম সেন, অধ্যাপক আবদুল খালেক, মওলানা আবদুল আউয়াল, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, প্রকৌশলী শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সঙ্গীতশিল্পী ওয়াহিদুল হক,

সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল, সাংবাদিক কামাল লোহানী, সাংবাদিক এ বি এম মূসা, সাংবাদিক বজলুর রহমান, ডঃ নূরুল্লাহর ফয়জুন নেসা, সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত, ব্যারিস্টার সুধীর চন্দ্র দাস, ডঃ জহিরুল হক, ডঃ এম এ কাদরী, ডাঃ সারোয়ার আলী, ডাঃ আবুল কাশেম, হোসনে আরা ইসলাম, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আহমদ হোসেন, লেখক সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ।

সংবাদ

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

খাগড়াছড়িতে সম্প্রীতি অভিযাত্রা

পাহাড়ি-বাঙালি কেউই রক্তপাত কামনা করে না

মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে: মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তুলতে হবে, পাহাড়ি-বাঙালি সকলেই হাতে হাত ধরে এখানে বসবাস করতে হবে। রক্তপাত, যুদ্ধ-সংঘাত পাহাড়ি-বাঙালি কেউই কামনা করে না। সকলেই পার্বত্যঞ্চলে শান্তিতে বসবাস করতে চায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সফররত শান্তি সম্প্রীতি অভিযাত্রা উপলক্ষে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ গতকাল শুক্রবার খাগড়াছড়ি সরকারি হাইস্কুল মাঠে এক বিশাল শান্তি সমাবেশে এ আহ্বান জানান। খাগড়াছড়ি জেলা সদরের হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম, আসাদুজ্জামান নূর, খালেদ খান, লেখক, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান এমপি কল্লরঞ্জন চাকমা, বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ জাহেদুল আলম প্রমুখ।

সংবাদ

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বান্দরবানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

চুক্তি নিয়ে আলোচনা হতে পারে সংসদেই

বান্দরবান থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফ বলেছেন, সংসদে আলোচনার পর চুক্তিতে প্রয়োজনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার সুযোগ রয়েছে। চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা মহান সংসদেই

হতে পারে। সকল সংসদ সদস্য শান্তি চুক্তির উপর আলোচনায় অংশ নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গতকাল শুক্রবার রাতে বান্দরবান সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী একথা বলেন। পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খোয়াইংচ প্রঃ মাস্টার, বীর বাহাদুর এমপি এবং জেলা প্রশাসক মোঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরীও সভায় বক্তব্য রাখেন। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সাংবাদিকরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী আজ শনিবার সকালে আলীকদম থানা হাসপাতাল ভবন উদ্বোধন করবেন।

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বান্দরবানে

শুক্রবার সকালে টাউন হলে সুদক্ষ ঋণ বিতরণী অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেছেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী পাহাড়ি-বাঙালিদের যাবতীয় নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী জেলা সদরে একটি শিশু সদন স্থাপনে ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেন এবং এ বছর ১ কোটি ১২ লাখ টাকা ঋণ বিতরণের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দের কথাও ঘোষণা দেন। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এমপি বীর বাহাদুর, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খোয়াইংচ প্রঃ মাস্টার বক্তব্য রাখেন। বান্দরবান প্রেসক্লাব চত্বরে ইসলামী ঐক্যজোট শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে এক সমাবেশ করেছেন। জেলা ঐক্য পরিষদ আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জোটের কেন্দ্রীয় নেতা মুফতি এজহারুল ইসলাম ও এনডিএ'র নেতা জহিরুল ইসলাম।

সংবাদ

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বান্দরবান সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের জনসভা

শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি-বাঙালি

মিলেমিশে থাকার পথ সৃষ্টি হয়েছে

বান্দরবান থেকে এনামুল হক কাশেমীঃ শনিবার বিকেলে বান্দরবান পার্বত্য জেলা শহরে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের শান্তি ও সম্প্রীতি অভিযাত্রা শীর্ষক এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তারা বলেছেন, শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালিরা দীর্ঘদিনের অশান্তির করাল গ্রাস থেকে মুক্তি লাভ করেছে। পাহাড়ি-বাঙালি ভাই-ভাই হিসেবে মিলে থাকার স্থায়ী পথ সৃষ্টি হয়েছে এ চুক্তির মাধ্যমে। অতীতের সরকারগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই বর্তমান সরকার তার রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসেবে এ

ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছে। বজারা উল্লেখ করেন যে, শান্তিচুক্তির ফলে বিদেশী দাতাগোষ্ঠীসহ বিশ্বের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতিগত সুযোগ পেয়েছেন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপক কর্মসূচি ইতোমধ্যেই নেয়া হয়েছে।

শহরের রাজার মাঠে অনুষ্ঠিত বিশাল শান্তি সমাবেশ ও জনসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত অভিনেতা আলী যাকের। বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খোয়াইংচ প্র মাস্টার, বীর বাহাদুর এমপি, জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস, সৈয়দ হাসান ইমাম, হাসান আরিফ, শাহরিয়ার কবির এবং বাসস-এর সাব-এডিটর আফজাল হোসেন প্রমুখ নেতা।

বিশাল জনসভা শুরু হবার আগে হাসান ইমাম ও বীর বাহাদুর এমপি'র নেতৃত্বে এক শান্তি র্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে জেলা সদর, রুমা, লামা, আলীকদম, রোয়াংছড়ি থানা থেকে প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ এবং শিশু-কিশোর উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশস্থল এবং শহর এলাকা শনিবার সকাল থেকেই উৎসবের শহরে পরিণত হয়। এটি ছিল যেন পাহাড়ি-বাঙালিদের মিলনমেলা। শান্তি র্যালির অগ্রভাগে বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন ব্যানার, প্লেকার্ড বহনকারী নারী-পুরুষ ছিলেন। জোট নেতৃবৃন্দ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় শান্তি-সম্মতি অভিযাত্রা শেষ করে শনিবার দুপুরে বান্দরবানে এসে পৌঁছান।

সমাবেশে শেষে সন্ধ্যায় শান্তিচুক্তির সমর্থনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। টিভি তারকা, শিল্পী এবং নাট্যকারবৃন্দ সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি করেন।

সংবাদ

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা সভায় মন্তব্য

যারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে

চায় তারাই চুক্তির বিরোধিতা করছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে গতকাল শনিবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত কয়েকটি আলোচনা সভায় বজারা বলেছেন, শান্তি চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি জিইয়ে রেখে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায় শুধু তারাই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে।

ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ: বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বজারা বলেছেন, শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্যঞ্চলে হানাহানির পরিবেশের অবসান হয়েছে। অ-উপজাতীয় লোকেরা যেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ কৃত্রিম পরিবেশে বসবাস করছিলেন, তাদের সুন্দর একটি পরিবেশে নিয়ে আসার জন্যই এই চুক্তি করা হয়েছে।

গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত “পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি ও সমঝোতাঃ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন” শীর্ষক এই গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ, এম, এস কিবরিয়া। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম, এ মুহিত, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, এইচ, টি ইমাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ, কে আজাদ চৌধুরী, ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান, বিচারপতি কে, এম সোবহান, অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, আলী আকসাদ, প্রমুখ। এতে সূচনা বক্তব্য রাখেন মোনায়েম সরকার।

সভাপতির ভাষণে অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ, এম, এস কিবরিয়া বলেন, বিভিন্ন দিক নিয়ে এ চুক্তিটি একটি সাফল্যের নিদর্শন। দীর্ঘদিনের পার্বত্য এলাকায় পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য শান্তি চুক্তিই হচ্ছে মূল সমাধান। এ সমাধানে সরকার সফল হয়েছে। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমরা চাই গণতন্ত্রের বিকাশ। সে লক্ষ্যেই পার্বত্যঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য আমরা চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছি। এখন হবে পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া।

মতিয়া চৌধুরী বলেন, দেশবাসী দীর্ঘদিন যাবৎ এমন একটি চুক্তি চেয়েছিল। কতগুলো অসত্য তথ্যের উপর বিরোধীদল অপপ্রচার চালাচ্ছে। যারা দীর্ঘদিন শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা জেনেগুনেই এখন শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে। তিনি বলেন, এখন অ-উপজাতীয় বা সকলেই দীর্ঘদিন যাবৎ যে কৃত্রিম পরিবেশে বসবাস করছিলেন, এই চুক্তির ফলে তারা সুন্দর একটি পরিবেশে বসবাস করতে পারবেন। তাই এই চুক্তি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ অস্থিতিশীল পরিবেশে বসবাস করছিলেন তারা এখন একটি রক্তপাতহীন সমাজ সেখানে দেখতে পাবেন। তিনি বলেন, যারা এখন শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে তারা ১৯৮৯ সালে যখন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন করেছিল তখন এর বিরোধিতা করেনি। তারা ক্ষমতায় এসে কেবল পদক্ষেপই নেয়নি, '৮৯-এর এ আইন

সংশোধন কিংবা পরিবর্তন অথবা বাতিল করেনি। কিন্তু এখন ঠিকই বিরোধিতা করেছে। তারা এ চুক্তি নিয়ে খেলতে পারে; কিন্তু আমরা মনে করি এটা হচ্ছে তাদের গুপ্তম।

বিচারপতি কে, এম সোবহান বলেন, আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান চুক্তি একটি বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে।

এম, এ মুহিত বলেন, বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যই এই শান্তি চুক্তিটি সই হয়েছে। তিনি বলেন, এখন প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রামে এর যথাযথ বাস্তবায়ন।

বাংলা একাডেমির ডিজি সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, অর্থনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই চুক্তির গুরুত্ব খুব বেশি। তবে পার্বত্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বৈদেশিক অর্থ সাহায্য।

ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, চুক্তির পুরো ব্যাপারটি তো সংসদে আলোচনা হবেই। যে চুক্তিটি হয়েছে, তাতে সেখানকার অবস্থানকারী সকল নাগরিকের জন্যই সুবিধা ও উন্নতি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এইচ, টি ইমাম বলেন, এই পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে যে, এর দ্বারা স্বাধীনতার বিরোধী চক্র আবার এক হতে পেরেছে।

সূচনা বক্তব্যে মোনায়েম সরকার বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রধান বিরোধীদল একান্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলের সঙ্গে জোট বেঁধে সারাদেশে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির এক ধ্বংসাত্মক আন্দোলন শুরু করেছে। তিনি বলেন, এক যুগসন্ধিক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বঙ্গবন্ধু যুব পরিষদ: ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন ঢাকা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে বঙ্গবন্ধু যুব পরিষদ গতকাল ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক’ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু যুব পরিষদের সভাপতি আবদুল জলিল ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, বিএফইউজের মহাসচিব আবুল কালাম আজাদ, এডভোকেট লালেকুজ্জামান ও পরিষদের মহাসচিব রেজাউল করিম রেজা।

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর তার বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে সমসাময়িক বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক চুক্তি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এ চুক্তিতে বাঙালিদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি পাহাড়িদের মানবাধিকারও সমুন্নত রাখা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এই চুক্তিতে সংবিধানবিরোধী কিছুই নেই। এ চুক্তির বিরোধীরা তাদের বিশেষ স্বার্থে চুক্তি সম্পর্কে অপপ্রচার এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ফলে সে অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পুরো জাতির উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখবে।

অন্যান্য বক্তা বলেন, শান্তি চুক্তির বিরোধীরা আসলে নিজেদের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি জিইয়ে রাখতে চায়। তারা সেখানকার পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়।

বাসদ (খালেকুজ্জামান): বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া বলেছেন, পার্বত্য অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছিল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে। তাদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য যে সামরিক ব্যয় করা হয়েছিল তা পুনর্বাসন কাজে ব্যয় হলে সমস্যা থাকতো না। গতকাল শনিবার বিকেলে ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন কার্যালয়ে বাসদ আয়োজিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন। মোবিনুল হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন আবদুল্লাহ সরকার।

সংগ্রামী নারী সমাজ: সংগ্রামী নারী সমাজের এক সমাবেশের ঘোষণায় পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করে বলা হয় : এই চুক্তির মধ্য দিয়ে কেবল পার্বত্য এলাকাতেই শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তার সাথে সাথে সারাদেশের জনজীবনে নিরাপত্তা, উন্নতি ঘটবে এবং দেশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে।

গতকাল শনিবার বিকেলে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে পল্টন ময়দানে আয়োজিত এ সমাবেশে বিশিষ্ট নারী নেত্রী আরমা গুণের সভানেতৃত্বে বক্তৃতা করেন মুক্তিযোদ্ধা শিরীন বানু মিতিল, নারী নেত্রী খুশী কবীর, আয়শা খানম, রোকেয়া কবির প্রমুখ। সমাবেশে সর্বজন শ্রদ্ধেয়া কবি বেগম সুফিয়া কামালের বাণী পাঠ করেন লায়লা আরজুমান্দ বানু, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের বাণী পড়ে শোনান শাহনাজ সুমী।

কবি বেগম সুফিয়া কামাল তার বাণীতে বলেন, বিরোধীদলের নেত্রী জঘন্যভাবে শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছেন। তিনি বলেন, দেশ ও সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এই দেশ একজনের রক্তে স্বাধীন হয়নি। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, উপজাতি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই দেশ আমরা অর্জন করেছি। নিজের এই দেশে, প্রত্যেকের থাকবার, বাঁচবার অধিকার আছে। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তির প্রতীক্ষায় দীর্ঘদিন ছিলাম। এখন দেশের মানুষরা দেশে ফিরবে, আমরা সবাই সুখে-দুঃখে মিলেমিশে থাকবো।

ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম তার বাণীতে যারা শান্তি চুক্তি সম্পর্কে অপব্যখ্যা করছেন তারা অবিলম্বে মানুষের কাছে নিন্দনীয় হবেন বলে অভিমত দেন।

অন্যান্য বক্তা পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র হামলা-পাল্টা হামলা, সামরিক বাহিনীর খবরদারি ইত্যাদি নারী সমাজকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা এই অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য অবিলম্বে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান।

সংবাদ

২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তির একটি দাড়ি কমা বাক্যও

পরিবর্তনের ইচ্ছে সরকারের নেই

— ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর

ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর। পরিকল্পনা এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। সম্প্রতি জনসংহতি সমিতি ও সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির মধ্যে বহুল আলোচিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরেও তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। শান্তিচুক্তি সইয়ের পর অন্য কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীরও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গিয়েছিলেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে। পার্বত্য এলাকায় তার সফর অভিজ্ঞতা এবং শান্তিচুক্তি পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল সংবাদ-এর পক্ষ থেকে। সংবাদ প্রতিনিধির সঙ্গে ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সাক্ষাৎকারটি তৈরি করা হয়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সোহরাবহাসান, কাশেম হুমায়ুন ও সাগর সরওয়ার।

সংবাদ: সম্প্রতি আপনারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে এলেন, সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি কেমন মনে হচ্ছে?

ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর: আমরা মনে করি সেখানে তেমন কোন সমস্যা নেই। ওখানে যে ৮৮টি গুচ্ছ গ্রাম আছে সে সব গ্রামের বাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু অপপ্রচার করা হয়েছে। একটি বিশেষ শ্রেণীর এই অপপ্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছেন চট্টগ্রাম নিবাসী বিএনপির একজন নেতা। এতে বলা হয়েছে, শান্তিচুক্তি সই হওয়ায় সেখান থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে, ভূমির মালিকানা বাঙালিদের থাকবে না। আমরা সকলের কাছে গিয়েছি। তাদেরকে চুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছি। সেখানে সেনাবাহিনী আগের মতই থাকবে, যেখানে প্রয়োজন হবে সেনাবাহিনী সেখানে যাবে। তাদের ভোটাধিকার কখনো সীমিত করা হবে না। ভূমি প্রসঙ্গে বলেছি,

সকলের ভূমি অধিকার সমান থাকবে। আমরা প্রতিটি গুচ্ছ গ্রামে গিয়েছি এবং তাদের এ সব বুঝিয়েছি।

সংবাদ: ওখানকার বাঙালিরা এ চুক্তিকে কিভাবে গ্রহণ করেছে?

মহীউদ্দীন: আমরা তিন পার্বত্য জেলায় গিয়েছি। সেখানে দেখেছি বান্দরবান, রাঙামাটিতে বাঙালিদের মধ্যে কোন সমস্যা নেই। খাগড়াছড়ি শহরেও অবস্থা একই রকম। এক সময় সেখানে অবস্থানকারী বাঙালিরা যারা বস্তিতে বসবাস করতো তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে এ চুক্তির মাধ্যমে তারা সে সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। একথা সত্যি যে যারা শান্তি বাহিনীর সদস্য তারা অস্ত্র সংবরণ করবেন। চুক্তির পর জনসংহতির কাছ থেকেও কোন প্রতিবাদ আসেনি। যারা শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে তাদেরকে বলেছি যেহেতু শান্তি বাহিনী একটি চুক্তির আওতায় সাধারণ জীবনে ফিরে আসবে, অস্ত্র সমর্পণ করবে তারা। ফলে এটা স্পষ্ট যে এ অঞ্চলে শান্তি আসবেই। একথা ঠিক যেসব বাঙালিকে গত ২২ বছরে নিরাপত্তা দেয়া যায়নি, এ চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে স্থায়ী নিরাপত্তা দেওয়া হল।

সংবাদ: চুক্তির আগে থেকেই বিরোধীদল চুক্তির ব্যাপারে নানা ধরনের কথাবার্তা বলেছে। আন্দোলনের নানা ধরনের কর্মসূচিও দিয়েছিল। সে সময়ে আপনারা কোন পদক্ষেপ নেননি কেন?

মহীউদ্দীন: দেখুন, আমাদের সরকারের মূল উদ্দেশ্য জনসেবা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা সরকারকে জনগণের সেবার বাহক বানাতে চাই, ক্ষমতার প্রয়োগ করে আন্দোলন দমাতে চাই না। কাজেই যখন আমরা চুক্তি করেছি তখনই আমরা তা জনগণের জন্য প্রকাশ করেছি। এই চুক্তি করার আগে থেকেই বিএনপি এই অবস্থান নিয়েছে যে তারা চুক্তির বিরোধিতা করবে। তারা প্রথম থেকে চুক্তির বিরোধিতা করেছে। তারা বলেছিল চুক্তি হলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের হয়ে যাবে, হয়নি। সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের অপপ্রচার চালানো হয়েছিলো, তাও হয়নি। গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীদের চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বের করে দেয়া হবে বলে যে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল, তাও মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নই। বিএনপি কি করবে না করবে তা ভেবে যদি আমরা পদক্ষেপ নিই তাহলে সরকারের মৌলিক প্রধান কাজ, জনগণের সেবা ব্যাহত হবে। আমরা জনগণের থেকে দূরে সরে যেতে চাই না। জনগণই বুঝবে কারা তাদের ভালো চায়, কারা মন্দ চায়। বিএনপি'র সময় অলি আহমদের নেতৃত্বে যে কমিটি করা হয়েছিলো, তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীকে স্বায়ত্তশাসন দিতে চেয়েছিলো, যার দলিল দস্তবেজ আমাদের হাতে আছে।

সংবাদ: বিএনপি তো এ ব্যাপারটি এখন অস্বীকার করছে?

মহীউদ্দীন: আমরা পার্লামেন্টেই ব্যাপারটি দেখাবো। একথাটি ঠিক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অত্যাচারের পরিবেশ ছিলো তা আমরা বন্ধ করেছি। এ চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়িদের আমরা বলেছি, অতীদের কথা ভুলে যান, বাংলাদেশের সমতলভূমিতে আমরা যে নাগরিক অধিকার ভোগ করছি পাহাড়িরাও একই নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে। আমরা যেহেতু এ নিশ্চয়তা দিতে পেরেছি তাই তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। বিএনপি সরকারের আন্তরিকতার অভাব ছিল বলেই সে সময় তারা চুক্তি করতে পারেনি। এটা তো আপনারা জানেন প্রতিদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে ১ কোটি টাকা খরচ হয়। কিন্তু ঐ অঞ্চলে গত কয়েক বছরে কোন উন্নয়ন হয়নি। এ শান্তিচুক্তির ফলে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবো।

সংবাদ: চুক্তির সাংবিধানিক দিক দিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীদল। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ, পুলিশ, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে বিরোধীদল যা বলছে, সে সম্পর্কে আপনাদের জবাব কি?

মহীউদ্দীন: সংবিধান অনুযায়ী কতজন মন্ত্রী হবেন, কাকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ারভুক্ত। সাংবিধানিক ভাবে সকল নির্বাহী ক্ষমতার দায়িত্বের এখতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর। কাজেই তিনিই এখানে নির্ধারিত করবেন-পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী থাকবেন কিনা! পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একজন মন্ত্রী দরকার, ব্যাপারটি আগেই স্বীকৃত হয়েছে। জিয়াউর রহমান আমলে বিনীতা রায় ছিলেন, এরশাদের সময় অংশু প্র ছিলেন। তখন যদি তাদের হয়ে একজন মন্ত্রী কাজ করতে পারেন, এখন পারবেন না কেন?

১৯৮৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন স্থানীয় সরকার পরিষদের একটি আইন করা হয়। সে আইনে বলা হয়েছে তিন জেলায় পুলিশের এসআই পর্যন্ত তাদের মাধ্যমে নিযুক্ত হবে। আমরা এই আইনকেই বহাল রেখেছি।

সংবাদ: ১৯শ' সালের আইনে ডিসিদের হাতে কতগুলো ক্ষমতা ছিলো। চুক্তির পর ডিসিদের ক্ষমতা কি হবে?

মহীউদ্দীন: পার্বত্য এলাকায় কর্মরত ডেপুটি কমিশনাররা সমতল এলাকার ডিসিদের চেয়েও অধিক ক্ষমতাবান। তারা কিন্তু সেখানে জেলা জজ হিসাবেও কাজ করেন। এখনো তারা আগের মতোই কাজ করবেন।

সংবাদ: জমি হস্তান্তরের প্রশ্নে ডিসিদের যে ক্ষমতা ছিল সেটি খর্ব করা হয়েছে কি?

মহীউদ্দীন: বর্তমানে যে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন আছে, সে আইনের ৬৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, ঐ পরিষদের অনুমতি ব্যতীত জমি হস্তান্তর করা

যাবে না। আমরা সেক্ষেত্রে বলেছি, হ্যাঁ হস্তান্তর করা যাবে অনুমোদনসহ। এক্ষেত্রে গুচ্ছ গ্রামের আওতায় নতুন যারা বসতি স্থাপন করেছেন তাদের জমি তারা যদি হস্তান্তর করতে চান তাতে আইনগত বাধা নেই। যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো উপজাতীয়দের জমি যদি তারা ক্রয় করতে চান, তাহলে ঐ উপজাতীয়দের অনুমতি লাগবে, সেটা আছে। আগে তো হস্তান্তর করাই যেতো না। দেখুন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ এখনো হয়নি। কোন জমি কার এটার জন্য কোন খতিয়ান সংরক্ষণ করা নেই। বংশ পরম্পরায় হয়ে এসেছে সে প্রক্রিয়াটি। তো এই চুক্তি করার ফলে আমি মনে করি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন যে সমস্যা ছিলো সে সমস্যাটির সমাধান হতে যাচ্ছে।

সংবাদ: চুক্তি করা যতো সহজ, তার বাস্তবায়ন ততো কঠিন। চুক্তিটি বাস্তবায়নের সঙ্গে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ব্যাপারে আপনাদের কোন চিন্তা রয়েছে কিনা?

মহীউদ্দীন: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে যে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিলো তাতে বিএনপি'রও সদস্য নেয়া হয়। কাজেই তাদের তরফ থেকে যা বলার তার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আমরা চুক্তি করেছি সেই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। মুষ্টিমেয় কিছু লোক যারা বিদেশী এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তারাই এ চুক্তির বিরোধিতা করেছে। এ সম্পর্কিত যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে আছে, আমরা অনুমানের উপর কোন কথা বলছি না। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসলে তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কালোবাজারি, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা এবং মাদক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। যারা গায়ের জোরে অন্যের জমি দখল করেছে তারাও এ গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধিতা এক কথা, আর জোর জবরদস্তি করা ভিন্ন কথা। দুষ্টকারীরা সেখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে সেটা কোনভাবেই মানবো না। শান্তিপ্রিয় জনগণের মধ্যে অপপ্রচার চালাতে দেবো না।

সংবাদ: বিএনপি বলছে আগে চুক্তি বাতিল হোক তারপর সংসদে আলোচনা হবে।

মহীউদ্দীন: পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও বাঙালি-সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে এ চুক্তি হয়েছে। অতএব বাতিল করার প্রশ্নই আসে না। এই চুক্তির একটি দাড়ি কমা এবং কোন একটি বাক্যও পরিবর্তন করার ইচ্ছা বা বাধ্যবাধকতা সরকারের নেই। তবে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আমরা যে কোন ব্যক্তির বা দলের সুচিন্তিত পরামর্শ বা মতামত বিবেচনা করবো।

সংবাদ: বিরোধী দলের অভিযোগ সরকার তাদের কর্মীদের অহেতুক হয়রানি করছেন, সরকার মোটেই সহনশীলতার পরিচয় দেননি।

মহীউদ্দীন: আমরা ৫ বছর ধরে বিএনপি'র শাসন দেখেছি। সরকারি চাকরির সময় আমি স্বৈরশাসক এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার শাসন আমল প্রত্যক্ষ করেছি, তারা কতটুকু সহনশীল ছিল তা আমার বেশ জানা আছে। বিএনপি শান্তি বাহিনীর সঙ্গে গোপনে চুক্তি করতে চেয়েছিল, আমরা তা করিনি। আমরা চুক্তি করার পর পরপরই তা প্রকাশ করেছি। আমরা কোন কিছু গোপন করিনি। যেহেতু আমরা সহনশীল, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাই জনগণের সামনে তা প্রকাশ করেছি। এ সম্পর্কিত কোন কথা যদি বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেন, তবে তা হবে মিথ্যার বেসাতি। তবে আমরা শুনে খুশি হয়েছি যে তিনি গণতন্ত্রের সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (ঢাকা চেম্বার নেতাদের সঙ্গে আলোচনাকালে খালেদা জিয়ার মন্তব্য প্রসঙ্গে।)

সংবাদ: চুক্তি পরবর্তী পার্বত্যঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আপনাদের পরিকল্পনাগুলো কি?

মহীউদ্দীন : দেখুন আমরা পার্বত্যঞ্চলকে পর্যটনের স্বর্গরাজ্য বানাতে চাই। এই জন্য আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দরকার রাস্তাঘাটের উন্নতি। আমরা সে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পানি সরবরাহের উপর। আমরা পানি সরবরাহ করার জন্য প্রতি ১৫ পরিবারের জন্য একটি নলকূপের ব্যবস্থা করবো। তৃতীয় অগ্রাধিকার পাবে শিক্ষা। আমরা ঐ এলাকার প্রতি ইউনিয়নে গড়ে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবো। এই হিসাবে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই হবে বিদ্যালয়, যেন বাংলা ভাষায় সেখানকার মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারে। এরপর আমরা অগ্রাধিকার দেবো স্বাস্থ্য খাতে। প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তিন জেলার প্রতিটি হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ২০০-তে উন্নীত করা হবে। এরপর আমরা পর্যটনের উপর জোর দেবো। খাগড়াছড়ির আলুটিলায় ৫০ সিটের একটি হোটেল করা হবে। বাঘাইঘাটে একটি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। রাঙামাটির পর্যটন কেন্দ্রটি আরো সম্প্রসারিত করা হবে। বান্দরবানের শহরের মেঘলা, বিজয় পাহাড় এবং চিম্বুক পাহাড়ে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। আমরা এ এলাকায় সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবো। এগুলো এখন শুধু পরিকল্পনার মধ্যে নেই। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ২ হাজার কোটি টাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। আমরা প্রত্যাশা করছি, শান্তি চুক্তির আওতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন তৎপরতা প্রসারিত হবে। এর ফলে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও পর্যটন শিল্পের প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ লাভবান হবে। মোট কথা, আমি বলতে চাচ্ছি-বাংলাদেশকে লাভবান করা, বিজয়ী করার জন্যই আমরা এই চুক্তি সম্পাদন করেছি।

সংবাদ
৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭
রাজ্যমাটিতে শান্তি চুক্তির
সমর্থনে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ

সুনীল কান্দি দে ॥ মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী বলেছেন, '৭১-এর সশস্ত্র সংগ্রামের মাত্র ৯ মাসে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আমরা এনেছি, তার মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের ১ ইঞ্চি জমিও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজনবোধে বীর মুক্তিযোদ্ধারা আবারো অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। কিন্তু একান্তরের ঘাতক ঘৃণ্য রাজাকার আলবদর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে অবশ্যই খেয়াল রেখে এগুতে হবে।

গতকাল রাজ্যমাটি শহরের পৌর চত্বরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল ও রাজ্যমাটি জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা-জনতা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরী এ মন্তব্য করেন।

সংবাদ
১ জানুয়ারি ১৯৯৮
পার্বত্য এলাকায় অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ছে না
১৭ জানুয়ারির মধ্যে শান্তি বাহিনীর
সদস্য ও অস্ত্রের তালিকা পাঠাবে

সাগর সরওয়ার/সুনীল কান্দি দে ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আর বাড়ছে না। গতকাল ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে অস্ত্রবিরতির সর্বশেষ মেয়াদ। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছেন, শান্তি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার কারণে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির আর প্রয়োজনীয়তা নেই। এ সংক্রান্ত একটি চিঠি সপ্তাহখানেক আগে জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানো হয়েছে বলে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানিয়েছেন।

সূত্র জানান, গত ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি সই হওয়ার পর জনসংহতি সমিতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে; সে সঙ্গে চুক্তিমতে আগামী ১৭ই জানুয়ারির মধ্যে জনসংহতি সমিতি তাদের সদস্য এবং অস্ত্র তালিকা পাঠিয়ে দেবে। সে সঙ্গে ঠিক করা হবে কবে নাগাদ কোথায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রসমর্পণ করবে। সূত্র বলছেন, এজন্য সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি বৈঠক হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ‘সংবাদ’কে জানান, গত ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি সইয়ের পর অস্ত্রবিরতি আর বাড়ানো হবে না। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। গত সপ্তাহখানেক আগে তিনি জনসংহতি সমিতিতে এ সম্পর্কে একটি পত্র দিয়েছেন। তিনি আরো জানান, মূলত পার্বত্য শান্তি চুক্তি সইয়ের পর মুহূর্তেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত রাজনৈতিক উদ্যোগের সফলতা সম্পন্ন অস্ত্রবিরতি হয়েছে। ’৯২ সালের ১০ই আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্যাঞ্চল সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ১০ই আগস্ট থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত ৩ মাস সময়ের জন্য প্রথম এক তরফা অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। এই অস্ত্রবিরতির ঘোষণা উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রচারপত্রে জনসংহতি সমিতি উল্লেখ করে এই অস্ত্রবিরতি ঘোষণার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি ও অন্যদের আগমন বা চলে যাওয়া বন্ধও সহায়ক হবে। পরবর্তী সময়ে ঐ বছরে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে সরকার ও জনসংহতি সমিতি এ পর্যন্ত ৪৬ বার এ মেয়াদ বাড়ায়। ৫ বছর ৪ মাস ১২ দিন পর্যন্ত বিরাজিত এই অস্ত্রবিরতি চলাকালে জনসংহতি সমিতি ও নিরাপত্তা বাহিনী একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রবিরতি লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির ১০টি বৈঠকেই এই অস্ত্রবিরতি লংঘনের বিষয়গুলো নিয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতি অনেক তিক্ত আলোচনায় অংশ নেয়। এ সময় দু’পক্ষে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছিল।

এদিকে, খাগড়াছড়ি থেকে মোহাম্মদ জহুরুল আলম জানান, আজ থেকে জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা শুরু হচ্ছে। খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী চিহ্নক নামক স্থানে এ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করবেন সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা)। সমিতি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আগামী ৭ই জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিন। তাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে সমিতি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে দিনটি পালনের প্রস্তুতি নিয়েছে।

সমিতির অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য সমিতির আর্মস ক্যাডার, কালেক্টর বাহিনী, গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রুপ, সকল গ্রুপের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রওনা হয়ে গেছেন।

সীমান্তের সেই কাছাকাছি স্থানের শান্তিবাহিনীর আর্মস ক্যাডারের অধিকাংশ সদস্যও অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন।

পানছড়িতে গত মঙ্গলবার প্রতিবেদকের কাছে বেশ কয়েকটি সূত্র জানায়, শান্তিবাহিনীর কালেক্টরগণ তাদের চাঁদা আদায়ের টোল কেন্দ্র গুটিয়ে নিয়েছেন।

আমন মৌসুমে এবারে কোন কৃষকের কাছ থেকে শান্তিবাহিনী চাঁদা নেয়নি। সূত্রে জানা যায়, সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী চলাকালে কোন এক সময়ে কমান্ডার পর্যায়ের নেতাদের সাথে জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ অপর এক বৈঠকে মিলিত হবেন। এ বৈঠকে অস্ত্র জমাদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। বৈঠকে কোন্ দলের কোন্ কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রথম দলটি অস্ত্র জমা দেবে তা নিশ্চিত করা হবে।

সমিতির আগের এক সিদ্ধান্তে কোম্পানি কমান্ডার মেজর নৈতিক চাকমা ও ক্যাপ্টেন রেনন চাকমার নেতৃত্বে প্রথম দলটি অস্ত্র জমা দেয়ার কথা ছিল। সম্প্রতি পানছড়িতে ইউপি নির্বাচন চলাকালে শান্তিবাহিনীর কমান্ডার রেনন চাকমা ও সুজন চাকমা আহত হলে তাদেরকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। ফলে প্রথম দলে কে কে আসবে তা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। রেনন চাকমা এখন ভারতের কলকাতায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রয়েছে বলে জানা গেছে।

শান্তিবাহিনী ‘জোন’ ভিত্তিক অস্ত্র জমা দেবে। অস্ত্র জমা দেয়ার আগে খাগড়াছড়িতে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বৈঠকে অস্ত্র জমাদানের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে। সম্ভাব্য বৈঠকটি আগামী ১৪ই জুন সংসদ অধিবেশনের আগে হতে পারে বলে যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা যায়।

অস্ত্র জমাদানের আগের বৈঠকে শান্তিবাহিনীর তালিকা ও অস্ত্রধারী এবং নানা গ্রুপের সকল খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনায় স্থান পাবে।

সংবাদ

২ জানুয়ারি ১৯৯৮

সাক্ষাৎকারে আমীর-উল-ইসলাম

পার্বত্য শান্তিচুক্তি সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে নয়

বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও সার্ক ল’-এর সভাপতি ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বলেছেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে যায়নি, বরং তা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বিন্যাসের ভিত্তিতেই সম্পাদন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বাসস’র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ব্যারিস্টার আমীর বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যখন চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ণ

স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সংবিধানের কাঠামোর আওতায় চুক্তিতে উপনীত হতে পারাটা বর্তমান সরকারের একটা বড় ধরনের সাফল্য।

শান্তি চুক্তিটি কোনভাবেই রাষ্ট্রের ইউনিটারি চরিত্রের লংঘন নয় বলে উল্লেখ করে ব্যারিস্টার আমীর বলেন, সংবিধানের ৫৯ ও ৬০নং ধারায় স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নের বিধান রয়েছে। তিনি বলেন, কার্যত এটা সুস্পষ্ট যে, স্থানীয় সরকার প্রশাসন গড়ে তোলার ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের অঙ্গীকারে ঘাটতি ছিল। তিনি আরো বলেন, তিনটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার সম্পর্কেও বিএনপি কোন প্রশ্ন তোলেনি। অথচ এখন সম্ভবত দলীয় স্বার্থে তারা গোলযোগ সৃষ্টি করছে।

প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে সংসদে আইন প্রণয়ন করা সম্পর্কে তিনি ইতিবাচক উত্তর দেন। তিনি বলেন, সংসদেই আইন প্রণয়ন করতে হবে। আর বেগম খালেদা জিয়া ও তার দল চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ও এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সুযোগ নিতে পারে। তিনি আরো বলেন, সংবিধানের আওতায় আইন প্রণয়ন করার ব্যাপারেও বিএনপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্পর্কে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক সাবেক বিএনপি মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কমিটির সুপারিশও বর্তমান চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ সম্পর্কে ব্যারিস্টার আমীর বলেন, এটা মোটেও নতুন নয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও রাষ্ট্রপতি এরশাদ উভয়েই তাদের শাসনামলে মন্ত্রীপদমর্যাদাসম্পন্ন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, ঐ দু'রাষ্ট্রপতির শাসনামলে বিনীতা রায়, সমীরণ দেওয়ান ও উপেন্দ্রলাল চাকমাকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকেরই পদমর্যাদা ছিল মন্ত্রীর সমান।

শান্তি চুক্তিতে একজন মন্ত্রীর অধীনে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে মন্ত্রিসভা ও সংসদের কাছে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

সংবাদ

২ জানুয়ারি ১৯৯৮

ডাচ রাষ্ট্রদূতের আশ্বাস

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে নেদারল্যান্ড সাহায্য করবে

বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ডিক সিবি ডেন হাস গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বাসস জানায়, সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত ডেন হাস তার দেশ এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্নমুখী সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদনে তার সরকারের সমর্থনের কথা জানান। তিনি বলেন, তার সরকার ওই এলাকার উন্নয়নে সর্বাঙ্গিক সহায়তা প্রদান করবে। ডেন হাস আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অঞ্চলের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তিরও প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তি চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে তার সরকার দীর্ঘদিনের এক পুরনো সমস্যার সমাধান করেছে। এলাকার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে পানি বন্টন চুক্তির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওলন্দাজ সরকার নদী খনন ও ভূমি উদ্ধার কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে। এ সময় পররাষ্ট্র সচিব মোস্তাফিজুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

সিস্টার লিনেটের সাক্ষাৎ

ঢাকা মিশনারি অফ চ্যারিটির সিস্টার এম লিনেট গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সংবাদ

২ জানুয়ারি ১৯৯৮

পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবর্তন শুরু

মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে: রামগড় সীমান্তবর্তী ডাকবাংলো ঘাট দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বাংলাদেশী পাহাড়ি শরণার্থীদের ষষ্ঠ পর্যায়ে দ্বাদশ প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে। প্রথমদিনেই তালিকাভুক্ত ১শ' ৮৫টি পরিবারের ৯শ' ৪১ জন শরণার্থী দেশে ফিরেছে। শরণার্থীদের দেশে স্বাগত জানান বাঁগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান।

গতকাল ফেনী নদীর উপর দিয়ে নির্মিত লম্বা কাঠের সেতু পার হয়ে প্রথম দেশে পা রাখেন সুরেন ত্রিপুরা। ষষ্ঠ দফার শরণার্থীদের স্বাগত জানাতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজি গোলাম রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াত হোসেন, বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল, নবগত ডিসি এ, কে, এম জাফরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম, স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জুলফিকার আলি, জেলা আওয়ামী লীগ নেতা নূরুন্নাবি চৌধুরী, মোহাম্মদ জাহেদুল আলম এবং হাজি রফিক উদ্দিন। ভারতের পক্ষে শরণার্থীদের বিদায় জানান দক্ষিণ ত্রিপুরার ডিএন লোকরঞ্জন, সাক্ষর এসডিও মানিকলাল ও শরণার্থী নেতা অজিত বরণ চাকমা ও জাদোরা মগ।

দেশের মাটিতে পা রেখে কাঁঠালছড়ি শিবিরের বাসিন্দা মণীন্দ্র ত্রিপুরা জানান, দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ বিদেশের মাটিতে ছিলাম। আজ শান্তি চুক্তির পর দেশে ফিরে খুবই ভাল লাগছে। মণীন্দ্র তার স্ত্রীসহ ৫ সদস্যের পুরো পরিবার নিয়ে দেশে ফেরেন। তার বাড়ি রামগড় থানার কুমারীপাড়ায়। আজও শরণার্থীরা দেশে ফিরবে।

সংবাদ

৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি

তালিকা চূড়ান্ত, অস্ত্র সমর্পণের দিনক্ষণ

ঠিক করতে বৈঠক ১৫ই জানুয়ারি

সাগর সরওয়ার ৯ আগামী ১৫ই জানুয়ারি বৈঠকে বসছে সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। শান্তি বাহিনীর তালিকা চূড়ান্ত, সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের দিন-তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করতে এ বৈঠক বসছে খাগড়াছড়িতে। যোগাযোগ কমিটি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত সপ্তাহে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির প্রধান হংসধ্বজ চাকমা জনসংহতি সমিতিকে অস্ত্র সমর্পণ-পূর্ববর্তী বৈঠকের ব্যাপারে চিঠি লিখলে এর জবাবে জনসংহতি সমিতি আগামী ১৫ই জানুয়ারি বৈঠক করার ব্যাপারে সম্মতি জানায়। গতকাল শুক্রবার এ চিঠি যোগাযোগ কমিটির কাছে পৌঁছে।

সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতি সকল সদস্যের তালিকাসহ তাদের হাতে মোট অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি বিবরণপত্র এই বৈঠকে উপস্থাপন করবে সরকারের কাছে। সূত্র বলছেন, এ বৈঠকে সরকারের পক্ষে জাতীয়

সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা) যোগ দেবেন।

গত বছরের ২রা ডিসেম্বর প্রণীত শান্তি চুক্তির ঘ (১৩) ধারা মতে দু'পক্ষ এই বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। চুক্তিতে জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও বৈঠক গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন-তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবরকমের নিরাপত্তা প্রদান করবে সরকার। নির্ধারিত তারিখে যেসব সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবেন সরকার তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করবেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিবেন বলেও চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

সংবাদ

৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

আরও ৯৬৯ জন শরণার্থী ফিরেছে

খাগড়াছড়ি, ২রা জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল শুক্রবার রামগড় সীমান্ত দিয়ে ১৯৪টি পরিবারের ৯৬৯ জন শরণার্থী দেশে ফিরেছে। ফিরে আসা শরণার্থীরা রামগড় ও পানছড়ি থানার বাসিন্দা। গত দু'দিনে ৩শত ৭৮টি পরিবারের ১,৯১১ জন শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছে।

ফিরে আসা শরণার্থীরা প্রথমে রামগড় ডাকবাংলো ঘাটে স্থাপিত বিশ্রামাগারে আশ্রয় নেয়। এখান থেকেই শরণার্থীরা প্রাপ্য সুবিধাদি নিয়ে বাস-কোস্টারযোগে স্ব স্ব এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

সংবাদ

৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

সরকার-জনসংহতি সমিতির বৈঠক এগিয়ে আসছে

সাগর সরওয়ার ৯ জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের পরবর্তী বৈঠকের দিন এগিয়ে আনা হচ্ছে। আগামী ১৫ই জানুয়ারির পরিবর্তে এ বৈঠক ১২ অথবা ১৩ই জানুয়ারি করার প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। এ দু'দিনের যেকোন একদিন বৈঠক হবে বলে একটি সূত্র জানিয়েছেন।

জনসংহতি সমিতির সদস্য তালিকা চূড়ান্তকরণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণ এবং শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণের স্থান ও তারিখ এ বৈঠকে নির্ধারণ করা হবে। সেই সঙ্গে বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস ছাড়া

সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়ার লক্ষ্যেও এ বৈঠকে সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানান, ১৫ই জানুয়ারি জনসংহতি সমিতি সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসার যে প্রস্তাব করেছিল সরকার পক্ষ সেদিন বৈঠকে বসতে পারবেন না। এ সম্পর্কিত একটি চিঠি গতকাল বিশেষ দূত মারফত চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। যেহেতু আগামী ১৪ই জানুয়ারি থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হবে, তাই সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এ সময় ঢাকার বাইরে থাকতে পারবেন না। তাই ১৫ তারিখের বৈঠকটি এগিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। সূত্র জানান, জাতীয় সংসদের চিফ ছইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপিসহ অন্য সাংসদরা মনে করছেন, সংসদের এই বৈঠকটি হবে অতি গুরুত্বপূর্ণ তাই তারা চান জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠকটি এগিয়ে আনতে। ফলে সরকারের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ বৈঠক এগিয়ে আনা এবং ১২ অথবা ১৩ই জানুয়ারি বৈঠকটি করার ব্যাপারে যোগাযোগ কমিটিকে চিঠি লিখেছে।

খাগড়াছড়ি থেকে জহুরুল আলম জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে বৈঠকটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনুষ্ঠিত করার জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বৈঠক অনুষ্ঠানের আগে পানছড়ির দুদুকছড়ি থেকে ৮টি অস্থায়ী নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা ও ৫টি ক্যাম্প নিষ্ক্রিয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পত্র পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে।

সংবাদ

৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

আরো ৯৩৫ জন উপজাতীয় শরণার্থী ফিরেছে

খাগড়াছড়ি, ৪ঠা জানুয়ারি (বাসস)।- ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হতে রামগড় সীমান্ত পথ দিয়ে ১৮৫টি পরিবারের মোট ৯৩৫ জন উপজাতীয় শরণার্থী আজ দেশে ফিরেছে। আজ ছিল শরণার্থী প্রত্যাবাসনের ষষ্ঠ পর্যায়ের চতুর্থ দিন। খাগড়াছড়ির কর্মকর্তা একথা জানান।

এ নিয়ে চার দিনে ত্রিপুরার কাঁঠালছড়ি শরণার্থী শিবির হতে ৭৫৬টি পরিবারের ৩ হাজার ৮শ' ৯৫ জন শরণার্থী দেশে ফিরল। কর্মকর্তারা বলেছেন, সব শরণার্থী ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রত্যাবাসন অব্যাহত থাকবে।

সংবাদ

৬ জানুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়িতে শান্তি সমাবেশ

খাগড়াছড়ি, ৫ই জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি আখ্যায়িত করে “পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ” খাগড়াছড়ি শাখা শুক্রবার সকালে সালকাতাল ক্লাবে এক শান্তি সমাবেশ করে।

ছাত্র পরিষদের নেতা মধু কুমার ত্রিপুরার সভাপতিত্বে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল শান্তি চুক্তির অপব্যবস্থা দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ব্রজকিশোর ত্রিপুরা, রামগড় শাখার অংগ্যজাই মার্মা, মাটিরাঙা থানার মনিরঞ্জন ত্রিপুরা, রাঙামাটির অমল ত্রিপুরা, পলাশ ত্রিপুরা। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি এখানকার সকল মানুষের কল্যাণের জন্য হয়েছে। এ চুক্তির মধ্য দিয়েই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটানো হয়।

এদিকে জেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগ গত শুক্রবার তাদের দলীয় কার্যালয়ে শান্তি চুক্তি সমর্থনে সাদা পতাকা উত্তোলন করেন। যুবলীগের সভাপতি সালেহ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আকবর হোসেন, সহ-সভাপতি রণজিত কুমার দে, ছাত্রলীগের সভাপতি শিবুশঙ্কর দেব, স্বপন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুজ্জামান মাসুদ দলীয় কার্যালয়ের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ

৬ জানুয়ারি ১৯৯৮

সীমান্ত গ্রাম চিম্বুক : শান্তি বাহিনীর

সমাপনী অনুষ্ঠানমালায় মুখর

মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে: শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সীমান্তবর্তী চিম্বুক এলাকায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালা চলছে। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন।

একটি সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতি উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল দু'ভাগে ভাগ করে প্রতিবছর ৭ই জানুয়ারি সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে। এবার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ‘উত্তরাঞ্চল’, সীমান্তবর্তী চিম্বুক এলাকায়। দক্ষিণাঞ্চল আগামীকাল মিজোরাম সীমান্তবর্তী একটি বোমপাড়ায়

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন করেছে। বোমপাড়ায় এ কর্মসূচি শান্তি বাহিনীর ডেপুটি ফিল্ড কমান্ডার এবং সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা স্নেহময় চাকমা ওরফে ধ্রুব উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে।

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে গতকাল সোমবার কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বোমপাড়ায় এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হবে। অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রাজ্যমাটি-বান্দরবান এলাকায় নিয়োজিত সকল গ্রুপের সদস্যরা ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠানস্থলে সমবেত হতে শুরু করেছে। এখানে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে সর্বশেষ ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হবে। সমিতির আলোচনা সভায় পানছড়ির দুদুকাছড়ার গ্রামবাসীদের একটি দাবিও উত্থাপন করা হবে বলে জানা গেছে। গ্রামবাসীদের দাবিটি হচ্ছে দুদুকাছড়াকে ঐতিহাসিক করে রাখার জন্য এ গ্রামে প্রয়াত মানবেন্দ্র লারমার একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করে “মানবেন্দ্র লারমা মেমোরিয়াল হাসপাতাল” স্থাপন করা। জনসংহতি সমিতি এ দাবিটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় তুলে ধরবে।

জানা গেছে, প্রথম গ্রুপে অস্ত্র জমাদানের জন্য সমিতির আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমান্ডারদের নাম পরিবর্তন করা হতে পারে। প্রথম অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে সমিতির শীর্ষনেতা রঞ্জনপল ত্রিপুরার (মেজর প্রণব) নেতৃত্বে প্রথম দলটি ২১০ জন সদস্যকে নিয়ে অস্ত্র জমা দিতে পারে।

সংবাদ

৭ জানুয়ারি ১৯৯৮

জনসংহতি সমিতি ১৬ই জানুয়ারি বৈঠকে বসতে চায়

সুনীল কান্তি দে/মোঃ জহুরুল আলম ৷ শান্তি বাহিনীর সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণ এবং অস্ত্রসমর্পণের তারিখ ঠিক করতে আগামী ১৬ই জানুয়ারি সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছে জনসংহতি সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক ‘সংবাদ’কে এ খবর দিয়েছেন। সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছেন, সরকার ঐ তারিখে বৈঠকে বসতে রাজি আছে।

যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানান, সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী ১২ অথবা ১৩ তারিখে জনসংহতি সমিতি বৈঠকে

বসতে রাজি নয়। তারা চান আগামী ১৬ই জানুয়ারি বৈঠক করতে। এ সম্পর্কিত সমিতির অন্যতম নেতা উষাতন তালুকদারের লেখা একটি চিঠি যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়কের কাছে পৌঁছেছে। হংসধ্বজ চাকমা জানিয়েছেন, তিনি এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে জানিয়েছেন। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে খুব শিগগিরই যোগাযোগ কমিটির একটি চিঠি পৌঁছে দেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ইতোপূর্বে সরকার বৈঠকটি ১৫ তারিখের স্থলে ১২ অথবা ১৩ই জানুয়ারি করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সরকার পক্ষ জানিয়েছিল, আগামী ১৪ তারিখ জাতীয় সংসদ অধিবেশন এবং ১৫ তারিখে ত্রিদেশীয় বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে সরকার খুব ব্যস্ত থাকবে। তাই ১৫ তারিখে বৈঠক করা সম্ভব নয়। যোগাযোগ কমিটি ঐদিন বৈঠকের আয়োজন করতে সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

সংবাদ

৭ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন

সাগর সরওয়ার ৷ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগকেই পরিবর্ধন, পরিমার্জন করে এ মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে বলে জানা গেছে। গতকাল বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত এ আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব আতাউল হক। বৈঠক আজ এবং আগামীকালও চলবে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানান, গত ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সম্পাদিত চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের কথা রয়েছে। সূত্র জানান, গতকালের বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ছাড়াও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানান, বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ‘ও এন্ড এম’ বিভাগে পাঠানো হবে। সে বিভাগই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আকার কেমন হবে, কি কি প্রয়োজন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো খতিয়ে দেখবে।

সংবাদ
৮ জানুয়ারি ১৯৯৮
পার্বত্য চুক্তি নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের
সম্ভাবনা নাকচ করেছেন রাষ্ট্রপতি
■ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মান্নান ভূঁইয়ার সাক্ষাৎ
■ নাসিম-দেলোয়ার কথা হয়েছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ৯ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ পার্বত্য শান্তি চুক্তি নিয়ে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে কোন প্রকার গোলটেবিল বৈঠক ডাকার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। তবে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন পার্বত্য চুক্তির বিষয়টিকে সর্বোচ্চ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চিহ্নিত করে রাষ্ট্রপতিকে কোন প্রকার বিতর্কে না টেনে এ নিয়ে সরকার ও বিরোধীদল সংসদের ভেতরে ও সংসদের বাইরে আলোচনা করতে পারে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া গতকাল বুধবার দুপুরে রাষ্ট্রপতির সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করে পার্বত্য চুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর সন্ধ্যায় বঙ্গভবন থেকে ইস্যুকৃত এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্ত ও মতামত জানানো হয়েছে। বিএনপি'কে জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশনে ফিরিয়ে আনার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের উদ্যোগ স্তিমিত হলেও একেবারে নিঃশেষ হয়নি। দু'পক্ষের যোগাযোগ চলছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া গতকাল রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে পার্বত্য চুক্তি, জাতীয় সংসদে যোগদানের ব্যাপারে বিএনপি'র ১৪ দফা দাবিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। দুপুর সোয়া ১২টা থেকে প্রায় ১ ঘণ্টা আলোচনা হয়। তিনি পার্বত্য চুক্তি প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক ডাকার জন্য বিএনপি'র আগের প্রস্তাবটিও পূর্নব্যক্ত করেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাননি।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপি নেতাদের সাক্ষাৎ, পার্বত্য ইস্যুতে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক ডাকার জন্য খালেদা জিয়ার প্রস্তাব, বঙ্গভবন থেকে ফিরে পার্বত্য চুক্তি বাতিল না করা হলে বিএনপি কোন গোলটেবিল বৈঠকে যাবে না বলে মান্নান ভূঁইয়ার নয়। শর্ত আরোপ, চুক্তি বাতিল না করলে সংসদে যাব না বলে খালেদা জিয়ার ঘোষণা, অন্যদিকে এই চুক্তি নিয়ে সংসদের বাইরে কোন আলোচনার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অনীহা-এসবকিছু মিলিয়ে রাষ্ট্রপতি বিরক্ত। গোলটেবিল বৈঠক হলেও তা যে সাফল্য বয়ে আনবে সে ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতি সন্দিহান। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি নিজেকে কোন প্রকার বিতর্কে না জড়ানোই শ্রেয় মনে করছেন।

সূত্র জানায়, রাষ্ট্রপতি কোন গোলটেবিল বৈঠক ডাকবেন না, একথা মঙ্গলবারে বিএনপি'কে জানিয়ে দেয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই মান্নান ভূঁইয়া গতকাল রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলতে যান। রাষ্ট্রপতির সাথে এই সাক্ষাতের বিষয়ে বিএনপি নিরবতা পালন করছে, কেউই মুখ খুলছেন না। জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিএনপি'কে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারিদলের উদ্যোগের ক্ষেত্রে ভাটা পড়লেও তা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মঙ্গলবার রাতেও বিএনপি নেতা, বিরোধীদলের চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সরকারিদলের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম 'সংবাদ'কে বলেন, বিরোধীদলের চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে আবারো আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছি। তাদের মতামত জানার জন্য অপেক্ষা করছি।

জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানশেষে একদল সাংবাদিকের সাথে আলোচনাকালে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বিষয়টি বিএনপি'কে সংসদে ফিরিয়ে আনার নয়। সংসদে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে বিএনপি'কে কেউ বাধা দেয়নি, সংসদে যোগ দেয়া তাদের অধিকার। কোন সমস্যা থাকলে তা সংসদেই আলোচনা করে সমাধান করা যায়। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাতিল না করলে সংসদে যাব না-এ ধরনের শর্ত আরোপ অবাস্তব। কেননা কোন কারণ ছাড়াই এ চুক্তি বাতিলের প্রশ্ন আসে না। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি কার্যকর হবে আইনের মাধ্যমে। ওই আইন পাস করবে সংসদ। সরকার সংসদে ওই আইনের বিল উত্থাপন করলে তা বাছাই কমিটিতে যাবে। বাছাই কমিটিতে বিএনপিসহ সকল দলের সদস্য রয়েছেন। তারা আইনের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করে মতামত দেবেন। বাছাই কমিটি হয়ে তা আবার সংসদে উপস্থাপিত হবে, সংসদে তা নিয়ে আলোচনা হবে। এভাবে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে চুক্তির বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টিও অসম্ভাবিক নয়।

বিএনপি'র অন্যান্য দাবি প্রসঙ্গে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, সংসদে সম্পাদিত ৪ দফা সমঝোতা চুক্তির বিষয়ে সরকারি দল আন্তরিক। প্রথম দফা অনুযায়ী মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে যতটা সম্ভব সংখ্যানুপাতে বিএনপি'র প্রতিনিধি নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংখ্যানুপাতে হলে বিএনপি ১১৬টি পায়, সেখানে ১১৩টি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিএনপি'র দলীয় সাংসদের নামে কোন হয়রানিমূলক মামলা থাকলে তা প্রত্যাহারের কথা রয়েছে দ্বিতীয় দফায়। এটি দেখার জন্য একটি কমিটি হয়েছে। বিএনপি চাইলে যে কোন মুহূর্তে এই কমিটি বসে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে সাংসদদের নামে মামলার যে তালিকা বিএনপি দিয়েছে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক নয় বলে মোহাম্মদ নাসিম মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তৃতীয় দফায় রয়েছে সংসদীয় কার্যক্রম নিরপেক্ষভাবে রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচার। এক্ষেত্রে রেডিও'র বেলায় কোন সমস্যা নেই, কেননা রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। টেলিভিশনের বিষয় দু'পক্ষের চিফ হুইপ বসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ দফায় রয়েছে সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মাঝেমাঝে দুই চিফ হুইপের বসার বিষয়। এক্ষেত্রে কোন সমস্যা আছে বলে মনে করি না।

বিএনপি'র ১৪ দফার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মোহাম্মদ নাসিম রাজপথে জনসভা করতে দিতে হবে। এমন দাবি সঙ্গত নয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বলেন, জনসভার জন্য স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে রাস্তায় জনসভা বন্ধ করেছে। জনসভার স্থান আরো বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। মোহাম্মদ নাসিম বলেন, সংসদে যাওয়ার জন্য কোনকিছুই পূর্বশর্ত হতে পারে না। সমস্যা থাকলে আলোচনা করে সমাধান করা যায়। আলোচনায় বসার জন্য পরিবেশ তৈরির ব্যাপারে বিএনপি'র দাবী প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, এমন কোন ঘটনা নেই যা আলোচনায় বসার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাতিল না করে আলোচনায় বসা যাবে না, এমন শর্ত দিলে তা তো মানা যাবে না।

সংবাদ

৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

সরকার এখন ১৫ই জানুয়ারিতেই বৈঠকে বসতে চায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকার আগামী ১৫ই জানুয়ারি বৈঠকে বসতে চায়। জনসংহতি সমিতির পক্ষে প্রথম ঐদিন বৈঠকে বসতে সরকারের কাছে প্রস্তাব জানানো হয়েছিল ৩০শে ডিসেম্বরের লেখা এক পত্রে। তারিখ পরিবর্তনের ব্যাপারে গতকাল বুধবার স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ থেকে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ খবর দিয়েছেন।

সূত্র বলেন, আগামী ১৫ই জানুয়ারি যথাসময়ে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজেই এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ

৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে বেলজিয়াম

বেলজিয়াম পার্বত্য শান্তি চুক্তি সইয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছে। ব্রাসেলস থেকে প্রেরিত এক বার্তায় বলা হয়েছে, বেলজিয়াম ২রা ডিসেম্বর সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানায়। এ চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু বছর ধরে বিরাজমান উত্তেজনার অবসান হয়েছে। খবর বাসস'র।

সংবাদ

৯ জানুয়ারি ১৯৯৮

জনসংহতি সমিতি নয়া রাজনৈতিক

দল হবে, সন্ত্রাসকে আঞ্চলিক

পরিষদ প্রধান করার প্রস্তাব

■ সর্বশেষ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ব্যাপক আলোচনা

মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে ৯ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে জনসংহতি সমিতির সর্বশেষ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান গত বুধবার শেষ হয়েছে। ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে (সন্ত্রাস লারমা) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সমিতির কর্মীরা উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল নামে দু'ভাগে ভাগ হয়ে সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে। উত্তরাঞ্চলের কর্মসূচি পালন করা হয় সীমান্তবর্তী চিমুক এলাকায় এবং দক্ষিণাঞ্চলের কর্মসূচি পালন করা হয় মিজোরাম সীমান্তের বম্পাড়া এলাকায়। শান্তি চুক্তির উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয় উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলোতে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেন, স্বাভাবিক জীবনে সমিতির সকল সদস্য ফিরে এলে তাদের কর্মপন্থা কি হবে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, খুব শিগগিরই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আলোচনা সভায় সমিতির বর্তমান মজুদ সম্পদের বিবরণ তুলে ধরা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সমিতির জমানো অর্থ দিয়ে একটি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হবে এবং এ টাকা সমিতির সদস্যদের কল্যাণে লাগানো হবে।

চিম্বুক এলাকার আলোচনা সভায় সমিতির প্রায় সকল কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। সূত্র জানান, শান্তি বহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন ‘কোম্পানী’ অনুযায়ী অস্ত্র সমর্পণ করবে। শান্তিবাহিনীর প্রায় সদস্যই তাদের নিজস্ব সম্পত্তি ইতোমধ্যেই নিজ নিজ বাড়িঘরে পাঠাতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির মধ্যে অস্ত্র জমাদান বিষয়ে খাগড়াছড়িতে আগামী ১৫ই জানুয়ারি বৈঠকটির জন্য যোগাযোগ কমিটির প্রস্তুতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্পন্ন করার জন্য আগামী ১৩ই জানুয়ারি খাগড়াছড়িতে প্রস্তুতিমূলক এক বৈঠক আহ্বান করেছে।

সংবাদ

১০ জানুয়ারি ১৯৯৮

রামগড় দিয়ে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন শেষ

আজ শুরু তবলছড়ি দিয়ে

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা: ত্রিপুরার কাঁঠালছড়ি শিবির থেকে সব উপজাতি শরণার্থী দেশে ফিরেছে। গতকাল শুক্রবার রামগড় সীমান্তবর্তী ডাকবাংলো ঘাট দিয়ে কাঁঠালছড়ি শিবির থেকে সর্বশেষ ৫৪টি পরিবারের ২শ’ ৬৩ জন শরণার্থী দেশে ফিরেছে। ফলে রামগড় সীমান্তবর্তী দিয়ে প্রত্যাবাসন কাজ গতকাল শেষ হয়ে গেছে।

আজ শনিবার মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে প্রত্যাবাসন কাজ শুরু হবে।

চুক্তিবিরোধী সমাবেশ

পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাতিল ও নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবি করে গতকালও জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়েছে।

জেলা সদরে জুমার নামাজ শেষে পৌর শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলকারীরা কালো পতাকা নিয়ে চুক্তি বাতিলের নানা শ্লোগান দেয়। পরে পৌর শাপলা চত্বরে এক সমাবেশ করে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী ১১ই জানুয়ারি খাগড়াছড়িতে মহাসমাবেশ হবে। তা সফল করার জন্য তারা সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জামাতের আমীর মওলানা হাবীব আহমদ, সেক্রেটারি সৈয়দ আবদুল মোমেন, নজরুল ইসলাম, আফসার ও রফিকুল ইসলাম। মাটিরাঙ্গাও মিছিল-সমাবেশ হয়েছে।

সংবাদ

১১ জানুয়ারি ১৯৯৮

দুদুকছড়ায় ৮টি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার, ৫টি নিষ্ক্রিয়

মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে: জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের আগামী ১৪ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকটির জন্য পানছড়ির দুদুকছড়া এলাকা থেকে গতকাল শনিবার ৮টি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার ও ৫টি ক্যাম্পের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানান, অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যেই প্রতি বৈঠকের আগে নিরাপত্তা ক্যাম্প তুলে নেয়া হয়। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকটি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে আগামী ১৩ই জানুয়ারি যোগাযোগ কমিটির এই বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। যোগাযোগ কমিটির সকল সদস্যকে আগামী ১৩ই জানুয়ারি প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে ইতোমধ্যে চিঠি পাঠানো হয়েছে। যোগাযোগ কমিটির সদস্যরা হলেন-কৈশঅং মারমা (বান্দরবান), মথুরালাল চাকমা (রাঙ্গামাটি), নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা (রামগড়), মোহাম্মদ শফি (পানছড়ি) এবং বিশ্বজিৎ চাকমা (খাগড়াছড়ি)। যোগাযোগ কমিটির প্রস্তুতিমূলক বৈঠকটি যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার খাগড়াছড়িস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে সর্বশেষ বৈঠকটিতে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা) যোগ দেবেন।

সংবাদ

১৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রী

সরকার সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাসস জানায়, গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার কার্যালয়ে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ২২ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় বলেন, দেশের পবিত্র সংবিধানও সকলের জন্য সমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সংঘের সভাপতি শ্রীমন্ত সুদানন্দ মহাথেরো ও মহাসচিব অধ্যক্ষ ডঃ প্রণব কুমার বড়ুয়া। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তাদের বিভিন্ন দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেন।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ বছরের অক্টোবর ও নভেম্বরের কোন এক সময় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন ঢাকায় আয়োজন করার পরিকল্পনা করছে। তারা পার্বত্য শান্তি চুক্তিকেও স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশের গোলযোগপূর্ণ অংশে শান্তি ফিরে আসবে বলে তারা দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি অঞ্চলটিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিরোধের অবসানের পাশাপাশি সেখানে শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। তিনি আরো বলেন, শরণার্থীরা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসছে এবং তাদের যথাযথভাবে পুনর্বাসনও করা হচ্ছে।

প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিপাল মহাথেরো, এস ধর্মপাল মহাথেরো, সুগতানন্দ মহাথেরো, বিমলেন্দু বড়ুয়া, অধ্যাপিকা স্মৃতি বড়ুয়া প্রমুখ।

সংবাদ

১৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

অবরোধ ডেকেছে ঐক্যপরিষদ

সরকারের সঙ্গে শান্তি বাহিনীর বৈঠক আজ

সাগর সরওয়ার, খাগড়াছড়ি থেকে: শান্তি বাহিনীর সদস্য তালিকা হস্তান্তর, অস্ত্রসমর্পণের স্থান ও তারিখ নির্ধারণ এবং অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয় চূড়ান্ত করতে আজ বৃহস্পতিবার সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। আর আজ এবং আগামীকাল খাগড়াছড়িতে ৪৮ ঘণ্টার সড়ক অবরোধ ডেকেছে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ।

আজকের বৈঠকে সরকার পক্ষের নেতৃত্ব দেবেন আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ লারমা)। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের বৈঠকে সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব যোগ দেবেন বলে জানা গেছে। সূত্র জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি পরিবীক্ষণের জন্য যে কমিটি গঠন করা হবে সে বিষয় ছাড়াও ‘আন্ডার গ্রাউন্ড’ সদস্যদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার শেষ তারিখ নির্ধারণের জন্যও কথা হবে উভয়ের মধ্যে। এবারের বৈঠকটি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সরকার।

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ আজ সকালে বৈঠকস্থলে পৌঁছবেন। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবে নিয়ে আসবেন যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা। সূত্র জানান, এবারের সংসদ অধিবেশনেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদ আইন পাস করিয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেয়া হবে। অনুমোদনের পর তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। এর পরপরই জেলা পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠনের ব্যাপারে জনসংহতির সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ হবে চিঠির মাধ্যমে। ঐ সূত্র বলছেন, সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির এটাই হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ বৈঠক।

বৈঠককে সামনে রেখে আজ থেকে ৪৮ ঘণ্টার জন্য সড়ক অবরোধ ডেকেছে সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ। গতকাল মাটিরদাঙ্গায় অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক জাফরুল হোসেন ‘সংবাদ’কে জানিয়েছেন, নিরাপত্তার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশসহ সকল নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক রাখা হয়েছে। আজ সোয়া ১১টায় এ বৈঠক শুরু হবে এবং বিকেল ৩টার আগেই শেষ হবে বলে জানা গেছে।

সংবাদ

১৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ঘোষণা

সম্ভ লারমা ক্ষমতা নিলে

পার্বত্য বাঙালিদের সশস্ত্র আন্দোলন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, খাগড়াছড়ি থেকে: ৩১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জেলার মাটিরদাঙ্গা থানায় সমাবেশ করেছে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি বাতিল ও গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে এ সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা মীর শওকত আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শাহজাহান সিরাজ, ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ এরশাদ এবং ওয়াদুদ ভূঁইয়া।

বক্তারা বলেন, যেদিন সম্ভ লারমা ক্ষমতার চেয়ারে বসবে সেদিন থেকে পার্বত্য বাঙালিরা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করবে। এজন্য বাঙালিদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য তারা আহ্বান জানান। তারা বলেন, এ চুক্তি কালো চুক্তি, কালো চুক্তি সাদা করার চক্রান্ত হচ্ছে—তা রুখে দাঁড়াতে হবে। কালো চুক্তি বাতিল করতে হবে।

সকাল সোয়া ১১টায় এ সমাবেশ শুরু করতে চাইলে পুলিশ প্রথমে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ পাহারায় তারা সমাবেশ করে। কোন গোলযোগ হয়নি।

মাটিরাঙ্গা থানা সদরের কলেজ এলাকায় পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ এবং নাগরিক কমিটি একই জায়গায় সমাবেশ ডাকলে থানা প্রশাসন উল্লেখিত এলাকা থেকে ১০ নম্বর এলাকা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে।

সংবাদ

১৬ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ শুরু ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে

সাগর সরওয়ার ও জহরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে: আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারি শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের প্রথম দলটি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্রসমর্পণ করবে। প্রথম দলটির নেতৃত্ব দেবেন জনসংহতি সমিতির প্রধান এবং শান্তি বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ড জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ লারমা)। গতকাল বৃহস্পতিবার সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত বৈঠকশেষে যৌথ প্রেসব্রিফিংয়ে জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ একথা জানান। এ সময় সম্ভ লারমা উপস্থিত ছিলেন। যৌথ প্রেসব্রিফিংয়ে জানানো হয়, প্রথমদিনেই শান্তি বাহিনীর ৬শ' সদস্য অস্ত্রসমর্পণ করবেন। এদের মধ্যে ৪শ' হাতিয়ারসহ এবং ২শ' থাকবেন গোলাবারুদ নিয়ে। দুপুর ১২টায় এ অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান শুরু হবে। এরপর ১৬ই ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়ি হাই স্কুল মাঠে, ২২শে ফেব্রুয়ারি বরদাম হাইস্কুল মাঠে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ দফায় অস্ত্রসমর্পণ হবে দুদকছড়ায়। গতকাল দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে শান্তি বাহিনী ও সরকার পক্ষের নির্ধারিত বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক স্থায়ী হয় বিকেল পৌনে ৪টা পর্যন্ত। নেতৃত্ব দেন জাতীয় কমিটির পক্ষে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র, বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ লারমা)।

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান, গতকালের বৈঠকে জনসংহতি সমিতির সদস্য তালিকা দেয়া হয়েছে। তবে তালিকা আংশিক বলেই মনে করা হচ্ছে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে তাদের ১৬শ' সদস্যের তালিকা হস্তান্তর করেছে বলে সূত্র জানান। সূত্র জানান, এরপর আরো সদস্যের তালিকা সরকারকে দেয়া হবে বলে জানা গেছে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছে। সরকার দ্রুতই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে বলে জনসংহতি সমিতিতে আশ্বাস দিয়েছে।

সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতির প্রধান সম্ভ লারমা প্রথম অস্ত্রসমর্পণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রক্রিয়াটি শুরু করবেন। তিনি এরপর আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করবেন।

সূত্র জানান, গতকালের বৈঠকে শান্তি বাহিনীর হাতে কি ধরনের অস্ত্র রয়েছে এবং গোলাবারুদ কি পরিমাণ আছে তাও লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। সরকারি হিসেবমতে শান্তি বাহিনীর সদস্যসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

এছাড়া জানা গেছে, শান্তি বাহিনীর হাতে কন্সোডিয়া ও ভারতের বিভিন্ন হালকা অস্ত্র রয়েছে।

সূত্র জানান, গতকালের বৈঠকে প্রথম অস্ত্রসমর্পণের অনুষ্ঠানে সরকার পক্ষে কে উপস্থিত থাকবেন, কার কাছে অস্ত্রসমর্পণ করা হবে তা ঠিক হয়নি। এ ব্যাপারে চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 'সংবাদ'কে জানান, এ ব্যাপারে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বৈঠক শুরু হওয়ার পর দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে জাতীয় কমিটির সকল সদস্যের সঙ্গে আলাপচারিতা হয়। এরপর জনসংহতির ৩ জন এবং জাতীয় কমিটির ৩ জন মূল আলোচনায় বসেন। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ এ সময় ছিল কড়া নিরাপত্তা বেষ্টিত। জাতীয় সমিতির ৩ সদস্যের মধ্যে ছিলেন আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, নবনিযুক্ত মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সম্ভ লারমা, রক্ত উৎপল ত্রিপুরা এবং সুধাসিন্ধু খীসা। এই ৬ জনের মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গতকালের বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন, শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন, এসএস চাকমা, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, সহকারী সচিব জুলফিকার আলী, পরিচালক মশিউর রহমান, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব।

গতকাল জনসংহতি সমিতির নেতাদের বৈঠকস্থলে নিয়ে আসেন যোগাযোগ কমিটির অন্যতম সদস্য বিশ্বজিত চাকমা। তিনিই বৈঠকশেষে জনসংহতি নেতৃবৃন্দকে দুদকছড়ায় পৌঁছে দেন। দুদকছড়ার উদ্দেশে হেলিকপ্টারে উঠার সময় জনসংহতি সমিতির সদস্যদের খুবই হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

সংবাদ
১৭ জানুয়ারি ১৯৯৮
দুদুকছড়ার ভিন্ন রূপ
শান্তি বাহিনীর সদস্যরা প্রস্তুতি নিচ্ছে ফিরে আসার
গুটিয়ে ফেলছে ‘হিট লিস্ট’, অস্ত্র যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কমান্ডে

সাগর সরওয়ার ও জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে: ঘরে ফেরার পক্ষের শান্তিবাহিনী সদস্যরা। দুদুকছড়া এখন তাদের চাপা উল্লাসে মুখরিত। নিজেদের মধ্যে চলছে নানারকম আলোচনা। জনসংহতি সমিতির বেশ কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, শান্তি বাহিনী প্রত্যাহার করেছে তাদের ‘হিট লিস্ট’। অস্ত্রসমর্পণের পর শান্তি বাহিনীর সদস্যদের জন্য গঠন করা হবে একটি ‘ভবিষ্যৎ তহবিল’। এছাড়া তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য একটি মনিটরিং সেলও গঠন করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা। ইতোমধ্যে পাহাড়ের বিভিন্ন গোপন আস্তানা থেকে তাদের মালপত্র নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। গতকাল খাগড়াছড়ির দুদুকছড়াতে গিয়ে তাই দেখা গেল চাঁদের গাড়ি ভর্তি করে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে বাস্কেটেরা আর ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাঠানো হচ্ছে। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা এখন রয়েছেন প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে। তাই অনেকটা ‘রিলাক্স মুডে’ দুদুকছড়ার শান্তি বাহিনীর ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে তারা গল্পগুজব আর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করছেন। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা সামরিক পোশাক ছেড়ে ‘সিভিল’ পোশাকে অপেক্ষমাণ সকলের সঙ্গে কথা বলছেন। গতকাল দুদুকছড়াতে একদল সাংবাদিক সন্ধ্যা লারমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারেন তিনি অসুস্থ। অসুস্থ অবস্থায় কেবল দলের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গেই দেখা করছেন। গঠিতব্য পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হতে ইচ্ছুক অনেকেই দেখা করতে অপেক্ষমাণ ছিলেন জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যানের সঙ্গে। তিনি বেছে বেছে তিনজনের সঙ্গে গতকাল দেখা করেছেন।

শান্তি বাহিনীর একটি সূত্র গতকাল দুদুকছড়ায় ‘সংবাদ’কে বলেছেঃ তারা এখন ফিরে আসতে চান। নির্দিষ্ট দিনের জন্যই তারা এখন অপেক্ষমাণ। ঐ সূত্র জানায়, শান্তি বাহিনীর অস্ত্রগুলো কেন্দ্রীয় কমান্ডের কাছে জমা দেয়া হচ্ছে। সদস্যদের জন্য শান্তিবাহিনীর হাইকমান্ড কোন অর্থ দিচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে ঐ সূত্র বলে, অর্থ নেয়ার কোন পরিকল্পনা শান্তি বাহিনীর আপাতত নেই। জনসংহতি সমিতির রক্ষিত অর্থ দিয়ে একটি তহবিল তৈরি করা হবে এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদের ভবিষ্যৎ কোন সমস্যা হলে তার জন্য ব্যয় করা হবে। ঐ একই সূত্র বলেছে, সরকারের কাছ থেকে

জনসংহতি সমিতির সদস্যরা যে অর্থ (৫০ হাজার টাকা) পাবে তা থেকে একটা অংশ এই তহবিলে প্রত্যেক সদস্যকে জমা দিতে হবে। অন্য একটি সূত্র বলে, শান্তি বাহিনী এক সভায় তাদের ‘হিট লিস্ট’ প্রত্যাহারের ব্যাপারে একমত হয়েছে। আগে শান্তি বাহিনীর কর্মকাণ্ডে বিরোধিতাকারীদেরকে ‘হিট লিস্ট’-এর আওতায় আনা হয়েছিল। যেহেতু এখন শান্তির পথে তারা পদযাত্রা করেছেন, তাই আর ‘কেউ শত্রু নন, সকলেই বন্ধু’ এই নীতিতে দেশ গড়ার আন্দোলনে শান্তি বাহিনীর সকল সদস্য অংশগ্রহণ করতে চান। আরেকটি সূত্র জানায়, শান্তি বাহিনীর সদস্যদের যথাযথ পুনর্বাসন করার জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠনের চিন্তাভাবনা করছেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

গতকাল দুদুকছড়ায় শান্তি বাহিনীর বর্তমান অনেক সদস্যের সঙ্গে কথা হয়েছে। এইসব সদস্য সবাই শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, আমরা যা চেয়েছিলাম, যার জন্য যুদ্ধ করেছি, তার অনেকাংশই আমরা পেয়েছি। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে চাই। যেসব শান্তি বাহিনীর সদস্য পরিবার-পরিজন নিয়ে ক্যাম্পে বাস করতেন প্রায় সকলেই তাদের পরিবারদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন তাদের অপেক্ষা কেবল নির্ধারিত তারিখের জন্য।

প্রথম দিনের (৯ই ফেব্রুয়ারি) অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের ৬শ’ সদস্যকে নিরাপত্তা বাহিনী এসকর্ট দিয়ে দুদুকছড়া থেকে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে নিয়ে আসবে বলে জানা গেছে। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার দুদুকছড়াতে অস্ত্রসমর্পণ করে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র অবস্থার ইতি টানবেন।

সংবাদ
১৯ জানুয়ারি ১৯৯৮
তিন পার্বত্য জেলায় ১২ হাজার মামলা বুলে আছে

বান্দরবান থেকে এনামুল হক কাশেমী ৯ ১৮ই জানুয়ারি।- ৩টি পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়িতে জায়গা-জমি সংক্রান্ত ১২ হাজার মামলা ৯ বছর ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় বুলে আছে। ‘৮৯ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলো গঠিত হবার পর থেকেই এসব মামলা নথিবন্দি রয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, ৩টি পার্বত্য জেলায় প্রায় ১৮ বছর ধরে স্থানীয় পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের বাধা দেয়ার কারণে পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে ভূমি জরিপ বন্ধ রাখা হয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রশাসনের দেয়া সাধারণ বন্দোবস্তি, রাবার ও হটিকালচার বাগানের নামে প্রদান করা ইজারার কারণে সীমানা, জবর দখল এবং নামজারিসহ জমি ক্রয়-বিক্রি সংক্রান্ত প্রায় ১২ হাজার মামলা প্রশাসনের কাছে ঝুলে আছে। স্থানীয় বাসিন্দা, পুনর্বাসিত বাঙালি এবং রাবার ও হটিকালচার বাগানের জন্য বন্দোবস্ত ও ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তির এসব মামলা করেছেন।

৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯, ২০ ও ২১ নম্বর বলে ৬৪ ধারা অনুযায়ী জমি বন্দোবস্তসহ যাবতীয় ভূমি সংক্রান্ত কাজ পরিষদের অনুমতি সাপেক্ষেই করার বিধান রয়েছে। ফলে পরিষদসমূহের কাছে অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসন থেকেই বহু আগে নথি পাঠানো হয়েছে, কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় ঝুলে থাকা মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে পরিষদগুলোর কর্মকর্তারা জানান, তারা ইতোমধ্যেই ভূমি বিষয়ক প্রবিধান তৈরি করে ঢাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় নথিবন্দি মামলাগুলোর কোন কাজ করা যাচ্ছে না।

এদিকে গত বছরের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় জমি-জমা সংক্রান্ত ঝুলে থাকা প্রায় ১২ হাজার মামলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। চুক্তিতে ভূমি বিষয়ে ভূমি কমিশন গঠনের কথা বলা হলেও বিচারাধীন বা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা মামলাগুলোর বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মতামতও উল্লেখ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী পাহাড়ি বাঙালিদের মাঝে এই ভূমি সমস্যার জন্যই সর্বত্র বিরাজ করছে ক্ষোভ। এ ব্যাপারে দ্রুত সরকারি ঘোষণা প্রয়োজন বলে এলাকার নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করেছেন।

সংবাদ

২২ জানুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্রসমর্পণের তারিখ একদিন পেছাচ্ছে

সাগর সরওয়ার/জহুরুল আলম ॥ আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের তারিখ একদিন পিছিয়েছে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি এ অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এ খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

অস্ত্র সমর্পণ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে রাঙামাটি থেকে নির্বাচিত সাংসদ দীপংকর তালুকদারকে শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। গত ১৫ই জানুয়ারি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দু'পক্ষ ঘোষণা করেছিল যে, আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারি শান্তি বাহিনীর ৪শ' সদস্য অস্ত্র এবং ২শ' সদস্য গোলাবারুদ সমর্পণ করবে। এ বৈঠকে দু'পক্ষের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতি থাকার ব্যাপারটি আলোচিত হয়েছিল। সূত্র জানিয়েছেন, আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে সরকার যোগাযোগ কমিটিকে জানিয়ে দিয়েছে। ১০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। গতকাল বুধবার যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এ সংক্রান্ত একটি চিঠি বিশেষ দূত মারফত জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ্র লারমা)র কাছে দুদুদুদুতে পাঠিয়েছে। এ চিঠির জবাব আগামীকাল অথবা পরশু জানা যাবে বলে হংসধ্বজ চাকমা জানিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অস্ত্র সমর্পণের সব কিছু ঠিকঠাক করতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হচ্ছে। এ বৈঠকে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম এবং মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমাসহ তিন জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সচিবগণ উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র জমা ও পাওনা টাকার চেক প্রদান, আগত অতিথিদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আজকের এ বৈঠকটি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তা বাতিল করা হয়েছে। বৈঠকটি খাগড়াছড়িতে হবে এই প্রস্তুতি নিয়ে রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহ আলম খাগড়াছড়ি আসার পথে তার গাড়ি মানিকছড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে তার দু'জন দেহরক্ষী আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কল্লরঞ্জন চাকমা মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সাংসদ দীপংকর তালুকদারকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গতকাল 'সংবাদ'-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দীপংকর তালুকদার জানান : গত মঙ্গলবার তাকে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার খবর জেনেছেন। তিনি যথাযথভাবে তার দায়িত্ব যাতে পালন করতে পারেন এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সংবাদ
২২ জানুয়ারি ১৯৯৮
প্রসঙ্গ : পার্বত্য শান্তি চুক্তি
ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা

বাগেরহাট, ২১শে জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বাগেরহাট জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১২ই জানুয়ারি বিকেলে জেলা শাখার সভাপতি ফররুখ হাসান জুয়েল-এর সভাপতিত্বে ‘পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনায় অংশ নেন এডভোকেট এসএমএ সবুর (গণফোরাম জেলা সভাপতি), এডভোকেট শেখ জাহাঙ্গীর আলী (বিএনপি নেতা), এডভোকেট বেগ এনায়েতুল হক (আওয়ামী লীগ), এডভোকেট এজেডএম রেজাউল করিম (সিপিবি), মানিকলাল মজুমদার (সিপিবি) এবং আশীষ কুমার দে (যুব ইউনিয়ন)।

বক্তারা শান্তি চুক্তির প্রশংসা করেন এবং এ ব্যাপারে কোন পক্ষের কোন বক্তব্য থাকলে তা জাতীয় সংসদে আলোচনার জন্য দাবি করেন। একই সঙ্গে সরকারি উদ্যোগে শান্তি চুক্তির বিষয় উন্মুক্ত আলোচনায় পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

আলোচনা সভায় ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীসহ আমন্ত্রিতরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ
২৩ জানুয়ারি ১৯৯৮
শান্তি বাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা শিগগিরই

সাগর সরওয়ার/সুনীল কান্তি দে ৥ খুব শিগগিরই শান্তি বাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে। নির্ধারিত তারিখে যেসকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবে সরকার তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করবে বলে গতকাল বৃহস্পতিবার সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ খবর দিয়েছেন।

সভায় শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণ কিভাবে সম্পন্ন করা হবে সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল

ইসলাম বীরোত্তম। এছাড়া গত বুধবার শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর করতে চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয়েছে, অস্ত্রসমর্পণের প্রথম দিনে ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকবেন। শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র আপাতত পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। সূত্র জানান, অস্ত্র জমাদানের পর শান্তি বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর তাদের নিরাপত্তা দেয়া হবে সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। সশস্ত্র সদস্যদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার চেক দেয়ার ব্যাপারটি চূড়ান্ত করতে স্পেশাল এফের্যাস বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

সভায় মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, সাংসদ বীর বাহাদুর ও দীপংকর তালুকদার, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ মোস্তাফিজুর রহমান, স্বরাষ্ট্র সচিব সফিউর রহমান, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিজি বিডিআর, ডিজি ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স, পিএস ও ফোর্সেস ডিভিশন, এনএসআই, পুলিশের আইজি, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি পুলিশ, তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ, পার্বত্য জেলাসমূহের ব্রিগেড কমান্ডারগণ, মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়িতে এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর যেসমস্ত উর্ধ্বতন নেতা অস্ত্রসমর্পণ করবেন সমিতির পক্ষে তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতি সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে সন্ত্রাস লারমার সঙ্গে রূপায়ন দেওয়ানও অস্ত্রসমর্পণ করবেন। খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি এলাকা থেকে শান্তি বাহিনীর মোট ৪শ’ সদস্য অস্ত্রসমর্পণ করবেন। জানা গেছে, সন্ত্রাস লারমা ১০ই ফেব্রুয়ারি অস্ত্রসমর্পণ করলেও ওইদিনই পুনরায় দুদকছড়িতে ফিরে যাবেন এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে দুদকছড়িতে অস্ত্রসমর্পণকারীদের সাথে পুনরায় ফিরে আসবেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে অস্ত্রসমর্পণকালে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সাথে অস্ত্রসমর্পণ করবেন জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরা। অন্যদিকে সমিতির উর্ধ্বতন নেতা গৌতম চাকমা ও সুধাসিন্ধু খীসা অস্ত্রসমর্পণ করবেন ২২শে

ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ির দিঘিনালায় এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি অস্ত্রসমর্পণের সর্বশেষ অনুষ্ঠানে পানছড়ির সুলুকছড়িতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার।

অনেক নেতাকর্মীই চিকিৎসাধীন

একই সূত্র জানিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনেক উর্ধ্বতন নেতাই বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার্থে ভর্তি অবস্থায় রয়েছেন। তাই অস্ত্রসমর্পণের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এদের বিষয়টি নিয়ে জনসংহতি সমিতি নেতারা চিন্তায় পড়েছেন। সূত্র মতে, চিকিৎসারতদের মধ্যে কয়েকজন অপারেশনের রোগীও রয়েছেন।

সংবাদ

২৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে
পেশ করা রিট আবেদন অগ্রাহ্য
(সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ প্রতিবেদক)

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট মামলা উপস্থাপন করা হলে আদালত রিট মামলাটির পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকার কারণে প্রত্যাখ্যান করে আদেশ দিয়েছেন। আবেদনকারী এডভোকেট মোঃ সামছুদ্দিন আহমেদ স্বয়ং রিট মামলাটি আদালতে উপস্থাপন করলে এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার কে, এম নবী রিট আবেদনটিকে একটি রাজনৈতিক মতে উদ্ভুদ্ধ এবং রাজনৈতিকভাবে আগ্রহপ্রসূত বিভিন্ন আক্রমণাত্মক বক্তব্যসংবলিত বিধায় রিট মামলাটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলে আদালতকে জানান।

হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন এবং সৈয়দ জে, আর মোদাচ্ছির হোসেন সমন্বয়ে গঠিত রিট বিষয়ক বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার মামলাটির ওপর রুল জারি প্রক্ষেপে শুনানি গ্রহণ করেন। রিট মামলাটি রাজনৈতিক বক্তব্যসংবলিত এবং রিট পিটিশনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় আবেদনটিতে অনুপস্থিত থাকায় আদালত এক আদেশবলে রিট আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিএনপির সাংসদ ব্যারিস্টার নাজমুল মামলাটি প্রত্যাখ্যান না করে আবেদনটি ফের এনে প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করে আদালতে উপস্থাপনের জন্য আবেদন জানালে রিট আবেদনকারী এডভোকেট সামছুদ্দিন আহমেদ রিট আবেদনটির বক্তব্য সঠিক দাবি করে এটি ফেরত নিতে অস্বীকার করেন।

রিট আবেদনটি সংবিধানের ৭ ও ৪৪(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দায়ের করা হয়। মামলাটিতে রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, বিশেষ কার্যাদি বিষয়ক বিভাগের সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক সচিব এবং চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে প্রতিপক্ষ করা হয়।

রিট আবেদনে গত ২-১২-১৭ইং তারিখে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমার সঙ্গে সম্পাদিত বলবৎকৃত শান্তি চুক্তি আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন ও চুক্তিটি আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে। এ চুক্তির কোন আইনসঙ্গত কার্যকারিতা নেই বলে কেন ঘোষণা দান করা যাবে না এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ওটির জন্য ১৯৮১ সালে প্রণীত যথাক্রমে ১৯, ২০ ও ২১ আইন ওটির প্রত্যেকটির ৪, ৬২ ও ৬৪নং ধারা-এর এবং ১নং ধারার শিরোনামে লেখা ‘পার্বত্য জেলার বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা’ অংশটুকু কেন বাতিল ও অকার্যকর বলে ঘোষণা দান করা যাবে না, সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর নিমিত্তে প্রতিপক্ষগণের ওপর একটি রুল জারি করার আবেদন জানানো হয়।

রিট মামলাটি নিষ্পত্তি পর্যন্ত গত ২-১২-৯৭ তারিখে সরকার এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা কর্তৃক সম্পাদিত ও বলবৎকৃত চুক্তিটি স্থগিত রাখা এবং উক্ত সময় পর্যন্ত প্রত্যাহত সামরিক চৌকিগুলাসহ আনসার ক্যাম্পগুলো পূর্বের জায়গায় পুনঃস্থাপন করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশসহ যথাবিধি আদেশদানের জন্য আদালতের কাছে প্রার্থনা করা হয়।

রিট মামলায় শান্তি চুক্তিটিকে একটি অপরিপক্বতা এবং চুক্তিকৃত পক্ষদ্বয়ের মধ্য চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ব্যতীত এবং সন্ত লারমা উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নয় বিধায় চুক্তিটির কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই এবং সন্ত লারমা বাংলাদেশী আইনে স্বীকৃত কোন ব্যক্তিত্ব বা ‘লিগ্যাল পারসন’ নয় বিধায় তার দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি আইনগত কার্যকর নয়।

হিন্দুস্তানের (ভারতের) নির্দেশ বা চাপ থাকা হেতু অথবা অন্য কোন আশায় পার্বত্য ওটি জেলার নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য এ চুক্তি সম্পাদন হয়েছে বলে রিট মামলায় উল্লেখ করা হয়।

সরকারপক্ষে এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার কে, এস নবী, অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, ডেপুটি এটর্নি জেনারেল ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, এম, ফারুক, সাইফুদ্দিন আহমেদ রিট মামলায় সরকারপক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

রিট আবেদনকারী এডভোকেট সামছুদ্দিন আহমেদ হাইকোর্ট থেকে প্রত্যখ্যাত হয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন।

সংবাদ

২৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর আত্মসমর্পণ : চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে দেড় ঘণ্টা ধরে : ৫টি

ক্যাম্প সরানো ও ১৭টি নিষ্ক্রিয় করার দাবি

সুনীল কান্তি দে ৥ আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি শান্তি বাহিনীর প্রথম দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের মেয়াদ হবে মাত্র দেড় ঘণ্টা। শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা একদিন আগেই অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে আসবেন। ঐ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখবেন। যেসব সশস্ত্র সদস্য সেদিন থেকে অস্ত্র সমর্পণ করবেন তাদের। প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে। গতকাল চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। জনসংহতি সমিতি ১০ই ফেব্রুয়ারির আগে অস্ত্র সমর্পণকারীদের সুবিধার্থে ৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্প সরানো ও ১৭টি ক্যাম্পের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় করতে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যোগাযোগ কমিটিকে চিঠি দিয়েছে।

গতকালের সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন একটি সূত্রে জানা গেছে : প্রথমদিন যারা অস্ত্র জমা দেবেন তাদের খাগড়াছড়ি জেলা শহরে নবনির্মিত নিরাপত্তা ক্যাম্প নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তারা রাত্রি যাপন করবেন। পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারি সকালে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা প্রথমেই খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রবেশ করবেন শুধুমাত্র অস্ত্র হাতে নিয়ে। এবং সেখানে তাদের জন্য নির্ধারিত আসনে বসানো হবে। এ সময়ে ঢাকা থেকে আমন্ত্রিত প্রায় ১৫০ জন অতিথিও স্টেডিয়াম অভ্যন্তরে আসন গ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীরা হেলিকপ্টার থেকে নেমে সরাসরি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে যাবেন এবং নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। এরপর শুরু হবে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান। নির্ধারিত মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এর সাথে সাথে শান্তি বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরাও অস্ত্রসমর্পণ করবেন সারিবদ্ধভাবে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য সময় নির্ধারিত হয়েছে ২০ মিনিট। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে স্বাগত ভাষণ রাখবেন

দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, জনসংহতি সমিতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির নেতা ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জানা গেছে, ঢাকার নামি দামি শিল্পীরা ছাড়াও অনুষ্ঠানস্থলে তিন পার্বত্য জেলার ১৫০ জন শিল্পীর উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন রাখা হবে।

স্থায়ী নিরাপত্তা ক্যাম্প: বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শান্তি বাহিনীর আত্মসমর্পিত সদস্যদের তিন পার্বত্য জেলার জেলা সদরে নির্মিত স্থায়ী নিরাপত্তা ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৪টি পয়েন্টে ৪ দিনে এ সমস্ত ক্যাম্পে কমপক্ষে ৩ দিন এবং সর্বোচ্চ ১ মাস অবস্থান করতে পারবেন। এ সময়ে তাদের থাকা খাওয়ার দায়িত্ব সরকার বহন করবে। আত্মসমর্পণের সাথে সাথেই পার্বত্য শান্তিচুক্তির শর্তানুসারে নগদ অর্থ প্রদান করা হবে। কেউ যদি আত্মসমর্পণের পর নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতে চান তার ব্যবস্থা করা হবে এবং সেক্ষেত্রেও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। খাগড়াছড়ি ও অন্যান্য আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানস্থলের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য তিন পার্বত্য জেলায় কর্মরত এপি ব্যাটালিয়নের ৭টি ইউনিটকেও নিয়োগ করা হবে।

সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিন পার্বত্য জেলায় কর্মরত পুলিশ, বিডিআর, এপিবিএন ও নিরাপত্তা বাহিনীসহ আইন-শৃংখলা বাহিনীকে সতর্ক রাখার কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এ সভায়।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

সভায় আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বিষয়টিও আলোচনা হয়েছে। জানা গেছে, জনসংহতি সমিতি ইতিমধ্যে ১৯৩৩ জনের তালিকা সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। তা থেকে প্রথম ৬০০ জনকে অস্ত্র সমর্পণের সাথে সাথেই ক্ষমা করা হবে। এবং পরবর্তীতে যারাই অস্ত্র সমর্�ণ করবেন তাদেরকেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে। তবে বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পার্বত্যঞ্চলের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি

সভায় তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিষদ আলোচনা হয়েছে। জানা গেছে, তিন জেলায় কর্তব্যরত পুলিশ, বিডিআর-এর সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তা চাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তিন জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও অস্ত্র সমর্পণের পরবর্তীতে পার্বত্য

জেলাসমূহের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আগের মতো নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়োগ করার বিষয়ে সরকারের উর্ধ্বতন মহলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথাও সভায় আলোচিত হয়েছে।

জানা গেছে, এর পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৬, ২২ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখের অস্ত্র সমর্পণের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ অস্ত্র সমর্পণের আগের দিন শান্তিবাহিনী সদস্যরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্থায়ী নিরাপত্তা ক্যাম্পে আসবেন এবং পরদিন শুধুমাত্র খালি অস্ত্র জমা দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করবেন আনুষ্ঠানিকভাবে।

খাগড়াছড়ি থেকে মোহাম্মদ জহুরুল আলম জানান, আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের আগেই জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নিরাপত্তা স্থলে আসার জন্য বিভিন্ন এলাকার ৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্প সরানো ও ১৭টি ক্যাম্পের কার্যক্রম স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে একটি পত্র দেয়া হয়েছে। চিঠিতে জানানো হয়, জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জাতীয় কমিটির একজন সদস্যকে দুদকছড়িতে পাঠাতে হবে।

সংবাদ

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর দুই নেতা খাগড়াছড়িতে (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান তদারকি করতে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা সুধাসিন্ধু খীসা এবং রঞ্জনপল ত্রিপুরা গতকাল রোববার খাগড়াছড়ি এসেছেন। আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করবেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সরকারি একটি সূত্র বলেছে, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণ করবে।

শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ আরেক দফা বাড়ানো হয়েছে। আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর ১৫৩ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবে। এদের মধ্যে ৭১ জন থাকবেন সশস্ত্র। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তিনটি ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়ে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আসবে। এ তিনটি পয়েন্ট হলো গিলাছড়ি হাই স্কুল থেকে ১৯৩ জন, গামারি টোলা মাইচছড়ি হাই স্কুল থেকে ১৩১ জন এবং দুদকছড়ি থেকে ২৭৬ জন। আগামী ১০ এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি ছাড়াও ১৬, ২২ এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি দফাওয়ারি শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করবে।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের সর্বশেষ প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা খাগড়াছড়ি যাচ্ছেন। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান খাগড়াছড়ি থেকে সরাসরি বিটিভি এবং রেডিওতে সম্প্রচার করা হবে বলে জানা গেছে।

সংবাদ

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১ হাজারের বেশি পাহাড়ি শরণার্থী দেশে ফিরেছে

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে গতকাল ১শ' ৮০ পরিবারের ১ হাজার ২৫ জন পাহাড়ি শরণার্থী দেশে ফিরেছেন। ৮ দিন বিরতির পর গতকাল পুনরায় খাগড়াছড়ির তবলছড়ি দিয়ে এ শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হয়।

সংবাদ

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণ: আজ খাগড়াছড়িতে প্রস্তুতি সভা

খাগড়াছড়ি থেকে মোহাম্মদ জহুরুল আলম: শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক এক পর্যালোচনা সভা আজ বুধবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হবে।

সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত এ সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম, চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা এমপি, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ক্রীড়া ও যুব প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সেনাবাহিনী প্রধান মোস্তাফিজুর রহমানসহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

সংবাদ

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে খালেদাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপি নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। গতকাল বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে তার

কর্মসূচি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ বিএনপি নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না।

গতকাল রাতে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, অংশগ্রহণ করব কি না-এ প্রশ্নই অবাস্তব। কারণ এই চুক্তি আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, বাতিল দাবি করেছি। এই চুক্তির মাধ্যমে সারাদেশে অশান্তি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়ঃ সরকার আন্তরিকভাবেই আশা করে বিরোধীদল এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে তখনও যেমন বিরোধী দলের ভূমিকা প্রয়োজন, তেমনি চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা চাই।

সংবাদ

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়িতে প্রস্তুতি সভা

অস্ত্র সমর্পণের পর সন্ত্রাস লারমাকে

প্রধানমন্ত্রী বরণ করবেন গোলাপ দিয়ে

সুনীল কান্তি দে/মোহাম্মদ জহুরুল আলম: ১০ই ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাস লারমা প্রথম অস্ত্র তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে, আর অস্ত্র নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যানকে বরণ করে নেবেন এক গুচ্ছ সাদা গোলাপ দিয়ে। এভাবেই শুরু হবে ১০ই ফেব্রুয়ারির জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের প্রথম দিনটি। এরপর বাকি দেশ' ৯৯ জন সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবেন।

গতকাল বুধবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম। সভায় ১০ই ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান বিটিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

সভায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পূর্ব নির্ধারিত স্থান থেকে জিপে অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসা, একইভাবে ঐ স্থান থেকেই অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়।

জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা প্রথমেই তার অস্ত্রটি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী সাথে সাথেই অস্ত্রটি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করবেন।

গতকালকের সভায় জে এস এস চেয়ারম্যানের দেয়া অস্ত্রটি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে মত পোষণ করা হয়। তবে সন্ত্রাস লারমা কি জাতীয় অস্ত্র দেবেন তা জানা যায়নি।

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: পানছড়ির দুদুকছড়া, পেরাছড়া, মাইছছড়িসহ বেশ কয়েকটি স্থানে অনুষ্ঠানের দু'দিন আগে থেকেই শান্তিবাহিনী সদস্যরা সরকারিভাবে স্থাপনকৃত ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান নেবেন।

অস্ত্র সমর্পণের দিন সকাল আটটা থেকে ১০টার মধ্যে সকল অতিথি ও জনসাধারণকে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে দেয়া হবে। সকাল ১১টায় স্টেডিয়ামের সকল গেট বন্ধ রাখা হবে।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে আসার আগে ও অনুষ্ঠানশেষে অনুষ্ঠিত হবে দু'দফা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গতকালের সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রমের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

জনসংহতি সমিতির প্রতি সাধারণ ক্ষমা

■ ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে অস্ত্র জমা দিলে ক্ষমা মিলবে

■ মামলা, হুঁলিয়া প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করা হবে, বন্দিরা মুক্তি পাবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ৯ আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে জনসংহতি সমিতির যেসব সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবে সরকার তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে এ ঘোষণা কার্যকর হবে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সকল সংসদ সদস্য, দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, পত্রিকার সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য ও দেশের শীর্ষস্থানীয় কবি-সাহিত্যিক এবং বাংলাদেশস্থ সকল দূতাবাস ও দাতা সংস্থার দূত, হাইকমিশনার ও মিশন প্রধানদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্র সচিব সফিউর রহমান এ

প্রজ্ঞাপন জারি করেন। সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় বলা হয় স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত ছিলেন এমন সকল স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও সরকারের সাধারণ ক্ষমা কার্যকর করা হবে।

ঘোষণায় বলা হয়, সাধারণ ক্ষমার আওতায় জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে বা গ্রেফতারি পরোয়ানা বা হুলিয়া জারি করা হয়েছে এই মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে।

জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্যকে তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে সাজা প্রদান করেছে তাদের সাজাও মওকুফ করা হবে। সেই সঙ্গে যারা জেলে আটক রয়েছেন তাদের মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেয়া ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর এই সমিতির সদস্য ছিলেন কেবলমাত্র এ কারণে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা, তাকে গ্রেফতার করা বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রথম খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে, ১৬ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় গ্রুপ বাঘাইছড়ি হাইস্কুল মাঠে, ২২শে ফেব্রুয়ারি তৃতীয় গ্রুপ বরদাম হাইস্কুলে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ চতুর্থ গ্রুপ দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির সদস্যরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবে।

ঘোষণায় আশা প্রকাশ করা হয়ঃ স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর জনসংহতি সমিতির সদস্যগণ বাংলাদেশের সুনামগরিক হিসেবে জীবনযাপন করবেন এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন।

এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানান, ১০ই ফেব্রুয়ারির অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদদের চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ বিমানের একটি এয়ার বাস ভাড়া করা হয়েছে। এতে চড়ে ২শ'রও বেশি অতিথি চট্টগ্রাম যেতে পারবেন। যে সব অতিথিকে বিমানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, সাইফুর রহমান, খন্দকার দেলওয়ার হোসেন, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ. এম এরশাদ, মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জামাতের সাংসদ কাজী সামসুর রহমান ও মিজানুর রহমান চৌধুরী, জাতীয় কমিটির সকল সদস্য, ডঃ কামাল হোসেন, রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, হাসানুল হক ইনু, কবি শামসুর রাহমান, কবির চৌধুরী, হাসান ইমাম, ২২

জন সম্পাদক এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার এবং মিশন প্রধানগণ। জামাতের এমপি মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার সকল এমপিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৪৬ জন বিদেশী রাষ্ট্রদূত, মিশন প্রধান ও হাইকমিশনারগণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন। ১০ই ফেব্রুয়ারির অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে ১শ' ৫০ জন দেশী-বিদেশী সাংবাদিক অংশ নিচ্ছেন। অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপার তদারক করতে আগামীকাল জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের খাগড়াছড়ি যাচ্ছেন। আগামীকাল রাতেই বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর সদস্যদেরকে ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে। ১০ তারিখে তাদেরকে স্টেডিয়ামে নিয়ে আসা হবে সকালে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে ভাষণ রাখবেন। ভাষণে তিনি শান্তি বাহিনীর সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানাবেন। ২৫ মিনিট বক্তব্য রাখার পর ১২টা ২০ মিনিটে সন্ত লারমা প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট অস্ত্র জমা দেবেন। এ অনুষ্ঠানের সময়সীমা হবে দেড় ঘণ্টা। পুরো অনুষ্ঠানটি বিটিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বলে জানা গেছে।

১৬, ২২ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারির ৩ দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

সংবাদ

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়িতে উড়ছে সাদা পতাকা,
উৎসবের আমেজ এলাকাজুড়ে

সাগর সরওয়ার, সুনীল কান্তি দে ও জহরুল আলম খাগড়াছড়ি থেকে: আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের প্রথম দলের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে খাগড়াছড়ি এখন উৎসবমুখর।

যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা গেছে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা জেলার মাইচছড়ি, ঘিলাছড়ি এবং দুদুকছড়ায় নির্মিতব্য সমাবেশ ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছেন। আজ রাতের মধ্যে তারা সেখানে এসে পৌঁছবেন। ৭ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে অস্ত্র সমর্পণের দিন বৃহত্তর চট্টগ্রামে ডাকা হরতালের

প্রচার গোপনে চালিয়ে যাচ্ছে খাগড়াছড়ির হরতালকারীরা। কালোপতাকা নামিয়ে সাদা পতাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তুলেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। হরতালে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন পার্বত্য এলাকার জনগণ। দগুর্বিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা আজ দুদুকছড়া যাচ্ছেন জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ্র লারমা)সহ।

একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ১০ই ফেব্রুয়ারির অস্ত্র জমাদানকারী সদস্যের সংখ্যা ৭শ' ৬৩ জনেরও বেশি হতে পারে। অস্ত্র সমর্পণের আগে ও পরে শান্তি বাহিনী সদস্যদের রাখার জন্য দুই জেলায় ৩টি সমাবেশ ক্যাম্প ও ১টি ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপনের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। রাজ্যমাটি জেলার ঘিলাছড়ি ও খাগড়াছড়ির দুদুকছড়া, মাইচছড়িতে সমাবেশ ক্যাম্প এবং পেরাছড়ায় ১টি ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। এ সমস্ত জায়গায় পুরাতন স্থায়ী অবকাঠামোর পাশাপাশি অস্থায়ী নির্মাণকাজও চলছে। এ সমস্ত ক্যাম্পে সেনিটেশন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি নিশ্চিত করা হচ্ছে। পেরাছড়া ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সমস্ত কাজে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দিনরাত কাজ করছেন। ক্যাম্পে অবস্থানকারী শান্তি বাহিনী সদস্যদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করবে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। ক্যাম্পগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ইতোমধ্যেই আর্মড ব্যাটালিয়নের পুলিশরা গ্রহণ করেছে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। খাগড়াছড়িতে ঢাকার ৫০০ জন বুদ্ধিজীবী শান্তি চুক্তির পক্ষে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা লিফলেট আকারে বিলি করা হচ্ছে। এ কাজে সরকারি দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে অস্ত্র সমর্পণের সমর্থনের পক্ষে বিভিন্ন ব্যানার-ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। শহরের সাইনবোর্ড লিখিয়েরা এখন কাটাচ্ছেন সবচেয়ে ব্যস্ত সময়। পাশাপাশি শান্তি চুক্তি বিরোধীদের হাতে লেখা পোস্টারও দেখা গেছে খাগড়াছড়ির কিছু কিছু জায়গায়, এ সমস্ত পোস্টারে জনসংহতি সমিতি নেতা-সম্ভ্র লারমাকে আক্রমণ করে বক্তব্য লেখা হয়েছে এবং চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ীদের সার্বিক মুক্তি আসবে না বলে দাবি করা হয়েছে পিসিপি, পিজিপি ও হিল উইমেন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। পানছড়ির বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শান্তি চুক্তিবিরোধী শ্লোগানযুক্ত চিকা মারা হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারির হরতালের সমর্থনকারীরা প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা চালাচ্ছে না, তারা গোপনে বিভিন্ন বাঙালিপাড়ায়

প্রচার চালাচ্ছে বলে যানা গেছে। খাগড়াছড়ির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে কালো পতাকা আর চোখে পড়ছে না, উড়ছে সাদা পতাকা। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে প্রচুর লোক আসছে খাগড়াছড়িতে। ফলে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব দেখা দিচ্ছে। দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা খাদদ্রব্য এবং কাঁচা শাকসবজির।

রাজ্যমাটিতেও প্রস্তুতি চলছে: ১০ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারি শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে রাজ্যমাটিতে। ১০ তারিখে খাগড়াছড়িতে যারা অস্ত্র সমর্পণ করবেন তারা রাজ্যমাটি জেলার ঘিলাছড়ির সমাবেশ স্থলে আসবেন ৯ই ফেব্রুয়ারি। এখানকার সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন নিরাপত্তা বাহিনী, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, অন্যদিকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি জেলার বাঘাইছড়ি থানার বাঘাইছড়ি হাইস্কুল মাঠে যে ৬শ' শান্তি বাহিনীর সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবেন তারও ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন: আজ বিকেল আড়াইটায় নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন দগুর্বিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। আগে সিদ্ধান্ত ছিল ১০ই ফেব্রুয়ারির অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করবেন। জানা গেছে, সময়ের স্বল্পতাহেতু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে।

সংবাদ

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তির সমর্থনে 'সমাজ বদলের' আলোচনা

সামাজিক সংস্থা 'সমাজবদল'-এর উদ্যোগে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি' শিরোনামে গত শনিবার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শিশু মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, বরণ্য কথাসাহিত্যিক রাহাত খানের সভাপতিত্বে এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, আজকের কাগজ সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদ, দৈনিক প্রভাতের প্রধান সম্পাদক এম, আর আখতার মুকুল, জাদুঘরের মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর শাহাদাত আলী এবং সমাজবদল-এর সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকারের এই সাফল্য সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ও সাংবিধানিক ক্ষমতা বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এই চুক্তিতে সংবিধানের কোনভাবেই অবমাননা করা হয়নি।

সভায় সভাপতির ভাষণে রাহাত খান বলেন, শান্তি চুক্তি সই করে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি অসাধ্য সাধন করেছেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের প্রস্তুতি

চূড়ান্ত : খাগড়াছড়ি অপেক্ষায়

সাগর সরওয়ার, সুনীল কান্তি দে ও জহুরুল আলম খাগড়াছড়ি থেকে: আগামীকাল শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করবে। অস্ত্র সমর্পণের সকল প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে। খাগড়াছড়ি এখন উৎসবমুখর, খাগড়াছড়ি এখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের জন্য।

খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ৭শ' ৫২ জন সশস্ত্র সদস্যের অস্ত্র সমর্পণের নেতৃত্ব দেবেন জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ লারমা)। শান্তি বাহিনীর প্রথম সারির নেতা কনক কান্তি এবং সনাতন চাকমা আগামীকাল অস্ত্র সমর্পণ করবেন। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর উচ্চপদস্থ নেতা সুধাসিন্ধু খীসা, রক্ত উৎপল ত্রিপুরা, রূপায়ণ দেওয়ান এবং গৌতম চাকমা উপস্থিত থাকবেন।

খাগড়াছড়ির ডিসি 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন, আগামীকাল অস্ত্র সমর্পণের যাবতীয় অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য ৫৪ প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্যদের আজই ৫০ হাজার টাকার চেক অথবা নগদ দেয়া হবে। শান্তি বাহিনীর জমাদানকারী সকল অস্ত্র জাদুঘরে রাখার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে বলে ডিসি জানিয়েছেন। যোগাযোগ কমিটির এক সূত্র জানিয়েছেন, আজ সম্ভ লারমা খাগড়াছড়ি আসবেন না, আসবেন আগামীকাল। আগামীকালই তিনি আবার দুদুকছড়ায় ফিরে যাবেন। সঙ্গে থাকবেন অন্য দু'নেতা। থেকে যাবেন রক্ত উৎপল ত্রিপুরা এবং সুধাসিন্ধু খীসা। এ দু'জনসহ অন্য সকল উচ্চপদস্থ জনসংহতি সমিতির নেতা ২৮শে

ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন এবং অস্ত্র সমর্পণের ইতি টানবেন। ১০ই ফেব্রুয়ারির অস্ত্র জমাদানের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সব কাজ ইতোমধ্যে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন সমাবেশ ক্যাম্পে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা আজ সকাল থেকে আসা শুরু করবেন।

গতকাল সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন সংবাদকে জানান— আজ সোমবার সকালে দুদুকছড়ির সমাবেশ ক্যাম্পে শান্তি বাহিনীর নেতা-কর্মীদের স্বাগত জানাবেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা। এখানে সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন যোগাযোগ কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ চাকমা ও স্বেচ্ছাসেবক আশীষ চাকমা। এ দু'জন গতকাল বিকেলেই দুদুকছড়িতে গেছেন। এখানে আজ ২শ' ৭৬ জন শান্তিবাহিনী সদস্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসবেন।

ঘিলাছড়ি ক্যাম্পে আজ আসবেন ২শ' ৬৯ জন শান্তি বাহিনী সদস্য। এখানে আগত শান্তি বাহিনীর সদস্যদের যাবতীয় বিষয় তদারকির জন্য জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা, যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরা লাল চাকমা ও স্বেচ্ছাসেবক শক্তি পদ রোয়াজা গতকাল বিকেলেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, শান্তি বাহিনীর উর্ধ্বতন নেতা যদুনাথের নেতৃত্বে এখানে ২শ' ৬৯ জন শান্তি বাহিনী সদস্য সমাবেশ ক্যাম্পে আসবেন। এই ক্যাম্পে আগত শান্তি বাহিনীর সদস্যদের স্বাগত জানাবেন উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্ত বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার। মাইচছড়ির ক্যাম্পে আসার জন্য শান্তি বাহিনীর সার্বিক দিক দেখাশোনার জন্য জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা রক্ত উৎপল ত্রিপুরা, যোগাযোগ কমিটির সদস্য ক্য শৈ অং ও স্বেচ্ছাসেবক রূপায়ণ চাকমা গতকাল বিকেলে সেখানে গেছেন। এখানে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের স্বাগত জানাবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য বীর বাহাদুর এমপি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে— এখানে শান্তি বাহিনীর মোট ৪ জন সিনিয়র কমান্ডারসহ ২শ' ৭৬ জন সদস্য আসবেন। যেখানে মেজর কনক ও মেজর সনাতন থাকবেন।

জেলা প্রশাসক আরো জানান, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা, টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার ও বীর বাহাদুর এমপি আজ ভোরেই তাদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে যাবেন। সমাবেশ ক্যাম্পসমূহে আগত শান্তি বাহিনীর সদস্যরা এই তিনজনের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবেন। জমা নেয়া অস্ত্রগুলো থেকে গোলাবারুদগুলো আলাদা করবে দুদুকছড়িতে বিডিআর এবং ঘিলাছড়ি ও মাইচছড়িতে নিরাপত্তা বাহিনী। আজ দুপুরে ক্যাম্পগুলোতে শান্তি বাহিনী সদস্যদের দুপুরের খাবার পরিবেশনের পরপরই

সন্ধ্যার আগে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে এই ৭শ' ৫২ জন শান্তিবাহিনী সদস্যকে নিয়ে আসা হবে। জেলা প্রশাসক জানান, ট্রানজিট ক্যাম্পে আগত শান্তি বাহিনী সদস্যদের সরকার প্রতিশ্রুত টাকা অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং চেকের মাধ্যমে দেয়ার সব ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক জানান, প্রায় ১৫ হাজার নিরাপত্তা কর্মী এ কাজে নিয়োজিত আছেন। তিনি জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত, মূল কমিটির অধীনে স্থানীয়ভাবে নিরাপত্তা, প্রশাসন, অভ্যর্থনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চারটি সাব-কমিটি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, জেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে সব কাজ এগিয়ে চলেছে। ১০ই ফেব্রুয়ারি বিএনপি ও সমমনাদের আহূত হরতালের কারণে অস্ত্র জমাদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান— এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তিনি জানান, এমনকি টাকা থেকে বিমানযোগে চট্টগ্রামে আগত ভিআইপি'দের ওই দিন খাগড়াছড়িতে আসার পথের সার্বিক নিরাপত্তাও ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে। তার মতে, ভিআইপি'দের অনেকেই ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখেই খাগড়াছড়ি এসে পৌঁছবেন।

জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন, আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, চিফ হুইপ ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী সকলেই খাগড়াছড়ি এসে ১০ই ফেব্রুয়ারির অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটি তদারক করবেন। শান্তি বাহিনী কোন ধরনের অস্ত্র জমা দেবে বা তার সংখ্যা কত সে সম্পর্কে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ১০ই ফেব্রুয়ারি সকালে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্ত লারমাকে খাগড়াছড়িতে নিয়ে আসবেন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা। প্রধানমন্ত্রীর কাছে অস্ত্র জমাদানের পরপরই তাকে দুদকছড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। জনসংহতি সমিতির নেতা সন্ত লারমা ছাড়া তাদের উর্ধ্বতন অন্য কোন নেতা অস্ত্র জমা দেবেন না। তবে উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্ত উৎপল ত্রিপুরা অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির সদস্যদের সাথে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন। সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতাদের বেশিরভাগ সদস্যই ২৮শে ফেব্রুয়ারি দুদকছড়িতে অস্ত্র জমা দেন। সর্বশেষ পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, ১০ই ফেব্রুয়ারির অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে হেলিপ্যাডে অভ্যর্থনা জানাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও চিফ হুইপ, খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে সন্ত লারমার কাছ থেকে এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তা সরাসরি খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকের হাতে তুলে দেবেন। এখানে সমবেত শান্তি বাহিনী নেতা-কর্মী ও দর্শকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দুদকছড়ায় ভিন্ন চিত্র: গতকাল দুদকছড়া গিয়ে দেখা গেছে ভিন্ন পরিস্থিতি। স্থানীয় মোগাং নামক পাহাড়ি ছড়ার উপর তৈরি করা হয়েছে সেতু। কাঠের এ সেতুটি খুব শিগগিরই পাকা হবে বলে জানা গেছে। দুদকছড়ার ভেতরে শান্তি বাহিনীর যে ক্যাম্পটি রয়েছে সেটিতে এখন ব্যস্ত স্মৃতি রোমন্থনে আর্মসধারী সদস্যরা। আজ 'সমাবেশ ক্যাম্পে' আসবেন এমন একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্যাপ্টেন জানালেন, তারা প্রস্তুত। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। যথাসময়ে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান পেলেই তারা অস্ত্র সমর্পণ করবেন। আবার ফিরে যাবেন স্বাভাবিক জীবনে। অস্ত্রগুলোর জন্য বেশ মায়া হচ্ছে বলে জানালেন তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যই তিনি যুদ্ধ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্যই কাজ করবেন এখন তারা। এর বেশি কোন কথা বলেননি তিনি। নিষেধ আছে তাও জানালেন। দুদকছড়ায় এক প্রান্তে চলছে সমাবেশ ক্যাম্প নির্মাণ। এ কাজ করছে বিডিআর। আর অন্য প্রান্তেও তোড়ন নির্মাণ করছে তারা। এ এলাকার পাহাড়িরা মিশেছেন খোশগল্পে শান্তি বাহিনীর উর্দি ছেড়ে সাধারণ পোশাক গায়ে দিয়ে। গতকাল দুপুর অবধি সকল সদস্য চলে এসেছেন। খাওয়া-দাওয়ার জন্য সীমান্ত পথ দিয়ে আসা বড় বড় মাছগুলো কিনেছেন তারা। এ স্থান নিয়ে ২শ' ৭৬ জন শান্তি বাহিনীর সদস্য অস্ত্র সমর্পণের জন্য সমাবেশ ক্যাম্পে যোগ দেবেন। জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্ত লারমা এ স্থান থেকেই স্টেডিয়ামে আসবেন এবং যথাসময়ে ফিরে যাবেন।

বিকালে মাইচছড়ি গিয়ে দেখা গেছে সেখানেও সমাবেশস্থল তৈরি করা হয়েছে। গতকাল রাতেই শান্তি বাহিনীর সদস্যরা এ সমাবেশ ক্যাম্পে যোগ দেবেন। গতকাল বৃহত্তম পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (দীপ্তি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ১০ই ফেব্রুয়ারির অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে মৃত জনসংহতি সমিতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জুম্ম জনগণ এই আপোস চুক্তি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে এতে উল্লিখিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন সম্ভার ভাড়াটে গুণ্ডাদের বিভিন্ন অপকর্মের তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা জানাচ্ছে। এই ধরনের সন্ত্রাসী অপকর্ম বন্ধ করা না হলে জুম্ম জনতা দাঁতভাঙা জবাব দেবে। খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমা এ বিজ্ঞপ্তিতে সই করেন।

সংবাদ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তি বাহিনীর আনুষ্ঠানিক অস্ত্রসমর্পণ আজ

- খাগড়াছড়িতে উৎসবের আমেজ
- প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র গ্রহণ করবেন
- প্রথম দফায় ৭৩৯ জন

সাগর সরওয়ার ও সুনীল কান্তি দে, খাগড়াছড়ি থেকে: শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের প্রথম দলটি অস্ত্রসমর্পণ করেছে। দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সম্ভ্র লারমা) অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। গতকাল শান্তি বাহিনীর ৩৯ জন সদস্য অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে খাগড়াছড়ি এসেছেন। তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ৪শ ৬৫টি অস্ত্র এবং ১ হাজার ৩৮টি গোলাবারুদ। এসব অস্ত্র গতকাল সেনা সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে তা আজ জেলা প্রশাসনের কাছে দেয়া হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজক। ইতোমধ্যে শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার এখন খাগড়াছড়িতে অবস্থান করছেন। গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে রাতে স্টেডিয়াম এলাকা পরিদর্শন করেছেন। গতকাল সকালে ৩টি সমাবেশ ক্যাম্পে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দেন। এদিকে খাগড়াছড়িতে হরতালকারীদের কোনই তৎপরতা নেই—আজকে ডাকা ৭ দলের হরতালের আহ্বানকে কেন্দ্র করে।

রাঙ্গামাটি জেলার ঘিলাছড়ি বিদ্যালয়ে স্থাপিত সমাবেশ ক্যাম্পে গতকাল শান্তি বাহিনীর ২৫৬ জন সদস্য তাদের অস্ত্র জমা দিয়েছেন। সকাল সাড়ে ৮টায় ঘিলাছড়ি বিদ্যালয়ে শান্তি বাহিনীর উর্ধ্বতন নেতা যদুনাথের নেতৃত্বে তার দলের সদস্যরা সারিবদ্ধভাবে আসতে থাকেন। এ সময় তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানান উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এমপি এবং তার সাথে ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির অন্যতম সদস্য মথুরানাথ চাকমা। এ সময় রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসক, সেনাবাহিনীর রিজিয়ন কমান্ডার, পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ভোর হওয়ার আগে থেকেই শান্তি বাহিনী সদস্যদের বিষয়গুলো তদারক করছিলেন। শান্তি বাহিনী সদস্যরা প্রথমে সমাবেশ ক্যাম্পে এসে আসন গ্রহণ করেন এবং পরে একে একে নাম রেজিস্ট্রিকরণের মাধ্যমে তাদের কাছে রক্ষিত অস্ত্রগুলো জমা দেন। সমাবেশ ক্যাম্পে উপস্থিত সেনাবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র এবং গোলাবারুদগুলো আলাদা

করেন। ঘিলাছড়িতে যে সমস্ত অস্ত্র জমা পড়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এসএমসি, সাব-মেশিনগান, এসএলআর, স্টেনগান, টমিগান, মেরেটোগান ও মোটর রয়েছে এবং গোলাবারুদের সংখ্যা হচ্ছে ৯৮টি। গতকাল ঘিলাছড়িতে অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান চলাকালীন পূর্বাপর সময়ে উপস্থিত সংবাদকর্মীরা ছবি তুলতে পারেননি মূলত শান্তি বাহিনী সদস্যদের নিষেধের কারণে।

অপরদিকে শান্তি বাহিনীর বর্তমান অবস্থানের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র দুদুকছড়িতে অস্ত্র জমাদানের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশি জোরদার। এখানে সমাবেশ ক্যাম্পের এক মাইলের মধ্যে কোন সাংবাদিককে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এখানে অস্ত্র জমা নিতে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা। গত রোববার বিকেল থেকেই যোগাযোগ কমিটির সদস্য বিশ্বজিত চাকমা ও স্বেচ্ছাসেবক আশীষ চাকমা দুদুকছড়িতে গিয়ে অবস্থান নেন। গতকাল সকাল ৯টা থেকে এখানে শান্তি বাহিনী সদস্যরা শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে সুশৃংখলভাবে সমাবেশ ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসেন। সমাবেশ ক্যাম্পে তাদের স্বাগত জানান মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা। এখানে গতকাল শান্তি বাহিনীর যে ২৬৫ জন সদস্য তাদের অস্ত্র জমা নিয়েছেন তাদের মধ্যে মেজর দেবংশী, মেজর নৈতিক, মেজর খীসা, লেঃ রনল, লেঃ নবোদয় এবং লেঃ অরিও রয়েছেন। ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার অস্ত্র জমাদানের সময় উপস্থিত ছিলেন। দুদুকছড়িতে চায়না রাইফেল, এস এল আর, জি থ্রি, থ্রি নট থ্রি, এসএমসি, ৯ সিসি এসএমসি, এসএমজি ও রকেট লাঞ্চারসহ মোট ২৬৫টি অস্ত্র এবং ৯০০টি গোলাবারুদ জমা পড়েছে। এখানে বিডিআর সদস্যরা অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলো পৃথক করার দায়িত্ব পালন করেন।

মাইচছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে আগত শান্তি বাহিনী সদস্যদের স্বাগত জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য বীর বাহাদুর এমপি। এছাড়া এ সময়ে এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, সদস্য কৈ শৈ অং জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা রঞ্জনপল ত্রিপুরা এবং স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও এপি ব্যাটালিয়নের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এখানে জমা পড়েছে ৭৭টি অস্ত্র, ৪০টি গুলি। এখানে যে সমস্ত অস্ত্র জমা পড়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এ কে ৪৭, কারবাইন, এলএমজি, চাইনিজ রাইফেল ও দেশীয় বন্দুক। মাইচছড়িতে গতকাল শান্তি বাহিনীর যে সমস্ত সদস্য অস্ত্র জমা দিয়েছেন তাদের মধ্যে মেজর কনক, মেজর নিমাই ও মেজর সনাতন রয়েছেন।

আবেগঘন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল গতকাল তিনটি সমাবেশ স্থানে। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অজ্ঞাত স্থান থেকে সারিবদ্ধভাবে এসেছেন এই

সকল ট্রানজিট ক্যাম্পে। তাদের হাতে ছিল অস্ত্র আর চোখে ছিল অশ্রুর ঝিলিক। হাসিমুখে তেমন কাউকেই দেখা যায়নি। সবাই চিন্তা করছিলেন হয়তো অনাগত ভবিষ্যতের কথা। জলপাই রঙের উর্দিপরা সকলের গতি ছিল খুব ধীর। তাদের দু'পাশে ছিলেন হাজারো পাহাড়ি জনতা। তারা অপেক্ষা করছিলেন খুব সকাল থেকেই। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে ছিলেন তারা। তাদের পরনে ছিল রঙ-বেরঙের জামা। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের দৃষ্টি ছিল শান্তিবাহিনীর সদস্যদের দিকে। সবাই দেখছিলেন তাদের জন্য এতদিন যারা সশস্ত্র আন্দোলন করেছেন তাদেরকে। গতকাল পাহাড়ের আকাশে ছিল ঝলমলে রোদ। তিনটি ক্যাম্পেই উপস্থিত ছিলেন ৩ জন এমপি। দুদুকাছড়ায় ছিলেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, ঘিলাছড়িতে শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার এবং মাইচছড়িতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বীর বাহাদুর।

মাইচছড়ি হাইস্কুল মাঠে তৈরি করা এ সমাবেশ ক্যাম্পে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা আসেন সকাল ৯টায়। এ সময় তাদের কারো হাতে ছিল অস্ত্র আর কারো বা গুলি কিংবা বোমা। সকালের দিকে এখানে সমাবেশ ক্যাম্পের সাজানো গোছানো কাজ সেনা সদস্যরাই সেরে ফেলেন। যোগাযোগ কমিটির সদস্য কৈ শৈ অং মার্মা এবং স্বচ্ছাসেবক দলের রূপায়ণ চাকমা ব্যস্ত ছিলেন শান্তি বাহিনীর সদস্যদের যথাসময়ে সমাবেশ ক্যাম্পে উপস্থিত হওয়া নিয়ে। জনসংহতি সমিতির অন্যতম নেতা রক্ত উৎপল ত্রিপুরা এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন শান্তি বাহিনীর পক্ষে। বীর বাহাদুর এমপি, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এবং সরকারি ও সেনা কর্মকর্তারা শান্তি বাহিনীর নেতা আশুতোষ তালুকদারকে প্রথমে অভ্যর্থনা জানান। ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে আর রজনীগন্ধার স্ট্রিক তুলে দেন কয়েকটি বালিকা শান্তি বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের হাতে। এরপর ধীরে ধীরে সকল সদস্য আসতে থাকেন। সকালের নাস্তা পর্ব সারার পর শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ নেয়ার কাজ শুরু হয়। আশুতোষ তালুকদার তার অস্ত্রটি প্রথম তুলে দেন বীর বাহাদুরের হাতে। বীর বাহাদুর পরবর্তীতে তা তুলে দেন স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের প্রধানের কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তা তার আর্মারদের কাছে তুলে দিয়ে অস্ত্রের পিন খুলে নেন। এই অস্ত্রগুলো আজ সকালে স্টেডিয়ামে যাওয়ার আগে তাদের হাতে দিয়ে দেয়া হবে বলে জানা গেছে। গতকাল দুপুরের খাবার খাওয়ার পর মাইচছড়ি থেকে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের প্যারাছড়ার ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে গেছেন। ট্রানজিট ক্যাম্পে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা একমাস পর্যন্ত থাকতে পারবেন। তাদের থাকা-খাওয়ার সকল ব্যবস্থা করবে সরকার।

এদিকে বৃহত্তর চট্টগ্রামে হরতাল আহ্বানকারীদের ডাকে সারা মিলছে না খাগড়াছড়িতে। এ জেলায় এখন চলছে উদ্দীপনা অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে। প্রশাসনের একটি সূত্র বলেছেন, হরতালকারীরা বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে প্রয়োজনে পুলিশকে সেনা ও বিডিআর সাহায্য করবে।

সংবাদ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
বিটিভিতে সরাসরি দেখানো হবে
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রসমর্পণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানটি প্যান এম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি বিটিভিতে দেখানো হবে। অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল সাড়ে ১০টায়।

সংবাদ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিতে আজ চট্টগ্রাম
বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিতে বিএনপি ও জামাতিসহ সমমনাদের আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল এবং দেশের অন্যান্য স্থানে বিক্ষোভ-সমাবেশ।

বিএনপিসহ সমমনাদের পক্ষ থেকে কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানিয়ে পৃথক পৃথক বিবৃতি দেয়া হয়েছে।

ঢাকা মহানগর বিএনপি ঘোষিত বিক্ষোভ-সমাবেশের কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ বিকেল সাড়ে ৩টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মাঠে সমাবেশ এবং পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করবে। জামাতে ইসলামী বিকেল সাড়ে ৪টায় পুরনো পল্টন মোড়ে সমাবেশ এবং পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করবে।

কাজী জাফরের নেতৃত্বাধীন জাপা বিকেল ৩টায় মুজাঙ্গনে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিল করবে।

সংবাদ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
খাগড়াছড়ির পথে পাহাড়ি-বাঙালি

বান্দরবান থেকে এনামুল হক কাশেমী: আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ ২৬ বছরের অশান্ত পরিস্থিতির রাজনৈতিক মীমাংসার

অংশ হিসেবে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র-নিরস্ত্র সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন আজ ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে।

৮৫ সালের ২৯শে এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন। ঐ সময় তারা সেনাবাহিনীর কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেছিলেন, কিন্তু এবার সরকার প্রধানের কাছে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সন্ত লারমার অস্ত্রসমর্পণের মধ্য দিয়েই ইতি টানা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহী তৎপরতার।

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের একটি সুইসাইড স্কোয়াড মানবেন্দ্র নায়ার লারমাকে হত্যা করার পর শান্তি বাহিনীর নেতৃত্বে আসেন তার ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা)। তখন থেকেই শান্তি বাহিনীর সদস্যরা সন্ত লারমার সাথে কাজ করে আসছিল।

বান্দরবান জেলার ৭টি থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাহাড়ি-বাঙালি জনপ্রতিনিধি, নেতা, মৌজা হেডম্যান, ইউপি মেম্বর-চেয়ারম্যান, পাড়া প্রধান এবং সচেতন ব্যক্তির দলবদ্ধ হয়ে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে রোববার থেকে। তারা খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় বর্ণাঢ্য ‘অস্ত্র জমা দান’ অনুষ্ঠান উপভোগ করার লক্ষ্যেই উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। এ জেলা থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রায় ৫ হাজার লোককে খাগড়াছড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত

থাকবেন ৩০ হাজার দর্শক

মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে: প্রায় ৩০ হাজার দর্শক আজ আসবেন অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। সদ্য উদ্বোধন করা এ স্টেডিয়ামকে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠান উপযোগী করে ইতোমধ্যেই। স্টেডিয়ামের মধ্যে অতিথিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেনা সদস্যদের।

শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ উপলক্ষে গতকালই অনুষ্ঠানের সব কিছু চূড়ান্ত করা হয়েছে। সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানস্থলে এসে উপস্থিত হবেন। এ সময় তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম এবং চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে আগত অতিথিদের এবং পাহাড়ি-

বাঙালিদের দেহ তল্লাশি করা হবে। সোয়া ১১টায় শান্তি বাহিনীর সদস্যরা স্টেডিয়ামে আসবেন এবং অবস্থান গ্রহণ করবেন মাঠের মাঝে। তারা আসবেন প্যাঁরাছড়ার ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে। ১১টা ৩৭ মিনিটে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে। এরপর হবে কোরান তেলাওয়াত, ত্রিপিটক, গীতা ও বাইবেল থেকে পাঠ। ১১টা ৫০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন। ১২টা ২০ মিনিটে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা) প্রধানমন্ত্রীর নিকট অস্ত্র জমা দেবেন। এরপর তিনি মঞ্চে আসন গ্রহণ করবেন। এরপর এক এক করে সকল শান্তি বাহিনীর সদস্য অস্ত্র জমা দেবেন পর্যায়ক্রমে। ১২টা ৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শ্বেত কপোত ওড়াবেন। এক সময় স্টেডিয়ামের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেগুন ওড়ানো হবে।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে আসবেন চট্টগ্রাম থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে এসে। তিনি যে মঞ্চে বসবেন সেখানে তার সঙ্গে থাকবেন আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, কল্লরঞ্জন চাকমা, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহদুর, আতাউর রহমান খান কায়সার এবং এস, এস চাকমা। পরে সন্ত লারমা এসে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবেন।

সন্ত লারমা আজই আবার দুদকছড়ায় ফিরে যাবেন। জনসংহতির নেতা উষাতন তালুকদার, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্ত উৎপল ত্রিপুরা, গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান আজ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সুধাসিন্ধু খীসা এবং রক্ত উৎপল ত্রিপুরা খাগড়াছড়ি থেকে যাবেন। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তারা এখানে থাকবেন। ঐদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তারা অস্ত্রসমর্পণ করবেন।

খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের যাবতীয় প্রস্তুতি কাজ সম্পন্ন হয়েছে ইতোমধ্যেই। গতকাল প্রস্তুতি কাজ দেখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদসহ অন্যান্য।

সংবাদ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিবৃতি

শান্তি চুক্তির সাফল্য ও অস্ত্র সমর্পণকে অভিনন্দন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন পার্বত্য শান্তি চুক্তির সাফল্য ও শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এক বিবৃতিতে বলেন, অস্ত্রসমর্পণ কর্মসূচির সাফল্য পার্বত্য এলাকায় সশস্ত্র সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসান ঘটাবে। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তির অন্যান্য ধারার পরিপূর্ণ, দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেই এলাকার মানুষের আত্মরক্ষা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি রচনা করবে।

গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম খান গতকাল এক বিবৃতিতে সরকারের কাছে শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকায় শান্তি বিরাজমান থাকলে এলাকার উন্নয়ন ও সমাজ প্রগতির দিক উন্মোচিত হবে।

ভাষা সৈনিক ও রাজবন্দি পরিষদের এক সভায় পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়, বর্তমান সরকার উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে। এডভোকেট গাজীউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কামরুজ্জামান, এম. আর. আখতার মুকুল, ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, এম আনিসুজ্জামান, কেজি মুস্তাফা, মুস্তাফা সারওয়ার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া এক বিবৃতিতে ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে অস্ত্রসমর্পণের মধ্য দিয়ে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে স্বাগত জানান।

এছাড়া আরো অভিনন্দন জানায়, জয় বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট, মানবাধিকার সংরক্ষণ সমিতি প্রভৃতি।

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ

■ দুই দশকের সংঘাতের অবসান

■ হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে আনন্দময় সমর্পণ অনুষ্ঠান

সাগর সরওয়ার ও সুনীল কান্তি দে, খাগড়াছড়ি থেকে: জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তি বাহিনীর সদস্যদের প্রথম দলটি গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করেছে। এর ফলে দীর্ঘ দু'যুগের সশস্ত্র আন্দোলনের পরিসমাপ্তির চূড়ান্ত পর্ব শুরু হলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা) প্রথম তার চাইনিজ এসএমজিটি তুলে দিয়ে অস্ত্রসমর্পণের সূচনা করেন। গতকাল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করেন ৭শ' ৩৯ জন শান্তি বাহিনীর সদস্য। এদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ৪শ' ৬৫টি অস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ। গতকালের এ অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর

ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা এবং রক্ত উৎপল ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন। গতকালই সন্ত লারমা পুনরায় দুদকছড়া ফিরে গেছেন। শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণকারী সদস্যরা এখন ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। আগামীকাল পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবেন। এরপর ফিরে যাবেন নিজ নিজ বাড়িতে। গতকালই সদস্যদের হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী ১৬, ২২ এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি পুনরায় অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে অস্ত্রসমর্পণের অপেক্ষায় আছেন ১ হাজার ১শ' ১৪ জন সদস্য। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। গতকাল বিএনপি ও সমমনাদের ডাকা হরতাল প্রভাব ফেলেনি অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামে পৌছান দুপুর ১২টা ১ মিনিটে। এর আগে তিনি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম গেটে এসে পৌছলে সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও চিফ হুইপ তাকে স্বাগত জানান। আগেই মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌছান। প্রধানমন্ত্রী আসার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি বাহিনীর সকল সদস্য দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানান। সকাল সোয়া ১১টায় জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা) অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। শান্তি বাহিনীর সকল সদস্য আসেন ১১টা ১০ মিনিটে।

সন্ত লারমা অনুষ্ঠানস্থলে এসে আসন গ্রহণ করেন যোগাযোগ কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। জনসংহতি সমিতির অন্যতম নেতা গৌতম চাকমা, যোগাযোগ কমিটির প্রধান হংসধ্বজ চাকমা, নকুল ত্রিপুরা, মথুরালাল চাকমা, বিশ্বজিৎ চাকমা, কে শৈ মং মারমা, আশীষ চাকমা এবং শক্তিপদ ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন। জনসংহতি সমিতির প্রধান দুদকছড়া থেকে প্যারাছড়ার ট্রানজিট ক্যাম্পে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আসেন। তাকে দুদকছড়া থেকে নিয়ে আসেন সাংসদ বীর বাহাদুর। প্রধানমন্ত্রী সমাবেশস্থলে আসার পর সকলের উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান। খাগড়াছড়িতে প্রথমবারের মতো তিনি এলেন। তিনি তার নির্দিষ্ট আসনে বসার পর অন্যরা আসনে বসেন। মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম, বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন, সাংসদ ও শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার, সাংসদ বীর বাহাদুর, জাতীয় কমিটির সদস্য এস এস চাকমা, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান বীর বিক্রম এবং ২৪ পদাতিক বাহিনীর জিওসি মেঃ জেনারেল আবু কায়সার ফজলুল কবীর।

অস্ত্রসমর্পণ করতে আসা ৭শ' ৩৯ জন জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্য স্টেডিয়ামে আসেন শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার এবং রক্ত উৎপল ত্রিপুরার নেতৃত্বে। তবে এ দু'জনের কেউই অস্ত্রসমর্পণ করেননি। তারা আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি অস্ত্রসমর্পণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা) ১২টা ৫২ মিনিটে তার চাইনিজ এসএমজিটি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। এরপর প্রধানমন্ত্রী তার হাতে দেন সাদা গোলাপ। উড়িয়ে দেন সাদা কবুতর। এরপরই ১২টা ৫৬ মিনিটে উষাতন তালুকদারের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট র্যাকে অস্ত্র রাখেন শান্তি বাহিনীর সদস্যরা। খুবই সারিবদ্ধ এবং সুশৃংখল ছিলেন এই বাহিনীর সকল সদস্য।

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনার মূল দায়িত্ব পালন করেছে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়। পার্বত্য শান্তি চুক্তির আলোকে জাতীয় ও উপজাতীয় সংস্কৃতির মিলিত অনুষ্ঠান হিসেবে এটাকে বিবেচনা করা হলেও খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজারো দর্শককে তা সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের শিল্পীদের যৌথ প্রয়োজনায় আরো উন্নতমানের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে এটাই ছিল সকলের আশা। কিন্তু বাস্তবতা ছিল অন্যরকম। দু'ঘণ্টার সংঘাতময় পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার সে ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা গেলে হয়তোবা আরও ভাল হতো। তবে 'এসো ভায়ের সাথে ভাই, এসো এক সুরে গান গাই' কথাপ্রধান গানটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যদিওবা এর সাথে নৃত্যশিল্পীদের উপস্থাপনা তেমন ভাল হয়নি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যান। সেখানে সকলের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। তিনি অনুষ্ঠানশেষে প্রথমে ট্রানজিট ক্যাম্পে যান। এরপর দুদুদুছড়ায় তাকে এগিয়ে দিতে আসেন সাংসদ বীর বাহাদুর। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন গৌতম চাকমা ও উষাতন তালুকদার।

স্বায়ত্তশাসনের দাবি

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার আগে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণপরিষদ এবং হিল উইমেন ফেডারেশনের কিছু সমর্থক পূর্ব গ্যালারিতে 'শান্তি চুক্তি মানি না, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে' ইত্যাদি ব্যানার প্রদর্শন করে। এ সময় আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় দু'পক্ষের মধ্যে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে

দাবি করেছে, তাদের একজন কর্মী আহত হয়েছে সেনা সদস্যের রাইফেলের বাঁটের আঘাতে। এ আচরণে সংগঠন তিনটির পক্ষ থেকে নিন্দা জানানো হয়েছে।

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সবার পথ যেন কাল মিশেছিল খাগড়াছড়ির পথে

খাগড়াছড়ি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি: পাহাড়ঘেরা খাগড়াছড়ি কাল মেতেছিল উৎসবে। ঢাকা থেকেতো বটেই, সারাদেশ থেকে, বিশেষত বৃহত্তর চট্টগ্রাম থেকে হাজার হাজার সাধারণ নারী-পুরুষ বিশিষ্টজনদের গন্তব্য যেন কাল একাকার হয়ে গিয়েছিল খাগড়াছড়ির পথে।

গত ক'দিন ধরেই খাগড়াছড়িতে চলেছে এই উৎসবের ব্যস্ততা। মন্ত্রী, শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত ছিলেন এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে। সাদা পতাকায় ছেয়ে যায় খাগড়াছড়ি গত ক'দিন থেকেই। গতকাল ছিল উৎসবের চূড়ান্ত দিন।

গতকাল সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই তিরিশ হাজার লোক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নবনির্মিত স্টেডিয়ামটি হয়ে যায় কানায় কানায় পূর্ণ। বাইরে তখনো মানুষের ঢল। অনুষ্ঠান যখন শুরু হয় তখন ভেতরে-বাইরে সমবেত জনতার সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

জাতীয় সংসদের স্পিকার, মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যবৃন্দ, সরকারি দলের প্রায় শ'খানেক এমপি, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনসমূহের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, দেশী-বিদেশী প্রায় দু'শ সাংবাদিকের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখে মনে হয়েছে যেন পুরো বাংলাদেশটাই হাজির হয়েছে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে।

গতকাল বিএনপি, জামাতসহ ডানপন্থী সাতটি দল এই অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানকে বিঘ্নিত করার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগে হরতাল আহ্বান করেছিল। কিন্তু সেই হরতাল পাহাড়মুখো জনতার শ্রোতকে আটকে রাখতে পারেনি। হরতাল আহ্বানকারীদের কোন তৎপরতাই খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম পর্যন্ত দীর্ঘ পথে দেখা যায়নি।

সবকিছু ছাপিয়ে কালকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে সন্ত লারমা ও তার সহযোগীদের অস্ত্রসমর্পণ। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর প্রবেশ করার কথা ছিল সকাল সাড়ে ১১টায়। কিন্তু তার আগে থেকেই স্টেডিয়াম সাজে অপরাপ সাজে। সেনাবাহিনীর ব্যান্ডদল কখনো পাহাড়ি গানের সুরে, কখনো বাংলা বা কখনো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের

সুর তুলে উজ্জীবিত করেন হাজার হাজার দর্শককে। কণ্ঠ দিয়ে মাতিয়ে রাখেন শেফালী ঘোষ ও শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব। মাঠে অনবরত চলে শিল্পকলা একাডেমির সদস্যদের নৃত্য-গীত। বেতার-টিভি গোটা অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে। নির্ধারিত সময় সকাল ১১টায় শান্তি বাহিনীর সদস্যরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করা শুরু করেন। জলপাই রঙের পোশাক, মাথায় ক্যাপ পরে প্রথম দফা মাঠে আসেন যারা, তারা ছিলেন নিরস্ত্র।

১১-১০ মিনিটে প্রবেশ করেন সশস্ত্র সদস্যদের প্রথম দলটি। ১১-৪০ মিনিটে সস্ত্র লারমা প্রবেশ করেন মাঠে। স্টেডিয়ামের বুকজুড়ে আড়াআড়িভাবে চেয়ারে বসেন ৭৩৯ জন। গোটা মাঠে যেন সে সময় নেমে আসে তিন পাহাড়ি জেলার সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি। এ সময় সেনাবাহিনীর ব্যান্ডে বাজতে থাকে পাহাড়ি সঙ্গীত। বাংলা করলে যার অর্থ দাঁড়ায় ‘পাহাড়ের পথ থেকে লোকালয়ে, আমরা সবাই মিলেমিশে এক হই।’ এরই মাঝখানে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে সামান্য গোলযোগ দেখা দেয়। শান্তিচুক্তি বিরোধী ব্যানার ঝুলিয়ে দেয় পাহাড়ি গণপরিষদের একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ। দ্রুতই তারা শান্ত হয়ে বসে যায়।

১১-৫০ মিঃ সেনাবাহিনীর ব্যান্ডে ভেসে আসে ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’ গানের সুর। ঠিক ১২টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবেশ করেন স্টেডিয়ামে। তাকে স্বাগত জানান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপিসহ জাতীয় কমিটির সদস্যরা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী এবং যোগাযোগ কমিটির নেতৃবৃন্দ।

স্টেডিয়ামে ঢুকেই জলপাই রঙের জমিনে ঘিয়ে রং জরির কাজ করা শাড়ি পরিহিত প্রধানমন্ত্রী হাত নেড়ে অভিবাদন জানান সমবেত জনতা ও অতিথিবর্গকে। কোরান, ত্রিপিটক, বাইবেল ও গীতা পাঠ করা হয়। যার মূল বাণী একই : শত্রুতা দিয়ে কখনই শত্রুতা হয় না, শত্রুকে জয় করতে হয় মিত্রতা দিয়েই।

১২-১০ মিঃ অনুষ্ঠানের একমাত্র বক্তা প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণ শুরু করেন। লিখিত বক্তৃতার ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব সংযোজন সমৃদ্ধ করে তার এই ভাষণটিকে।

এরপরেই সস্ত্র লারমা তার আত্মসমর্পণ করেন। দুই দশকের প্রিয় হাতিয়ারটি তুলে দিতে কিছুটা আবেগপ্রবণ হন সস্ত্র লারমা। কিন্তু দ্রুতই প্রধানমন্ত্রী তার হাতে তুলে দেন এক গুচ্ছ গোলাপ। মাঠে বসা শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা তাদের অস্ত্র জমা দেন নিজ উদ্যোগে তাদের আসনের পাশেই বিশেষ স্থানে। বেলুন উড়ানো, শান্তির শ্বেত কপোত উড়োনো, শ্লোগান, সঙ্গীত ও নৃত্যের সমন্বয় এক চমৎকার ব্যাঙ্গনা সৃষ্টি করে এসময়।

শিল্পীদের পরিবেশন পর্যায়ে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী মঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ান। মঞ্চের চারপাশ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ভেঙে একাই হাঁটতে থাকেন মঞ্চের ডান দিকে সাজিয়ে রাখা সমর্পিত অস্ত্রশস্ত্রের দিকে। হকচকিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীরা, মঞ্চের তার পাশে বসা নেতৃবৃন্দ দ্রুত সামলে নেন। তারাও সাথী হন। প্রধানমন্ত্রী প্রায় স্টেডিয়ামের গোটা মধ্যভাগ চক্কর দিয়ে অস্ত্র দেখেন, কথা বলেন শান্তি বাহিনীর অন্য সদস্যদের সঙ্গে। গোটা স্টেডিয়াম সাধুবাদ জানায় তাকে।

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালি সবাই
থাকবেন, কোন বাঙালিকে সরানো হবে না
— শেখ হাসিনা

খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে কাশেম হুমায়ুন ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি ও অন্যান্য দলের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে দেশ ও জাতির শান্তির জন্য সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার খাগড়াছড়িতে শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য মোট ২ হাজার ১শ’ ৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা ও আনুগত্য সমুন্নত রেখেই এই চুক্তি সই হয়েছে। এ বিষয়ে কারো মনে কোনরূপ ভুল বোঝাবুঝি, অস্পষ্টতা, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচীন হবে না। দেশের সকল নাগরিকের, বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি-বাঙালি সবার অধিকার অতীতে যা ছিল তা নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা তিনটিতে তিনি ডিসি, এসপি থাকবেন, থাকবেন পূর্বের ন্যায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী। বাঙালিরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। গুচ্ছগ্রামবাসীরাও স্বভূমিতে থাকবেন। কোন বাঙালিকে জোরপূর্বক প্রত্যাহার করা হবে না। কেউ কেউ এই চুক্তি ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী এদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনুপম স্বাক্ষর এই অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঐতিহাসিক

শান্তি চুক্তির পটভূমি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অতীতের সরকারগুলো কখনো কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছে। কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এর সমাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমস্যাটি ছিল মূলত রাজনৈতিক সমস্যা। আওয়ামী লীগই প্রথম '৮২ সালে একে রাজনৈতিক সমস্যা বলে ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত বিএনপি সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে যে কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটিকে আওয়ামী লীগ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সব সময় সমর্থন দিয়ে এসেছিল। সে কমিটিতে আওয়ামী লীগের দুজন সদস্য ছিলেন এবং তারা জনসংহতি সমিতির সঙ্গে কমিটির প্রতিটি বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। এমনকি আওয়ামী লীগসহ বিরোধীদল সংসদ থেকে পদত্যাগের পরও আওয়ামী লীগের ঐ দুই সাংসদ দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত কমিটিতে বিএনপি'র দু'জন সাংসদকে রাখা হলেও তারা এতে যোগ দেননি। তারা সমগ্র বিষয়টি দেখেছেন সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রথম থেকেই সরকারের প্রচেষ্টার প্রতি অসহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, গত ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে দীর্ঘ প্রতিক্ষীত চুক্তি সই হয়েছে। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মহল ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালিসহ দেশের আপামর জনগণ এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবেও এ চুক্তি প্রশংসিত হয়েছে। এখন থেকে পাহাড়ি-বাঙালি শান্তিতে বসবাস করবে, হানাহানি বন্ধ হবে।

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্রসমর্পণের পরে সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাস লারমা

চাই শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়ন

খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে মনজুরুল আহসান বুলবুল: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রধান এবং এই সমিতির সশস্ত্র উইং শান্তি বাহিনীর মূল নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত্রাস লারমা)। গতকাল মঙ্গলবার অস্ত্রসমর্পণের পর তার উল্লাস ঃ আমি ভারমুক্ত হলাম, প্রতিশ্রুতি রাখলাম, আমার খুব ভাল লাগছে। এখন চাই শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়ন। এর সফল বাস্তবায়নই কেবল প্রকৃত শান্তি নিশ্চিত করতে পারে।

গতকাল দুপুর সোয়া ১টায় খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে মুক্ত মানুষ সন্ত্রাস লারমা প্রাণ খুলে কথা বলছিলেন সবার সঙ্গে। একটু আগেই তার দীর্ঘ ২২ বছরের সার্বক্ষণিক সাথী হাতিয়ারটি তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে; বদলে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে নিয়েছেন শান্তির শ্বেত গোলাপ, আকাশে উড়িয়েছেন শ্বেত কপোত।

খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের বুকজুড়ে আড়াআড়িভাবে তখনও প্রবল রোদের সব উত্তাপ উপেক্ষা করে নিশ্চুপ বসে আছেন শান্তি বাহিনীর ৭শ' ৩৯ জন সদস্য।

জলপাই রঙের পোশাক আর মাথায় ক্যাপ অধিকাংশের, যেন পাহাড়েরই স্বাধীন সবুজ প্রকৃতি। প্রধানমন্ত্রী একটু আগে অনুষ্ঠান শেষ করে স্টেডিয়াম ত্যাগ করেছেন। এখন মাঠের মধ্যমণি শান্তি বাহিনীর সদস্যরা আর তাদের নেতা সন্ত্রাস লারমা।

দেশী-বিদেশী শত শত সাংবাদিক ছেকে ধরেছেন সন্ত্রাস লারমাকে।

প্রশ্ন: কেমন আছেন আপনি? কেমন লাগছে আপনার? এই মুহূর্তের অনুভূতি কিছু বলুন।

উত্তর: খুব ভাল আছি এখন। টেনশনে ছিলাম খুব, সব ভালোয় ভালোয় হলেই ভাল। এই মুহূর্তে সবই ভাল লাগছে আমার। এই অনুষ্ঠান, এই যে আপনারা এত মানুষ, খাগড়াছড়ি জুড়ে উৎসবের আমেজ— সব, সবই ভাল লাগছে আমার। প্রশ্ন: অস্ত্রসমর্পণের সিদ্ধান্ত কি সর্বসম্মত? সবাই কেন সম্মত হলেন অস্ত্রসমর্পণে?

উত্তর: নিশ্চয়ই সর্বসম্মত। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে চুক্তির সব দিক পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সবাই ভেবেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠার এখনই উপযুক্ত সময়— এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা শান্তি চুক্তি সম্পাদনে এবং এর সব শর্ত মেনে নিতে রাজি হয়েছি।

প্রশ্ন: জনসংহতি সমিতি কি আজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল?

উত্তর: না, না। জনসংহতি সমিতি আজ থেকে নতুন করে যাত্রা শুরু করলো। শান্তির পথে নতুন করে পথ চলা শুরু হলো আমাদের। এটি একটি রাজনৈতিক দল। দল হিসেবেই জনসংহতি সমিতি তার অস্তিত্ব ধরে রাখবে। প্রশ্ন: আপনি এবং আপনার অনুসারী যারা অস্ত্রসমর্পণ করলেন তারা কি নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন এখন?

উত্তর: নিশ্চয়ই। কেন নিরাপদ মনে করব না, আমরা তো আমাদের লোকজনের মধ্যেই আছি। সমস্যা যা ছিল তা নিয়ে তো চুক্তিই হয়েছে। আমি তো কোন সমস্যা দেখি না। সমস্যা হলে তো সরকার নিরাপত্তা নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মাঠের এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যেই সম্ভ্র লারমা খুঁজে পেলেন তার ২২ বছর আগের এক পুরনো বন্ধুকে। দেশের এই বিশিষ্ট সাংবাদিক নেতাকে বুকে জড়িয়ে ধরেই স্মৃতিচারণ করেন সম্ভ্র লারমা : আমি যখন ঢাকায় যাই, কলেজে ভর্তি হতে গিয়েই বন্ধুত্ব হয় এর সঙ্গে। আজ প্রায় ২২ বছর দেখা এত কাছাকাছি।

আবার প্রশ্ন করি: আপনি কি চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান হচ্ছেন? উত্তর: না, এখনও তো আমি কিছুই জানি না। এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না।

প্রশ্ন: একটি বড় দলসহ কিছু দল এই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে— সে সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর: এ সম্পর্কে দয়া করে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি কোন মন্তব্য করব না। যারা যা বোঝেন তারা সেভাবেই কাজ করছেন। আমি শান্তি ও আমাদের অধিকারের কথা বুঝি। সরকারও এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা বোঝেন— এজন্যই চুক্তি হয়েছে। অন্যরা কে কি বোঝেন সে সম্পর্কে আমার কোন মন্তব্য নেই— তাদেরই জিজ্ঞাসা করুন।

প্রশ্ন: ওরা তো বলেন আপনারা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, অস্ত্র ধরেছেন, আপনাদের বিচার হওয়া উচিত।

উত্তর: আমরা তো বিদ্রোহ করিনি। আমরা হচ্ছে অধিকারাকাজক্ষী। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার চেয়েছিলাম আমরা, আমাদের ঠেলে দেয়া হয়েছিল ঐ পথে। আমাদের অধিকার খর্ব করে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিবাদ করেছি মাত্র।

প্রশ্ন: এই চুক্তির মধ্য দিয়ে সেই অধিকার কতটা ফেরত পেয়েছেন?

উত্তর: চুক্তি অনুযায়ী তো পেয়েছি অনেক কিছুই, তবে সব নির্ভর করছে চুক্তি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে। চুক্তির সফল বাস্তবায়নই বলবে আমরা কি পেলাম, কতটুকু পেলাম।

প্রশ্ন: প্রচারণা চালানো হচ্ছে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে এখানকার বাঙালিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

উত্তর: কেন বাঙালিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। যারা বৈধভাবে অবস্থান করছেন তাদের তো কোন সমস্যা নেই, কিন্তু যারা বেআইনিভাবে জমিজমা দখল করে আছেন তাদের তো সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। কেউ যদি বেআইনিভাবে আপনার জমি দখল করে থাকে তা আপনি ফেরত চাইবেন না?

প্রশ্ন: সব শরণার্থী প্রত্যাবাসনে আর কত সময় লাগবে?

উত্তর: এ মাসের মধ্যেই সব শরণার্থী ফেরত আসবে।

প্রশ্ন: এখন আপনার পরিকল্পনা কি? কোথায় যাবেন, আবার কি যাবেন ‘ওপারে’? যারা অস্ত্র সমর্পণ করলেন তারা কি করবেন?

উত্তর: কাজ তো শেষ হয়নি। অস্ত্রসমর্পণসহ সব খুঁটিনাটি কাজগুলো দ্রুত শেষ করতে হবে। আমাকে তো ছোট্টাছুটি করতে হবে। তবে আমি স্থায়ীভাবে খাগড়াছড়িতেই থাকব। আর যারা অস্ত্রসমর্পণ করলেন তারা কালই বাড়ি চলে যাবেন। সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের প্যাকেজ সুবিধা দিচ্ছে। তাই দিয়ে স্বাভাবিক জীবন শুরু করবে।

প্রশ্ন: চুক্তি বাস্তবায়নে বড় সমস্যা কি? সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে কি কোনো প্রশ্ন আছে আপনার মধ্যে?

উত্তর: চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সবার ধৈর্যই বড় প্রয়োজন। ধীরে ধীরে এর সফল বাস্তবায়নই সমস্যার সব সমাধান করবে। আর চুক্তি বাস্তবায়নে বড় বাধা কি সে সব তো আপনারাই জানেন। আমি কিছু বলতে চাই না। না, সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। সরকার আন্তরিক বলেই তো একটি চুক্তি হয়েছে।

প্রশ্ন: পাহাড়িদেরই তো কেউ কেউ এই চুক্তির বিরোধিতা করছে— কেন? তাদের জন্য আপনার কোন আহ্বান আছে?

উত্তর: পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশনের একটি ক্ষুদ্র অংশ এই চুক্তির বিরোধিতা করছে এই বলে যে, এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সবটুকু সমাধান হবে না। তারা পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের কথা বলছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই চুক্তি অনুযায়ী যে অধিকার আমাদের পাওয়ার কথা তা যদি ঠিক ঠিকভাবে কার্যকর হতে পারে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পথ অবশ্যই উন্মুক্ত হবে এবং তার ভিত্তি রচিত হবে। যারা এই চুক্তির বিরোধিতা করছেন তাদের প্রতি এই মুহূর্তে আমার কিছুই বলার নেই।

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্রসমর্পণ : কে কি বলেন

সাগর সরওয়ার/সুনীল ক্লাস্তি দে/ জহুরুল আলম/এনামুল হক কাশেমী: শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ও সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সংবাদকে বলেন, আমার খুব ভাল লাগছে। এটা রাজনৈতিকভাবে একটি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে অন্যতম মাইল স্টোন। আওয়ামী লীগের এটা একটা রাজনৈতিক বিজয়। মানুষের প্রতি আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতিরই অংশ এটি। সরকারের একার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়— সকল মত, ধর্ম, গোত্রকে এক সঙ্গে নিতেই হবে। সবই হয়েছে জনগণের জন্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের জন্য।

সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার বলেন, যারা জঙ্গলে থেকে যুদ্ধ করতেন তারা ফিরে আসছেন এটাই বড় ব্যাপার। আমরা আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আস্থানে সাড়া নিয়ে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা যে অস্ত্রসমর্পণ করছেন, এখন তাদের সময় নিজেকে গড়ে তোলার সঙ্গে দেশকে গড়ে তোলার কাজ শুরু করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য এস এস চাকমা বলেন, আমরা সকলে খুবই খুশি হয়েছি। আমরা চাই সকলে মিলে দেশ গড়তে। এ সরকারের বড় বিজয় এটি। এখন এগিয়ে যেতে হবে উন্নয়নের পথে। তিনি সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষকে এক হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানান।

দীর্ঘ দু'ঘণ্টার সংঘাতময় পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণে যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছেন সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাকে যখন সংবাদ-এর পক্ষ থেকে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে বলা হলো— তিনি বলেন, আমি আনন্দিত। তিনি বলেন, পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এর সমাধান নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা ছিল বলেই বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছা গেছে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নেও এ সরকার আন্তরিক বলে আমি মনে করি। শান্তি চুক্তির বিরোধিতাকারী দল বা সংগঠনের নাম উল্লেখ না করে হংসধ্বজ চাকমা বলেন, দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্যই তাদের সুমতি হওয়া প্রয়োজন।

রাজ্যমাটি জেলার বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জহির রহমান আজিজ বলেন, শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের আজকের দৃশ্য দেখে আমার মধ্যে এ ধারণাই জন্মেছে যে, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেই। খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান আবুল কাশেম বলেন, শান্তি বাহিনীর এতজন সদস্যের অস্ত্রসমর্পণ একথা প্রমাণ করেছে, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। রাজ্যমাটির সোনেঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী খিমিত চাকমা বলেন, পৃথিবীর বাস্তবতার নিরিখে বলব এ চুক্তি পাহাড়ি জনগণের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল আলম বলেন, পার্বত্যবাসীদের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা আজকের অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান অনেকটা নিশ্চিত করেছে। রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখে এ ধারণা আমার মাঝে জন্মেছে যে, শান্তিময় পরিবেশে পার্বত্য অঞ্চলের

অর্থনৈতিক অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবেই। রাজ্যমাটি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান বলেন, সেদিন আর বেশি দূরে নয় যখন পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ি-বাঙালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজে নামবেন। বিশিষ্ট মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী জে এফ আনোয়ারা বিনু বলেন, এ অনুষ্ঠান দেখে আমি একথা বলতে পারি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরতদের দুঃখের দিন ঘুচলো। বান্দরবানের একজন সাংবাদিকের মন্তব্য হলো : সাংবাদিকতার শুরু থেকে শান্তি বাহিনীর সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে মনে হতো এ এলাকায় আর বুঝি শান্তি স্থাপিত হবে না; কিন্তু আজকের অনুষ্ঠান আমার সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে।

মঙ্গলবার খাগড়াছড়িতে শান্তি বাহিনী সদস্যদের ঐতিহাসিক অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত পাহাড়ি-বাঙালিদের ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানান, পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর এভাবে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে শান্তি বাহিনী যে সত্যিই অস্ত্র জমা দিয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন একথা কখনো ভাবতেও পারেননি তারা। শান্তি বাহিনী সদস্যরা সুশৃংখলভাবে প্রথর রোদের মাঝে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকেও যেভাবে অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন তা ছিল এক দুর্লভ দৃশ্য এবং সূচিত শান্তির এক প্রতীকী নিদর্শন।

বান্দরবান জেলা থেকে এ অনুষ্ঠানে আসা ঠিকাদার এস এম রাজ্জাক বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় ইতোমধ্যেই বিশেষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। চুক্তিবিরোধী সমর্থক ঠিকাদারদের ভাগ্যেই জুটছে এসব কাজের প্রায় ৮০ ভাগ। চুক্তির সফল বাস্তবায়নের শুভ সূচনা হলো এই অস্ত্র জমাদানের মধ্য দিয়ে।

একই জেলার রোয়াংছড়ি থানা থেকে আসা যুবনেতা অংশু প্র মারমা বলেন, শান্তি বাহিনী সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণ করা খুবই দরকার ছিল পাহাড়ি-অপাহাড়িদের মধ্যকার সম্প্রীতি দৃঢ়করণের জন্যে।

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

উৎসবের নগরী খাগড়াছড়ি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি ছিল উৎসবের নগরী। সকাল থেকেই পাহাড়ি-বাঙালি দলে দলে এসেছেন অস্ত্রসমর্পণের অনুষ্ঠান দেখতে। কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম উপচে পড়েছে মানুষ। পঁচিশ হাজার লোকের ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ

হাজার লোক দেড় ঘণ্টার অঙ্গসমর্পণের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছে। স্টেডিয়ামে জায়গা না পেয়ে কয়েক হাজার নারী ও পুরুষ বাইরে দাঁড়িয়েছিল। নানা রঙের ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছিল খাগড়াছড়ি শহর।

মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃস্থানীয় সংস্কৃতিকর্মীদের একটি দল গতকাল সকালে ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি যায়। এই দলে ছিলেন ১১৭ জন। বাংলাদেশ বিমানের ভাড়া করা এয়ারবাসযোগে তারা সকাল ৯টা ২০ মিনিটে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে পৌঁছেন। সেখান থেকে তাদের হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। অনুষ্ঠানশেষে তারা সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরে আসেন।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম এবং উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ছাড়া জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জাসদের সভাপতি ও নৌ-পরিবহনমন্ত্রী আ, স, ম আবদুর রব, জাসদের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কাজী আরেফ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম খান, ন্যাপের (মো) সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নূরুল আলম অঙ্গসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রিসভায় আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ,
সম্মানিত উপজাতি নেতৃবৃন্দ,
মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ,
বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ,
সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে একটি অনন্য দিন। আজকের এ শুভদিনে প্রথমই আমি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালায় প্রশংসা করছি এবং তাঁর রহমত কামনা করছি।

আপনারা জানেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে সমিতির ... জন সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়ে আজ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রত্যাশায় আজ খাগড়াছড়ির নবনির্মিত স্টেডিয়ামের এই আন্তরিক অনুষ্ঠানে যারা অস্ত্র জমা দিচ্ছেন, আমি তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁদের বরণ করে নিচ্ছি অন্তরের গভীরতম ভালোবাসায়। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম আজ থেকে এ আনন্দময় ইতিহাসের অংশ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো। অনন্য এ ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম যাতে পার্বত্য লোকালয় বিভিন্ন ক্রীড়ার বিকাশ ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য এ স্টেডিয়ামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া কমপ্লেক্সে রূপান্তরের জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ অস্ত্র জমাদান আমাদের দেশের ইতিহাসে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এক নবদিগন্তের সূচনা করবে। আমাদের দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে যা ত্বরান্বিত করবে। উপজাতি ও অ-উপজাতীয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এদেশের সর্বস্তরের জনগণ এর সুফল ভোগ করবে। জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অবাধ-নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনে জনগণের রায় নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আমরা সরকার গঠন করার পর খোলামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমাদের আলোচনার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতীতের সরকারগুলো কখনো কখনো সমস্যাটিকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এর সমাধান চেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি মূলত ছিল একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আমিই প্রথম ১৯৮২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটি সেল গঠন করা হয় এবং এ এলাকার ঘটনাবলির উপর সচেতন দৃষ্টি রাখা হয়। সমস্যা কি কি, সমাধানের পথ কি ইত্যাদি বিষয়ে এই সেল দীর্ঘদিন কাজ করে এবং মাঝে মাঝে রিপোর্ট পেশ করতে থাকে। আর তাই সমস্যা নিরূপণ করা ও সমাধান খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য সহজ হয়।

দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আমরা অনুভব করি। পার্বত্য

চট্টগ্রাম সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে দেশের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১১০ দিনের মাথায় চৌদ্দই অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সরকারি ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজকর্মীদের এ কমিটির সদস্য করা হয়। এ জাতীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে বিএনপির ২ জন সংসদ সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে এ কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পক্ষ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঢাকায় একনাগাড়ে তা অনুষ্ঠানে একমত হন। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে পরবর্তী ৬টি বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপি দলীয় দু'জন সংসদ সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রথম থেকেই আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি অসহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করে আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তারা সমগ্র বিষয়টি সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। পক্ষান্তরে, সমস্যা সমাধানে বিগত বিএনপি সরকারের আমলে যে কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটিকে আমরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সবসময় সমর্থন দিয়ে এসেছিলাম। আমাদের দু'জন সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা এবং মোস্তাক আহমদ চৌধুরী জনসংহতি সমিতির সাথে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকেই যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এমনকি আমরা যখন সংসদ থেকে পদত্যাগ করে পথে আন্দোলন করেছিলাম তখনও আমাদের সংসদ সদস্যরা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে এ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। সমস্যার দ্রুত সমাধান যাতে হয় এজন্য বিএনপি সরকারকে আমরা সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলাম।

২৬ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখ থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সপ্তম বৈঠকে শেষে গত ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে সমগ্র জাতি এ চুক্তিকে শান্তি চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মহল ছাড়া সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও অ-পাহাড়ি আপামর জনসাধারণসহ সমগ্র দেশবাসী ও বিশ্ববাসী এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশসহ অনেক

আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছে। আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে বিএনপিসহ কয়েকটি সমমনা দল অযৌক্তিকভাবে ভুল তথ্যনির্ভর এবং একপেশে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁদের অনুরোধ করব অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে আসুন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি বাবু জ্যোতির্নন্দ বোধিপ্রিয় লারমা এবং তার সহকর্মীবৃন্দ দেশের ও বিশ্বের বিরাজমান অবস্থার এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমস্যা সমাধানে প্রজ্ঞা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আমি এজন্য তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আলোচনা অনুষ্ঠানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে সহায়তা করেছেন আমি তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কোনরূপ দ্বিধা সংশয় ছাড়াই স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য সমুন্নত রেখেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিষয়ে কারো মনে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি, অস্পষ্টতা, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচীন হবে না। দেশের সকল নাগরিকের বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি-বাঙালি সকলের অধিকার অতীতে যা ছিল তাই নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা তিনটিতে ডিসি-এসপি থাকবেন, থাকবেন পূর্বের ন্যায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। বাঙালিরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। গুচ্ছগ্রামবাসীরাও স্বভূমিতে থাকবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পাশাপাশি তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করবো। আমি আবাবো দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালি সবাই থাকবেন, কোন বাঙালিকে বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হবে না।

আমি আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে কোন কারণে হোক না কেন আমাদের পাহাড়ি ভাইবোনদের একটি অংশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিগত সরকারগুলো শরণার্থীদের অন্তরে আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে পারেনি বলেই অধিকাংশ শরণার্থীই ভারতে থেকে যান। আমরা তাদের

মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা তাদের আশ্বস্ত করেছি যে দেশে তাঁদের প্রত্যাবর্তনকে নির্বিলম্ব করা হবে, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের যথাযথ পুনর্বাসন করা হবে। আমরা প্রত্যগত শরণার্থীদের জন্য ২০ দফা সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। এ পর্যন্ত ৭,২৬৭টি শরণার্থী পরিবারের ৩৭,৯৯৬ জন সদস্য দেশে ফিরে এসেছেন। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। শরণার্থীদের সকলকে সরকার প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যথোপযুক্তভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশা করি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত থেকে সকল শরণার্থীর দেশে প্রত্যাবর্তন শেষ হবে। ফলে তাদের দুঃসহ শরণার্থী জীবনের অবসান ঘটবে। উপজাতীয় শরণার্থী শব্দটি আমাদের জীবন থেকে চিরদিনের মতো মুছে যাবে বলে আমি আশা করি।

এদেশ আমার আপনার— আমাদের সবার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অস্থিতিশীল অবস্থার অবসান ঘটবে। এখানে শান্তি ফিরে আসবে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে এখানে পর্যটন শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে। এর সুফল পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীসহ সমগ্র দেশবাসী ভোগ করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা এবং বন্ধুরাষ্ট্রের কাছ থেকে ব্যাপক বিনিয়োগের সাড়া পাওয়া গেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অপরিহার্য এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ফলে এখন এসব বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-অপাহাড়ি উভর সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীর্ঘদিনের ইতিহাস রয়েছে। আমি আশা করি তা বজায় থাকবে এবং স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিতে কোনরূপ অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। আমরা বিশৃংখলা সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টাকে কঠোর হাতে দমন করতে বদ্ধপরিকর। আইন-শৃঙ্খলাসহ স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা হবে। আমাদের সরকার নাগরিকের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ চুক্তির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সঠিক নেতৃত্ব। সকল মহলের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতায় আমরা এই দুরূহ কাজের সফল বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। আমি দেশবাসীর প্রতি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি-অপাহাড়ি বাঙালি সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি এই চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অতীতের দুঃখজনক ঘটনাবলি এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমরা ভুলে যেতে চাই। আমি জানি, পার্বত্য এলাকার সর্বস্তরের জনগণকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহে দীর্ঘদিন অনেক অসুবিধা ও অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসব কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাকে অতীতের বিষয় হিসেবে গণ্য করে ভবিষ্যত সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধ এক নতুন জীবনের প্রত্যাশায় আসুন আমরা মিলেমিশে একাত্ম হয়ে কাজ করি।

আমরা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ পার্বত্য চট্টগ্রামকে সকল দিক থেকে উন্নয়নের আদর্শ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমাদের এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা। আশু কার্যক্রম বাবদ ১৫৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা ইতোমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী চাহিদা বাবদ ২৮৮ কোটি টাকা, মধ্য মেয়াদী চাহিদা বাবদ ৪৬৬ কোটি টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা বাবদ ১২৩৭ কোটি টাকা প্রদানের জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সর্বমোট ২,১৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

আশুকারণীয় কর্মসূচির আওতার শরণার্থীদের ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তদের নগদ অর্থ সাহায্য, খাদ্য সাহায্য ও গৃহ নির্মাণ সামগ্রী সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পুরাতন অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ। এছাড়া, এর আওতায় সড়ক, রাস্তা, পুল, সেতু, স্কুল, চিকিৎসালয়, গ্রামীণ সড়ক ও বাজারের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ে চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে। কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রমও এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, মাটি ক্ষয়রোধ প্রকল্প, পাহাড়ি জমিতে উন্নত চাষ পদ্ধতির উদ্ভাবন, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, বাজার উন্নয়নসহ অন্যান্য কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় আমরা এ এলাকার প্রতিটি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবো। প্রতিটি থানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য-উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বনজ, ফলমূল ও রাবার বাগান স্থাপন, কৃষিজাত শিল্পায়ন, বিদ্যুতায়ন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প।

এছাড়া, কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ভিন্ন ভিন্নভাবে এ এলাকায় আরো সহস্রাধিক কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। শিশু নারীদের সার্বিক উন্নতির জন্যও এখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা যাতে এ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে পারেন সেজন্য আমরা উৎসাহ প্রদান করছি। এ এলাকার শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যে খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি গঠিত হয়েছে। এ তিনটি জেলা চেম্বারকে ফেডারেশন অভ বাংলাদেশ চেম্বার অভ কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ গঠিত হয়েছে। এ তিনটি জেলা চেম্বারকে ফেডারেশন অভ বাংলাদেশ চেম্বার অভ কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের সদস্যভুক্ত করেছে। আশা করা যাচ্ছে, এ তিনটি জেলা চেম্বার এ এলাকার শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অচিরেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমরা পাহাড়ি জনগণের বৈচিত্রময় নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশেও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশেও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, যা আপনারা অবগত আছেন। এ এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সমৃদ্ধ এক রূপসী এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এজন্য আমরা এ এলাকার উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আশা করা যায়, অচিরেই তার সুফল পাহাড়ি-বাঙালি সবাই ভোগ করবে।

ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত সমাজ গঠন আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু দেশের একটা অংশকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সংঘাতের পথ পরিহার করে। শান্তি স্থাপনকেই আমরা শ্রেয় মনে করি এবং শান্তিই আমাদের সবার কাম্য। শান্তির পথেই স্থিতিশীলতা আসে, গণতন্ত্র বিকশিত হয়, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। আমরা তাই—

সংঘাত নয় শান্তি চাই

ধ্বংস নয় সৃষ্টি চাই

পশ্চাৎপদতা নয় অগ্রগতি চাই

বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা তাই কবির ভাষায় বলতে চাই—
“জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক”। নতুন পথের যাত্রী আমরা নতুন শতাব্দীকে আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে বরণ করতে চাই। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছেও আমার

আবেদন থাকবে— নতুন শতাব্দী যেন শান্তিময় বিশ্ব হিসেবে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে— এ লক্ষ্যে একাত্ম হয়ে কাজ করার।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজনকে সফল করতে সেনাবাহিনীর সকল স্তরের অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ, বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, পুলিশ-বিডিআর, আনসার সদস্যবৃন্দ এবং রাজনৈতিক ও উপজাতি নেতা ও কর্মীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আসুন, দেশের উন্নয়নে, জনগণের উন্নয়নে আমরা দলমত-পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

শান্তির পথে, কল্যাণের পথে, অগ্রগতির পথে এবং উন্নয়নের পথে আমাদের অগ্রযাত্রার জয় হোক। খোদা আপনারদের সবার জীবনে কল্যাণ যোগে আনুন এ প্রার্থনা করি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়া সহায়তা দেবে

—আলেকজান্ডার ডাওনার

(কূটনৈতিক বার্তা পরিবেশক)

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাওনার পার্বত্য শান্তি চুক্তির জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওই অঞ্চলের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া চলতি বছর ২ জন ক্রিকেটার ও ২৪ জন বাংলাদেশী ছাত্রকে বৃত্তি প্রদানের কথাও ঘোষণা করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠককালে তিনি এ ঘোষণা দেন। বৈঠকশেষে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আলেকজান্ডার ডাওনার বলেন, চমৎকার পরিবেশে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু’দেশের সম্পর্ক সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বাংলাদেশের কৃষি খাতের ইতিবাচক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে জানান। অস্ট্রেলিয়ার অনুদান বৃদ্ধির ব্যাপারেও তিনি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-৯৭

অর্থবছরে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার অনুদান দিয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে এবং দু'পক্ষই অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

তিনি বলেন, আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে সহযোগিতা চেয়েছি। তারা এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রকল্পে অস্ট্রেলীয় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (আমেরিকা এবং প্যাসিফিক) আশরাফ-উদ-দৌলা সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বলেন, দু'দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। তিনি এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের উদ্যোগের কথাও অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান। এছাড়া ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি, রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং আটকেপড়া পাকিস্তানিদের ব্যাপারেও অস্ট্রেলীয় মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়।

ত্রিদেশীয় শীর্ষ সম্মেলনের উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এর ফলে তিন দেশের বিনিয়োগকারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আরো জানান, অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের মান উন্নয়নে দু'জন ক্রিকেটারের প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং ২৪ জন ছাত্রকে বৃত্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাছাড়া দু'পররাষ্ট্রমন্ত্রী দু'দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। দু'দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের ব্যাপারেও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান। বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব এম. আমিনুল ইসলাম, ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূতসহ দু'দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সকালে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অলেকজান্ডার ডওনার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ। এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

চট্টগ্রাম বিভাগে আংশিক হরতাল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ৯ পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাতিল ও গতকাল খাগড়াছড়িতে শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিভাগে

বিএনপি ও সমমনা বিভিন্ন দল আহূত হরতাল আংশিকভাবে পালিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলা সদরে হরতাল পালিত হয়নি। চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকঃ চট্টগ্রাম মহানগরসহ জেলার বিভিন্ন থানায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে পুলিশ শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে নগরীতে ১৫/১৬ জন হরতাল সমর্থককে গ্রেফতার করেছে।

নগরীতে হরতালের পক্ষে-বিপক্ষে ২/৩টি মিছিল বের করা হয়। রাস্তায় কোন পিকেটারকে দেখা যায়নি। সকালবেলা থেকেই রিকশা-টেক্সি চলাচল করেছে কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই। বিভিন্ন স্থানে দোকানপাটও খোলা থাকতে দেখা যায়। এই পানসে হরতাল নিয়ে অনেককেই প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়, কেন ডাকা হয়েছিল? হরতাল আহ্বানকারীরাই মাঠে নেই। কাউকে দেখা যায়নি রাজপথে। পত্রিকায় একটি বিবৃতি দিয়েই হরতাল আহ্বানের কার্য সারা। এদিকে হরতাল চলাকালে বিকেলে নগরীর নিউমার্কেট মোড়ে সংসদের বিরোধীদলীয় হুইপ ও মহানগর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এমপি'র সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মহানগর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব দস্তগীর চৌধুরী, শাহজাদা এনায়েত উল্লাহ খান, আবু সুফিয়ান, এফ, এইচ খান ফজু, হারুন জামান প্রমুখ। পরে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মহানগর বিএনপি এক বিবৃতিতে হরতাল সফল করায় জনগণকে অভিনন্দন জানায়। বান্দরবান থেকে জেলা বার্তা পরিবেশকঃ বান্দরবান জেলা শহরে গতকাল হরতাল হয়েছে। হরতাল চলাকালে সারাদিন অফিস-আদালত, দোকানপাট, ডাকঘর, ব্যাংক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ছিল।

হরতালশেষে সন্ধ্যায় প্রেসক্লাব চত্বরে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা ঐক্য পরিষদ নেতা কামাল উদ্দিন। সমাবেশে খাগড়াছড়িতে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

রাস্তামাটিতে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল হয়েছে বলে জানা গেছে। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। খাগড়াছড়ি জেলা সদরে কোন হরতাল পালিত হয়নি। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল।

কুমিল্লা: শান্তিপূর্ণভাবে আংশিক হরতাল পালিত হয়েছে। কিছু রিকশা চলাচল করেছে। প্রধান সড়ক ছাড়া অন্যান্য স্থানে দোকানপাট খোলা ছিল। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। দূরপাল্লার বাস চলাচল করেনি। হরতালশেষে পূবালী চত্বরে বিএনপি সমাবেশ করেছে।

সংবাদ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

তারা ফিরছেন বাড়িঘরে স্বাভাবিক জীবনে

■ সন্ত লারমার জমা দেয়া অস্ত্র যাবে জাদুঘরে

■ প্রতিশ্রুত ৫০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে

সাগর সরওয়ার ও সুনীল কান্তি দে, খাগড়াছড়ি থেকে: শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণকারী সদস্যদের অধিকাংশই গতকাল ফিরে গেছেন তাদের বাড়িঘরে। প্রথম দফা অস্ত্রসমর্পণকারীদের মধ্যে ৫শ’ ২৪ জন সদস্য গতকাল ফিরে গেছেন নিজ নিজ পরিবারের কাছে। অস্ত্রগুলো পুলিশের মালখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে কেবলমাত্র সন্ত লারমার চাইনিজ এসএমজিটি জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে। অন্য অস্ত্রগুলোর ব্যাপারে সরকার পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবে বলে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন। তিনি জানান, সন্ত লারমা বাদে অন্য সদস্যদের মধ্যে গতকালই নগদ ৩ কোটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্যারাছুট্রা ট্রানজিট ক্যাম্পে এখন অবস্থান করছেন ২শ’ ১৫ জন সদস্য। তারা আজ তাদের নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাবেন। স্বাভাবিক জীবনের প্রথম ধাপে গতকাল খাগড়াছড়ি সদরের ৫৮ জন, মহালছড়ি থানার ১শ’ ২৫ জন, দিঘিনালা থানার ১শ’ ৭৭ জন, মাটিরাঙার ১শ’ ১৮ জন, পানছড়ির ৮১ জন এবং রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ির ৩৫ জনকে ৩২টি বাস এবং ৬টি টাঁদের গাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নিজ নিজ পরিবারের কাছে।

জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল ইসলাম ‘সংবাদ’কে জানিয়েছেন, প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল সন্ত লারমা একটি পিস্তল প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে অস্ত্রসমর্পণের সূচনা করবেন। কিন্তু শান্তি বাহিনীর অস্ত্রগুলোর মধ্যে কোন পিস্তল পাওয়া যায়নি, কেবলমাত্র দেশে তৈরি পিস্তল ছাড়া। তাই একটি এসএমজি দিয়েই অস্ত্রসমর্পণের সূচনা হয়।

গতকাল ও আজ যে সমস্ত সদস্য বাড়ি ফিরে যাবেন তাদের যাত্রাপথে পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সদস্য যে থানার বাসিন্দা তাকে প্রথমে থানা সদরে গিয়ে থানা নির্বাহী অফিসারের কাছে রিপোর্ট করার কথা বলা হয়েছে। গতকাল প্যারাছুট্রা ট্রানজিট ক্যাম্পে অনেকে অপেক্ষা করছিলেন কাঁটাতারের বেড়া ধরে স্বজনকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে।

বাড়িঘরে ফিরে যাওয়া: খাগড়াছড়ির প্রতিটি পাহাড়ি গ্রাম এখন ব্যস্ত ফিরে আসা শান্তি বাহিনী সদস্যদের বরণ করতে। নিজস্ব সংস্কৃতিতে তারা বরণ করে নিচ্ছেন তাদের। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে—এটাই এখন বড় ব্যাপার। দলে দলে গ্রামবাসী দেখা করতে আসছেন তাদের সঙ্গে, যারা জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের জন্য একদিন যুদ্ধ করেছেন।

গতকাল বুধবার শহরের খাগড়াপুর এলাকায় গিয়ে দেখা হলো শান্তি বাহিনীর ৩ সদস্যের সঙ্গে। এদেরকে দেখা পাওয়া গেলো স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের সামনে। সঙ্গে এলাকার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শক্তিপদ ত্রিপুরা। এ ৩ সদস্য হলেন সুধাকর ত্রিপুরা, কল্লোল রোয়াজা এবং প্রাণেশ্বর।

সুধাকর ত্রিপুরার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেলো তার সঙ্গে দেখা করতে অপেক্ষা করছেন স্থানীয় বাঙালি ব্যক্তিত্ব এবং এলাকার বন্ধুরা। বাড়িতেও দেখা গেলো উৎসবের আমেজ। নিকট আত্মীয়ের ফিরে আসা সত্যিই আনন্দের। আর একজন দেখা গেলো তার শিশুপুত্রকে কাঁধে নিয়ে হাঁটছেন। দীর্ঘদিন বাদে দেখা। বাবাকে পেয়ে ছেলেও খুশি। বাবা তাকে কিনে দিয়েছেন বিস্কুট। শান্তি বাহিনীর এই সদস্যের নাম কল্লোল রোয়াজা। অনেকদিন পর বাড়িতে আসায় তার মুখে খুশির বিলিক থাকলেও যখন পুত্রকে কাঁধে নিয়ে হাঁটছিলেন তখন তার চিন্তা ছিলো আপন ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে। খুশির বিলিক দেখা গেলো প্রাণেশ্বরের চেহারাও। বললেন, “ভালো আছি, খুব ভালো।”

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে সাড়ে ৫শ’ শান্তি বাহিনীর সদস্য অস্ত্রসমর্পণ করবেন বলে জানা গেছে। তাদের জন্য সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বরদাস এবং দুদুকছড়ির অস্ত্রসমর্পণের ব্যাপারেও চলছে প্রস্তুতি। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির সকল উচ্চপর্যায়ের নেতা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। অস্ত্রসমর্পণের অন্য দফাগুলো সরকারের সঙ্গে দেখভাল করার জন্য জনসংহতির দু’নেতা সুধাসিন্ধু খীসা এবং রক্তোৎপল ত্রিপুরা এখন খাগড়াছড়িতে অবস্থান করছেন।

প্রতিক্রিয়া: পার্বত্য শান্তি চুক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিতব্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহে পার্বত্যঞ্চলে বসবাসরত অ-উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব রাখার দাবি ক্রমান্বয়ে জোরদার হয়ে উঠছে। এদের বক্তব্য হচ্ছে, ঢালাওভাবে অ-উপজাতীয় প্রতিনিধিত্বের কথা পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে উল্লেখ করা হলেও এর মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

সংবাদ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

জীবন শুরু হবে আবার নতুন

করে : অস্ত্র জমা দিয়ে আশাবাদ

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে: অস্ত্রসমর্পণকারী শান্তি বাহিনীর সব সদস্যই আশা করছেন, তাদের নতুন করে জীবন শুরু হবে। এই জীবন হবে

তাদের স্বপ্নের। আকাজক্ষার। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের আগে ও পরে কঠোর নীরবতা ভেঙেও টুকরো টুকরোভাবে তারা তাদের স্বপ্নের কথা বলেন, তারা স্মৃতিচারণ করেন অতীত দিনের।

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রক্তোৎপল ত্রিপুরা। ‘সংবাদ’কে তার প্রতিক্রিয়া, আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছি, এটাই বড় ব্যাপার। শান্তি বাহিনীর সদস্য শান্তিময় চাকমা অস্ত্রসমর্পণশেষে জানান, বড় ভালো লাগছে। এবার স্বাভাবিক জীবন। পরবর্তীতে দেখা হবে। দয়াশংকর চাকমা তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, ১৯৮৯ সালে শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম। এখন স্বাভাবিক জীবনের দিকে যাচ্ছি।

আশাপূর্ণ চাকমা বলেনঃ আমরা চাই সুন্দর জীবন। আর সুন্দর জীবনের জন্য এমন একটি দিনের অপেক্ষাই ছিল এতোদিন।

পরাজন চাকমা তাকিয়ে ছিলেন বিমর্ষ চোখে। তিনি জানালেন, অস্ত্রসমর্পণ করলাম— ব্যাপারটি ভালো না খারাপ বলতে পারছি না। দেশে শান্তি আসবে— এটাই এখন একমাত্র চাওয়া। তিনি আবার পড়ালেখা করবেন এই আশা প্রকাশ করলেন।

নীলময় চাকমা প্রায় ১৪ বছর যাবৎ শান্তি বাহিনীতে আছেন। জানালেন, তার বাড়ি রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে। গ্রামে ফিরে যাবেন। তার অনেক স্মৃতিই মনে পড়ছে।

মহেশচন্দ্র চাকমা জানান : ২২ বছর ধরে ছিলেন শান্তি বাহিনীতে। অস্ত্র জমা দেয়ার পর প্রতিক্রিয়া : ভালো লাগছে। স্বাভাবিক জীবনেই তো ফিরে যাবো এখন।

রাঙ্গামাটির প্রিয়ময় শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য ছিলেন ১১ বছর। শান্তি বাহিনীর সদস্য হিসেবে চালাতেন রাইফেল। বেশ ক’টি অভিযানেও অংশ নিয়েছেন তিনি। অস্ত্র জমা দিয়ে ভালো জীবনে ফিরে যাচ্ছি— তার প্রতিক্রিয়া।

রাঙ্গামাটির কিশোর স্বাধীনও অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছেন বলে জানালেন।

সংবাদ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র জমাদান স্বস্তি

ফিরিয়ে এনেছে সবার মধ্যে

শাহ মোহাম্মদ মাকসুদ: খাগড়াছড়ি, ১১ই ফেব্রুয়ারিঃ শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে গোটা এলাকায়।

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে দিঘিনালা থানার কাঠালটিলা গুচ্ছগ্রাম থেকে এসেছিলেন মকবুল হোসেন নামের পঙ্গু এক বৃদ্ধ। ক্রাচে ভর দিয়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরুচ্ছিলেন। ‘৯০ সালে ভিডিপি’র সদস্য হিসেবে চাকরিকালীন সময়ে শান্তিবাহিনীর হামলার শিকার হয়ে বাঁ পা হারিয়েছেন। তিনি ‘৮৩ থেকে এখানে আছেন। আদিনিবাস চাঁপাইনবাবগঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৭ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। তার মন্তব্যঃ শান্তিচুক্তি হওয়ায় এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দেয়ায় তিনি বেশ খুশি।

৪ সন্তানের জননী প্রমীতা দত্ত (৩২) তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পেরাছড়া থেকে এসেছিলেন অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে। তার মন্তব্য শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণে তারা এখন নিরাপদ।

খাসবান রাবার বাগানের শ্রমিক শান্তি কুমার ত্রিপুরাও (৩২) বেশ খুশি। তারা এখন উৎকর্ষামুক্ত নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারবেন।

সংবাদ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্রসমর্পণ টুকিটাকি

- * অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ৪৬৫টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ। প্রথম অস্ত্রটি ছিল চাইনিজ এসএমজি, এটি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন সন্ত লারমা। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানশেষে তিনি আবার দুদকছড়ায় ফিরে যান।
- * অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করেন ৭শ’ ৩৯ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য। অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা এবং রক্তউৎপল ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন। এরা এখনও অস্ত্রসমর্পণ করেননি। তারা অস্ত্রসমর্পণ করবেন ২৮শে ফেব্রুয়ারি।
- * ১৬, ২২ এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি পুনরায় অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠিত হবে। তালিকা অনুযায়ী অস্ত্রসমর্পণের অপেক্ষায় আছেন ১ হাজার ১শ’ ৯৪ জন সদস্য।
- * অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির দু’জন সদস্য জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য এডভোকেট ফজলে রাব্বী ও প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান ছিলেন অনুপস্থিত।
- * পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা রূপায়ন দেওয়ান অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে আসেননি। সরকারের সঙ্গে বৈঠকগুলোতে সন্ত লারমার নেতৃত্বে যে ৮ জন নেতা আলোচনায় অংশ নেন তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই অনুপস্থিত ছিলেন।

- * অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের তল্লাশি করে স্টেডিয়ামে ঢুকতে দেয়ার জন্য স্থাপিত মেটাল ডিটেক্টরের সংখ্যা কম হওয়ায় সাধারণ দর্শকদের অনেককেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ভিড়ের চাপে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙেছে এবং দুটো ডিটেক্টর মেশিন নষ্ট হয়েছে।
- * অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার আগে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণপরিষদ এবং হিলউইমেন ফেডারেশনের কিছু সমর্থক পূর্ব গ্যালারিতে ‘শান্তি চুক্তি মানি না, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে’ ইত্যাদি ব্যানার প্রদর্শন করে ও এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় দু’পক্ষের মধ্যে।

সংবাদ

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সাংবাদিক সম্মেলনে বিএনপি নেতৃবৃন্দ
শান্তি বাহিনীর হাতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আছে,
যার অনেকগুলোই তারা জমা দেয়নি
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিএনপি’র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশেষ কমিটির নেতারা ‘শান্তি বাহিনী’র কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র থাকার তথ্য তুলে ধরে বলেছেন, সেই অস্ত্রের অনেকগুলোই ‘শান্তি বাহিনী’ জমা দেয়নি। তবে বিএনপি নেতারা ‘শান্তি বাহিনী’র কাছে যে পরিমাণ অস্ত্র থাকার তালিকা দিয়েছেন, সেটির ভিত্তি বা সূত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি। তারা বলেছেন, ‘আমাদের জানা মতে’ শান্তি বাহিনীর কাছে এসব অস্ত্র রয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিবসহ বিশ্ব নেতারা ও দেশের প্রায় সকল সংবাদপত্র পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে ঐতিহাসিক বলে অভিনন্দিত করায় বিএনপি’র মতে তারা সবাই এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরোধী কিনা- এ প্রশ্নে বিএনপি নেতাদের মন্তব্য হলো: ওই চুক্তি সম্পর্কে এখনো সবাই পুরো বুঝে উঠতে পারেনি, আমরাও (বিএনপি) ঠিকমতো বুঝতে পারিনি, তাই এমনটা ঘটছে। তবে একদিন সবাই এটা বুঝতে পারবে। বিএনপি নেতারা সম্পাদিত শান্তি চুক্তি বাতিলের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিএনপি’র নয়া পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিএনপি’র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশেষ কমিটির নেতারা এসব তথ্য তুলে ধরেন- মন্তব্য করেন। শান্তি বাহিনী আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আরো তিন দফা অস্ত্রসমর্পণ করবে, অস্ত্রসমর্পণের পর্ব শেষ

হওয়ার আগেই সকল অস্ত্র জমা দেয়া হচ্ছে না- এ অভিযোগ করছেন কেন, এ প্রশ্নের জবাবে বিএনপি নেতারা বলেন, আমরা আমাদের তথ্য তুলে ধরলাম, দেখা যাক কত অস্ত্র জমা পড়ে। শান্তি বাহিনীর সদস্য সংখ্যা নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার বলে বিএনপি নেতারা মত ব্যক্ত করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন বিএনপি’র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশেষ কমিটির আহ্বায়ক লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আবদুল হান্নান শাহ, সাংসদ মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, শাহজাহান সিরাজ, সাংসদ জয়নাল আবেদিন ফারুক। উপস্থিত ছিলেন এম এ মান্নান, সাংসদ সালাহউদ্দিন আহমেদ, এহসানুল কবির প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে অসাংবিধানিক ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী বলে অভিহিত করে বলা হয়, এই চুক্তির জন্য জনগণ একদিন বর্তমান সরকারের বিচার করবে। তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, কারণ শান্তি বাহিনীর একটা অংশ এই চুক্তির বিরোধিতা করছে। জনগণও এই চুক্তি মেনে নেয়নি। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিকেও বিএনপি এক সময় অসাংবিধানিক- সংবিধানের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছিল, আবার বিএনপি’ই ওই দাবি মেনে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করেছে। তাই পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে শেষ বিচারে অসাংবিধানিক ও সংবিধানের পরিপন্থী বলা সঙ্গত কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে বিএনপি নেতারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি ছিল রাজনৈতিক, শান্তি চুক্তির সাথে সেটির তুলনা চলে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, আমরা জানতে পেরেছি শান্তি বাহিনীর হাতে রয়েছে এসএলআর, প্রি নট প্রি, একে-৪ রাইফেল ২ হাজার, এসএমজি (ভারতীয়) ৪শ’, লাইট মেশিনগান (ভারতীয় ও চেকশ্লোভাকিয়া) ২শ’, গ্রেনেড ১০ হাজার, এমুনেশন ৪ লাখ, রকেট লাঞ্চার ১২, এক্সপ্রোসিভ (পি-৩) ২শ’ কেজি, ৬০ মি.মি. মর্টার (সোভিয়েত ব্লক) ১২টি (সেকশন ৩টি করে), পিস্তল ১২০টি, ওয়ারলেস সেট ৫টি।

সম্ভ্র লারমাকে সম্ভ্রাসী বলে অভিহিত করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী তার হাতে সাদা গোলাপ তুলে দিয়েছেন, তার জবাব জাতি একদিন আওয়ামী লীগের কাছ থেকে আদায় করে নেবে।

সংবাদ
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
ওয়াশিংটন টাইমসের অভিমত
অস্ত্রসমর্পণ একটা বড় ধরনের অগ্রগতি

মর্যাদাবান ওয়াশিংটন টাইমস পত্রিকায় শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের খবর পরিবেশন করতে গিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ও সন্ত্রাস লারমা নামে পরিচিত জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বাধীন উপজাতীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির শর্ত পূরণে অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানটি একটি বড় ধরনের অগ্রগতি। পত্রিকাটিতে একটি বড় ছবিও ছাপা হয়। তাতে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সুশৃংখলভাবে অস্ত্রসমর্পণ করতে দেখা যায়। খবর বাসস'র।

পত্রিকাটির বুধবারের সংখ্যায় বলা হয়, স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের বিনিময়ে উপজাতীয় বিদ্রোহীদের সাদা গোলাপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে ২৪ বছরের বিদ্রোহী তৎপরতার অবসান হয়েছে।

পত্রিকাটিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে সাদা গোলাপ গ্রহণের বিনিময়ে উপজাতীয় বিদ্রোহীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে।

সংবাদ
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
পাহাড়ি পল্লীগুলোতে মিলন উৎসব
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি গ্রামগুলোতে এখন চলছে মহামিলন উৎসব। দীর্ঘদিনের সশস্ত্র জীবন ত্যাগ করে ৭শ' ৩৭ জনই আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে গেছেন অথবা পথে রয়েছেন।

রাঙ্গামাটি
রাঙ্গামাটি থেকে সুনীল কান্তি দে: অস্ত্রসমর্পণকারী ১শ' ১২ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য গতকাল রাঙ্গামাটির বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছেছেন।

কুতুকছড়ি, ঘিলাছড়ি, মানিকছড়ি ও রাঙ্গামাটি শহরের বাড়িঘরে উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শান্তি বাহিনী সদস্যদের দ্বিতীয় পর্যায়ের অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তুতি চলছে।

বান্দরবান
বান্দরবান থেকে এনামুল হক কাশেমী: স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য শান্তি বাহিনীর বেশ ক'জন সদস্য স্থানীয় সার্কিট হাউসে উঠেছেন। তারা

বুধবার রাতেই চলে আসেন। গতকাল কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিনিধির। তারা উৎফুল্ল ও আনন্দ প্রকাশ করেন।

খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি থেকে মোহাম্মদ জহুরুল আলম: খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রথম দফায় অস্ত্র জমাদানকারী ৭শ' ৩৯ জনের মধ্যে ৭শ' ৩৭ জনই নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। দু'জন অসুস্থ থাকায় তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা হলেন তন্ময় বিকাশ চাকমা ও যুগেশ্বর চাকমা।

সংবাদ
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তি বাহিনী : দ্বিতীয় দফায় অস্ত্রসমর্পণ করবেন ৫৫০ জন

সুনীল কান্তি দে : পার্বত্য শান্তি চুক্তির ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্র জমাদানের ২য় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিকতার সকল কাজের প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি সোমবার সকাল ১১টায় রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলামের (বীরউত্তম) কাছে জনসংহতি সমিতির ৫শ' ৫০ জন সদস্য তাদের অস্ত্র জমা দেবেন। উল্লেখ্য, গত ১০ই ফেব্রুয়ারি ৭শ' ৩৯ জন শান্তি বাহিনীর সদস্য প্রথম দফায় অস্ত্রসমর্পণ করেছিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক অস্ত্র জমাদানের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়ির কচুছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর সদস্যরা টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদারের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবেন। সেখানে কর্তব্যরত সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা এ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পরীক্ষা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পৃথক করবেন। এ সময়ে জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্দু খীসা সেখানে উপস্থিত থেকে সকল কাজের সমন্বয় করবেন। এরপর শান্তি বাহিনী সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন করা হবে এবং সেদিনই তাদের বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ও বাঘাইছড়ি আবাসিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে।

১৬ই ফেব্রুয়ারির আনুষ্ঠানিক অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রত্যন্ত অঞ্চল বাঘাইছড়িতে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। থানা সদরের সাথে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়ক উন্নয়নের কাজ চলছে দিনরাত। সামরিক ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে নিরাপত্তা ও প্রহরার দায়িত্ব এবং আনুষ্ঠানিকতা ও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে

দু'টি ট্রানজিট ক্যাম্পের আবাসন, বিনোদন, নিরাপত্তা বেটনী, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, চিকিৎসা সুবিধা, টেলিফোন সংযোগ ও ফ্যাক্স স্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করেছে এতদসংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো। অস্ত্র জমাদানকারী ৫শ' ৫০ জন শান্তি বাহিনী সদস্যের মাঝে বন্টনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাক্ফোর্স বিভাগ থেকে ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল এ সমস্ত প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণের জন্য টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। এ সময়ে তার সাথে ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা, ব্রিগেড কমান্ডার আ ত ম জহিরুল আলম, বিডিআর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মাহমুদ, জেলা প্রশাসক শাহ আলম, পুলিশ সুপার এম এ জামান, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সাহানা দেওয়ান এবং এ উপলক্ষে গঠিত প্রশাসনিক কমিটির সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) মোঃ শহীদুল্লাহ মজুমদার, টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান ট্রানজিট ক্যাম্প, অনুষ্ঠান স্থল ইত্যাদি ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে খোঁজখবর নেন। তিনি গতকাল রাঙামাটি ফিরে এলেও আগামীকাল বিকেলে পুনরায় বাঘাইছড়ি যাবেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীরউত্তম) এবং বিশেষ অতিথি থাকবেন উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য বীর বাহাদুর এমপি। স্বরাষ্ট্র সচিবের সই করা আমন্ত্রণপত্র অনুসারে জানা গেছে, অস্ত্র জমাদানের এই অনুষ্ঠানে সময় নেবে মাত্র ১ ঘণ্টা।

সকাল ১১টায় প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানস্থলে আসবেন। তার আগেই শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অনুষ্ঠানস্থলে এসে উপবেশন করবেন। অনুষ্ঠানে শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। এরপর শান্তি বাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলের বিশিষ্ট কমান্ডার মেজর পেলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে একটি অস্ত্র তুলে দেবেন এবং সাথে সাথে অন্য সদস্যরা মাঠে রক্ষিত নির্দিষ্ট স্থানে অস্ত্র জমা রাখবেন।

সংবাদ

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

যেকোন সুস্থ মানুষই পার্বত্য চুক্তিকে সমর্থন জানাবে

—আনোয়ার হোসেন

মাহবুব রহমান ৯ রংপুর, ১৩ই ফেব্রুয়ারি।— জাতীয় পার্টির মহাসচিব এবং সড়ক ও যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেছেন, বর্তমান সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধাবস্থা নিরসনে শান্তি বাহিনীর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছে তা আমিসহ পৃথিবীর যেকোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ সমর্থন দেবে।

আজ রংপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের অতিথিশালায় তিনি সংবাদ-এর সাথে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন। আগামীকাল তিনি পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে করতোয়া নদীর উপর চীন-বাংলাদেশ পঞ্চম মৈত্রী সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাওয়া প্রাক্কালে রংপুরে অবস্থান করছেন। এ সেতু আগামীকাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি চাই; শান্তিপূর্ণ অবস্থার পক্ষপাতি। তাই সরকার শান্তি বাহিনীর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছেন তা 'শান্তি চুক্তি' কিনা সেটি বিষয় নয়, এই যুদ্ধাবস্থা অবসানের যে উদ্যোগ তা নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী মহৎ উদ্যোগ।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি সাংসদ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ শান্তি চুক্তির যে বিরোধিতা করে বক্তব্য দিচ্ছেন এ সম্পর্কে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি শান্তির পক্ষে এই উদ্যোগ সমর্থন করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, '৮৯ সালে এই শান্তি বাহিনীর সাথে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মনমানসিকতা, চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন জাতীয় পার্টি সরকার একটি আইন প্রণয়ন করেছিল। যে আইনের আওতায় পাহাড়ি অঞ্চল তথা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান— এই তিনটি এলাকার অধিবাসীদের জন্য সংবিধান ও সার্বভৌমত্বের আওতায় এ অঞ্চলের মানুষের জন্য কতগুলো বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল।

সংবাদ

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর দ্বিতীয় গ্রুপের

অস্ত্র জমাদান কর্মসূচি চূড়ান্ত

সুনীল কান্তি দে ও মোঃ জহুরুল ইসলাম ৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র নেতা-কর্মীদের ২য় পর্যায়ের অস্ত্র জমাদানের সার্বিক প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

কাল ১৬ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে সব অস্ত্র জমা নেয়ার পর সকাল ১১টা থেকে অস্ত্র জমাদানের আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু করা হবে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে। গতকাল বাঘাইছড়িতে উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ২ উর্ধ্বতন নেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাঘাইছড়িতে অবস্থানরত টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এমপি জানান, ১৬ই ফেব্রুয়ারি যারা অস্ত্র জমা দেবেন, জনসংহতি সমিতির সেই ৪শ'৫৫ জন নেতা-কর্মী বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের খুবই কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিয়েছেন।

এদিনই সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে তাদের অস্ত্র জমা নিয়ে গোলাগুলি পৃথকীকরণের কাজ শেষ করা হবে। সকাল ১১টায় আনুষ্ঠানিক অস্ত্র জমাদানের পর্ব শুরু করা হবে। সকল অস্ত্র দীপংকর তালুকদার সরাসরি গ্রহণ করবেন এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুষ্ঠানস্থলে অস্ত্রগুলো নিয়ে যাবেন।

যে বৈঠক এই কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়েছে তাতে টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এমপি ছাড়াও জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরা চাকমা এবং বাঘাইছড়িতে অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপের এই ৪শ' ৫৫ জনের দলনেতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে একটি অস্ত্র তুলে দেবেন। বাকিরা সকলেই নিরস্ত্র অবস্থায় অনুষ্ঠানস্থলে সাজানো আসনে থাকবেন। জমা দেয়া অস্ত্রশস্ত্র অনুষ্ঠানস্থলে এনে সাজিয়ে রাখা হবে।

সংবাদ

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বাঘাইছড়িতে দ্বিতীয় দফা অস্ত্রসমর্পণ আজ

বাঘাইছড়ি থেকে সুনীল কান্তি দে: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপ শান্তি বাহিনীর অস্ত্র জমাদানের ২য় পর্বের অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাজ্যমাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানা এলাকা এখন উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। আজকের অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর ৫৪২ জন নেতা-কর্মী অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন।

বাঘাইছড়ি থানা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এলাকা নতুন সাজে সেজেছে। এ বিদ্যালয়ের মাঠে আজকের আনুষ্ঠানিক অস্ত্র জমাদানের সকল প্রস্তুতি গতকাল সন্ধ্যার আগেই শেষ করা হয়েছে।

অন্যদিকে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন। সেখানে এখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের মেলা বসেছে। আজ সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যেই শান্তি বাহিনীর সদস্যরা সারিবদ্ধভাবে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব প্রান্তের গেটে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানাবেন উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য বীর বাহাদুর এমপি। সাথে থাকবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরা লাল চাকমা ও বিশ্বজিত চাকমা। এখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি বাহিনী সদস্যদের সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হবে। এরপর সকাল ৮টা থেকে দীপংকর তালুকদার এমপি ও বীর বাহাদুর এমপি ক্রমান্বয়ে অস্ত্রগুলো গ্রহণ করবেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তা পরীক্ষা করে সরাসরি অনুষ্ঠানস্থলের র্যাকে নিয়ে রাখবেন। এ কাজ শেষ হবে সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে। সকাল ১১টায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছানোর পর আজকের অস্ত্র জমাদানকারীদের নেতা মেজর পেলে নিজে এগিয়ে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র তুলে দেবেন প্রধান অতিথির হাতে।

আজকের অনুষ্ঠানে জনসংহতি সমিতির নেতাদের সাথে আলোচনাক্রমে শেষের দিকে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরার সাথে আলোচনাক্রমে অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা বাদ দেয়া হয়েছে। একই সাথে প্রধান অতিথির ভাষণও বাদ দেয়া হতে পারে শেষ পর্যন্ত। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আজকের অনুষ্ঠানে যে ৫৪২ জন অস্ত্র জমা দেবেন তাদের বেশিরভাগই শান্তি বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি দক্ষিণাঞ্চলের 'ডি' কমান্ড গোষ্ঠীর নেতা-কর্মী। আজকের অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বীর বিক্রম, বিডিআর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবু কায়সার ফজলুর কবির, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত থাকতে পারেন।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রথম দফায় খাগড়াছড়িতে ৭৩৯ জন এবং আজ বাঘাইছড়িতে ২য় দফায় ৫৪২ জন অস্ত্র জমা দিলে বাকি ৬৪৬ জন শান্তি বাহিনী নেতা-কর্মী আগামী ২২ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা থানার বরাদম উচ্চ বিদ্যালয় ও পানছড়ি থানার দুদকছড়িতে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। অবসান ঘটবে দু'দশকের গেরিলা জীবনের।

সংবাদ
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
দ্বিতীয় দফা অস্ত্রসমর্পণ
শান্তি বাহিনীর ৫৪২ জন জমা দিয়েছে
আড়াইশ' অস্ত্র ৪০ হাজার গোলাবারুদ

সুনীল কান্তি দে ও মোহাম্মদ জহুরুল আলম, বাঘাইছড়ি থেকে ৪ গতকাল দ্বিতীয় দফায় শান্তি বাহিনীর ৫শ' ৪২ জন সদস্য ২শ' ৪২টি অস্ত্র ও প্রায় ৪০ হাজার গোলাবারুদ সমর্পণ করেছেন। রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠিত হয়। শান্তি বাহিনীর 'বি' কমান্ড পোস্টের কমান্ডার মেজর তাতেন্দ্রলাল চাকমা পেলেন তার পিস্তল প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলামের হাতে তুলে দিয়ে অস্ত্রসমর্পণের দ্বিতীয় দফার সূচনা করেন। অস্ত্রটি গ্রহণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর পেলের হাতে তুলে দেন এক গুচ্ছ সাদা গোলাপ। শান্তিচুক্তির ধারা অনুসারে এ অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গতকাল বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছিল হাজারো মানুষের ঢল। সকাল সাড়ে ৭টার আগেই জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীরা বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বপার্শ্বের গেটে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। তাদের স্বাগত জানান টাঙ্গফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এমপি ও বীর বাহাদুর এমপি। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় অস্ত্র জমা নেয়া। গতকাল দুই সাংসদ ছাড়াও চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবশীষ রায় অস্ত্র জমা নেন। জমা নেয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ পৃথক করেন। এ সময়ে সেখানে জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা, যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরা লাল চাকমা ও বিশ্বজিত চাকমা, সেচ্ছাসেবক দলের শক্তিপদ ত্রিপুরা ও আশীষ চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে জনসংহতি সমিতির অস্ত্র জমাদানকারী নেতা-কর্মীরা অনুষ্ঠানস্থলে তাদের জন্য নির্ধারিত আসন গ্রহণ করেন। বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ও চতুষ্পার্শ্বের এলাকায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এক পর্যায়ে দর্শকদের প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে বিদ্যালয়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের বেড়া ভেঙে যায়। পুলিশ এতে বাধা দিতে গেলে জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে দু'জন পুলিশ ও দু'জন ছাত্র আহত হয়। শেষ পর্যন্ত ১১টা ২০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমা দিয়ে জনসংহতি সমিতির অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মেজর পেল, মেজর স্বজন, মেজর মদন, মেজর

অস্টিন, সুজিত, রুবেল, সৌরভ, নিপ্লন, বাতায়ন, প্লাবন, কেতু রয়েছেন। গতকাল জমা পড়েছে উল্লেখযোগ্য প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র। মোট অস্ত্রের সংখ্যা হচ্ছে ২শ' ৪১টি। এর মধ্যে চাইনিজ এলএমজি ৬টি, বৃটিশ এলএমজি ৬টি, এসএমজি ৯টি, চীনা রাইফেল ১৩টি, থ্রি নট থ্রি ১৯টি, জিথ্রি ৩২টি, এসএমসি ৪টি, মর্টার ১টি, রিভলবার ৮টি, বন্দুক ১০টি ও টুটুবোর রাইফেল ৭টি এবং গোলাবারুদ ৪০ হাজারের মতো। সকাল ১১টার দিকে এসমস্ত জমাকৃত অস্ত্রশস্ত্র বাঘাইছড়ি স্কুলে আনা হয়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্ধাস্ত বিষয়ক টাঙ্গফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এমপি ছাড়াও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান খোয়াই চন্দ্র মাস্টার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য বীর বাহাদুর এমপি, স্বরাষ্ট্র সচিব শফিউর রহমান, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ রাইফেলস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবু কায়সার ফজলুর কবির, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জানিবুল হক, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক মোবাইদুল ইসলাম, ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেডের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আজম জহিরুল আলম, ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেডের নবাগত কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাইফুল আলী, সেক্টর কমান্ডার বিডিআর রাঙ্গামাটি কর্নেল মোঃ মাহমুদুল হক, রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক শাহ আলম, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক একেএম জাফরুল হোসেন, চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবশীষ রায়। এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'শান্তির সন্ধানে' শীর্ষক ফেস্টুন অবমুক্ত করেন। এ সময়ে দর্শক, অতিথি ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতি নেতা-কর্মীদের করতালিতে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এলাকাটি উৎসবের এলাকায় পরিণত হয়। মধ্যে উপবিষ্ট জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরাকে এসময় খুবই উৎফুল্ল দেখা যায়।

জনসংহতি সমিতির যে ৫৪২ জন নেতা-কর্মী গতকাল অস্ত্র জমা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৪২১ জন আজ তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাবেন। তন্মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলার ১৫৬ জন, রাঙ্গামাটি জেলার ২৬১ জন এবং বান্দরবানের ১৪ জন রয়েছেন।

সংবাদ

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি চুক্তি হাসিনাকে অভিনন্দন জানালেন ক্রিনটন

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্রিনটন পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ওয়াশিংটন থেকে প্রাপ্ত বার্তায় এ খবর জানা গেছে। খবর বাসস'র।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় ক্রিনটন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি আমি গভীর আগ্রহের সাথে জেনেছি। দীর্ঘমেয়াদি ও দুর্ভাগ্যজনক এ সংঘাতের সমাপ্তি ঘটনায় আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণের কথা উল্লেখ করে ক্রিনটন বলেন, বাংলাদেশে সফরের বিষয়টি তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। শেখ হাসিনার ছেলে জয় যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করায় ক্রিনটন তাকেও অভিনন্দন জানান।

সংবাদ

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তি : প্রধানমন্ত্রীর জন্য

সংসদে ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপিত

(সংসদ বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। এই প্রস্তাবের উপর সংসদে একদিনের আলোচনা হবে।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে এই ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংসদে সরকারদলীয় উপনেতা জিল্লুর রহমান। এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ৩০০ বিধি অনুযায়ী এক বক্তব্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন।

সংবাদ

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর আরো সাড়ে ৪শ' সদস্যের অস্ত্রসমর্পণ

বরাদ্দম থেকে ফিরে সুনীল কান্তি দে/মোঃ জহুরুল আলম: তৃতীয় পর্যায়ে গতকাল জনসংহতি সমিতির আরো ৪শ' ৪৩ জন নেতা-কর্মী দীঘিনালায় ১শ' ১০টি অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর হাতে অস্ত্র জমাদানকারীদের ডেপুটি লিডার চতুর্পময় খীসা (মেজর ক্রেতার) একটি একে-৪৭ রাইফেল তুলে দিয়ে এ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বিনিময়ে চিফ হুইপ মেজর ক্রেতারের হাতে উঠিয়ে দেন একগুচ্ছ সাদা গোলাপ। চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ের অস্ত্র জমা দেয়া হবে ৫ই মার্চ।

গতকাল খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা থানার বরাদ্দম হাইস্কুল মাঠ সংলগ্ন পুকুরপাড় ও বিলে সকাল ১১টার আগেই জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীরা সারিবদ্ধভাবে এসে আসন গ্রহণ করেন। তার আগে তারা সকলেই দণ্ডবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তান্তর করেন সকালবেলায়। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলো পৃথক করে রাখেন।

বরাদ্দমের অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে দণ্ডবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ, উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক টার্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান ও বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান হোয়াইচ প্রু মাস্টার, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান, ২৮ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবু কায়সার ফজলুল কবীর, স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব কাজী গোলাম রহমান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জানিবুল হক, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ির রিজিওনাল কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক একেএম জাফরুল হোসেন, পুলিশ সুপার লুৎফর রহমান ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিতি ছিলেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষে উপস্থিতি ছিলেন উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরার পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির সম্পাদক মেজর তাপস ও অন্যতম নেতা মেজর বিভাস।

গতকাল যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ৬.৬২ এমএম রাইফেল ২টি, থ্রিনট্রি রাইফেল ৩১টি, এসএলআর ১০টি, ১২ বোর ডিবিবি ১৮টি, ৯ এমএম এসএমজি ৮টি, ২২ বোর এসএমজি ৯টি, ৭.৬২ এমএম রিভলবার ২৫টি ও স্পেয়ার ব্যারেল ৩৬টি। গোলাবারুদের মধ্যে থ্রিনট্রির গুলি ১৮ হাজার ২শ' ২১টি, ৯ এমএম এসএমজির গুলি ৩৫ হাজার ২শ'টি, ৭.৬২ রাইফেলের গুলি ৭৪,৭১৮টি, সেফটি ফিউজ ৫০ কয়েল, প্লাস্টিক বিফ ৬৮ কেজি, ডেটোনেটর ২টি, এমএসজি বিস্ফোরক ২০

কেজি, গ্লেড ডেটোনেটর ৭৬টি, হাতবোমা ৪শ' ৯৬টি, ফাইবার রড ১২০ গজ এবং ডেটোনেটর ইলেক ৬৭০টি।

গত ১০, ১৬ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম, বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও বরাদমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৭২৫ জন নেতা-কর্মী অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলেন।

পরবর্তী অস্ত্র জমাদান ৫ই মার্চ

জনসংহতি সমিতির বাকি নেতা-কর্মীদের পরবর্তী অর্থাৎ সর্বশেষ অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে না। জনসংহতি সমিতির ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার এক চিঠিতে অনিবার্য কারণ দেখিয়ে এই তারিখ পরিবর্তনের কথা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ২৮শে ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে আগামী ৫ই মার্চ জনসংহতি সমিতির বাকি নেতা-কর্মীরা দুদকছড়িতে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন।

সংবাদ

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শেষ দফা অস্ত্রসমর্পণ তারিখ পরিবর্তনের প্রস্তাব

খাগড়াছড়ি, ২২শে ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—জনসংহতি সমিতি ২৮শে ফেব্রুয়ারি তাদের সশস্ত্র সদস্যদের শেষ দফা অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানটি আগামী ৫ই মার্চ করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

জনসংহতি সমিতি এক চিঠিতে যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে শেষ দফা অস্ত্রসমর্পণ করার তারিখ আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৫ই মার্চ করার প্রস্তাব পাঠায়। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বস চাকমা আজই এ চিঠি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সংবাদ

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

উপজাতীয় শরণার্থীদের শেষ দল আজ ফিরছে

সুনীল কান্তি দে/মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে: ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের পাহাড়ি শরণার্থীদের সবশেষ দলটি আজ তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে আসবেন। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে শেষদিনে ৩৩টি পরিবারের ১শ' ৯৮ জন শরণার্থীর দেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে শেষ হবে দীর্ঘ ১২ বছরের শরণার্থী সমস্যার।

বর্তমান সরকারের সময় শরণার্থী প্রত্যাবর্তন শুরু হয় গত বছরের ২৮শে মার্চ। সে সময় একনাগাড়ে ১০ দিনের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় ১ হাজার ৪শ' ১৬টি পরিবারের ৭ হাজার ৩শ' ৪ জন শরণার্থী দেশে ফেরেন। এরপর নভেম্বর মাসে দুই পর্যায়ে ২ হাজার ৫শ' ৫২টি পরিবারের ১৩ হাজার ২৭ জন এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ পর্যায়ে বাকি সকলেই ফিরে আসছেন।

সীমান্তের অপর প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ভারতীয় সীমান্ত এলাকা শিলাছড়িতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের বিদায় জানাতে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার মুখ্যসচিবসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। জানা গেছে, নির্বাচনের কারণে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলার প্রশাসন বড় ধরনের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারছে না। বাংলাদেশ এদিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে।

তবলছড়ি সীমান্ত এলাকায় শরণার্থী প্রত্যাবর্তন স্থানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংবর্ধনা সভায় বিশেষ অতিথি থাকবেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর এমপি এবং খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান।

১৯৮১ এবং '৮৬ থেকে '৮৯ সাল পর্যন্ত সময়ে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তৎকালীন অশান্ত পরিবেশের কারণে বিভিন্ন সময়ে মোট ১২ হাজার ১শ' ৯৪টি পরিবারের ৫৩ হাজার ৪শ' ৭ জন পাহাড়ি শরণার্থী ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন।

সংবাদ

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দেশে ফিরে সাক্ষাৎকারে উপেন্দ্র লাল চাকমা

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে যেন বিলম্ব না ঘটে

সুনীল কান্তি দে ॥ জুম্ম শরণার্থী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা দেশে ফিরেই বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যে উদ্যোগ নিয়েছে তার মাধ্যমে পার্বত্যবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

গতকাল সকালে মাটিরাঙার তবলছড়ি এলাকায় উপজাতীয় শরণার্থীদের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানস্থলে ‘সংবাদ’-এর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

সংবাদ: দীর্ঘদিন পর নিজ দেশে ফিরে এসে আপনার কেমন লাগছে?

উপেন: মাতৃভূমিতে ফেরার মধ্যে যে গৌরবময় আনন্দ অনুভূত হওয়া দরকার সেরকমই লাগছে। তবে আমি বেশি আনন্দিত এজন্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগের প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসতে পেরে।

সংবাদ: পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত শান্তি চুক্তিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উপেন: দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় ধরে শরণার্থী হিসেবে বিদেশে অবস্থানের পর দেশে ফেরার মাধ্যমেই এ প্রশ্নের জবাব মিলবে।

সংবাদ: উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে সরকার যে ২০ দফা প্যাকেজ প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছে তা বাস্তবায়ন সম্পর্কে আপনি কতটা আশাবাদী?

উপেন: আমি মনে করি সরকার ও অপর পক্ষ এ ব্যাপারে আন্তরিকতার প্রমাণ রেখে আসছে।

সংবাদ: সকলকে সাথে নিয়ে তো ফিরে এলেন। এখন আপনার মূল কাজ কি হবে, কিভাবে সব নতুন করে শুরু করবেন?

উপেন: একথা সকলেই জানে যে, পার্বত্য অঞ্চলের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে প্রায় ৬০ হাজার জুমকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে মানবতর জীবন কাটাতে হয়েছে। এই অসহায় ও নিরীহ উপজাতীয়দের অভাব-অভিযোগ এবং দুঃখ-কষ্টের লাঘব ঘটতেই আমরা জুম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি গঠন করেছিলাম। যখন অন্য দেশে আশ্রিত ছিলাম তখন চেষ্টা করেছি জুম শরণার্থীদের পক্ষে কথা বলার জন্য। এখন নিজ দেশে ফিরে এসেও তাদের জন্যই কাজ করে যাব। আমি আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যাগত জুম শরণার্থীদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে, তাদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সংবাদ: পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে ভবিষ্যতে আপনার ভূমিকা কি হবে?

উপেন: একথা সবাই জানে যে, আমি গণতান্ত্রিক পথেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে বিশ্বাস করেই কাজ করেছিলাম। কিন্তু সে ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমাকে শরণার্থী জীবন বেছে নিতে হয়েছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে যখন আবারো গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে এসেছে তখন অবশ্যই গঠনমূলক ভূমিকা রাখব। এক্ষেত্রে আমার প্রথম

দাবিই হবে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে যেন বিলম্ব না ঘটে। জম্ম জনসাধারণের মধ্যে যারা ভূমি হারিয়েছে তাদের সেই অধিকার খুবই দ্রুততার সাথে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সংবাদ: উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আপনি সবসময়েই বলতেন, আমাদের ফেরত আসার জন্য যে নিরাপত্তা প্রয়োজন তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। এখন কি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে মনে করেন?

উপেন: আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের আগের অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে। এজন্যই জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার লক্ষ্যে অস্ত্র জমা দিয়ে চলেছেন। বলতে গেলে পার্বত্য সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান বেশি দূরে নয়। তাই এ যুগসন্ধিক্ষণে এখানকার নিরাপত্তা নিশ্চিতই বলা চলে।

সংবাদ

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

এক যুগের উদ্বাস্ত জীবনের

অবসানঃ ওরা সবাই ফিরেছেন নিজ বাসভূমে

সুনীল কান্তি দে/মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে : অবশেষে সকল পাহাড়ি শরণার্থী ফিরে এলেন নিজ বাসভূমে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবির থেকে সর্বশেষ ৩৩ পরিবারের ১শ’ ৯৯ জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল শুক্রবার দেশে ফিরে আসেন বর্ষীয়ান পাহাড়ি নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা। তাদের ফিরে আসার মাধ্যমে শেষ হলো ১২ বছরের শরণার্থী সমস্যা। ত্রিপুরায় অবস্থানরত ৬৪ হাজার ৪শ’ ৪৩ জন শরণার্থীর সবাই দেশে ফিরে এলেন।

গতকাল সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে তবলছড়িতে ফেনী নদীর উপর নির্মিত কাঠের সেতু দিয়ে পায়ে হেঁটে প্রথম স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন বর্ষীয়ান নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা এবং তার স্ত্রী যুগতারা। উপেন্দ্র লাল চাকমা দেশের মাটিতে পৌঁছেই মাটি ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়ে বলেন, আমি আজ খুবই আনন্দিত। যা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। গায়ে সাফারি ও মাথায় ক্যাপ পরা হাস্যোজ্জ্বল নেতাকে সেতুর মাঝে এলে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার। এ সময় বাংলাদেশ-ভারতের অপেক্ষমাণ হাজার হাজার মানুষ করতালি দিয়ে তাদের সম্ভাষণ জানান। উপেন্দ্র লালের সঙ্গে অপর দুই শরণার্থী নেতা অজিত বরণ চাকমা ও রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরাও দেশে ফিরে আসেন।

ত্রিপুরার জ্বালানি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মজুমদার, মুখ্য সচিব সুধীর শর্মা, দক্ষিণ ত্রিপুরার ডিএম লোকরঞ্জন এপারের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ফেনী নদীর সীমান্ত ঘাটে সর্বশেষ দলটিকে অভ্যর্থনা জানান সাংসদ বীর বাহাদুর, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্সের মহাপরিচালক মোবাইদুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, জেলা প্রশাসক এ, কে, এম জাফরুল হোসেন, বিডিআর-এর সেক্টর কমান্ডার, স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য রণবিক্রম ত্রিপুরা, উলাফ্রা চৌধুরী, মোহাম্মদ জাহেদুল আলম। সকাল সোয়া এগারটায় তবলছড়ি পুরাতন হাই স্কুল মাঠে এক বিশাল সংবর্ধনা সমাবেশে উপেন্দ্র লাল চাকমা বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য অঞ্চলে যে শান্তির বাতাবরণ শুরু হয়েছে, তারই ডাকে আজ আমরা ফিরে এসেছি। বর্ষীয়ান নেতা দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের অতীতের ভারাক্রান্ত করুণ ইতিহাস আমরা ভুলে যেতে চাই। শান্তির বাতাবরণের মধ্য দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ সুখী সমৃদ্ধশালী একটি দেশ গড়তে চাই। সংবর্ধনা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন। উপেন্দ্র লাল চাকমা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজ পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিচুক্তি সম্পাদন হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে রক্তপাত, হানাহানি, সংঘাত চিরতরে বন্ধ হয়েছে। তিনি ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে বলেন, ভারত আমাদের অত্যন্ত আন্তরিক ও হৃদয়তা দিয়ে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় খাদ্য, বাসস্থান ভরণপোষণ দিয়ে বাঁচিয়েছে। আজ বিদায় মুহূর্তে এসব কথা খুব মনে পড়ছে। আমরা ভারত সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সংবর্ধনা সমাবেশে প্রধান বক্তৃতায় মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন— বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোনদের আশ্রয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ সর্বশেষ দলটির দেশে ফেরার মধ্য দিয়ে শরণার্থী জীবনের অবসান ঘটবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়া ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মজুমদার তার বক্তৃতায় বলেন, ১৯৭১ সালেও আমরা এ দেশের জনগণের সুখ দুঃখে ছিলাম। তাই প্রতিবেশী দেশের মানুষ যখনই আমাদের কাছে ছুটে এসেছে, আমরা যা পারি সাধ্যমতো তাদের দিয়েছি। তবে একটি মানুষের ভরণপোষণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমরা তা (শরণার্থীদের) দিতে পারিনি।

সমাবেশে টাঙ্ক ফোর্স চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার বলেন, বর্তমান সরকার শরণার্থীদের আস্থা ও বিশ্বাসের উপর অটুট রেখেই প্রত্যাবাসন শুরু করেন। আমরা আজ সকলেই দুঃস্বপ্নময় অতীতকে ভুলে যেতে চাই।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, বীর বাহাদুর এমপি, জেলা প্রশাসক এ,

কে, এম জাফরুল হোসেন, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যসচিব সুধীর শর্মা। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

সংবাদ

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

চট্টগ্রামে আলোচনা সভায় মন্তব্য

পার্বত্য শান্তিচুক্তি দেশের ইতিহাসে মাইলফলক
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঝোতা চুক্তি : সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা শীর্ষক একটি সেমিনারে আলোচনা করতে গিয়ে দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, রাজনীতি বিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীরা সদ্য সম্পাদিত চুক্তিকে দেশের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তবে তাদের মাঝে আবার অনেকে চুক্তিটি নিয়ে আরো ব্যাপক আলোচনা এবং কিছু বিষয় সংশোধনের উপর জোর দিয়েছেন। তারা বলেছেন, এ ব্যাপারে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হলেও দেশ-জাতির কল্যাণে তা করা যেতে পারে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল শুক্রবার নগরীর শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এই সেমিনারের আয়োজন করেন। সকাল সাড়ে ৯টায় সেমিনারের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঝোতা চুক্তির সাংবিধানিক পর্যালোচনা’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর মোঃ শাহ আলম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিচারপতি কেএম সোবহান, ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম ও ডঃ মিজানুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দিন। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া, প্রফেসর ফজলি হোসেন, প্রফেসর মুনির আহমদ চৌধুরী, জাকির হোসেন ও শামসুদ্দিন চৌধুরী।

দুপুরের অধিবেশনে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঝোতা চুক্তি : নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রফেসর মোঃ মাহবুব উল্লাহ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর হামিদা বানু, প্রফেসর আহমদ ফজলে হাসান চৌধুরী, আবুল মোমিন, প্রফেসর সিদ্দিক আহম্মদ চৌধুরী ও ডঃ প্রশান্ত ত্রিপুরা। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর অনুপম সেন।

বিকেলের অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঝোতা চুক্তি : রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পর্যালোচনা শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর জ্যোতি বিকাশ দত্ত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ, প্রফেসর এম বদিউল আলম, প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া, প্রফেসর মোঃ মোস্তফা চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোঃ ইব্রাহীম, প্রফেসর হরেন্দ্র কান্তি দে, প্রফেসর মঈনুল ইসলাম ও প্রফেসর মাহফুজুল হক চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মুহম্মদ সিকান্দর খান।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য আবদুল মান্নান বলেন, ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি দেশের জন্য গৌরবের বিষয়। আন্তর্জাতিকভাবে এই চুক্তি প্রশংসিত হয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, সীমান্তের ওপারে আমাদের নাগকিররা শরণার্থী হিসেবে থাকবে, এটা কারো কাম্য নয়। পার্বত্য এলাকায় শান্তি ফিরে আসলে দেশের অপরাপর এলাকায়ও শান্তি ফিরে আসবে। তিনি শান্তিচুক্তির বিষয়ে আইন হবার আগে উক্ত আলোচনাকে সমন্বয়যোগ্য চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হোক এটা আমরা চাই। বিচারপতি কেএম সোবহান বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সারা দেশে শান্তি বিরাজ করছে। এর বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে-অস্ত্রসমর্পণ। চুক্তিতে সংবিধানের বাইরে কোন কিছু করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম বলেন, আমরা পার্বত্য সমস্যাকে যে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত করছি তাই আমাদের ভুল ধারণা। পৃথিবীর অনেক দেশ যেখানে উপজাতীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ পায়নি সেদিক দিয়ে বাংলাদেশ ভাগ্যবান।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, আমার মতে এ আলোচনা নিরর্থক। আমি বিশ্বাস করি না এ আলোচনার পর চুক্তির কিছু পরিবর্তন হবে। এমনকি চুক্তিটি সংবিধানসম্মত নয়। শেষে বলেন, আমরাও শান্তি চাই। প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেন, এ চুক্তি শেষ পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় শান্তি স্থাপনের স্থায়ী সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোঃ ইব্রাহীম বলেন, গত ২০ বছর পার্বত্য এলাকায় শান্তি বাহিনী ভাল-মন্দ সব কাজই করেছে। কিন্তু তাদের প্রতি রুঢ় আচরণ করা হয়েছে। তিনি শান্তি বাহিনী, সরকার, পার্বত্য এলাকাসহ সর্বসাধারণের একমত হবার পক্ষে জোর দেন।

সংবাদ

১ মার্চ ১৯৯৮

রুশ এমপিদের অভিমত

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বিশ্বের জন্য মডেল

(কূটনৈতিক বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা সফররত রাশিয়ার সংসদীয় প্রতিনিধিদলের নেতা গাবদুল ওয়াহিদ জি, বাগাউদিনভ পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে বিশ্বের জন্য মডেল হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, এই চুক্তি দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য তিনি শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিশ্বে এ ধরনের প্রায় ১৫টি সমস্যা রয়েছে, কিন্তু শুধু পার্বত্য সমস্যাই কোন মধ্যস্থতাকারী ছাড়া সমাধান হয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণকে সরকারের বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের এই মডেলে চেকনিয়া সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। তবে মডেলটি নিয়ে রাশিয়ার সংসদে আলোচনা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গতকাল শনিবার রাশিয়ান ফেডারেশনের ঢাকাস্থ দূতাবাস কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। এ সময় সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য ইউরি পাভনিকভ, আজাদ কে, খামাভ এবং ঢাকাস্থ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ইভানভ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার চমৎকার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, ঢাকা-মস্কো, দ্বিপাক্ষীয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার ব্যাপারে আমরা দু'পক্ষই একমত। তিনি আরো বলেন, মস্কোতে প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশী নাগরিক অবস্থান করছে।

রাশিয়ান সংসদের ৩ সদস্যের এই প্রতিনিধিদল গত সোমবার সপ্তাহব্যাপী সফরে ঢাকা এসেছেন। সফরকালে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের স্পিকার হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদসহ মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আজ রোববার প্রতিনিধিদল দু'দিনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে যাবেন। সোমবার তারা স্বদেশের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন বলে জানান।

সংবাদ
৫ মার্চ ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর শেষ দল অস্ত্র জমা দেবে আজ

সুনীল কান্তি দে/ মোহাম্মদ জহুরুল আলম খাগড়াছড়ি থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের শেষ পর্বের অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান আজ দুদুকছড়ায় অনুষ্ঠিত হবে। শেষ দিনের এ অনুষ্ঠানে সমিতির সর্বশেষ ২শ' ২২ জন নেতা-কর্মী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের হাতে একটি অস্ত্র দিয়ে আনুষ্ঠানিক অস্ত্র জমাদানের পর্বের সমাপ্তি টানবেন। চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

দুদুকছড়ায় এখন উৎসবের প্রস্তুতি। বিডিআর ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও জওয়ানরা অনুষ্ঠানস্থল সাজানোর কাজে ব্যস্ত। বাস, ট্রাক ও টাঁদের গাড়িতে করে উপজাতীয় নারী পুরুষরা দুদুকছড়া গ্রামে যাচ্ছেন।

আজ সকাল ১০টা থেকে দুদুকছড়ার অনুষ্ঠানস্থলে দণ্ডবাহিনী মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের জমা দেয়া অস্ত্র গ্রহণ করবেন।

সকাল ১১টার আগেই অনুষ্ঠানস্থলের খুবই কাছাকাছি হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারযোগে এসে পৌঁছবেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং চট্টগ্রামের মেয়র আলহাজ এবিএম মহিউদ্দীন আহমদ চৌধুরী। সাথে থাকবেন স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার।

সম্ভলারমার সমর্থনে মিছিল

গতকাল বিকেলে খাগড়াছড়ি সদর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্য-সদস্যারা সম্ভলারমার আগমনকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। গতকাল বিকেল ৩টায় রাঙ্গামাটি থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিরাট একটি দল বাসযোগে দুদুকছড়াতে এসে পৌঁছায়। আলাপ করে জানা গেছে আজকের অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তারা দুদুকছড়ায় এসেছেন।

সংবাদ
৬ মার্চ ১৯৯৮
জনসংহতি সমিতি হবে রাজনৈতিক দল
শান্তি বাহিনীর শেষ দলের অস্ত্রসমর্পণ

খাগড়াছড়ি থেকে সুনীল কান্তি দে/ মোঃ জহুরুল আলম ৥ শান্তি বাহিনীর সর্বশেষ দলের ২শ' ২২ জন নেতাকর্মী অস্ত্র জমা দিয়ে গতকাল থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। ৫৬টি অস্ত্র ও ৫১ হাজার ১শ' ৬৪টি গোলাবারুদ জমাদানকারী এ সমস্ত নেতাকর্মীর বেশির ভাগই সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি ও শান্তি বাহিনীর উর্ধ্বতন নেতা, দুদুকছড়ায় আয়োজিত অস্ত্র জমাদানের শেষ পর্বের অনুষ্ঠিত প্রধান অতিথি বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের হাতে জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা জগদীশ চাকমা একটি এসএমজি তুলে দিয়ে অস্ত্র জমাদানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।

জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির বেশির ভাগ নেতাই গতকাল স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। ১০ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভলারমা)সহ সমিতির উর্ধ্বতন নেতা গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, চন্দ্র শেখর চাকমা, গৌতম চাকমা (শিল্পী), অমিয় কান্তি দেওয়ান ছাড়াও শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদারের পাশাপাশি শান্তি বাহিনীর মহিলা নেত্রী মাধুরী লতা চাকমা ফিরেছেন গতকাল। এছাড়া ফিরেছেন গত দু'যুগের সংগ্রামময় জীবনে জড়িয়ে থাকা আরো অনেক নেতাকর্মী। এদের অনেককেই দেখা গেছে বয়সের ভারে নুজ। ফিরে আসাদের বেশির ভাগই গতকাল চলে গেছেন নিজ নিজ বাড়িঘরে। তবে পার্টির চেয়ারম্যান সম্ভলারমা ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় ২৪ জন নেতা গতকাল থেকে খাগড়াছড়ি থানা সদরেই অবস্থান নিয়েছেন।

গতকালের অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির নেতা ও চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, চট্টগ্রামের মেয়র এ. বি. এম মহিউদ্দীন চৌধুরী, উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিত্ত কিউ রোয়াজা, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান খোয়াইচ প্রু মাস্টার, পার্বত্য চট্টগ্রাম

বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য বীর বাহাদুর এমপি, স্বরাষ্ট্র সচিব বাকিউর রহমান, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, স্পেশাল এফেরার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবু কায়সার ফজলুল কবীর, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা, এবং খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার।

গতকাল লোগার ইউনিয়নের দুদুকছড়ায় ছিল উৎসবের আমেজ, বিডিআর ক্যাম্পের কাছাকাছি এই অনুষ্ঠানস্থলটি ছিল খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খুব সকাল থেকেই পাহাড়ী বাঙালি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অনুষ্ঠানস্থল ও তার পাশাপাশি এলাকাসমূহে অবস্থান নেন। জগদীশ চন্দ্র চাকমার নেতৃত্বে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠানস্থলে একে একে প্রবেশ করতে থাকেন সমিতির নেতাকর্মীরা এবং সন্ত্র লারমা আসেন ১১টার পরে।

আনুষ্ঠানিকভাবে অঞ্জ জমাদানের সর্বশেষ পর্যায় শেষ হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীরা সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলতে চাচ্ছেন না। জানা গেছে, আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যেই তারা এক সংবাদ সম্মেলনে দলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা দেবেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে জনসংহতি সমিতির একটি মুক্ত কংগ্রেস করার বিষয়েও নেতৃবৃন্দ চিন্তাভাবনা করছেন। গতকাল থেকে সমিতির উর্ধ্বতন নেতাদের বেশির ভাগই খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তবে সমিতির চেয়ারম্যান সন্ত্র লারমা কিছুদিনের মধ্যে খাগড়াছড়ি সদরে স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যানের জন্য নির্মিত বাংলোতে সপরিবারে অবস্থান নেবেন।

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা ওফাফুল হোসেন শানিক মিয়া

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তি
বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া গত মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল বাহির হয় এবং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়নগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদে সাংসদ শামীম ওসমানের নেতৃত্বে বাদ্য বাজনাসহ একটি আনন্দ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জমায়েত হন। এই স্থানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, সাংসদ শামীম ওসমান, আনিছুর রহমান দিপু, এডঃ আসাদুজ্জামান, এডঃ খোকন সাহা, আবু হাসনাত মোঃ শহীদ বাদল প্রমুখ। এছাড়া শান্তি চুক্তি সম্পাদন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আলহাজ বজলুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ বণিক সমিতির সভাপতি গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ, বি কে এম ই-এর সহ-সভাপতি এ কে এম সেলিম ওসমান, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ছামিউল্লাহ মিলন, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের আহ্বায়ক সাহাব উদ্দিন আহমদ, জেলা আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি এডঃ আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান দিপু, জেলা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তমিজ উদ্দিন রিজভী প্রমুখ।

বরিশাল অফিস ॥ শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সন্ধ্যায় যৌথভাবে টাফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর ছবি লইয়া মিছিল বাহির করে। মিছিল হইতে আতসবাজি পোড়ান হয়। পরে এক সমাবেশে মহিউদ্দিন আহমেদ, গোলাম আব্বাস চৌধুরী দুলাল, মীর আমিন উদ্দিন মোহন, তারিক বিন ইসলাম, জসীম উদ্দীন, বাদশা প্রমুখ বক্তৃতা দেন।

বরগুনা (দঃ) সংবাদদাতা জানান, সেখানে বাদ্যযন্ত্র সহকারে আওয়ামী লীগ আনন্দ মিছিল বাহির করে।

নরসিংদী সংবাদদাতা ॥ শান্তি চুক্তির প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও কৃষক লীগ যৌথভাবে শহরে আনন্দ মিছিল বাহির করে। মিছিল শহরের প্রধান সড়কগুলি প্রদক্ষিণ শেষে আওয়ামী লীগ অফিস প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া সমাপ্ত হয়।

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ শহরে একটি আনন্দ মিছিল বাহির হয়। পরে

দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সমাবেশে চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া বক্তব্য রাখেন জিল্লুর রহমান, জিন্নাতুল ইসলাম, সাহাদৎ হোসেন, শরীফ সাদী প্রমুখ।

কুমিল্লা সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তির স্বাক্ষরের খবরের সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শহরে আনন্দ মিছিল বাহির হয়। মিছিলে যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগসহ বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতা অংশগ্রহণ করে। মিছিল শেষে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফজল খান, সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ আবদুর রউফ, জেলা নেতা আ ফ ম বাহাউদ্দিন বাহার প্রমুখ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতা ॥ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ছাত্র লীগের উদ্যোগে শহরে একটি শান্তি মিছিল বাহির হয়। মিছিল শেষে ছাত্রনেতা এহসান উল্লাহ মাসুদের সভাপতিত্বে স্থানীয় পুরাতন কাচারি প্রাঙ্গণে এক শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আশরাফুল ইমাম রাজা, ফুলমিয়া, সিরাজুল ইসলাম ফেরদৌস, স্বপন রায় প্রমুখ।

টাঙ্গাইল সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানকল্পে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় টাঙ্গাইল শহর আওয়ামী লীগ স্থানীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এক আনন্দ সমাবেশের আয়োজন করে। সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মিজা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল, আকতারুজ্জামান খান ফিরোজ, শরীফ হাজারী, খোরশেদ আলম, এডভোকেট মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ।

ময়মনসিংহ (উত্তর) সংবাদদাতা ॥ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের খবর শুন্যর পর পরই ময়মনসিংহ শহর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্র লীগের এক বিশাল মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দলীয় কার্যালয়ে আসিয়া শেষ হয়। মিছিল গুরুর পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আহ্বায়ক এডভোকেট ওয়াজেদুল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগ নেতা শাহজাহান খান, মোশারফ হোসেন খান নিল, জেলা যুবলীগ সভাপতি ইউসুফ খান পাঠান, জেলা ছাত্র লীগ সভাপতি এ, বি, এম নূরুজ্জামান খোকন প্রমুখ।

রংপুর সংবাদদাতা ॥ রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগ শহরে আনন্দ মিছিল বাহির করে। মিছিলকারীরা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করিয়া পথসভার আয়োজন করে। বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আহমদ, দেলোয়ার তালুকদার, তুষার কান্তি মণ্ডল প্রমুখ।

বগুড়া অফিস ॥ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বগুড়া আনন্দ মিছিল বাহির হয়। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মমতাজ উদ্দিন-

এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলির যৌথ মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এক গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা ৥ গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ শহরে এক বিজয় মিছিল বাহির করে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণশেষে চৌরঙ্গীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মাহবুব আলী খান, শেখ মোঃ ইউছুফ আলী, জামিল সরোয়ার, হাফিজুর রহমান লিকু প্রমুখ।

নীলফামারী সংবাদদাতা ৥ জেলা সদরে বিরাট আনন্দ মিছিল ব্যাঙ পার্টিসহ শহর প্রদক্ষিণশেষে বাজার মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, মোস্তাফিজুর রহমান দুলাল ও মোহাম্মদ আলী বক্তৃতা করেন।

পঞ্চগড় সংবাদদাতা ৥ পঞ্চগড় শহরে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ যৌথভাবে আনন্দ মিছিল বাহির করে। আওয়ামী লীগ পঞ্চগড় জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ নূরুল ইসলাম জনসংহতি সমিতির সহিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় চুক্তিকে ইতিহাসের নজিরবিহীন ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি পূর্ণাঙ্গ না হইলেও

গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হইয়াছে

— বামফ্রন্ট

বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সভা বাম ফ্রন্টের সমন্বয়ক কমরেড বিমল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, হায়দার আকবর খান রনো, আ, ফ, ম, মাহবুবুল হক, আবদুল্লাহ সরকার, আঃ সালাম, বেলায়েত হোসেন শিকদার, রেজাউর রশীদ খান, মোর্শেদ আলী, দিলীপ বড়ুয়া, আঃ রউফ, মোস্তফা ফারুক, কামরুল আহসান প্রমুখ।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন যাবত তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। ফ্রন্ট দেশের সমস্ত সংখ্যালঘু জাতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রাখিয়া তাহাদের স্বকীয় জীবনধারণের ভিত্তিতে স্বশাসন এবং তাহাদের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানাইয়া আসিতেছে।

গত সোমবার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ওই চুক্তি ফ্রন্টের দাবী অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ না হইলেও সেই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলিয়া ফ্রন্ট মনে করে। এই চুক্তিতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার যতটুকু অধিকার অর্জিত হইয়াছে তাহার সুষ্ঠু ও আন্তরিক পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ফ্রন্ট সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানায়। — প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিএনপি'র প্রতি নাসিম

শান্তি চুক্তির বিরোধিতা না করিয়া

সংসদ অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নিল

মোড়ল নজরুল ইসলাম ৥ সংঘাত-সংঘর্ষের পরিবর্তে সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিটির অযৌক্তিক বিরোধিতা না করিয়া আগামী সংসদ অধিবেশনে শান্তি চুক্তি নিয়া আলোচনা করার জন্য বিএনপিসহ সকল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম। তিনি গতকাল (বুধবার) দৈনিক ইত্তেফাককে জানান, কয়েকদিন পূর্বে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শান্তি চুক্তি সংসদে উত্থাপনের দাবী জানাইয়াছিলেন। আগামী সংসদ অধিবেশনে যোগদান করিয়া নিশ্চয়ই বিরোধী দলীয় নেত্রী তাঁহার কথা রাখিবেন এবং শান্তি চুক্তির উপর তিনি ও তাহার দল-আলোচনায় অংশ নিবেন। চুক্তিতে তাহাদের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি থাকিলে তাহা খোলাখুলিভাবে সংসদে তুলিয়া ধরবেন। প্রয়োজনে আলোচনা সরাসরি রেডিও, টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হইবে। তিনি বলেন, বিএনপি যদি এবারও সংসদে না আসে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জনগণের প্রতি তাহাদের সামান্যতম দায়বদ্ধতা নাই। বিরোধী দল হিসাবে জনগণের যে প্রতিনিধিত্ব বিএনপি করিতেছে সেই অধিকারের প্রতিও অবিচার করা হইবে। মন্ত্রী আরও বলেন, ধর্মঘট, হরতাল, গাড়ী ভাংচুরের মত নেতিবাচক রাজনীতির মাধ্যমে কোন সমস্যা সমাধান হইবে না। বিএনপির যে কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত বিএনপির জন্য আত্মঘাতী হইবে। তিনি বিএনপি আহুত হরতালের সমালোচনা করেন।

টেলিযোগাযোগমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, আমাদের নেত্রী শান্তি চুক্তি সংসদে উত্থাপনের কথা বলিয়াছেন।

বিএনপি যতক্ষণ ইচ্ছা আলোচনা করিতে পারিবে। তিনি বলেন, আশা করি বিএনপি আগামী সংসদে ফিরিয়া আসিবে এবং শান্তি চুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করিবে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ইতিমধ্যেই বিএনপির দাবী অনুযায়ী স্টাডিং কমিটির সদস্য পদ দেওয়া হইয়াছে, কিছু কিছু মামলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি সংসদে আলোচনা হইতে যাইতেছে। তিনি বলেন, আশা করি বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিবেন কোনপ্রকার হঠকারী সিদ্ধান্তে তাহাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হইবে না। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তি সম্পাদনে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের মানুষের মধ্যে যে আনন্দ ও স্বতস্কৃততা দেখা দিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয় শান্তি চুক্তির প্রতিটি ধারাকে মানুষ সমর্থন করিয়াছে। জোর করিয়া আন্দোলন গড়িয়া তোলা যাইবে না।

মন্ত্রী বলেন, শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিয়া বিএনপির নেতৃবৃন্দ অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন, অনেক কাল্পনিক আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিএনপির সকল আশংকা মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখিয়াই ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। পাহাড়ী, বাঙ্গালী, উপজাতি, অ-উপজাতি সকলেই যাহার যাহার অবস্থানে পরিপূর্ণ অধিকার নিয়া বসবাস করিবে চুক্তিতে তাহা নিশ্চিত করা হইয়াছে। তিনি বলেন, কাহাকেও উচ্ছেদ ত দূরের কথা ১৫ পৃষ্ঠার শান্তি চুক্তি নামায় ‘উচ্ছেদ’ শব্দটিই ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া বলেন, এতদিন যে অঞ্চলটি ছিল ভীতিসন্ত্রাস ও অনিশ্চয়তার জনপদ তাহা হইতে যাইতেছে বাংলাদেশের সবচাইতে সম্ভাবনাময় জনপদ। শান্তি চুক্তি সম্পাদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করিয়া মন্ত্রী বলেন, অতীতের সরকারগুলি চেষ্টা সত্ত্বেও শান্তি চুক্তি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছার কারণে শান্তি চুক্তির মত দুরূহ কাজটি সম্পাদন হইয়াছে। সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রতিটি পার্বত্য জেলায় সেনাবাহিনীর জন্য স্থায়ী ক্যাম্প থাকিবে। শুধু অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলি পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হইবে। কারণ দীর্ঘদিন ধরিয়া দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীর সদস্যদের বন-জঙ্গলে থাকা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, বহু প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তিটি সংবিধানের আওতায় প্রকাশ্যে হইয়াছে। রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিটি বহুল প্রচারিত হইয়াছে। এই চুক্তির প্রতিটি ধারা, উপ-ধারা বিচার-বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা করার দায়িত্ব এখন দেশের প্রতিটি নাগরিকের। তিনি বলেন, আজ সারা বিশ্বে সমঝোতা ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা-সংকট নিরসনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। সংঘাত-সংঘর্ষের দিন চলিয়া গিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির সমর্থনে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ গতকাল (বুধবার) স্থানীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক শান্তি সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে ভাষণ দানকালে চট্টগ্রাম কর্পোরেশনের মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দীন চৌধুরী বলেন, এই চুক্তি সম্পাদনের ফলে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদের অবসান ঘটিয়াছে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের গণঅধিকার নিশ্চিত করার জন্যই আমরা দেশ স্বাধীন করিয়াছিলাম। তাই এই শান্তি চুক্তি মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই বিজয় বহিয়া আনিয়াছে।

মেয়র বলেন, যাহারা স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব এখনও মানিয়া নিতে পারে নাই, যাহারা দেশে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নতি চায় না তাহারা ই কেবল এই চুক্তি মানিতে পারিতেছে না।

চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবুল কালাম সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা শেষে একটি বিশাল শান্তি মিছিল শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

খাগড়াছড়িতে প্রতিক্রিয়া

সভা ও আনন্দ মিছিল

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে গতকাল (বুধবার) সন্ধ্যায় পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পার্টির নেতা শাহজাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বাঙালী নেতৃবৃন্দ এই চুক্তিতে বাঙালীদের মৌলিক অধিকার ভোটাধিকার খর্ব করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন।

সমাবেশস্থলে শান্তি চুক্তির একটি কপি অগ্নিসংযোগে পুড়াইয়া দেওয়া হয়। সমাবেশে বিএনপির সাবেক এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, জামায়াত নেতা আবদুল মোমেন, ছাত্রদল নেতা জয়নাল আবেদিন প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

এদিকে পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া পানছড়ি থানা সদরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এক আনন্দ মিছিল বাহির করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
বান্দরবানে উপজাতীয়রা
আনন্দ মিছিল

বান্দরবান সংবাদদাতা ৯ বান্দরবানে পাহাড়ী সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ বাদ্য-বাজনা নিয়ে আনন্দ মিছিল করে। সাথে সাথে শান্তিবাহিনীর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির সমর্থনে আনন্দ মিছিল বাহির করা হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ উইমেন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই শান্তি ও আনন্দ মিছিলে মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, খ্যাত, বম, লসাই, মুরং, চাকসহ বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বিশাল মিছিলটি জেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে বিভিন্ন প্রকারের ঢোল-বাদ্য-বাজনা শহরবাসীকে তাক লাগাইয়া দেয়। শত শত উপজাতীয়ের ব্যতিক্রমধর্মী এই আনন্দ মিছিল দেখার জন্য রাস্তার দুই পাশে বাঙ্গালীরা ভিড় জমায়। আনন্দ মিছিল শেষে বান্দরবান প্রেস ক্লাব চত্বরে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি মং চসিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জলিমং মারমা, নুমং প্রং, কে এস মং ও ইউকোচিং বীর বীক্রম।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৯ পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ হইতে কার্যক্রম শুরু হইয়াছে। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিশেষ কার্যাদি বিভাগ ও আইন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করিতেছে। বিশেষ কার্যাদি বিভাগকে উপজাতীয়বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পরিণত করার কাজ শুরু হইয়াছে। এদিকে তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন (রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) অনুষ্ঠানেরও কাজ চলিতেছে। সরকারী সূত্রে জানায়, আগামী মার্চ মাসে এ তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে সংশোধনী আনিতে হইবে। সংশোধনীগুলি নিয়া আইন মন্ত্রণালয় ও বিশেষ কার্যাদি বিভাগ কাজ করিতেছে। সংসদের আগামী অধিবেশনে এ সংশোধনীগুলি পাস করা হইবে। এ দিকে পার্বত্য এলাকার

উন্নয়নে কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য সরকার কাজ করিতেছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) এলক্ষ্যে দাতাদের সঙ্গে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে শান্তি বাহিনী শীঘ্রই অস্ত্র সমর্পণ করিবে। বিশেষ কার্যাদি বিভাগ ইতিমধ্যেই জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছে। তাহাদের সদস্যদের তালিকা গোলাবারুদের হিসাব দিতে বলিয়াছে। সূত্র মতে পার্বত্য খাগড়াছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান হইতে পারে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকিতে পারেন- খাগড়াছড়িতে ইতিমধ্যে বিরাট স্টেডিয়াম নির্মিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ স্টেডিয়াম উদ্বোধন করার কথা। স্টেডিয়াম উদ্বোধন ও অস্ত্র সমর্পণ একই দিনে হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সকলের
আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত
- ব্যারিস্টার ইশতিয়াক
শান্তিচুক্তি সংবিধান সম্মত
- ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম

মোড়ল নজরুল ইসলাম ৯ পার্বত্য জেলাসমূহের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে ওই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করিয়াছেন দেশের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ও সুপ্রীম কোর্ট বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। গতকাল (বৃহস্পতিবার) আইনজ্ঞদ্বয় শান্তি চুক্তি সম্পর্কে সৃষ্ট বিতর্ক প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বলিয়াছেন, এই চুক্তির সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলিয়াছেন, শান্তি চুক্তি সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের আওতায় সম্পাদিত হইয়াছে এবং আঞ্চলিক পরিষদ লইয়া যে প্রশ্ন তোলা হইতেছে তাহাও অযৌক্তিক। কারণ বিশেষ অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন ও তাহাদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পরিষদ গঠনের বিধান সংবিধানে রহিয়াছে।

গত মঙ্গলবার সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির সহিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বিএনপিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল চুক্তির বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে।

বিএনপি চুক্তির প্রতিবাদে আগামী রবিবারে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করিয়াছে।

শান্তি চুক্তির ব্যাপারে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও বিতর্ক সম্পর্কে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ইন্ডেকাককে বলেন, সাংবিধানিক প্রশ্নে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়া সমাধান করা হয় না, সম্ভবও নয়। তিনি বলেন, ইহা কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ না হওয়াই শ্রেয়। তিনি বলেন, সংবিধান ব্যাখ্যা করার অধিকার এবং এখতিয়ার কেবল সুপ্রীম কোর্টের। আর কাহারও নয়। এই তর্ক-বিতর্কের সুরাহা করিতে হইলে সেখানেই করা উচিত। আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলা হইলে তিনি বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন উঠিয়াছে সেগুলির সাংবিধানিক ব্যাখ্যা কেহ চাহিলে তাহারা সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে সমাধান পাইতে পারেন। তবে তিনি বলেন, ‘ডিভিশনাল কাউন্সিলের কনসেপ্ট’ আমাদের সংবিধানে রহিয়াছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদকে একটু মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে বেশী। ইহাকে পার্বত্য জেলা পরিষদ পদ্ধতির সংস্কারও বলা যাইতে পারে।

তিনি আরও বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিনের সংঘাত-সংঘর্ষের অবসান ঘটিতেছে এবং সবচাইতে বড় কথা এতদিন পরে ঐ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশে-বিদেশে মানবাধিকার লংঘনের যে ধিক্কারে আমরা ধিকৃত ছিলাম সেই অভিযোগ হইতে আমরা মুক্তি পাইয়াছি। তিনি বলেন, সম্পাদিত শান্তি চুক্তি কতখানি সফলকাম হইবে তাহা নির্ভর করিবে ভবিষ্যতে চুক্তি বাস্তবায়নের ভিতর দিয়া।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি সমঝোতার যে স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার কৃতিত্ব শুধু বর্তমান সরকারের নয়। তিনটি সরকারেরই কৃতিত্ব। তিনি বলেন, বিগত ১৯৮৫ সাল হইতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সরকারের আলোচনার ফলশ্রুতিতেই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তিনি বলেন, স্মারক এ কারণে বলা হইতেছে যে, সাংবিধানিক অর্থে যাহাকে চুক্তি বলি বা আন্তর্জাতিক আইনে যে ধরনের চুক্তির স্বীকৃতি রহিয়াছে ইহা সে ধরনের চুক্তি নয়। তিনি চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলেন, সমঝোতা দলিলটি কার্যকর করিতে পারিবে একমাত্র সংসদ এবং সংসদই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইহার খ ও গ বিষয়গুলি কার্যকর করিতে সক্ষম। তিনি বলেন, দলিলের খ অংশে বলা হইয়াছে, ১৯৮৯ সালের পার্বত্য এলাকার জেলা পরিষদ আইন কিভাবে পরিবর্তন করিয়া আরও গণতান্ত্রিক ভিত্তি দেওয়া যায় এবং স্থানীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণকে গণতান্ত্রিক ও

সমন্বয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করার একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সংবিধান সম্মত কিনা এ সম্পর্কে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, আমাদের সংবিধানে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির বিধান বলবৎ রহিয়াছে শুধু তাহাই নয়— রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে এসকল স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সংবিধানে। তিনি সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, এই অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, “রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন...”। তিনি আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে আরও বলেন, আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ সংযোজিত ধারায় সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার একটি রূপরেখা দেওয়া হইয়াছে। তিনি সংবিধানের উপরোক্ত অনুচ্ছেদ দুইটির উদ্ধৃতি দিয়া স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন, প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য, জনশৃংখলা রক্ষা এবং জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ছাড়াও সংসদ আইনের দ্বারা স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা প্রদানের বিধান করা হইয়াছে সংবিধানে। তিনি বলেন, সংবিধানের প্রতিস্থাপিত স্থানীয় শাসন কাঠামোর আলোকে প্রস্তাবিত যে একমত্যের ভিত্তিতে বর্তমানে প্রচলিত জেলা পরিষদকে গণতান্ত্রিকরণ এবং আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের যে পরিকল্পনা এই চুক্তির সমঝোতা স্মারকে স্থান পাইয়াছে তাহা সংবিধান বহির্ভূত নয় বরং সংবিধানের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেক্ষিত তাহার সহিত সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

সমঝোতা স্মারক চুক্তিতে বাঙালী, পাহাড়ীদের মধ্যে বৈষম্য রহিয়াছে কিনা এ প্রশ্নে তিনি বলেন, কেহ কেহ হয়ত এ প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, উপজাতীয়দের বিশেষ চাকুরী, ব্যবসা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান করা বা মন্ত্রী পরিষদের একজন মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহাতে বাঙালী-পাহাড়ীতে কোন বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে কিনা? এ ব্যাপারে তিনি বলেন, সংবিধানে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, অসাম্য বিলোপ করার জন্য একটি অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুযোগ দানের বিধান সংবিধানসম্মত। তিনি বলেন, একথা অনস্বীকার্য যে, পার্বত্য উপজাতীয়রা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নিগৃহীত বলিয়া তাহারা মনে করে। তাহাছাড়া ঐ অঞ্চলের অনগ্রসরতা সম্পর্কে কোন মতপার্থক্য নাই।

সংবিধানের ১৯, ২৩ এবং ২৮(৪) অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কি করণীয় হইবে তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তিনি বলেন, সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, “মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন”। তিনি সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, এই অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, “নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না”। তিনি বলেন, সংবিধানের উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে মোটেই অসুবিধা হইবার কথা নয় যে, উপজাতীয়দের শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা, এমনকি একজন মন্ত্রী নিয়োগের বিষয়টি সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অনুকূলে করা হইয়াছে।

সমঝোতা স্মারক চুক্তিতে সংসদের সার্বভৌমত্বকে খাট করা হইয়াছে কিনা এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যাহা কিছু করণীয় চুক্তির খ এবং গ ধারাকে কার্যকর করার জন্য সবকিছু সংসদে করা হইবে। তিনি বলেন, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের চীফ হুইপের সহিত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং সংসদীয় বিশেষ কমিটির মাধ্যমে আলোচনা ফলপ্রসূ হইয়াছে। সংসদীয় কমিটি সংসদের অংশ। এই চুক্তি প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতার ভিত্তিতে করা হয় নাই, তাই এ সমঝোতা সার্বভৌম সংসদের সহিত সম্পৃক্ত এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের ভূমিকা অপরিবর্তনীয়। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ব্রিটিশ আমলেও আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালনার জন্য “হিলট্রাস্টস রেগুলেশন ১৯০০” নামে একটি অ্যাক্ট তৈরী করা হয়। তিনি বলেন, ব্রিটিশ, পাকিস্তান আমলেও পার্বত্য এলাকাবাসীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ আইনেও সাবধানতার উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি বলেন, বিগত জেনারেল এরশাদ সরকারের আমলে প্রণীত ১৯৮৯ সালের আইনে ৭৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আরোপিত কোন আইন যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিবাসীদের জন্য কষ্টদায়ক হয় তাহা হইলে সে আইন পরিবর্তন করার জন্য জেলা পরিষদ আবেদন করিতে পারিবেন এবং সংসদ সে আবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তিনি বলেন, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কোন আইন পরিবর্তনের পূর্বে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা,

পরামর্শ করার কথা বলা হইয়াছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আলোচনা-পরামর্শের রীতি-নীতি গণতান্ত্রিক বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, সম্পাদিত শান্তি চুক্তি রাজনৈতিক জটিলতার বিতর্কের মধ্যে না আসিয়া মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নে সকলের প্রচেষ্টা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তির প্রতি সমর্থন

পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায়

দাতা গোষ্ঠীর সহায়তার আশ্বাস

শওকত হোসেন মাসুম ৥ ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নসহ চুক্তির অধীনে পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দাতাদের কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়া হইয়াছে। অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) দাতা দেশ ও সংস্থার প্রতিনিধিদের চুক্তির বিস্তারিত দিক ব্যাখ্যা করিয়া এই সহায়তা চাহিয়াছেন। দাতা প্রতিনিধিগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানাইয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। এজন্য দাতাগণ সরকারের নিকট হইতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব চাহিয়াছে। খুব শীঘ্রই দাতাদের সঙ্গে সরকারের আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

এনইসি সম্মেলন কক্ষে গতকাল দাতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), জাপান, যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল দাতা দেশ ও সংস্থার প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেয়। বৈঠকের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী স্বাক্ষরিত চুক্তির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, এই চুক্তি স্বাক্ষর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আরেকটি বড় সাফল্য। ইহার আগে পানি চুক্তি করিয়া সরকার সফলতা অর্জন করিয়াছিল।

তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার আশ্রয় চেষ্টা করিতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিনিয়োগের একটি সম্ভাবনাময় অঞ্চল হইলেও অশান্ত পরিবেশের কারণে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। একই কারণে দেশের সার্বিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে এই সকল সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া সরকার আশা করিতেছে। তিনি দাতাদের জানান, যে সকল বিরোধী দল শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিতেছে তাহাদের বক্তব্য সঠিক নয়। বরং সমগ্র দেশবাসী চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানাইয়াছে।

তিনি বলেন, অশান্ত পরিবেশের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে নাই। অনেকেই জায়গা-জমি হারাইয়াছে। অনেকে নিজ জায়গা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আশা করা হইতেছে তাহারা আবার ফেরত আসিবে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এ প্রসংগে তিনি বলিয়াছেন, এই ব্যাপারে যত বিলম্ব হইবে ততই সমস্যা বাড়িবে। বিলম্ব হইলে বিরোধিতাকারীরাও নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করিয়া পরিবেশকে অস্থিতিশীল করিয়া তুলিতে পারে। তিনি বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নের সার্বিক প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল। সুতরাং দ্রুততার সঙ্গে চুক্তি বাস্তবায়ন করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইবে।

সূত্র জানায়, এই পর্যায়ে অর্থমন্ত্রী ৩টি বিষয়ে দাতাদের সহায়তা কামনা করেন। যেমন, (ক) পুনর্বাসনের জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, চুক্তির ১৬-এর ‘ক’ ধারা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবারপ্রতি এককালীন ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে। সুতরাং বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের প্রয়োজন হইবে। অর্থমন্ত্রী দাতাদের কাছে নগদ আর্থিক সহায়তা কামনা করেন। (খ) সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গ্রামীণ বাজার ও গ্রামীণ সংযোগ সড়ক তৈরী করিতে হইবে। এ লক্ষ্যেও দাতাদের সহায়তা প্রয়োজন। (গ) পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। অর্থমন্ত্রী দাতাদের জানান, অশান্ত পরিবেশের কারণে এতদিন এই এলাকায় কোন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখন করিতে হইবে। অর্থমন্ত্রী এই ৩টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে এই ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে। অর্থমন্ত্রী এসময় আরও জানান, সকল ধরনের অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের ফলে সামরিক ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সাশ্রয় হইবে এবং এই অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে ব্যয় করা সম্ভব হইবে।

অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর কয়েকজন দাতা প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। তাঁহারা চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানাইয়া বক্তব্য রাখেন। দাতারা বলিয়াছেন, তাঁহারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারের অংশীদার হইতে আগ্রহী এবং সাহায্য প্রদানে সম্মত। তবে ইহার জন্য সম্পূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন। কোন কোন প্রকল্প ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে, কত রাস্তা-ঘাট তৈরী হইবে, কি পরিমাণ স্কুল ও হাসপাতালের প্রয়োজন হইবে তাহা বিস্তারিতভাবে সরকারের জানাইতে হইবে। অর্থমন্ত্রী ইহার জবাবে জানান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) শীঘ্রই বিস্তারিত দাতাদের জানাইবে।

সবশেষে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ইআরডি’র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

যুক্তরাষ্ট্র শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছে

নিউইয়র্ক হইতে মনজুরুল ইসলাম ৥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের শান্তি চুক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাগত জানাইয়াছে। গত বুধবার বিকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মিঃ জেমস পি রুবিন ‘বাংলাদেশ : এগ্রিমেন্ট টু এন্ড চিটাগাং হিল ট্রাস্ট কনফ্লিক্ট’ শিরোনামে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাইতেছে। আমি স্বীকার করি যে এই চুক্তির মেয়াদ, সম্পাদনের এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া লইয়া নানান মত রহিয়াছে। তথাপি আমরা আশা করি যে, উভয় পক্ষের সদিচ্ছার মধ্য দিয়া এই শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হইবে। ফলে গত দুই দশকে গড়িয়া উঠা দ্বন্দ্ব, যাহার ফলে অসংখ্য জীবন নষ্ট হইয়াছে সেই পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটিবে।

উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ পৃথিবীর কোন দেশে আন্তর্জাতিকভাবে কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটিলে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এই ধরনের বিবৃতি প্রদান করে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তির ব্যাপারে অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করা হয়। ইউএনবি জানায় : যুক্তরাষ্ট্র গতকাল (বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের সহিত সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছে। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র বলেন, এই চুক্তির শর্তাবলী, ইহার অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে বাংলাদেশে মতপার্থক্য আছে-ইহা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। তবে আমরা আশাবাদী যে, দুই দশকব্যাপী যে বিরোধের ফলে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে, তাহা অবসানের লক্ষ্যে এই শান্তি চুক্তি কার্যকর করা যাইতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সংশোধনীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

সংসদে পাস করাইতে হইবে

- এরশাদ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৥ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) ধানমন্ডি থানা জাতীয় পার্টির সম্মেলনে প্রধান অতিথির

ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে সংশোধনসহ সংসদে পাস করার দাবী জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমরা শান্তি প্রক্রিয়াকে স্বাগতঃ জানাই, কিন্তু বর্তমান শান্তি চুক্তিকে সমর্থন করি না। আমাদের বক্তব্য অনুসারে সংশোধনী গ্রহণ করিয়া সংসদে পাস করা হইলেই জাতীয় পার্টি এই চুক্তিকে সমর্থন জানাইবে।

রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন। দলের অতিরিক্ত মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জুর, প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ ও মাহবুবুল হক দোলন, ঢাকা মহানগর জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল ও সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এডভোকেট আবুল খায়ের মনি সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। ধানমন্ডি থানা শাখা জাতীয় পার্টির সভাপতি আমজাদ হোসেন মিয়া সভাপতিত্ব করেন।

এইচএম এরশাদ বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধান পরিপন্থী। সংবিধানে লিখিত আছে বাংলাদেশ একক ও অখণ্ড। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইলে এই একক অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আমাদের আমলে যে স্থানীয় সরকার আইন ছিল, উহাই ছিল সংবিধান সম্মত। আমরা সরকারের ক্ষমতা খর্ব করি নাই। কিন্তু এই চুক্তিতে সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অ-উপজাতীয় এবং চাকমা মারমা ছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট উপজাতীয়দের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানাইয়া তিনি বলেন, চুক্তিতে তাহাদের কথা নাই। তিনি ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক রয়্যালটি আদায়েরও বিরোধিতা করেন।

এরশাদ বলেন, বিএনপি কোন কারণ না দেখাইয়াই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিতেছেন। কারণ তাহাদের রাজনীতি হইতেছে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা। সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু বলিয়াও তাহারা সংসদে যান না। তাহারা যাহা বলেন, উহাতে বিশ্বাস করেন না। বিএনপির মত গাড়ী ভাঙ্গা ও হরতালের রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। জনজীবন বিপর্যস্ত না করিয়া আলোচনার মাধ্যমে আমরা দাবী আদায় করিতে চাই। আমরা আজও হরতাল, সন্ত্রাস চাই না— ইহাই জাতীয় পার্টির রাজনীতির আদর্শ। দলীয় কর্মীদের প্রতি পার্টিকে সুসংগঠিত করার শপথ গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, পার্টি শক্তিশালী না হইলে আমরা জনগণের কাছে পৌছাইতে পারিব না। জনগণের কল্যাণ, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন এবং বিশ্বে সম্মানিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জনগণের ম্যাণ্ডেট কামনা করেন।

আনোয়ার হোসেন জাতীয় পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার আহ্বান জানাইয়া বলেন, বিগত ৬ বছরে জাতীয় পার্টির উপর যে অত্যাচার নির্যাতন হইয়াছে, উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরা এমন ধারার রাজনীতির সূচনা করিতে চাই যেন সরকারের বিরোধিতা করিলেই কোন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন নামিয়া না আসে। তিনি বলেন, ৯০-এ আমাদের পদত্যাগের পর জনগণ একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় নাই। দেশবাসী চাহিয়াছিল, আমাদের চেয়ারম্যান যে উন্নয়নের রাজনীতির সূচনা করিয়াছিলেন, উহা অব্যাহত থাকুক। কিন্তু সেই প্রত্যাশাও পূরণ হয় নাই। দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অবস্থার পরিবর্তন চায়। দেশে রাজতন্ত্র কয়েম হোক, ইহা তাহারা চায় না। তাহারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের পরিবর্তন চায়। তিনি বলেন, ৯৬ সালে সংবিধান সংশোধন করিয়া জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা হইয়াছে। আমাদের আন্দোলনের ফসল হিসাবে অতঃপর কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না।

তিনি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, উহার নিরপেক্ষতা ও সুষ্ঠুতা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন ক্রমান্বয়ে দানা বাঁধিতে শুরু করিলে ভবিষ্যতে স্থানীয় নির্বাচন কিভাবে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করা যায় সে সম্পর্কেও জাতিকে চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে।

নাজিউর রহমান মঞ্জুর বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতীয় পার্টির বিকল্প কোন রাজনৈতিক দল এখনও সৃষ্টি হয় নাই। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কাটা রাইফেল ও পিস্তল ব্যবহৃত হইতেছে। অতীতে কোন সরকারের আমলে এমন দলীয়ভাবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয় নাই। কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, এ দেশের মানুষ আবার এরশাদকে ক্ষমতায় দেখিতে চায়। মাহবুবুল হক দোলন এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টিকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করার আহ্বান জানান। জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং মেয়র নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে জয়ী করার লক্ষ্যে পার্টিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। আবদুস সালাম বলেন, বহু অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও ধানমন্ডির জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা রাজপথ ছাড়ে নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭
দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল ও চুক্তির প্রতি অভিনন্দন জানানো অব্যাহত রহিয়াছে। খবর আমাদের সংবাদদাতাদের।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার রাতে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ, অঙ্গ-সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে শহরে বিরাট আনন্দ মিছিল হয়। মিছিলটি শহর প্রদক্ষিণের পর স্থানীয় রেল গেটে এক সমাবেশে বক্তারা এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এ্যাডভোকেট শহীদ উল্লাহ।

গত বুধবার জয়পুরহাট শহরে আনন্দ মিছিল এবং শহীদ মিনার চত্বরে সমাবেশের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানান হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও উহার অঙ্গ-সংগঠনগুলি যৌথভাবে এই মিছিল ও সমাবেশ করে।

গত বুধবার ফেনী জেলার সর্বত্র ছাত্রলীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির সমর্থনে এবং চুক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই যুগান্তকারী পদক্ষেপকে আপামর জনতা অভিনন্দিত ও সমর্থন জানাইয়াছে।

পার্বত্য সমস্যার ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে গত বুধবার ফেনী জেলা ছাত্রলীগ ফেনী শহরে এক শান্তি মিছিল বাহির করে। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া শহীদ মিনারে আসিয়া শেষ হয়।

গত বুধবার সন্ধ্যায় পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ ও উহার অঙ্গ সংগঠনসমূহের উদ্যোগে পার্বত্য শান্তি চুক্তির সমর্থনে এক বিরাট আনন্দ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলকারীরা শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া নানা শ্লোগান দেয়। আওয়ামী লীগের সভাপতি ওয়াজিউদ্দিন খান এমপি, সিনিয়র সহ-সভাপতি এম, সাইদুল হক চুন্নু ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউর রহিম এক যুক্ত বিবৃতিতে দীর্ঘ দিনের শান্তিকামী পাহাড়ী-বঙ্গালীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করায় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আনন্দে গত বুধবার গৌরনদীতে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিরাট মিছিল বাহির হয়। বিভিন্ন এলাকা হইতে হাজার হাজার লোক বাদ্যযন্ত্র সহকারে মিছিলে যোগদান করেন। তাঁহারা রং ছিটাইয়া উল্লাস প্রকাশ করেন। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রী ও চীফ হুইপের নামে শ্লোগান

দেন। শান্তি চুক্তির অন্যতম প্রণেতা চীফ হুইপ এ এলাকার সংসদ সদস্য এ কারণে মিছিলে ছিল আনন্দের বন্যা। পরে এক সমাবেশে পৌর প্রশাসক গোলাম সরোয়ার ফারুক, তালুকদার মোঃ ইউনুস, বলরাম পোদ্দার প্রমুখ বক্তৃতা দেন। জাতীয় পার্টি জেলা শাখা শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছে। এদিকে গত মঙ্গলবার এখানে জেলা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ আনন্দ মিছিল বাহির করে। মহিউদ্দিন আহমেদ, গোলাম আব্বাস চৌধুরী দুলাল, তারিক প্রমুখ বক্তৃতা দেন। কলাপাড়ায় গতকাল আনন্দ মিছিল বাহির করে আওয়ামী লীগ।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে অবশেষে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হইয়াছে। গত মঙ্গলবার ঢাকায় সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এখন প্রত্যাশা-প্রায় দুই দশকের সশস্ত্র সংঘাত, হানাহানি ও রক্তপাতে ক্ষতবিক্ষত পার্বত্য চট্টগ্রামে এবার শান্তির সুবাতাস বহিবে, পাহাড়ী-বঙ্গালী নির্বিশেষে উক্ত অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হইয়া বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইবে। উভয় জনগোষ্ঠী শান্তির সুযোগকে কাজে লাগাইয়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাহাদের পারিবারিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক অগ্রগতির পথে আগাইয়া যাইবে। দেশের বাকি অংশের জনগণও দীর্ঘদিনের একটি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বস্তিতে থাকিতে পারিবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতি মোটামুটি দুই দশকের পুরাতন হইলেও উহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় আরও অনেক পূর্বে পাকিস্তানী শাসনামলে। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার কর্তৃক চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকাকে চট্টগ্রাম জেলা হইতে পৃথক করিয়া ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম’ নামে নূতন একটি জেলা গঠন করিয়া প্রথম এই অঞ্চলের স্বাভাবিক স্বীকার করা হয়। অতঃপর ১৯০০ সালে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল’ আইন পাসের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সাহায্য করার লক্ষ্যে এলাকাটিকে ‘এক্সক্লুডেড জোন’ বা তৎকালীন প্রাদেশিক প্রশাসনের আওতা-বহির্ভূত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি অঞ্চলটিকে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেল নামক তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করিয়া তিন সার্কেলের শাসনভার তিনজন রাজার উপর অর্পণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্যানুয়াল

আরেকটি বিশেষ দিক হইতেছে এই এলাকার বাহিরের লোকদের পার্বত্যঞ্চলে জমি ক্রয় করা বা জমির মালিক হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়ালে প্রদত্ত রক্ষাকবচগুলির কারণেই ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ কয়েক দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেমন কোন অসন্তোষ ছিল না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই তৎকালীন উপজাতীয় নেতৃবর্গ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনীহা প্রদর্শন করে। ততোধিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হইতেছে পাকিস্তানের শাসকগণ এই রাজনৈতিক বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করিয়া সামরিক বাহিনী পাঠাইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে।

ইহার পর ধাপে ধাপে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল পরিবর্তন এবং অকার্যকর করা হয়। এইসব কিছু পার্বত্য অঞ্চলে যতটা না অসন্তোষের জন্ম দেয় উহা অপেক্ষা অধিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে ১৯৬২ সালে চালুকৃত কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের ঘটনা। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে চাকমা রাজার প্রাসাদসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪০ শতাংশ কৃষি ভূমি কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কাণ্ডাই হ্রদের পানির নিচে তলাইয়া যায়। যাহার ফলে হাজার হাজার উপজাতীয় তাহাদের জীবিকার উৎস হারায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়সহ প্রধান পার্বত্য নেতারা আরও একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করেন। বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন না করিয়া তাহারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাভাবিক ও অধিকার রক্ষার আশ্বাস প্রদান করা হইলেও নিশ্চয়তামূলক কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। এই পরিস্থিতিতেই ১৯৭২ সালে প্রধানতঃ চাকমাদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবিনামা পেশ করা হয়। ইহার পাশাপাশি ঐ বছরই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। '৭৩ সালে গঠিত হয় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তি বাহিনী। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় হইতে শান্তি বাহিনীর সামরিক তৎপরতা মোকাবেলায় সামরিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

এরূপ সংঘাতপূর্ণ অবস্থা মানিয়া নেওয়া বা চলিতে দেওয়া কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। আর তাই ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে সমস্যাটির সমাধান রাজনৈতিকভাবে করার তাগিদ অনুভূত হইতে থাকে। ১৯৮৫ সালে এরশাদ সরকারের আমলে প্রথম সেনা কর্মকর্তাদের সহিত জনসংহতি সমিতির সংলাপ শুরু হয়। এরশাদ সরকারের আমলে '৮৮ সাল পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির সহিত সরকারী প্রতিনিধিদের ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় উপজাতীয় প্রাধান্যপূর্ণ স্থানীয় সরকার গঠন সম্পর্কিত একটি আইন পাসের ভিত্তিতে জেলা ৩টিতে পার্বত্য

জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এতদসত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি সুদূরপর্যায়ত থাকিয়া যায়। ১৯৯১ সালে পুনর্বীর বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একটি সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে -নূতন করিয়া জনসংহতি সমিতির সহিত শান্তি আলোচনা শুরু হয়। বেগম খালেদা জিয়ার সরকার কর্তৃক গঠিত উক্ত সংসদীয় কমিটি জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের সহিত ১৩ দফা বৈঠক করেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নূতন সংসদীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে শান্তি আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়।

অতএব ইহা বলা কোনক্রমেই অযৌক্তিক হইবে না যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি বা সমঝোতা পূর্ববর্তী সরকারগুলির সময় পরিচালিত আলোচনার ধারাবাহিকতায়ই ফলপ্রসূ হইয়া উঠিয়াছে। পার্বত্যঞ্চলের তো বটেই, সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এতদসত্ত্বেও প্রধান বিরোধী দলসহ কোন কোন বিরোধী দল এই শান্তি চুক্তিকে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী অভিহিত করিয়া ইহার বিরোধিতা করিতেছেন। এমনকি ইহাও বলা হইতেছে যে এই চুক্তি নাকি সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একইভাবে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীরও কোন কোন মহল এই চুক্তিকে তাহাদের স্বার্থহানিকর আখ্যা দিয়া ইহার বিরোধিতা করিতেছে। আমরা মনে করি, এই শান্তি চুক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিকট-অতীত ও বর্তমান বাস্তবতার আলোকেই মূল্যায়ন করিতে হইবে। বিশ্বের অনেক দেশেই স্বাধিকারকামী এবং সহিংস আন্দোলনরত সংখ্যালঘু জাতি বা উপজাতীয়দের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের এরূপ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মরো গেরিলাদের সহিত ফিলিপিন্স সরকারের চুক্তির কথা। যাহা হউক, আমরা আশা করিতে চাই, এই শান্তি চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই দশকের সহিংসতার অবসান ঘটাইয়া তথাকার পাহাড়ী ও বাঙালী সকল শ্রেণীর মানুষের ন্যায়সংগত ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে উন্নততর জীবন গঠনের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

জাতীয় পার্টি শান্তি প্রক্রিয়াকে

স্বাগত জানাইয়াছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৯ গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়ামের জরুরী সভায় সম্প্রতি স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি পর্যালোচনা করা হয়। প্রেসিডিয়াম সভায় চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানানো হয়। এবং চুক্তির পরিবর্তন আনয়ন করিয়া অনতিবিলম্বে খসড়া জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের দাবী জানান হয়। সভায়

বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া সংখ্যালঘু অন্য উপজাতিসমূহসহ বাংলা ভাষা-ভাষীদেরও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দান করতে হইবে। বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের অখণ্ডতা ও একক দেশ হিসাবে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন-ভূমি ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে একটি স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের যে ক্ষমতা রাখা প্রয়োজন তাহা খর্ব করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

আমরা পার্বত্য অঞ্চলে

রক্তপাত বন্ধের ব্যবস্থা করিয়াছি

— শেখ হাসিনা

ইউএনবি ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত চুক্তিকে ঐ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নিয়া যাইবে। গতকাল সকালে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটеле লায়নস শান্তি পুরস্কার গ্রহণকালে তিনি বলিয়াছেন, আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাত ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্থায়ীভাবে বন্ধের এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরুর ব্যবস্থা নিয়াছি।

লায়স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩১৫এ২ প্রধানমন্ত্রীকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও মানবতা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার জন্য এই পুরস্কার দিয়াছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা দীর্ঘকালের সমস্যার অবসান ঘটাইয়া পার্বত্য এলাকায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য উপজাতীয় নেতাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছি। তিনি সকলকে চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তা করিতে আগাইয়া আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কোন কোন মহল চুক্তিটির সমালোচনা করিতেছে। কিন্তু জনগণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, চুক্তিটির বিরোধিতাকারীরা জাতি, জনগণ ও মানবতার স্বার্থকে সবকিছুর উপরে রাখিবেন। তিনি বলেন, মত ও বিশ্বাসে ভিন্নতা থাকিতে পারে। কিন্তু সকলেরই উচিত সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থ সম্মুখ রাখা। শ্রেয় বিরোধিতার জন্য চুক্তিটির বিরোধিতা করা কাহারও উচিত নয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি অ-পাহাড়ি, উপজাতীয় অ-উপজাতীয়-সব মানুষ শান্তিতে একত্রে বসবাস করিবে। তিনি প্রশ্ন রাখেন : এক ভাই কেন তাহার অপর ভাইকে খুন করিবে? এই দেশের নাগরিকেরা কেন আরেক দেশে শরণার্থী হইয়া থাকিবে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাহার সরকার দারিদ্র্যকে দেশের প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে এবং শিক্ষাকে দারিদ্র্য দূর করার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করে। তিনি বলেন, আমরা যদি সমাজকে সাক্ষর করিতে পারি তবে আমরা জাতিকে দারিদ্র্যমুক্ত করিতে সমর্থ হইব। তিনি বলেন, তাহার সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত একটি সমৃদ্ধিশীল দেশ গড়া। মানুষের ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর সরকার মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কাজ হাতে নিয়াছে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শেখ হাসিনা বলেন : আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। আমার পাওয়ার কিছু নাই। আমি শুধু বঞ্চিত মানুষের জন্য সুখী সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করিতে চাই...গরীব মানুষের মুখে হাসি ফিরাইয়া আনিতে চাই।

লায়স ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর প্রফেসর মোদাচ্ছের আলী করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর হাতে লায়স শান্তি পুরস্কার তুলিয়া দেন। একটি লায়স ক্রেস্ট ও এক লক্ষ টাকার চেক নিয়া এই পুরস্কার। লায়ন বদিউল ইসলাম, লায়ন মোসলেম আলী খান, লায়ন এম এ হাসান, লায়ন আনোয়ার হোসেন খান এবং লায়ন শেখ আনিসুর রহমানও বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি সম্পাদনে আরও অভিনন্দন

শান্তি চুক্তি সম্পাদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন জ্ঞাপন অব্যাহত রহিয়াছে। তাহারা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকাল শুক্রবার বাসস জানায়, পাকিস্তানের ইসলামাবাদ হইতে সাবেক চাকমা প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে আন্তরিকভাবে শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিতভাবে অবদান রাখিবে। তিনি জেপে লার্মার প্রতিও অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চুক্তির প্রশংসায় লর্ড পিটার শোর

লন্ডন হইতে বাসস ॥ তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ গত বৃহস্পতিবার এখানে পার্লামেন্ট ভবনে লর্ড পিটার শোরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি লর্ড শোরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকার

ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত চুক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। লর্ড পিটার শোর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রশংসা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের এই প্রচেষ্টা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুফলদায়ক হইবে। পরে প্রতিমন্ত্রী লন্ডন হইতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিকগুলির সাংবাদিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি তাহাদের বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত চুক্তির বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি ট্রাস্টভুক্ত পত্রিকা দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, বিচিত্রা ও আনন্দ বিচিত্রার বেসরকারীকরণ সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দেন। তিনি রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি সম্পাদনে আরও অভিনন্দন

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন জ্ঞাপন অব্যাহত রহিয়াছে। নেতৃবৃন্দ শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার এবং ইহার বিরোধীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোঃ নূরুল আলম গত বৃহস্পতিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, শান্তিচুক্তি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। শান্তিচুক্তি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই উপজাতীয় জনগণকে তাহাদের নিজস্ব স্বকীয়তায় নিজেদের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিবে।

জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি রফিক আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মদ সামাদ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিকাশ এবং তাহাদের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে শান্তিচুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে।

অভিনন্দন জ্ঞাপনকারী সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ হইতেছেন : জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান বেগম আই ভি রহমান, বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি এ কে এম জয়নুল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক এ কে এম মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান, মহাসচিব মোঃ শামসুল হক, বঙ্গবন্ধু

সমাজকল্যাণ পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী আলহাজ্ব মোঃ সামসুল হক ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জহির উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা আবদুল আউয়াল, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান, মাওলানা ভাসানী একাডেমীর চেয়ারম্যান আলী হোসেন আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম চৌধুরী, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভানেত্রী অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম, সাধারণ সম্পাদিকা ডাঃ মাখদুমা নাগিস রত্না, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা শাহজাহান আলম সাজু, আহ্বায়ক এ কে আজাদ লাভলু, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এমএ সামাদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আকতার হোসেন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক থানা কমান্ডের কমান্ডার আবদুর রব, ডেপুটি কমান্ডার মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান, ডেপুটি কমান্ডার-২ মোঃ মজিবুর রহমান, ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ শ্রমিক লীগের সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, রূপালী ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি এস এম শাহাদাত হোসেন, কার্যকরী সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল হক হামিদ এবং জাতীয় পানি উন্নয়ন শ্রমিক-কর্মচারী লীগের সভাপতি এ কে এম মহীবুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মোল্লা আবুল কালাম আজাদ।

সংগঠনগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঐক্য প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ পরিবার ইউনিট, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সংসদ, কামিয়াতল মুরাদনগর কুমিল্লা, ঢাকা মহানগর বাস্তবহারা পুনর্বাসন ও সমাজ কল্যাণ সমিতি, এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট বার এই এসোসিয়েশন পেশাজীবী টাইপিষ্টগণ।

সভারে আনন্দ মিছিল

সভার সংবাদদাতা ৯ শান্তি চুক্তির প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া বুধবার সন্ধ্যায় সভার থানা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগ এক মিছিল বাহির করে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন ঢাকা আওয়ামী লীগ সভাপতি শামসুরে খান মজলিশ।

জামালপুরে

জামালপুর সংবাদদাতা ৯ মঙ্গলবার জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠন যৌথ উদ্যোগে জামালপুর শহরে সন্ধ্যার পর এক আনন্দ মিছিল

বাহির করা হয়। স্থানীয় রেলগেটে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আ'লীগের সভাপতি অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, স্বৈচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

বাঘাইছড়িতে

রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা ॥ বাঘাইছড়ি থানার খেদারা সার্চোয়াতলী ও বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে পৃথক পৃথক শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। ইছাড়া কাচালং প্রাঙ্গণে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাঘাইছড়ি থানা শাখা শান্তি চুক্তির পক্ষে মিছিল করিয়াছে।

নোয়াখালীতে

নোয়াখালী সংবাদদাতা ॥ নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ যৌথ উদ্যোগে শহরে এক শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। আওয়ামী লীগ অফিস প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক হানিফ।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

আজ খাগড়াছড়িতে আনন্দ মিছিল

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য শান্তিচুক্তির সমর্থনে আজ (শনিবার) পাহাড়ী পেশাজীবী ঐক্য কমিটি এবং জেলা নাগরিক কমিটি খাগড়াছড়ি জেলা সদরে যৌথভাবে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করিয়াছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ এবং হিল উইমেন ফেডারেশন এই মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তিবাহিনীর সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি

বাসস ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় দুই দশকের গেরিলা যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিতেছে। গত বৃহস্পতিবার একজন শীর্ষ নেতা বাসসকে জানান, সেপ্টেম্বর মাসে ৬ দফা আলোচনার পর

সমিতির নেতাদের নিকট হইতে 'সবুজ সংকেত' পাইয়া সশস্ত্র ক্যাডারগণ তাহাদের গোপন ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসার প্রস্তুতি শুরু করে। গত মঙ্গলবার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর অস্ত্র সমর্পণ করিয়া তাহারা প্রকাশ্যে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নেয়।

বিভিন্ন উপজাতীয় সূত্র সমিতির নেতা বলেন, খাগড়াছড়ি জেলার প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকার দুদুকছড়িতে যাহারা অস্থায়ী আবাস স্থাপন করিয়াছিল তাহারা চুক্তিতে সম্মত হইয়া অস্ত্র সমর্পণ এবং নাশকতামূলক তৎপরতা বন্ধের শর্তসমূহ পূরণের জন্য কাজ শুরু করিয়াছে। তাহারা জননেতা ও প্রশাসনের নেতা ও কর্মকর্তাদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যে সর্বস্তরের লোক দুদুকছড়িতে যাইয়া পার্বত্য এলাকার শান্তির জন্য শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের জন্য জনসংহতি নেতাদের অভিনন্দন জানাইতেছেন। এদিকে সকল প্রকার বাধা, বিপত্তি কাটাইয়া শান্তি চুক্তি সরকারের জন্য এলাকায় আরেক সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন সরকারকে অভিবাদন জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিদেশী পত্র-পত্রিকায় শান্তি চুক্তির প্রশংসা

বাসস ॥ গত বুধবার 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক ঘণ্টা পরই জাতীয় পতাকা হাতে নিয়া হাজার হাজার লোক ঢাকায় আনন্দ মিছিল বাহির করে। বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণকালে তাহারা 'আমরা শান্তিতে বাস করিতে চাই' বলিয়া শ্লোগান দেয়। রিপোর্টে বলা হয়, এই শান্তি মুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যদিয়া বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের এক বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়াছে। বিদ্রোহীরা সাধারণ ক্ষমার আওতায় ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই চাকমা উপজাতীয়।

ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার আন্তর্জাতিক পাতায় গুরুত্বসহকারে শান্তি চুক্তি সংক্রান্ত একই ধরনের খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরের সহিত উল্লিসিত আনন্দমুখর জনতার তিন কলাম জুড়িয়া ছবিও ছাপা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭
“মনে মনে একজন পাহাড়ীকে
প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
মেনে নেয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে”
— আহমদ ছফা

আমার বিচারে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা একমাত্র একটি উপায়েই সম্ভব। আর সেটি হ'ল, পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার করা। খুব ঠান্ডা মাথায় বিচার করলে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের মূল কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের ওপর অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে জাতিগত বিশ্লেষণ, জাতিগত নিষ্পেষণ থেকে জন্ম নিয়েছে সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণ।

এখন পাহাড়ী এলাকার লোকেরা জাতিগত অধিকার এবং সাংস্কৃতিক অধিকার চাইছেন। এই অবস্থাটির সঙ্গে আমাদের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের তুলনা করা যায়। আমাদের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সেদিন ছাত্র সমাজ মাতৃভাষার অধিকারই দাবী করেনি, তার পেছনে একটা বৃহত্তর দাবী সুপ্ত ছিল সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই অর্থনৈতিক অধিকারের দাবীটি তাদের নানাবিধ হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করছে। অনেকে বলছেন, তাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার স্বীকার করে নিলে, তাঁদের স্বায়ত্তশাসন মেনে নিলে, তারা যে ভূখণ্ডে বাস করেন তার উপর তাঁদের পূর্ণ অধিকার দিলে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে। আমার মনে হয় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলো যথেষ্ট নয়। যে কারণে পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে তার মূল কারণটি অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ। সেই মূল জায়গাটিকে স্পর্শ করতে হবে। আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবহন, কলকারখানা, দোকানপাট এবং বনজ সম্পদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগিত রয়েছে তার পাঁচ শতাংশের মালিকও স্থানীয় অধিবাসীরা নয়। সমতলভূমির বাঙালীরা অর্থলগ্নি করে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর উপর অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ চালিয়ে আসছে। এই অবস্থাটির অবসান ঘটাতে হবে। তার জন্য একটা সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার দিতে হবে। অন্ততঃক্ষে বিশ-তিরিশটা কোম্পানী করে সেগুলো চালাবার অধিকার তাদের দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে একটা ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা সহজ শর্তে পার্বত্য অধিবাসীদের অর্থ ঋণ দেবে। বাংলাদেশের মধ্যে প্রসারিত যে

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি কয়েক দশকে হয়েছে পার্বত্য অধিবাসীদের তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে না পারলে তাঁদের বিচ্ছিন্নতা কখনও দূর হবে না। বর্তমানেও পার্বত্য অধিবাসীরা এই অর্থনীতির আওতার মধ্যেই বসবাস করছেন। কিন্তু এই অর্থনীতি সবদিক দিয়ে তাদের শোষণ করছে। এই অর্থনীতিতে তারা নিজেরা কোনভাবেই লাভবান হতে পারছেন না। এমন একটা পদ্ধতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে করে তাঁরা এই অর্থনীতির সক্রিয় অংশীদার হতে পারেন। পার্বত্য অঞ্চলে এন্ট্রোপেনিওর সৃষ্টির একটা উদ্যোগ এখনই নিতে হবে। কতগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য এককভাবে পাহাড়ীদের ছেড়ে দিতে হবে। সেগুলো প্রতিযোগিতামুক্ত হতে হবে, পাহাড়ীরা যাতে করে সঙ্কোচ, অভিজ্ঞতা এবং কুণ্ঠা পরিহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনবোধে তাদের পরামর্শক সরবরাহ করতে হবে। এ ব্যবস্থাটি একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে।

দেশের অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না করে তাদের সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক এবং সামাজিক যে অধিকারই দেয়া হোক না কেন, সেগুলো তাদেরকে অধিকতর বিচ্ছিন্নতার পথে টেনে নিয়ে যাবে। এক কথায় তাদের হাতে মূলধন সঞ্চয়ের একটা প্রক্রিয়া এখনই উদ্ভাবন করতে হবে।

শাসকরা সবসময়ই তাদের নাকের ডগার চাইতে দূরের জিনিস দেখতে পান না। খুব কল্পনা এবং অনুদার মনোভাব নিয়ে কখনও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমরা সমতলভূমির বাঙালীরা যদি মনে করি পাহাড়ীরাও আমাদের দেশের সমান নাগরিক; পাহাড়ীদের মধ্যে যোগ্যতা এবং মেধাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মত কোন ব্যক্তি যদি থাকে, তাকে মনে মনে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি আমাদের এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে। আমি সর্বান্তকরণে কামনা করব এই শান্তি প্রক্রিয়াটিতে যেন উদ্যমের অপচয় না হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে
নয়া দিগন্তের সূচনা করিবে

জাহিদুজ্জামান ফারুক ৥ পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিগত ২৪ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসানকল্পে গত সোমবারের ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি পার্বত্য অঞ্চল তথা বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নয়া দিগন্তের উন্মোচন করিয়াছে। বন্ধ হইয়া যাওয়া উন্নয়ন প্রকল্পে নতুন করিয়া কর্মচাঞ্চল্যের সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের

জন্য বিনিয়োগের নয়া ক্ষেত্র তৈয়ারী হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচী লইয়া ইতিমধ্যেই সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ নূতন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কথা ভাবিতেছে। দেশের সবচাইতে সম্ভাবনা খাত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণসহ পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটন শিল্প বিকাশে নূতন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই আগাইয়া আসার পরিকল্পনা করিতেছে।

আভ্যন্তরীণভাবে সরকারের কর্মকাণ্ডকে নূতন সাজে সাজানোর পূর্বেই দুইটি বিদেশী গ্যাস ও তেল আহরণ কোম্পানীতে নূতনভাবে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তেল ও গ্যাস আহরণের ক্ষেত্রে সম্প্রতি সরকারের সাথে আমেরিকার দুইটি প্রখ্যাত তেল-গ্যাস আহরণ ও বিতরণ কোম্পানী বেকসউড অকল্যান্ড এবং ইউনাইটেড মেরীল্যান্ড কোম্পানীর সাথে ৭ বছর মেয়াদী যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর হয় উহা আগামীতে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হইবে বলিয়া পুঁজি বিনিয়োগকারীরা ভাবিতেছেন। ভারত-মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্যাস ও তেল আহরণের ২২ নম্বর ব্লকে আমেরিকার বেকসউড কোম্পানী নূতন করিয়া কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা করিতেছে। ইহা ছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৭ এবং ১৮ নম্বর গ্যাস-তেল ব্লকে অপর আমেরিকান কোম্পানী ইউ, এম বিনিয়োগকারী সংস্থা, নূতন করিয়া তাহাদের কর্মপন্থা সাজানোর কথাও ভাবিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। একইভাবে পেট্রোবাংলা নির্ধারিত জাতীয় গ্যাস ও তেল আহরণ ক্ষেত্রে ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, এবং ২২ নম্বর ব্লকের গ্যাস আহরণের ক্ষেত্র বিগতদিনের সকল সন্দেহ ও ঝুঁকির অবসান ঘটাইয়া শান্তি চুক্তি বিনিয়োগকারীদের নয়া ও বর্ধিত বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করিবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করিতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের বাধাহীন কর্মতৎপরতা দেশের গ্যাস ও তেল আহরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনিতে পারিবে বলিয়াও মনে করা হইতেছে।

এই ব্যাপারে পেট্রোবাংলার একজন কর্মকর্তার সাথে আলাপ করিলে তিনি জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্যাস আহরণের ক্ষেত্রে যে দুই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারী কোম্পানী তাহাদের নির্ধারিত ব্লকে গ্যাস আহরণের প্রাথমিক পর্বে ভূকম্পন জরীপ শুরু করিয়াছে উহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হইয়া মূল লক্ষ্য গ্যাস আহরণের কাজে হাত দিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশাবাদী। ইহা ছাড়া, এই দুইটি বিদেশী কোম্পানীর পুঁজি বিনিয়োগ অত্যন্ত স্বার্থক ও সফলতার সাথে কাজ্জিত ফল আহরণে সফল হইতে পারিবে বলিয়া বিনিয়োগকারীরাও বর্তমানে দৃঢ়ভাবে আশা করে। আগামী

৫/৬ মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে এই কোম্পানী দুইটি ভূকম্পনের জরীপ শেষ করিয়া গ্যাস আহরণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ শুরু করিবে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। এই দুইটি আমেরিকান কোম্পানীর সফলতার উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেকাংশে নির্ভর করে বলিয়াও তিনি মনে করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সনে প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী 'শেল ওয়েল' পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঘাইছড়ি থানায় খনিজ তেলের সন্ধান পায়। বাঘাইছড়ি ও কাশালং অঞ্চলে তেল আহরণের কাজ সফলভাবে শুরু করার পরে শান্তিবাহিনীর সাথে মতপার্থক্য ও মতদ্বৈধতার ফলে শেষ পর্যন্ত তেল আহরণের কাজ বন্ধ করিয়া দিতে বিদেশী কোম্পানী বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া, বান্দরবন জেলায় রুমা থানার ঘেরাউ এলাকায় প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস, আলীকদম থানা এবং লামা থানার চলম ঝিলিতে প্রচুর কয়লা মণ্ডজুদ রহিয়াছে বলিয়া গবেষকরা মনে করেন।

অনেকে মনে করেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা-বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলের ৩২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫২০ একর জমিতে সংরক্ষিত খনিজ সম্পদের পুরোটাই এখন পর্যন্ত অনাবিকৃত। এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক অবস্থানই প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল, চুনাপাথর, এবং কঠিন শিলার ন্যায় প্রাকৃতিক সম্পদ সমারোহ ঘটাইয়াছে বলিয়াও বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন। পার্বত্য এলাকার খাগড়াছড়ির সামুদ্রিক এলাকায় উন্নতমানের মিথেন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক গ্যাসের মণ্ডজুদ সম্পর্কে স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া রাঙ্গামাটির কাপ্তাই ও বান্দরবান জেলার আলীকদমে কঠিন প্রকৌশল শিলা এই অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামোর জন্য অত্যন্ত নির্ভরশীল খনিজ সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী খরস্রোতা নদী ও পার্বত্য ভূমিরূপের অগাধ পানি সম্পদ এই অঞ্চল তথা দেশের সার্বিক জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন ক্ষেত্রে একটি সহায়ক শক্তি। কর্ণফুলি নদীতে বর্তমানের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুইটি পর্বে প্রায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। এই অঞ্চলের নদীসমূহের পানি শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ যোগান দিতে পারে।

বনাচ্ছাদিত পাহাড়ী অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে ১০২৬ বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে ৫১২ কিলোমিটার এলাকা সংরক্ষিত বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত। বাকি বনাঞ্চলের প্রায় ৫৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি হিসাবে পরিচিত।

এ অঞ্চলের সেগুন, তুন, গর্জন, জারুল, গামারী, কড়ই, চাপালিশ কাঠ ছাড়াও বাঁশ ও বেত দেশের সিংহভাগ কাঠ, বাঁশ, বেতের সরবরাহকারী স্থান। ১৮৭০ সনে তদানীন্তন ব্রিটিশ আমলে তৎকালীন বার্মা হইতে সেগুন ও অন্যান্য ফলবতী কাঠ গাছের চারা আনিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বনায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশ্বের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারিলে পর্যটন শিল্প হইতে বাংলাদেশের কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি সম্পাদনে

অষ্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিনন্দন

বাসস ॥ শান্তি চুক্তি সম্পাদনে অষ্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছে। শুক্রবার অটোয়া হইতে অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী আলেকজান্ডার ডোনার গত শুক্রবার অটোয়া হইতে প্রেরিত এক বার্তায় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসনিক কাঠামো গঠনে সেখানে দুই দশক ধরিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটনার অবসান হইল। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হইবে। তিনি ইহার সফলতা নিশ্চিত করিতে চেষ্টা চালাইবার জন্য সকল দলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের অভিমত

শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়ন দেশের

জন্য কল্যাণ বহিয়া আনিবে

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরগণ স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছেন, পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাত-সংঘর্ষের অবসান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমঝোতা চুক্তিটি শুধু দেশে নয় আন্তর্জাতিক বিশ্বেও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হইয়া

থাকিবে। ভিসিগণ চুক্তিটির সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আব্দুল খালেক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস.এম নজরুল ইসলাম, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক কায়েস উদ্দিন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এম হাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী গতকাল (শনিবার) ইত্তেফাককে শান্তি চুক্তি সম্পর্কে তাহাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় এ আহ্বান জানান। ভিসিগণ চুক্তি সফল বাস্তবায়নের ব্যাপারে আশা পোষণ করিয়া বলেন, এই চুক্তি পার্বত্যবাসী তথা দেশের সকলের জন্য কল্যাণ বহিয়া আনিবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম পার্বত্য শান্তি চুক্তির ব্যাপারে তাহার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া ইত্তেফাককে জানান, শান্তি চুক্তির মধ্যদিয়া পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটবে এবং ঐ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা আশার কথা। তিনি বলেন, যেকোন জাতীয় ইস্যুতে চুক্তি লইয়া ভিন্নমত থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তির সপক্ষে কোন চুক্তি হইলে তাহাকে স্বাগত জানাইতে হইবে। তিনি বলেন, সংবিধানের আওতায় সম্পাদিত যেকোন চুক্তি জনগণের কল্যাণ বহিয়া আনিতে সক্ষম।

শান্তি চুক্তিকে কেন স্বাগত জানাইতেছেন এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানানোর কারণ হইতেছে, এই চুক্তি যেমন সরকারের তেমনি বিগত সরকার সমূহেরও। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার যে সামরিক সমাধান কাঙ্ক্ষিত নয়, সম্ভবও নয়; ইহা জানিয়া বিগত সরকারসমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাহারই ধারাবাহিকতায় শান্তি চুক্তি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে। তিনি বলেন, এ চুক্তিকে স্বাগত জানানোর কারণ হইতেছে, একটি সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে চুক্তিতে। তিনি বলেন, জাতীয় সংহতির স্বার্থে যত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হউক না কেন রাষ্ট্র তাহাকে এমন ধারণা প্রদান করিবে সে যেন রাষ্ট্রকে তাহার রক্ষক হিসাবে দেখিতে পায়। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে অ-উপজাতীয়রা যাহাতে উপজাতীয়দের সহিত শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান করিতে পারে তাহারও নিশ্চয়তা

এই চুক্তিতে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তিনি বলেন, যেকোন মানুষ দেশ, কাল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বিশেষ শান্তি চায়। শান্তি প্রক্রিয়া সভ্যতার চালিকাশক্তি। বিভেদ, অনৈক্য, হানাহানি প্রগতির প্রধান অন্তরায়।

চুক্তিতে ভূমি অধিকার প্রসঙ্গে যে বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, ভূমি অধিকারের বিষয়টির সিদ্ধান্ত লইবেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন। তাহার চাইতে সৃষ্ট ব্যবস্থার আর কি হইতে পারে। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কমিশন ভূমির মালিকদের ন্যায় অধিকার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এক্ষেত্রে উচ্ছেদের প্রশ্নই আসে না।

আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ ব্যবস্থার অনুরূপ। দ্বিতীয় পার্লামেন্ট নয়। যদিও আঞ্চলিক পরিষদকে কিছু কিছু ক্ষমতা বেশী দেওয়া হইয়াছে। এক্ষেত্রে সংবিধান লংঘনের প্রশ্ন অবাস্তব। তিনি বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ প্রশাসন পরিচালনা করিলেও প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী (খুব নিম্ন পর্যায় ছাড়া) রাষ্ট্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে। পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক রয়েলটি আদায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু কিছু লোকের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর পার্বত্য অঞ্চলের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ পার্বত্য পরিষদ করিবে এবং রয়েলটি তাহারা নিয়া যাইবে এবং রাষ্ট্র ন্যায় পাওনা হইতে বঞ্চিত হইবে। তিনি বলেন, এ ধারণা নিতান্তই অমূলক। কারণ চুক্তি অনুযায়ী রয়েলটির একটি অংশ পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে ব্যয় করা হইবে। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রকে ঐ অঞ্চলে এমনিতেই অর্থের যোগান দিতেই হইবে। তাহার একটি অংশ যদি রয়েলটি হইতে আসে তাহা হইলে সম্পদের অধিকার হারানোর প্রশ্নই আসে না বরং ইহা যুক্তিসঙ্গত।

শান্তি চুক্তির ফলে অ-উপজাতীয়দের উপর নির্যাতন চালান হইবে এ ধরনের অপপ্রচার সম্পর্কে তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে জননিরাপত্তা, শান্তি বিঘ্নিত হইলে রাষ্ট্র কর্তৃক সেনা ব্যবহারের বিধান চুক্তিতে রহিয়াছে। বাঙালীদের উপর নির্যাতন হইবে এ ধরনের কাল্পনিক প্রশ্ন উত্থাপন কাহারও কাম্য নয়। তিনি বলেন, আমি মনে করি পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ী-বাঙালী সকলে মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিবে।

চুক্তিতে সার্বভৌমত্ব রক্ষা হইবে না এ বিতর্ক সম্পর্কে তিনি বলেন, পূর্বে উপজাতীয়দের শায়ভূশাসন ও বাঙালী উচ্ছেদের ব্যাপারে অনুমণীয় মনোভাব ছিল, সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের জোরালো দাবী ছিল। উপজাতীয় ভাইয়েরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সে মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় দাবীকে মানিয়া নিয়াছে। তাই সার্বভৌমত্ব হারানোর প্রশ্নই আসে না। তিনি বলেন,

সবচাইতে বড়কথা, চুক্তির একটি মানবিক দিক রহিয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে মানবাধিকার লংঘনের যে অভিযোগ ছিল তাহা হইতে জাতি মুক্তি পাইয়াছে এবং বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হইয়াছে।

শান্তি চুক্তি সম্পর্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি আব্দুল মান্নান ইন্ডেক্সকে জানান, পার্বত্য শান্তি চুক্তি করিয়া বর্তমান সরকার একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তিনি চুক্তি স্বাক্ষরের কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন সময় চুক্তি স্বাক্ষরে যাহারা উদ্যোগ নিয়াছেন সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি চুক্তি সম্পর্কে বলেন, এখন সকল মহলের উচিত ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়া পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরাইয়া আনা। তিনি বলেন, কেহ কোন বিশেষ অঞ্চলে দীর্ঘদিন সংঘাত, রক্তপাত চাইতে পারে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি অধ্যাপক আবদুল খালেক শান্তি চুক্তি সম্পর্কে তাহার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া বলেন, এ চুক্তির ফলে দীর্ঘ ২২ বছরের পার্বত্য সমস্যার সমাধান হইবে, রক্তপাত বন্ধ হইবে। তিনি বলেন, এ চুক্তি নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হইবে। চুক্তি ঐ অঞ্চলে উন্নয়নের নবযুগের সৃষ্টি করিবে। সিলেট শাহ জালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি অধ্যাপক হাবিবুর রহমান চুক্তি সম্পর্কে বলেন, আমি মনে করি আমাদের দেশের অনেক দিনের একটি সমস্যার সমাধান হইয়াছে। ইহাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত। সকলের এ চুক্তিকে স্বাগত জানানো উচিত। তিনি বলেন, এ চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি শান্তি বিরাজ করে তাহলে বাঙালী ও পাহাড়ীদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ় হইবে এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য বৈদেশিক সাহায্যেরও সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে। কারণ আভ্যন্তরীণ গন্ডগোল চলিতে থাকিলে দাতাগোষ্ঠী বা বিদেশী বিনিয়োগকারিগণ সাহায্য প্রদান বা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী হন না। কাজেই আশা করি এ চুক্তির ফলে দেশে শান্তি বিরাজ করিবে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের গতি বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বলেন, জাতির জন্য শান্তি ও কল্যাণ বহিয়া আনিবে। কেন শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইতেছেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই চুক্তির ফলে দীর্ঘদিনের পার্বত্য সমস্যার সমাধান হইবে। তিনি অবিলম্বে শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানাইয়া বলেন, দেশের প্রতিটি শান্তিপ্ৰিয় নাগরিকের এ চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম শান্তি চুক্তি সম্পর্কে ইন্ডেক্সকে জানান, পশ্চাদপদ কোন অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নয়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য। তিনি বলেন, শ্রীলংকার তামিল অধ্যুষিত

এলাকা, কাশ্মীর, আয়ারল্যান্ড, কুর্দিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘদিন জাতিগত সমস্যা বিরাজ করিতেছে। তিনি বলেন, সমস্যার ধরন অনুসারে বাংলাদেশের শান্তি চুক্তিকে বিবেচনা করিলে বলিব চুক্তি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হইয়াছে। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য স্থানে যেখানে এ ধরনের আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংকট বিরাজ করিতেছে তাহার সমাধানে বাংলাদেশের শান্তি চুক্তি মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস, এম নজরুল ইসলাম শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বলেন, গত ২০/২২ বছরে পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ অনেক প্রাণহানি ঘটিয়াছে। এই শান্তি চুক্তির ফলে রক্তপাত, সংঘাত বন্ধ হইবে এবং পার্বত্য এলাকায় শান্তি আসিবে। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটিলে সমগ্র দেশ লাভবান হইবে। তিনি চুক্তিকে সমন্বয়যোগী এবং যুগোপযোগী হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক কায়েস উদ্দিন ইত্তেফাককে জানান, চুক্তি অত্যন্ত যুগোপযোগী। তিনি বলেন, এই শান্তি চুক্তি দেশের উন্নয়নে স্ফীত ভূমিকা পালন করিবে। তিনি বলেন, চুক্তির ফলে, বাঙালী ও পাহাড়ী ভাই-বোনেরা অত্যন্ত শান্তিতে ও দ্রাভুল মনোভাব লইয়া বসবাস করিতে পারিবে। তিনি বলেন, চুক্তিতে পাহাড়ী-বাঙালী সকলের অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বলেন, দীর্ঘদিন ধরিয়া পার্বত্য অঞ্চলে যে সংঘাত, রক্তপাত ঘটিতেছিল শান্তি চুক্তির ফলে তাহার অবসান ঘটিবে এবং ঐ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি কাহারও কোন দ্বিমত থাকিলে সমস্যাটি সংসদে আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আমীরুল ইসলাম চৌধুরীকে শান্তি চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলা হইলে তিনি ইত্তেফাককে জানান, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিয়া সংবিধানের আওতায় যেকোন চুক্তিকে আমি সমর্থন করি। তিনি বলেন, সবচাইতে বড়কথা হইতেছে, শান্তি চুক্তিকে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী গ্রহণ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে চুক্তিটি যথার্থ হইয়াছে। তিনি শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া বলেন, শুধু চুক্তি হইলে হইবে না, চুক্তি বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করিবে চুক্তির সফলতা।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি পার্বত্য সমস্যার

রাজনৈতিক সমাধানে সাহায্য করিবে

— ওয়ার্কাস পার্টি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাইয়া বলিয়াছে, দেশবাসী সব সময় পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চাহিয়াছে এবং এই চুক্তি রাজনৈতিক সমাধানকে আগাইয়া লইতে সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

গতকাল (শুক্রবার) পার্টির সভাপতি অমল সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পলিটবুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় একথা বলা হয়।

সভায় বলা হয়, অতীতের সরকারসমূহের আলোচনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়াই পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি ১৯৭২-এর সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকার সংরক্ষণ না করা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারসমূহের এ বিষয়ে পরিচালিত ভ্রান্ত নীতি সংশোধন করার ক্ষেত্রে একটি অগ্রগতি।

সভায় চুক্তির ধারা-উপ-ধারা পর্যালোচনা করিয়া বলা হয়, বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের যে ব্যবস্থাকে এ যাবত মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই তাহারই কিছু উন্নতি বিধান করিয়া এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। চুক্তিতে ঐ আইনকে সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান ও পার্বত্যবাসীদের স্বকীয় জীবনধারণের ভিত্তিতে স্বশাসনের সাংবিধানিক অধিকার প্রদানের পার্বত্য জনসংহতি সমিতির মৌল দাবীও অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। চুক্তিতে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ এই তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের একটি সমন্বয়কারী সংস্থা মাত্র। ইহার দ্বারা সংবিধানের এক নং বিধিতে বর্ণিত বাংলাদেশে ‘একক (ইউনিটারী)’ রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে বিসর্জন দেওয়ার অভিযোগও সংবিধান সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। অবশ্য পার্বত্য এলাকার জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিধিনিষেধ, খনিজ সম্পদের রয়ালটির অংশ স্থানীয় পরিষদকে প্রদান, সরকার কর্তৃক উপজাতীয়দের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করা ও স্থানীয় সরকার বিষয়াদির ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত বেশ কিছু ধারা, উপ ধারা জটিলতা সৃষ্টি করিতে পারে এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে, সংসদের আলোচনায় এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্প্রীতি সমাবেশ
শান্তি চুক্তি বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন
ও হানাহানি বন্ধ করিবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ গতকাল (শনিবার) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত এক সম্প্রীতি সমাবেশে বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন। তাহারা বলেন, সংবিধানের আওতায় সম্পাদিত এই শান্তি চুক্তির ফলে দেশের এক দশমাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার যে অভিযোগ উত্থাপন করা হইতেছে তাহা অবাস্তব। বরং ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন এবং হানাহানি বন্ধ হইবে।

শান্তিচুক্তির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এই সমাবেশে জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদ, ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সভাপতি নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, মোর্শেদ আলী, অভিনেতা মামুনুর রশীদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার। সমাবেশ পরিচালনা করেন গোলাম কুদ্দুস। কাজী আরেফ আহমেদ বলেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাত হইবে এমন কোন কথা শান্তি চুক্তিতে নাই। যাহারা এই ভ্রান্ত অভিযোগ তুলিতেছেন তাহারা চাহেন পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করুক। তিনি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন অস্ত্র এবং স্বর্ণ চোরাচালানীরা এই চুক্তির বিরোধিতা করিতেছেন। কাজী আরেফ আহমেদ বলেন, কেহ পাহাড়ীদের ব্যবহারের চেষ্টা করিবেন না। তাহা হইলে পরিণতি শুভ হইবে না। তিনি চুক্তির প্রতিবাদে আহৃত অদ্যকার হরতালে প্রগতিশীল মানুষকে সম্পৃক্ত না হওয়ার আহ্বান জানান।

ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যে কাঠামোর মাধ্যমে সমাধান করা হইয়াছে তাহা সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অথচ বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোন যুক্তিতে এই চুক্তির বিরোধিতা করিতেছেন তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। তিনি বলেন, অতীতের কোন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। এই সরকার চুক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সমস্যা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা সমস্যার সুরাহা করতে পারিতেছে

না। ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম বলেন, স্থানীয় সরকার গঠনের যে সিদ্ধান্ত চুক্তিতে উল্লেখ রহিয়াছে উহা সংবিধান নির্দেশিত।

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বলেন, শান্তি চুক্তি আমাদের পথের সন্ধান দিয়াছে। ইহাকে যে কোন মূল্যে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। যাহারা ইহার বিরোধিতা করিতেছে তাহারা মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি। তাহারা দেশকে উন্নত হইতে দিবে না। রামেন্দু মজুমদার বলেন, এই চুক্তির ফলে দেশের এক দশমাংশ চলিয়া যাইবে বলিয়া বিএনপি যে অভিযোগ তুলিতেছে উহা ঠিক নহে। বরং ইহার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা রোধ করা গিয়াছে। তিনি বলেন, চোরাচালানীদের রাজনৈতিক আশ্রয় বন্ধ হইবে এই জন্য তাহারা অশান্তি চাহিতেছে। শান্তি চুক্তি নিয়া যে হরতাল ডাকা হইয়াছে তাহা অযৌক্তিক।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭
আজ ঢাকাসহ সারাদেশে
আওয়ামী লীগের শান্তি মিছিল

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইতে আওয়ামী লীগ আজ (রবিবার) রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী মিছিল করিবে। ঢাকা শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড, পাড়ায়-মহল্লায় শান্তি মিছিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গতকাল (শনিবার) আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত গণতন্ত্র মুক্তি দিবসের আলোচনাসভা হইতেও নেতৃবৃন্দ শান্তি মিছিল বাহিরের জন্য কর্মীদের নির্দেশ দিয়াছেন। এদিকে গতকাল রাত্রে শহর নেতৃবৃন্দ রাজধানীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে যান। ঢাকা ছাড়াও দেশের সর্বত্র শান্তি মিছিল বাহিরের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিএনপি আজ শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিয়াছে। আওয়ামী লীগ চুক্তির সপক্ষে শান্তি মিছিল করিবে। আওয়ামী লীগ সূত্র বলিয়াছে রাজপথে আজ তাহাদের নেতা-কর্মীরা থাকিবে। রাজপথ দখলে রাখিবে। নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া গতকাল রাত্রে ইত্তেফাককে জানান, আমরা শান্তি মিছিল করিব। হরতালের নামে জনগণের জান-মাল যাহাতে কেহ নষ্ট করিতে না পারে সেজন্য জনগণকে সহায়তা করিব। তিনি বলেন, জনগণের জন্য আমরা রাজনীতি করি, তাই জনগণের খেদমতে আমরা রাস্তায় থাকিব। আমাদের ছাত্রলীগ, যুবলীগ, মহিলা লীগ, কৃষক লীগসহ সকল অংগ-সংগঠনের নেতা-কর্মীরাই রাস্তায় থাকিবে।

গত ৪ঠা নভেম্বর বিএনপি আহৃত হরতালের দিনও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা রাজপথ দখল করিয়া রাখিয়াছিল। সেদিন আওয়ামী লীগের

হাজার হাজার নেতা-কর্মী দিনব্যাপী মিছিল করিয়াছে। হরতাল আহ্বানকারীরা রাস্তায় ছিল না। আওয়ামী লীগ সূত্র বলিয়াছে আজ তাহাদের প্রস্তুতি ৪ঠা নভেম্বরের চাইতে বেশী।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

খাগড়াছড়িতে আনন্দ মিছিল

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ৥ সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতি সমর্থন জানাইয়া গতকাল (শনিবার) সকালে জেলা শহরে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় পাহাড়ী ছাত্রগণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিল ও সমাবেশে বিভিন্ন এলাকার বহু উপজাতীয় নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। মিছিলকারীরা বিভিন্ন শ্লোগান লেখা প্লে-কার্ড ও ব্যানার হাতে নিয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে স্থানীয় কলেজ মাঠে এক সমাবেশে মিলিত হয়। পাহাড়ী গণপরিষদের নেতা শক্তিপদ রোয়াজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে শক্তিমান চাকমা, ডাঃ কনিষ্ক চাকমা, রূপক চাকমা, খোয়াই অং মার্মা, মৃগাংক খীসা, খগেশ্বর ত্রিপুরা ও চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ পাহাড়ী নেতা বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শান্তি চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন ও তাহাদের ন্যায় গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী জানান। বক্তারা বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই দশকের হিংসা, হানাহানি ও রক্তপাতের অবসান ঘটাইয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করিবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ী বাঙ্গালী সকলের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনেও শান্তি চুক্তি সহায়তা ভূমিকা রাখিবে। নেতৃবৃন্দ এই চুক্তিকে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রগতির একটি ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বলেন, অবিলম্বে এই চুক্তি কার্যকর করিয়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

এদিকে পাহাড়ী পেশাজীবী ঐক্য কমিটি ও জেলা নাগরিক কমিটি শান্তি চুক্তির সমর্থনে গতকাল বিকালে খাগড়াছড়িতে যে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়াছিল তা শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হইয়াছে। বিএনপির শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল পালন কর্মসূচীর সমর্থনে জেলা সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ এখানে বিক্ষোভ মশাল মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করায় সম্ভাব্য সংঘাত এড়াইবার জন্য আনন্দ মিছিল স্থগিত করা হয় বলিয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়। বিজ্ঞপ্তিতে খাগড়াছড়িতে যে কোন মুহূর্তে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া এ ব্যাপারে সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিরোধী দলের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

সহিংসতার পথ ছাড়িয়া সংসদে আসিয়া

নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলিয়া ধরুন

বাসস ৥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহিংসতা ও আন্দোলনের পথ পরিহার করিয়া জাতীয় সংসদে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিসহ সকল জাতীয় প্রশ্নে নিজেদের যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী তুলিয়া ধরার জন্য পুনরায় বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। বিরোধী দলের যেকোন গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, “আমরা টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে দেশের আনাচে-কানাচে জনগণের নিকট আপনাদের বক্তব্য পৌছাইয়া দিব।” আমরা যদি কোন ভুল করি, বিরোধী দলের দায়িত্ব তাহার সমালোচনা করা। ভুল সংশোধনের মধ্যে লজ্জার কিছু নাই। প্রধানমন্ত্রী গতকাল (শনিবার) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণির ৫৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যুবলীগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিএনপি আহূত হরতালের তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশ্ন রাখেন : কাহার স্বার্থে এই ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী দেওয়া হইয়াছে? গোটা দেশবাসী যখন শান্তি চায় এবং শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছে, তখন শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে হরতাল আহ্বান হরতাল আহ্বানকারীদের কুমতলবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা জাতীয় সংসদকে সমস্ত জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়াছি। বিএনপি’র তুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, শুধু একটি বিলেই আমরা বিরোধী দলের ১৬টি সংশোধনী গ্রহণ করিয়াছি।’

যুবলীগের চেয়ারম্যান ও বাংলার বাণী সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমু, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইকবাল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সৈয়দ আহমদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নুরুল মজিদ হুমায়ুন, সংগঠনের প্রেসিডিয়াম সদস্য ডঃ মীজানুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট সাইদুর রহমান প্রমুখ। যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবীর নানক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরলমতী সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে নির্জলা মিথ্যা ও বিভ্রান্তকর প্রচারণা চালানোর জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সমালোচনা করেন। তিনি

বলেন, “একবার খালেদা জিয়া ঘোষণা দিলেন, কোন শান্তি চুক্তি হইলে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের দখলে চলিয়া যাইবে।” তিনি প্রশ্ন করেন, “২রা ডিসেম্বর শান্তি চুক্তির পর কি এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটিয়াছে?” তিনি কৌতুকভরে প্রশ্ন করেন : “খালেদা জিয়া কি এখনও ফেনীর এম.পি অথবা সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী আছেন, নাকি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর উহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে?”

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন আর একবার দাবী করিয়াছিলেন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশে কোন ইসলাম থাকিবে না। মসজিদেও কোন আজানের সুর শোনা যাইবে না। আওয়ামী লীগ ১৭ মাস আগে ক্ষমতায় আসিয়াছে কিন্তু দেশে তেমন কোন পরিস্থিতি হয় নাই। কাজেই বেগম জিয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। শেখ হাসিনা বিএনপিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, ভোট চুরির জন্য জনগণের অসন্তোষের মুখে বিএনপিকে বিদায় নিতে হইয়াছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ কখনও উহা করে নাই। আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ নিরপেক্ষ উপ-নির্বাচন করিয়াছে। তিনি বলেন, “আমরা নির্বাচন কমিশনে কোন আদেশ-নির্দেশ পাঠাই নাই। নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ হইয়াছে।” দেশের যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার সরকার দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবকদের শক্তি ও উদ্যমকে কাজে লাগাইতে চায়। তিনি বলেন, আমরা দেশের বিশাল যুব সমাজকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করিতে চাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতা দখলকারী শক্তি যুব সমাজের উদ্যমকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে প্রবাহিত করে। তাহারা যুব শক্তিকে তাহাদের আপন স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে, দেশের জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে নয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

অপপ্রচার চালাইয়া তাহারা বিভ্রান্তি

সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন, বিএনপি জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াইবার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির অপব্যাখ্যা করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাহারা চুক্তি সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলিয়া, এমনকি সংবিধানকে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে চায়। তাহারা হরতালের কর্মসূচী

পর্যন্ত দিয়াছে। আমি হরতালের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিব না, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমরাও হরতাল করিয়াছি, কিন্তু আজ কি ইস্যুতে বিএনপি হরতাল ডাকিল, এ প্রশ্ন আমি জনগণের বিবেকের কাছেই ছাড়িয়া দিলাম। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করার নামে বলিয়াছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে না-কি ডিসির পদ থাকিবে না। অথচ চুক্তির কোথাও নাই যে, ডিসির পদ থাকিবে না।

গতকাল ‘গণভবনে’ এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন ও বিশেষ পদক্ষেপ নিতে পারে— ইহা সংবিধানেরই অঙ্গীকার। শান্তি চুক্তিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী-পাহাড়ী নির্বিশেষে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুল্লভ রাখা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং দেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ইতোমধ্যেই শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ব্যক্তিবর্গ কাজ শুরু করিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী শান্তি চুক্তিকে একই পরিবারের দুই ভাই-এর মধ্যকার দ্বন্দ্বের আপোষ-মীমাংসা হিসাবে বর্ণনা করিয়া বলেন, এই শান্তি চুক্তির ফলে দীর্ঘদিনের সংঘাত-সংঘর্ষের অবসান হইবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষিত হইবে। পার্বত্য এলাকায় বিরাজমান দীর্ঘদিনের সমস্যার অবসান তথ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই শান্তি চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আমি দলমত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পিছনে রহিয়াছে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে তিনি বিরোধী দলে থাকিতেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে তাঁহার ও তাঁহার দলের চিন্তাভাবনার উল্লেখ করিয়া বলেন, বিরোধী দলে থাকিতে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন বিষয়ে সাব-কমিটি রহিয়াছে, যেমন, অর্থ, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদির মত পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিতও একটি সাব-কমিটি রহিয়াছে। আমি যেমন বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করিয়া সেখানকার সকল মানুষের বিভিন্ন সমস্যা বোঝার চেষ্টা করিয়াছি, তেমনি এ সম্পর্কিত সাব-কমিটিও কাজ করিয়াছে। ইহার ভিত্তিতেই আমরা ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আমাদের ম্যানুফেস্টোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। এইভাবেই আমরা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত জাতীয়

কমিটি ও সেখানকার জনসংহতি সমিতির সহিত মাত্র ৭টি বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সম্পাদনে সফল হইয়াছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতের সরকারগুলিও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে প্রচেষ্টা চালাইয়াছে, তাহারা সফল হয় নাই, আমরা সফল হইয়াছি। সেই জন্য আমি সকলের প্রতি অভিনন্দন জানাই। আজ যাহারা বিরোধিতা করিতেছেন সেই বিএনপির সময়ও কর্নেল (অব) অলি আহমদের নেতৃত্বে কমিটি হইয়াছিল। তাঁহারা জনসংহতি সমিতির সহিত ১২টি বৈঠক করিয়াছিলেন, এমনকি তাঁহারা ভারতে পর্যন্ত যাইয়া বৈঠক করেন। তাঁহারা সফল হন নাই, ইহাতে কি অন্যকে দোষ দেওয়া যায়? প্রধানমন্ত্রী বিএনপি নেত্রীর সাম্প্রতিক কয়েকটি বক্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, বিএনপির সময় কর্নেল অলির নেতৃত্বাধীন কমিটিতো জনসংহতি সমিতির দাবী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন দিতেও রাজী হইয়াছিলেন। অথচ আজ তাঁহারাই বিরোধিতা করিতেছেন। কর্নেল (অব) অলির নেতৃত্বাধীন কমিটি যখন জনসংহতি সমিতির সহিত বৈঠক করিতেছিলেন, তখনতো আমরা কোনরকম বিরোধিতা করি নাই, বরং সহযোগিতা দিয়াছি। প্রতিটি বৈঠকে আমাদের দলীয় সদস্যগণ অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি সরকারও শান্তি চুক্তির জন্য কমিটি করিয়াছিল, আলোচনা করিয়াছিল, তাহারা আগরতলায় বৈঠকসহ ১৩টি বৈঠক করিয়াছিল এবং ১৯৯৩ সালে উপেন্দ্রলাল চাকমার দেওয়া ১৩ দফা দাবীর মধ্যে ১১ দফা মানিয়া নিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা বাহিনীর সকল ক্যাম্প গুটাইয়া ফেলা এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে ক্যান্টনমেন্টে সীমিত করারও সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। বিএনপি যে দুইটি দাবী মানিয়া নিতে রাজী হন নাই তাহা হইল জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালীদের ফেরত না-আনা। বিএনপির পূর্ববর্তী সরকারও শান্তি চুক্তি সম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা না-থাকায় তাঁহারা সফলকাম হয় নাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তি চুক্তির কয়েকটি দিক ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, দেশের কোন বিশেষ অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন ও তাহাদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিভিশনাল কাউন্সিল বা স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির বিধান আমাদের সংবিধানেই আছে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে এসব প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ‘রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন।’ সংবিধানের ৩য় অনুচ্ছেদের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন

সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে, ‘প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য, জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ছাড়াও সংসদ আইনের দ্বারা স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে’। শান্তিচুক্তিতে উল্লেখিত আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধানের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেক্ষিতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎফুল্ল হৃদয়ে সাংবাদিকদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেনঃ

প্রশ্নঃ বিএনপি বলিয়াছে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করিবে।

উঃ শান্তি চুক্তি সম্পূর্ণরূপে সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য রাখিয়া সম্পাদন করা হইয়াছে। তবে কেহ কেহতো বলিয়াছেন ফেনী পর্যন্ত ভারতে চলিয়া যাইবে- এইভাবেই তাহারা বিভ্রান্তি ছড়াইতেছে। তবে হ্যাঁ, দুষ্টলোকেরা বলিতেছেন তাহা হইলে তিনি (বিরোধীদলীয় নেত্রী) এখন কোন দেশের পার্লামেন্টে বসিবেন?

প্রশ্নঃ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন ভূমি অধিগ্রহণ করিতে হইলে পার্বত্য পরিষদের অনুমতি লাগিবে, ইহা কি সার্বভৌমত্ব বিরোধী নহে?

উঃ দেশের যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করিতে হইলে ঐ এলাকার ডিসির সুপারিশ লাগে, একটা পরিমাণ আছে, পরিমাণের অতিরিক্ত হইলে সরকার প্রধানের অনুমতি লাগে। বলা হইয়াছে আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশের কথা, ইহাতে সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হইল কি করিয়া?

প্রশ্নঃ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনি যেকোন নাগরিককে মন্ত্রিসভার সদস্য করিতে পারেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রী কেন?

উঃ অনুন্নত অঞ্চলের অনগ্রসর জনগণের কথা আমি আগেই বলিয়াছি। এ প্রসঙ্গে আপনাদের সরণ করাইয়া দিতে চাই, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বিনিতা রায়কে মন্ত্রীর মর্যাদায় উপদেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রশ্নঃ শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিদেশী কোন শক্তির ইচ্ছা আছে কি না?

উঃ ‘ঘরের শত্রুই বিভীষণ’।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, তথ্যপ্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়দ, যুব ও ক্রীড়া

প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান, সুলতান মোঃ মনসুর আহমদ এমপি ও আখতারুজ্জামান এমপি।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি নিয়া আলোচনার

জন্য সংসদ ডাকুন

— এরশাদ

রংপুর সংবাদদাতা ॥ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ, এম, এরশাদ বলিয়াছেন, বিএনপি সরকারের আমলে এদেশের অর্থনীতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফলে দেশের ব্যাংকগুলি ঋণ দিতে পারিতেছে না। দেশে অস্থিরতার কারণে দেশের অর্থনীতি আরও পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আগাইয়া আসিতেছে না। তিনি গতকাল (রবিবার) বিকালে রংপুর সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে একথা বলেন। এরশাদ বলেন, বিএনপি বলিয়াছে, তাহারা শান্তি চুক্তি মানে না, এ কথা ঠিক নয়। আমরা অবশ্যই শান্তি চুক্তি চাই তবে সংসদে আলোচনা করিয়া শান্তি চুক্তি করা হইলে দেশবাসী অন্ধকারে থাকিত না। বিএনপি বলিয়াছে চুক্তি করিয়া দেশ বিক্রি করিয়া দিয়াছে এ কথা ঠিক নয় তাহারা ই ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করিয়া দিয়াছে। তিনি বলেন, সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান, শান্তি চুক্তি লইয়া আলোচনার জন্য সংসদ ডাকা হউক। সংসদে বসিয়া আলোচনা করা না হইলে আমরা শান্তি চুক্তির প্রতি সমর্থন জানাইব না। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালে বলিয়াছিলেন, হরতাল করিলে দেশে প্রতিদিন ২০০ শত কোটি টাকা ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তিনি হরতাল করিতেছেন কেন? বর্তমান সরকার বি, এন, পির নিকট জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে। বি, এন, পির দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার কোন মামলা করিতে পারিতেছে না। এমনকি খালেদা জিয়া নিজের বাড়ীতে সরকারী তিন কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। সকালে এরশাদ পায়ে হাঁটিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন। সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন মোজাম্মেল হোসেন এম, পি, হাজী আবুবকর প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

‘শান্তি চুক্তি সংশোধন করিয়া

পাহাড়ী জনগণের ন্যায্য দাবী মানিয়া নিন’

পাহাড়ী গণপরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত খীসা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক ক্য ছা চিং মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহ-সভানেত্রী বর্তিকা চাকমা গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে বি, এন, পি’র আহূত হরতালের সমালোচনা করিয়া বলেন, বি, এন, পি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য স্বাধীনতা-বিরোধী মৌলবাদী ও চরম দক্ষিণপন্থী দল শান্তি চুক্তি বিরোধিতার নামে চরম পাহাড়ী বিদ্বেষ সৃষ্টি ও দাঙ্গা বাধানোর পায়তারা করিতেছে।

নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন সরকারেরও সমালোচনা করিয়া বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বিএনপি ও স্বাধীনতা-বিরোধী অপশক্তির চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকায় হত্যাযজ্ঞ ও অরাজকতা সৃষ্টি সত্ত্বেও সরকার এ যাবৎ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। ফলে ইহা বোঝা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু দ্বন্দ্ব থাকিলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, বি, এন, পি, জামায়াতের ও জাতীয় পার্টির নীতি বরাবরই এক এবং অভিন্ন। তাহারা বলেন, সম্প্রতি সম্পাদিত শান্তি চুক্তির সাথে এরশাদের চাপাইয়া দেওয়া তথাকথিত জেলা পরিষদ চুক্তির কোন পার্থক্য নাই। এই চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ী জনগণের মৌলিক দাবীগুলির কোনটাই পূরণ হয় নাই বিধায়, তাহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে না। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সদ্য সম্পাদিত চুক্তি সংশোধন করিয়া পাহাড়ী জনগণের ন্যায্য দাবীগুলি মানিয়া নিয়া দূরদর্শী ভূমিকা রাখার জন্য সরকারসহ সকল দলের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তির সমর্থনে ঢাকাসহ সারাদেশে মিছিল

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির সমর্থনে গতকাল (রবিবার) ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনসমূহসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্ত শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলশেষে বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত শান্তি সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানান। শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিএনপি আহূত সকাল সন্ধ্যা হরতালের প্রতিবাদে গতকাল সকাল হইতে রাজধানীর বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড হইতে বহু মিছিল বাহির করা হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজার হাজার মানুষ শান্তির সপক্ষে শান্তি মিছিলে যোগদান করে। গতকাল নগরীতে নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম এমপি'র নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল বাহির করা হয়। ঢাকার বাহিরেও অনুরূপ শান্তি মিছিল বাহির করার খবর পাওয়া গিয়াছে। সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন স্থানে শান্তি মিছিল বাহিরের দৃশ্য চোখে পড়ে।

গতকাল নগরীতে এক বিশাল শান্তি মিছিল শেষে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলীয় কার্যালয়ে আগত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম এমপি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পানি চুক্তি, ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিসহ দেশের উন্নয়নে যখন বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়াছেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যখন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হইয়াছে তখনই জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বিএনপি, জামায়াত, রাজাকার একত্রিত হইয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়া নস্যাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। তিনি বলেন, বিএনপি আহূত গণবিরোধী হরতাল জনগণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শান্তি মিছিলে নগর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ফজলুর রহমান ফেন্টমাস, আজহার-উল-আলম, ফয়েজ উদ্দিন মিয়া, এডভোকেট শাহ আলম এমপি, বেগম সেগুণ্ডা ইয়াসমিন এমপি প্রমুখ অংশ নেন। শান্তি মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণশেষে দলীয় কার্যালয়ে আসিয়া শেষ হয়।

গতকাল লালবাগে সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে হরতাল বিরোধী একটি বিশাল শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলটি লালবাগ, চকবাজার, সদরঘাট, মিটফোর্ড, ইসলামপুর, বাবুবাজার, কোর্ট-কাচারি, নবাবপুর, গুলিস্তান প্রভৃতি এলাকা ঘুরিয়া পুনরায় চকবাজারে আসিয়া শেষ হয়। হরতাল বিরোধী শান্তি মিছিল শেষে হাজী সেলিম এমপি পুরানা ঢাকা, লালবাগ এলাকায় দোকানপাট খোলা রাখার জন্য এলাকাবাসীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। লালবাগ থানা আওয়ামী লীগের আনিস আহাম্মদ, কমিশনার কাজী মাসুম, কমিশনার কামালউদ্দিন বাবুল, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ শান্তি মিছিলে অংশ নেন। বিএনপি'র হরতালের প্রতিবাদে গতকাল ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর এলাকায় সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের নেতৃত্বে শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া মিছিলকারীরা বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। গতকাল বিএনপি আহূত

হরতালের বিরুদ্ধে সবুজবাগ থানা এলাকায় শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। মহাখালী-গুলশান এলাকায় গতকাল বিশাল শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংসদ সদস্য এম, রহমতুল্লাহ। হরতালের প্রতিবাদে গতকাল উত্তরায় উত্তরা থানা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। শান্তি মিছিলশেষে এক সমাবেশে শহীদুল্লাহ, দেলোয়ার হোসেন, তোফাজ্জল, কুতুবউদ্দিন, বুলবুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ইছাছাড়া বিএনপি আহূত হরতালের প্রতিবাদে জাতীয় শ্রমিক লীগ, রিকশা শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ পৃথক শান্তি মিছিল বাহির করে।

খুলনা অফিস ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়া গতকাল (রবিবার) দুপুরে আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয় হইতে একটি শান্তি ও হরতাল বিরোধী মিছিল বাহির করে। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আবদুল খালেক মিছিলে নেতৃত্ব দেন। সন্ধ্যায়ও অনুরূপ একটি মিছিল বাহির করা হয়।

বরিশাল অফিস ॥ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ যৌথভাবে এখানে গত সন্ধ্যায় শান্তি মিছিল বাহির করে। মিছিলে অধর মুখার্জী, মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, এ্যাডভোকেট শাহীন, জুয়েল, তারিক, বলরাম পোদ্দার নেতৃত্ব দেন।

সিলেট অফিস ॥ গতকাল দুপুরে জেলা আওয়ামী লীগ হরতালের প্রতিবাদে শহরে মিছিল ও সমাবেশ করে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে মিছিলটি সুরমা মার্কেট পয়েন্টে গিয়া সমাবেশের মধ্যে শেষ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সৈয়দ আবু নসর এডভোকেট এবং বক্তব্য রাখেন আ.ন.ম. শফিকুল হক, আবু জহির চৌধুরী সুফিয়ান, সংসদ সদস্য সৈয়দা জেরুন্নেছা হক, সোয়ের আহমদ চৌধুরী, অহিদুল ইসলাম তোফা, নজরুল ইসলাম, জগদীশ দাস, নাসির উদ্দিন খান, বিধান চন্দ্র সাহা প্রমুখ।

ফেনী ॥ দুপুরে ছাত্রলীগের উদ্যোগে শহরে একটি শান্তি মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করিয়া শহীদ মিনারে যাইয়া শেষ হয়। আতংকের কারণে দোকানপাট ও যান চলাচল বন্ধ ছিল, কাজকর্ম ও লেনদেন কম হইলেও প্রায় সকল অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা খোলা ছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্রের নিন্দা

বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হরতাল আহ্বান করার নিন্দা করিয়াছেন। তাহারা শান্তি চুক্তি সম্পাদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অভিনন্দন জানান। নেতৃবৃন্দ শান্তি চুক্তির বিরোধীদের চক্রান্ত প্রতিহত ও হরতাল প্রত্যাখ্যান করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

শান্তি চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার লক্ষ্যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে গতকাল শনিবার দেশব্যাপী সম্মিলিত দিবস পালিত হয়। কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে গতকাল বিকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বলা হয়, শান্তি চুক্তি সম্পাদনে কোনভাবেই সংবিধান লংঘিত হয় নাই। সংবিধান লংঘনের অভিযোগ ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। রামেন্দু মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু, জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদ, বামফ্রন্ট নেতা মোর্শেদ আলী প্রমুখ।

বাংলাদেশ যুব কল্যাণ সমিতির সভাপতি মোঃ বছির আহমদ বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ এ, কে শাহজাহান কবীর এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, যে শান্তি চুক্তিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সমর্থন জানাইয়াছে সেই চুক্তির বিরোধিতা করিয়া কতিপয় লোক ও দল তাহাদের প্রকৃতরূপই জনগণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে হরতাল বিরোধী একটি মিছিল ৮১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন মোঃ আইয়ুব আলী। পরে এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, সোলেমান কাদের মিন্টু, আঃ করিম বাবুল প্রমুখ।

অনুরূপ বিবৃতি দানকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি ঢাকা শাখার সভাপতি ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী, ঢাকা আন্তঃজেলা বাস, মাইক্রো ও মিনিবাস সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শওকত আলী অনু, কার্যকরী সভাপতি নুরুল আমিন নুর ও সাধারণ সম্পাদক রেজাই সাত্তার ফারুক। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিএনপি'র প্রতি আওয়ামী লীগ

ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের পথ ছাড়িয়া

সংসদে ফিরিয়া আসুন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ গতকাল রবিবার আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের জরুরী সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বিএনপি'র শান্তি চুক্তি বিরোধী অপপ্রচারের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলা হয়, বিএনপি শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে মনগড়া, কল্পিত ও অযৌক্তিক অভিযোগ উত্থাপন করিয়া দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিলুপ্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। বিএনপি'র এই গণবিরোধী অপতৎপরতার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানাইয়া বলা হয়, একটি নির্বাচিত সরকারকে ষড়যন্ত্র ও শক্তির জোরে ক্ষমতাচ্যুত করার যে আন্দোলন তাহারা করিতেছে দেশের সচেতন জনগণ ইহার সমুচিত জবাব দিবে। গতকাল বিকালে গণভবনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের এই জরুরী সভায় সভানেত্রী করেন দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সভায় দেশের সর্বশেষ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়া বিস্তারিত আলোচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের ২৬ বছর পূর্তিতে বিজয়ের এই মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণকে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি উপহার দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি অভিনন্দন জানান।

প্রস্তাবে বলা হয়, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের আওতায় দেশের এক-দশমাংশ জুড়িয়া দীর্ঘ দুই দশকে রক্তপাত, হানাহানি ও যুদ্ধাবস্থা অবসানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করিয়াছে। প্রস্তাবে বলা হয়, একটি বিশেষ গোষ্ঠী ছাড়া বাংলাদেশের দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল, বিশেষ শ্রেণী ও পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী, মানবাধিকার সংস্থা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি-অ-উপজাতি নির্বিশেষে সকলে এই চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছে। এ প্রসঙ্গে শান্তি চুক্তির প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও জাপানসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবে ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের পথ পরিহার করিয়া জাতীয় সংসদে ফিরিয়া আসিয়া দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের জন্য বিএনপি'র প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তিচুক্তি সম্পাদনে রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইশত শিক্ষকের অভিনন্দন

বাসস ৷ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুইশত শিক্ষক গত রবিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হয়, এই শান্তি চুক্তি পার্বত্য জেলাসমূহে বাঙ্গালী এবং পাহাড়ীদের জীবনযাত্রায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হইবে।

ইহাছাড়াও সরকারের পার্বত্য জেলাসমূহে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্য করিবে। শিক্ষকগণ আশা প্রকাশ করেন, শান্তি চুক্তির ফলে সেখানে সম্ভ্রাসী কার্যক্রম চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী শিক্ষকগণের মধ্যে রহিয়াছেন প্রফেসর সাইদুর রহমান খান, প্রফেসর হাসান আজিজুল হক, প্রফেসর আজিজুল ইসলাম, প্রফেসর জুলফিকার মতিন ও প্রফেসর জাহিদুল হাসান।

রাজশাহী আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট আবুল কাসেমও শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭
বিবিসির ভাষ্য
শান্তি চুক্তি প্রণে পাবর্ত্য
এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া

বিবিসি জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় উভয় সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের লোকজন সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে।

শান্তি চুক্তির ব্যাপারে জনমত নিরূপণ করিতে বিবিসি সংবাদদাতা সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন দিন কাটান। তারপর ঢাকা হইতে পাঠানো তাহার রিপোর্টে বলা হয় : লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, খাগড়াছড়ি জেলার উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় উভয় সমাজের গ্রামের মানুষ শান্তি চুক্তিটির ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু এইটি সম্পর্কে তাঁহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সাধারণভাবে উপজাতীয়রা আশাবাদী। তবে অনেকে মত প্রকাশে সতর্ক এবং অপর কিছু লোক আরও প্রত্যাশা করে। পানছড়ি থানার উজ্জ্বল কান্তি

চাকমা, নয়ন বিকাশ চাকমা ও গোপাল চাকমা চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছেন। তবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন উহার বাস্তবায়নের উপর। তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, এলাকা হইতে সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীরা চলিয়া গেলে শান্তি আসিবে।

পানছড়ি থানারই গুচ্ছগ্রাম সাঁতিলার বাঙ্গালীরা এখনও শান্তিবাহিনীর ভয় করিতেছে। তাহারা তাহাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। গ্রামের আবুল কালাম বলিলেন, চুক্তিটি তাহাদের জন্য শান্তি আনিবে না। তাহারা সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। তাহাদের কথা যে, সেনাবাহিনী চলিয়া গেলে তাহারা এলাকায় বসবাস করিতে পারিবে না। গ্রামের রেনু বিবি বাঙ্গালীদের ভাগ্যে কি ঘটবে তাহা বিবেচনা না করার জন্য সরকারকে দোষারোপ করিলেন এবং গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার অভিযোগ : নেতারা উপজাতীয়দের কথা ভাবিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালীদের কথা ভাবে নাই।

খাগড়াছড়ির ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া নেতৃত্বের প্রশ্নে বাঙ্গালীদের অধিকার কিছু খর্ব করা হইলেও শান্তির স্বার্থে চুক্তিটি মানা উচিত। এলাকায় শান্তি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া তিনি আশাবাদী। পারাছড়ার সুকুমার দেওয়ান বলিলেন, শান্তি চুক্তি নিয়া তাহাদের কোন মাথাব্যথা নাই। তাহারা শান্তিবাহিনী অথবা সেনাবাহিনীর ভয়শূন্য পরিবেশে রাতে শান্তিতে ঘুমাতে চান। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের একটি অংশও চুক্তির বিরোধিতা করিতেছেন। তাহারা বলিতেছেন যে, উপজাতীয়দের অধিকার যথোচিত নিশ্চিত করা হয় নাই। এলাকার মানুষ সাধারণভাবে শান্তি চায়। তবে তাহারা এখনও অনিশ্চয়তা ও ভীতির মধ্যে রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭
চট্টগ্রাম ও তিন পার্বত্য জেলায়
দুইদিন হরতাল আহ্বানে দেশবাসী উদ্বিগ্ন
- আওয়ামী লীগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ গতকাল (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর এক সভা আওয়ামী ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমির হোসেন আমু সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় দেশে, বিশেষ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া এক প্রস্তাবে বলা হয়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে দুই দশকের ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি ও রক্তপাতের অবসানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকে যখন সমগ্র দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বাগতঃ ও অভিনন্দন জানাইয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তে কল্লিত, বানোয়াট ও মিথ্যা অভিযোগে বিএনপি এবং চিহ্নিত স্বাধীনতা-বিরোধী জামায়াত-শিবির অপশক্তি উপর্যুপরি হরতাল আহ্বান করিয়া দেশে অশান্তি, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টায় উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতা-বিরোধী অপশক্তির সাথে অশুভ আঁতাত করিয়া বিএনপি গত ৭ই ডিসেম্বর দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষার্থে ঘোষিত ‘জাতীয় টিকা দিবসে’ জনগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া জ্বরদস্তিমূলকভাবে, অমানবিক হরতাল চাপাইয়া দেওয়ার পর পুনরায় একই ইস্যুতে তাহাদের হীন ও অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য চট্টগ্রাম ও তিন পার্বত্য জেলায় ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর পরপর দুইদিন হরতাল ডাকিয়া দেশবাসীকে স্তম্ভিত ও উদ্ভিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

প্রত্যবে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র বন্দর নগরী চট্টগ্রামকে অচল করার অপচেষ্টার মাধ্যমে দেশের আমদানী রফতানী বাণিজ্য এবং অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙ্গালী জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও হানাহানির উস্কানি দিয়া বিএনপি-জামায়াত চক্র দেশে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির যে হীন চক্রান্তে মাতিয়া উঠিয়াছে সমগ্র দেশবাসী বিশেষ করিয়া মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে বরিশাল শহরের সন্নিহিত দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেন

পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে সমগ্র

বাংলাদেশেরই অগ্রগতি হইবে

বাসস ৥ জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং জনগণের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হইবে। তিনি বলেন, এই চুক্তির ফলে সমগ্র বাংলাদেশের অগ্রগতি হইবে। গত বুধবার জাতিসংঘ সদর দফতরে জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষে তাঁহার মুখপাত্র এক

প্রেস ব্রিফিং-এ বলেন যে, এই শান্তি চুক্তির ফলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে প্রায় ২৫ বছরের সংঘাত-সংঘর্ষের অবসান হইয়াছে।

কফি আনান তাঁহার বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরাইয়া আনা এবং সংঘর্ষ অবসানের কথা রহিয়াছে। মুখপাত্র বলেন, মহাসচিব সম্প্রতি তেহরানে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকের সময় এই বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। মহাসচিব বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিতে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ডেপুটি প্রধান বুথ আলবুরাকর গতকাল শান্তি চুক্তিকে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক অভিহিত করিয়া বলেন, আমরা উহার বাস্তবায়ন দেখার অপেক্ষায় রহিয়াছি। তিনি গতকাল ঢাকায় তাঁহার হোটেলের সাংবাদিকদের বলেন যে, দীর্ঘদিনের সমস্যার বিরোধের অবসান হইয়াছে। তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুর অধিকারে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, ইউনিয়ন এ অঞ্চলের উন্নয়নে সাহায্য দিতে আগ্রহী। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন সরকার ও শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিকগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দুই দশকেরও বেশী সময় ধরিয়া যে সংঘাত-সংঘর্ষ চলিতেছিল উহার অবসান হইয়াছে। শান্তি চুক্তি পাহাড়ী-বাঙ্গালীর সমঅধিকার নিশ্চিত করিয়াছে।

এই চুক্তি বিগত জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টারই ফসল। এই চুক্তি দেশের সংবিধানের কাঠামোতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সম্পন্ন করা হইয়াছে।

সরকার এবং শীর্ষ রাজনীতিক ছাড়াও বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর বহুল প্রচারিত পত্রিকাসমূহে চুক্তির প্রশংসা করিয়া নিবন্ধ ছাপা হইয়াছে। পত্রিকাগুলির মধ্যে রহিয়াছে ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস, হেরাল্ড ট্রিবিউন, জাপানের আশাহি শিম্বুন ইউমুরি, জার্মানীর নেয়াস ডেসল্যাভ, ভারতের দি হিন্দু ইত্যাদি। এ সকল পত্রিকায় শান্তিচুক্তিকে ‘বিরট বিজয়’ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এ সকল পত্রিকায় বলা হয় ২৬ দফা বৈঠকশেষে এই চুক্তি হয়। জাতীয় পার্টির সরকারের সময় ৬ দফা, বিএনপি’র ১৩ দফা এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ৭ দফা বৈঠকশেষে...এই চুক্তি হয়।

মার্কিন সরকার চুক্তির পর পরই চুক্তিকে অভিনন্দিত করিয়াছে। ...দফতরের ঘোষণায় আশা প্রকাশ করিয়া বলা হয় উভয় পক্ষের ইচ্ছায় শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হইবে। চুক্তির ফলে দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান হইল।

বর্তমানে পাকিস্তানে বসবাসরত সাবেক চাকমা প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় শান্তি চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। পাকিস্তানের হাউজ অব কমন্সের চীফ হুইপ নিক ব্রাউন বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করিয়াছেন।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া বলিয়াছে, চুক্তির ফলে বাংলাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। লর্ড পিটার শোর অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

ওয়াশিংটন পোস্ট ও হেরাল্ড ট্রিবিউন শান্তি চুক্তির পক্ষে মিছিলকারীদের ছবিসহ চুক্তির খবর প্রকাশ করে।

‘হিন্দুস্তান টাইমস’-এ অভিনন্দন জানাইয়া বলা হয়, চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উভয়পক্ষই প্রশংসনীয় বাস্তবতার পরিচয় দিয়াছে। আওয়ামী লীগ সরকারকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাইতে হয়। পত্রিকায় বলা হয়, বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার চুক্তির বিরোধিতা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত নয় কারণ বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের সবকিছুই বিএনপি বিরোধিতা করে।

সৌদী আরবের প্রভাবশালী পত্রিকা খালেজ টাইমস এক সম্পাদকীয়তে বিরোধী দলের ব্যাপক চাপের মধ্যেও সাহসের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করিয়াছে। পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান হয়।

জাপানের সকল প্রধান দৈনিক যেমন আশাহি শিমুন, আশাহি ইভনিং নিউজ, জাপান টাইমস, ডেইলী ইউরুই ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়াছে।

জাপানী সাংসদ শিন সাকুরি চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তুরস্কের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুরাত সুংগার চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, আমি উহা বিস্তারিতভাবে পড়িয়াছি।

হংকং-এর প্রধান তাং চী অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কানাডা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতও অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কুয়েত চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছে যে, ইহা ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশের জন্য বিরাট অগ্রগতি।

ইহাছাড়া রাশিয়া ফেডারেশন, ইউরোপীয় সম্প্রদায়, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড অভিনন্দন জানাইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তিচুক্তি নিয়া সংসদে আলোচনার পরামর্শ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিয়া মাঠ গরম না করিয়া সংসদে গিয়া আলোচনার জন্য দাতা দেশসমূহ বিরোধী বিএনপিকে পরামর্শ দিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপানসহ বাংলাদেশকে সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ ইতিমধ্যে শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছে। দীর্ঘদিনের পার্বত্য সমস্যা সমাধানে শান্তিচুক্তির প্রশংসা করিয়া পত্র পাঠাইয়াছে। কিন্তু এখন এ শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করিয়া বিএনপিসহ কয়েকটি ছোট দল যে কর্মসূচী পালন করিতেছে, দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ ইহাকে ভাল চোখে দেখিতেছে না। বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে বিরোধী দল বিএনপিকে বলা হইয়াছে, তাহারা যেন অযথা মাঠ গরম না করে। চুক্তি সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকিলে, কোন বিষয়ে পরামর্শ থাকিলে যেন সংসদে গিয়া আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে।

সূত্র জানায় বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেলজম্যান গত সপ্তাহের প্রথমদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সংগে সাক্ষাৎ করিয়া এ ব্যাপারে তাঁহার দেশের বক্তব্য জানাইয়া দিয়াছেন। কিছু দিন আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটিশ হাই কমিশনারও অনুরূপ বক্তব্য জানাইয়া দিয়াছেন।

ইহাছাড়া অন্যান্য দেশ ও সংস্থার পক্ষ হইতেও বিরোধীদের কাছে তাঁহাদের অনুরূপ বক্তব্য জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত গত বুধবার ঢাকায় এক সেমিনারে বলিয়াছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন কোন বিরোধ ও বিতর্ক নাই, যাহা সংসদের মধ্যে আলোচনা করিয়া নিরসন করা যায় না।

এদিকে গত সপ্তাহে বৃটিশ ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির প্রভাবশালী এমপি উনা শিং বাংলাদেশ সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে চমৎকার চুক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া চুক্তির সফল বাস্তবায়ন কামনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান করিলেন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যদি সে প্রকারে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন, তবে অবশ্যই তিনি খুশী হইতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া
ভাংচুর সহিংস ঘটনা আমরা সমর্থন করি না
- এরশাদ

নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ, এম, এরশাদ বলিয়াছেন, দেশের সর্বত্র অশান্তি ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়াছে। এই অবস্থা হইতে বাঁচার জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য বড় প্রয়োজন। গতকাল শুক্রবার বিকালে বন্দরের কুতুববাগ দরবার শরীফের ওরশ উপলক্ষে আগত পীর জাকির শাহ-এর ভক্তবৃন্দের উদ্দেশে তিনি একথা বলেন। উহার আগে এরশাদ জুমার নামাজ শেষে স্থানীয় সাংবাদিকদের সহিত মতবিনিময়কালে বলেন, দেশের স্বার্থে অবশ্যই শান্তিচুক্তি প্রয়োজন। তবে খেয়াল রাখিতে হইবে এই চুক্তি যেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব খর্ব না করে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, এই চুক্তি নিয়া কাহারো মনে যেন সংশয় না থাকে এ জন্য তাহার উচিত সংসদ ডাকিয়া বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি অথবা সংবিধানের ১০৬ ধারা সুপ্রীম কোর্টের এফিলিয়েট বিভাগে প্রেরণ করা। ইহার মাধ্যমে ভুলভ্রান্তির যেমন অবসান হইবে তেমনি বিএনপিও সংসদে আসিতে বাধ্য হইবে। সাবেক প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করেন, চুক্তির অনেক ধারা উপধারা সম্পর্কে কমিটির অনেক সদস্যই অবগত নন। তিনি সংবিধানের বাহিরে সকল সুযোগ-সুবিধা পাহাড়ীদের দেওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার আহ্বান জানাইয়া বলেন, তারপরও চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ভাংচুর সহিংস ঘটনা আমরা সমর্থন করি না।

দৈনিক ইত্তেফাক
২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তির আলোকে সংশোধনীসহ নূতন আইন
প্রণয়নের বিষয় সংসদে উত্থাপন করা হইবে

শাহজাহান সরদার ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তির আলোকে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহে বেশকিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। এসব কিছুই সংসদে উপস্থাপন করিয়া আলোচনার মাধ্যমে পাস করিতে হইবে। সংসদের অনুমোদন ছাড়া সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নূতন আইন কোন কিছুই কার্যকর হইবে

না। পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নে যেসব আইন পরিবর্তন ও নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হইবে আইন মন্ত্রণালয় সে বিষয়ে কাজ শুরু করিয়াছে। মন্ত্রণালয়ের কাজ শেষ হইলে এ সব আইন পরিবর্তন, সংশোধন ও নূতন আইন প্রণয়নে শীঘ্রই সংসদে উত্থাপন করা হইবে। সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে আইনগুলি পাস করা হইবে। সংসদে পাসের পরই পার্বত্য স্থানীয় পরিষদের আইনগুলি কার্যকর হইবে। পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে সে এলাকার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের কথা রহিয়াছে, উহাকে শান্তি চুক্তি বিরোধীরা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী হিসাবে আখ্যা দিতেছে। এ সম্পর্কে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু গতকাল (শনিবার) ইত্তেফাককে বলেন, স্থানীয় সরকার পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের ধারণা একই। তিনি সংবিধানের ৭(২), ২৬(১-২) অনুচ্ছেদ উল্লেখ করিয়া বলেন, সংবিধানের বাহিরে কোনকিছু করার ক্ষমতা কাহারও নাই। সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদে রহিয়াছে “জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এ সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এ সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অংশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।” ২৬(২) অনুচ্ছেদে রহিয়াছে “রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবে না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে”। আইনমন্ত্রী সংবিধানের ধারাগুলি তুলিয়া ধরিয়া বলেন, সংবিধান বিরোধী কোন আইন সংবিধানমতেই টিকিয়া থাকিতে পারে না। কেহ যদি এমন মনে করেন তাহা হইলে সংসদে আসিয়া আলোচনা করিতে পারেন। অথবা সুপ্রীম কোর্টে আইনের ব্যাখ্যার জন্য যাইতে পারেন। কেননা সংবিধান বিরোধী কোনকিছু হইলে সুপ্রীম কোর্টের নজরে আনিতে আপনা-আপনিই ইহা বাতিল হইয়া যাইবে। যাহারা সংবিধান বিরোধী বলিতেছেন তাহাদের হয় সংসদে গিয়া আলোচনা, না হয় সুপ্রীম কোর্টে ব্যাখ্যার জন্য যাওয়া উচিত।

আইনমন্ত্রী বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধানের ২৮(৪), ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের মধ্যেই করা হইবে। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে রহিয়াছে “নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না”। স্থানীয় শাসনের বিধান সম্বলিত সংবিধানের ৫৯(২) অনুচ্ছেদে রহিয়াছে ‘এ সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষ সংসদ

আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেঃ- (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য, (খ) জনশৃংখলা রক্ষা (গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। সংবিধানের ৬০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে “... স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।” মন্ত্রী সংবিধানের উল্লেখিত অনুচ্ছেদগুলি তুলিয়া ধরিয়া বলেন, চুক্তিতে বর্ণিত আঞ্চলিক পরিষদে যা যা করার কথা আছে, সবই সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে আছে। তিনি প্রশ্ন করিয়া বলেন, জনশৃংখলার মধ্যে কি পুলিশ পড়ে না। একই সংগে তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহেন কোনটি সংবিধানবিরোধী সংবিধানের ব্যাখ্যা দিয়া বলুন। আইনমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য এলাকায় ১৯০০ সালের পার্বত্য আইন ৯৭ বছর ধরিয়া প্রযোজ্য হইয়া আসিতেছে। দেশের সব জেলায় দায়রা জজ আদালত থাকিলেও পার্বত্য তিন জেলায় নাই। ১৯০০ সালের পার্বত্য আইন দ্বারা পরিচালিত। তিনি বলেন, আমাদের দেশে প্রচলিত অধিকাংশ আইনেই বলা আছে এসব আইন পার্বত্য এলাকায় প্রযোজ্য হইবে না। পার্বত্য এলাকায় নিজস্ব স্থানীয় কিছু বিধান আছে। কিন্তু এই বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নাই ইহা ঠিক নয়।

দেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে যেসব বাঙালীদের নিয়া উপজাতীয়দের আবাসভূমি পার্বত্য অঞ্চলে গুচ্ছগ্রাম করিয়া বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয় তাহাদের উচ্ছেদ করা হইবে বলিয়া পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক প্রচারণা করা হইতেছে। এ সম্পর্কে আইনমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি স্পষ্টতঃ বলেন, সেটেলার বাঙালী এবং বহুপূর্ব হইতে বসবাসকারী কোন বাঙালীকেই পার্বত্য এলাকা হইতে বিতাড়িত করা হইবে না। বরং পাহাড়ী বাঙালী সবাই যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে পারে সে ব্যবস্থা চুক্তিতে করা হইয়াছে। তিনি বলেন, এমনও বিরূপ প্রচারণা করা হইতেছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে নাকি আঞ্চলিক পরিষদের সংগে চুক্তি করিতে হইবে। ইহা সত্যের অপলাপ। তেল গ্যাস অনুসন্ধানসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে চুক্তি হইবে। চুক্তি সংসদে উপস্থাপন করা সম্পর্কে তিনি বলেন, সংবিধানের ১৪৫(ক) অনুচ্ছেদ মতে শুধুমাত্র কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে চুক্তি হইলে প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে তাহা সংসদে উপস্থাপন করিতে হইবে। দেশের অভ্যন্তরে কোন চুক্তি সংসদে

উপস্থাপনের কোন বিধান নাই। ইহার পরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন বিরোধী দল চাহিলে আমরা সংসদে চুক্তি নিয়া আলোচনা করিতে রাজী আছি। মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি তিন সরকারের ধারাবাহিক কর্মের ফসল। আগের সরকারগুলিও কাজ করিয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, বলপ্রয়োগে শান্তি আসে নাই। হানাহানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় হইয়াছে। গত ২২ বছর ইহার প্রমাণ, তাই আগের সরকারগুলির আমল হইতেই শান্তি আলোচনা শুরু হয়। তাহারা চুক্তি করিতে পারে নাই। বিএনপি নেতা কর্নেল অলি আহমদ ত্রিপুরা গিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আজ যাহাকে সন্তোষী বলিতেছেন তাহার সংগেই বৈঠক করিয়াছেন। কর্নেল অলি জনসংহতি নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনাকালে যে সব প্রস্তাব তাহাদের দিয়াছিলেন আমরা ইহার চাইতে কম দিয়াও চুক্তি করিতে পারিয়াছি। ইহা সম্ভব হইয়াছে আমাদের রাজনৈতিক সততা ও সদিচ্ছার কারণে। তিনি বলেন, কর্নেল অলি কি কি প্রস্তাব জনসংহতি সমিতিতে দিয়াছিলেন। সবই সরকারের কাছে আছে। মন্ত্রী বলেন, বিএনপি আমলে গঠিত পার্বত্য কমিটিতে আওয়ামী লীগের তিনজন এমপি ছিলেন। তাহারা প্রতিটি সভায়ই যোগদান করেন। এমনকি সংসদ হইতে পদত্যাগের পরও তাহারা বৈঠকে অংশ নেন, আর বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত কমিটিতে বিএনপি সদস্যরা কোন সভায় যোগদান করে নাই। তাহাদের প্রতিটি সভার জন্য চিঠি ও টেলিফোনে যোগাযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আসেন নাই। বৈঠকগুলিতে যোগদান না করিয়া তাহারা আগে হইতেই বিশৃংখলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাহাদের কর্মকাণ্ডে ইহা আজ স্পষ্ট।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

চুক্তির বিরোধিতাকারীরা সংসদে দৃষ্টিভঙ্গী তুলিয়া ধরুন

-আইন মন্ত্রী

আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলিয়াছেন, একটি গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মত ও আদর্শের ব্যবধান সত্ত্বেও পরমতসহিষ্ণুতাও থাকিবে ইহাই সুশীল সমাজ প্রত্যাশা করে। মন্ত্রী গতকাল (রবিবার) ঢাকায় কৃষি ব্যাংক সিবিএ আয়োজিত এক কর্মচারী মহাসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছিলেন। পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে সংবিধানসম্মত আখ্যায়িত করিয়া আইন মন্ত্রী বলেন, সংবিধান বিরোধী কোন চুক্তি স্বাক্ষর করার সাধ্য আওয়ামী লীগ সরকারের নাই। তিনি চুক্তির বিরোধিতাকারীদের প্রতি এ ব্যাপারে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় সংসদে তুলিয়া ধরার আহ্বান জানান। আইনমন্ত্রী বলেন, সকল অরাজকতা

পরিহার করিয়া চুক্তি বিরোধীরা এ ব্যাপারে সংবিধানের রক্ষক দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্টেরও দ্বারস্থ হইতে পারেন। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যবস্থা নেওয়া তথা আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্বলিত অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে সৈনিক জিয়ার অবদানের প্রশংসা করিয়া মন্ত্রী বলেন, মরহুম জিয়া কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলিয়া দাবী করেন নাই। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহসান মাস্টার এমপি, কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ডঃ মীর্জা আবদুল জলিল ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুস সালাম খান। —তথ্য বিবরণী

দৈনিক ইত্তেফাক

২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি সম্পর্কে

বাঙ্গালীদের মনে আস্থা ফিরিয়াছে

— মোহাম্মদ নাসিম

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলিয়াছেন, শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বাঙ্গালীদের মনে আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বিরোধী দল সৃষ্ট ভয় এবং সন্দেহের ধোয়ার আবরণ অপসৃত হইয়াছে।

গত পাঁচদিন যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চল সফর শেষে গতকাল (শনিবার) তাঁহার বাসভবনে ইউএনবির সহিত এক স্বাক্ষারকালে মন্ত্রী বলেন, শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিএনপি ও ইহার মিত্র দলগুলোর অপচেষ্টা তিন পার্বত্য জেলার জনগণ নস্যাত করিয়া দিয়াছে। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙ্গালীরা এখন এই মর্মে আশ্বস্ত হইয়াছেন যে, তাহাদের জমি-জমা এবং ভোটের অধিকার খর্ব করা হয় নাই এবং সেনাবাহিনী সেখানে অবস্থান করিবে। মন্ত্রী বলেন, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি শীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কাজ শুরু হইবে এবং এই অঞ্চলের উপজাতি ও বাঙালীরা শান্তি চুক্তির সুফল লাভ করিতে শুরু করিবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই সফরকালে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীর মোহাম্মদ নাসিমের সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শীঘ্রই শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিবিসিকে অর্থমন্ত্রী

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে

যুক্তরাষ্ট্রসহ দাতাদেশগুলি সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছে

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে সরকার ও উপ-জাতীয় জনসংহতির মধ্যে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল দাতাদেশ সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছে। অর্থমন্ত্রী শাহ এএসএম কিবরিয়া গতকাল শনিবার বিবিসি'কে একথা বলিয়াছেন। কিন্তু বাংলাদেশ কি পরিমাণ সাহায্য চাহিবে তাহা এখনও চূড়ান্ত হয় নাই বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, এমাসেই তিনি সকল দাতা দেশের সহিত বৈঠক করিবেন। যাহাতে তিনি পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন এবং শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন তাহা তুলিয়া ধরিবেন। আর সেই প্রেক্ষিতেই এই বৈঠকে দাতাদের সাহায্যের পরিমাণ চূড়ান্ত হইবে বলিয়া জনাব কিবরিয়া আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, গত ২রা ডিসেম্বর ঢাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পর পরই তিনি পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন ও চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য চাহিতে দাতা দেশগুলির সহিত বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল দাতাদেশ সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছে এবং কোন কোন খাতে কি পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন তাহা তাহারা জানিতে চাহিয়াছে।

অর্থমন্ত্রী জানান, পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে সাহায্যের প্রয়োজন হইবে এমন ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রগুলি হইতেছে পার্বত্য এলাকার প্রশাসনিক অব-কাঠামো ও সড়ক উন্নয়ন, উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়দের পুনর্বাসন, পর্যটন, কুটির শিল্প স্থাপন, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ বৃদ্ধি করা। এই খাতগুলিকে তিনটি মেয়াদে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যাহার মধ্যে দুই বছরের জন্য নির্ধারিত খাতকে স্বল্পমেয়াদী, পাঁচ বছরের খাতকে মধ্য মেয়াদী এবং দশ বছরের প্রকল্পগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী বলা হইবে। কিন্তু মোট কি পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন হইবে বা বাংলাদেশ সরকার কি পরিমাণ সাহায্য চাহিবে তাহা এখনও চূড়ান্ত হয় নাই বলিয়া অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া জনাইয়াছেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বিশেষ সম্পর্ক বিভাগ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে।

এদিকে সরকারের বিশেষ সম্পর্ক বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, দাতাদের নিকট দেওয়ার জন্য সাহায্যের প্রস্তাব সম্মিলিত, একটি খসড়া তাহারা তৈরী করিয়াছেন। যাহাতে তিন মেয়াদে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হইবে বলিয়াও তিনি জানান। বিশেষ সম্পর্ক বিভাগের এই কর্মকর্তা আরও জানান, জনসংহতি সমিতির সদস্য শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও তিন পার্বত্য জেলার প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন, আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়দের কর্মসংস্থানের জন্য কৃষিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে জরুরী ভিত্তিতে দুইশত কোটি টাকার প্রয়োজন। তবে তিন মেয়াদের উন্নয়ন পরিকল্পনার বাহিরে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে জরুরী ভিত্তিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহাতেও দাতা দেশগুলি সাহায্য করিবে বলিয়া অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি প্রশ্নে সংসদের

ভিতরে ও বাহিরে আলোচনা হওয়া উচিত

— মেনন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন বলিয়াছেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে আমরা অগ্রগতি মনে করি। তবে এ ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্যের জন্য সংসদের ভিতরে এবং বাহিরে সকল দলের মধ্যে যে কোন ভাবেই হউক আলোচনা হওয়া উচিত। আমার মতে চুক্তিতে কিছু অসংগতি আছে। আলোচনার মাধ্যমে এসব দূরীভূত হইতে পারে। তবে চুক্তি বাতিল করিয়া আলোচনা হইতে হইবে এমনটি আমি মনে করি না। কেননা আমাদের পিছাইবার কোন অবকাশ নাই। পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাতিল করিয়া সংসদের সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠকের জন্য বিএনপি প্রেসিডেন্টের প্রতি যে আহ্বান জানাইয়াছে এ ব্যাপারে রাশেদ খান মেননের প্রতিক্রিয়া জানিতে চাহিলে তিনি আরও বলেন, আমরা নিশ্চিতভাবে শান্তির পক্ষে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এখন সকল দলের মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন। চুক্তির অসংগতি দূর এবং শান্তি নিশ্চিত করিতে হইলে জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্টের প্রতি বিএনপি'র গোলটেবিল আহ্বানের দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহা তাহাদের দাবী। আমাদের কোন মন্তব্য নাই। আমরা চাই শান্তি।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শরণার্থী প্রত্যাবাসন বিষয়ে

আগামীকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বৈঠক

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ৷ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ৬টি আশ্রয় শিবির হইতে অবশিষ্ট ৩৫ হাজার চাকমা শরণার্থীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে আগামীকাল মঙ্গলবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কিট হাউসে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স এবং উপজাতীয় শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতাদের মধ্যে ষষ্ঠ পর্যায়ের শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের বিষয় লইয়া এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব কাজী গোলাম রহমান, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল, শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষে সমিতির চেয়ারম্যান উপেন্দ্র লাল চাকমা, রঞ্জিত নারায়ণ ত্রিপুরা, রবীন্দ্র লাল চাকমা, প্রভাকর চাকমা উপস্থিত থাকিবেন। উল্লেখ্য বর্তমান সরকারের আমলে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে প্রায় ২০ হাজার শরণার্থী দেশে ফিরিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

শান্তি চুক্তি উন্নয়নের শক্ত ভিত হিসাবে কাজ করিবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ গতকাল (রবিবার) রাজধানীতে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিঃ আইনগত ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত’ শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা উল্লেখ করেন, বিজয়ের মাসে স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি দেশের ভবিষ্যতের উন্নয়নের শক্ত ভিত হিসাবে কাজ করিবে। চুক্তি স্বাক্ষরকে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভিনন্দনে সেই বাস্তবতার পরিচয় মিলিয়াছে। তাহারা বলেন, সংবিধানের আওতায় এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

এখন রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য একটি মহল ইহার বিরোধিতা করিতেছে। তবে বক্তারা এই চুক্তি নিয়া সংঘাত-সহিংসতার পথ পরিহার করিয়া আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের তাগিদ দিয়াছেন।

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (সোডাক)-এর বিইউবি মিলনায়তনে আয়োজিত এই আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন সোডাকের সভাপতি ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ও সৈয়দ শফিক আহমদ। আলোচনায় অংশ নেন জাসদ সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, সাবেক রাষ্ট্রদূত এমএম রেজাউল করিম, ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম, অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম, ডঃ হারুন অর রশীদ, অধ্যাপক এম, এম, আকাশ, ডঃ ফেরদৌস হোসেন, মঞ্জুরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন নিলুফার বানু।

হাসানুল হক ইনু বলেন, আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও বাঙালী যুদ্ধ করিত। আর এখন শান্তি চুক্তির পর বাঙালী-বাঙালী যুদ্ধ করিতেছে। এই চুক্তি সাংবিধানিক কিনা তাহা আদালত দেখিবে। আর চুক্তিতে বাঙালী অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা তাহা নিয়া আলোচনা হইতে পারে। ইনু বলেন, আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য এই চুক্তিকে কেহ ব্যবহার করিবেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী-পাহাড়ী যুদ্ধ লাগিলে রাষ্ট্র তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। এই চুক্তির মাধ্যমে উপজাতিদের প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম বলেন, বর্তমান চুক্তিতে উপজাতিদের বিশেষ ছাড় দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর হইতে খালোদা জিয়ার শাসনকালে শান্তি বাহিনীর নেতাদের সহিত যে ১৩ দফা বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে ইহার চাইতে অনেক বেশী ছাড় দেওয়ার কথা ছিল। তিনি বলেন, চুক্তি নিয়া খালোদা জিয়া রাখাল বালকের মত বাঘে খাইয়া ফেলিল বলিয়া বারবার চিৎকার করিতেছেন। কিন্তু ইহা রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসুলভ নয়।

ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম বলেন, বিশ্বের অনেক দেশেই বহুকাল ধরিয়া এই ধরনের জাতিগত সমস্যা রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা সমাধান করিতে ব্যর্থ হইতেছে। সেখানে সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশে ইহা সম্ভব হইয়াছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

রেজাউল করিম বলেন, দেশ এখন এই শান্তি চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পার্বত্য জেলার বেশীর ভাগ বাঙালীই এই চুক্তির বিপক্ষে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ পালন করিতেছে। তিনি বলেন, পার্বত্য জেলার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাদেশে অশান্তি ছড়ান হইতেছে। এখন উচিত সকল দলমত মিলিতভাবে এই সমস্যার সুরাহা করা।

অধ্যাপক এম. আমিনুল ইসলাম বলেন, এই চুক্তি নিয়া আলোচনা হইতে পারে। সেই পরিবেশ তৈরী করিতে হইবে।

ডঃ হারুন-অর রশীদ বলেন, খালোদা জিয়া যখন বলেন, শান্তি চুক্তি বাতিল ছাড়া আলোচনা নহে তখন আমরা হতাশ হই। তিনি বলেন, অতীতের ধারাবাহিকতায় এই চুক্তি স্বাক্ষর হইয়াছে। নূতন কিছু নহে।

সৈয়দ শফিক আহমদ তাহার প্রবন্ধে বলেন, পার্বত্য উন্নয়নের ফসল কিছুটা হইলেও গোটা দেশবাসীর প্রাপ্য। প্রত্যাগত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই সাহায্যনির্ভর।

ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, শান্তি চুক্তি করিলেই হইবে না হই। বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

মন্ত্রিসভার বৈঠকে শান্তি চুক্তি অনুমোদন

বাসস ৥ মন্ত্রিসভা গতকাল সোমবার সরকার মনোনীত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্মতি স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি অনুমোদন করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল চিকিৎসা, প্রাইভেট ক্লিনিক এবং ল্যাবরেটরী নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ করার জন্য একটি কেবিনেট কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বৈঠকে ১৯৯৮ সালের সরকারী ছুটির তালিকাও অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রীবর্গ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীগণ, কেবিনেট সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সচিবগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য জেলায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের শান্তি মিছিল

বান্দরবান হইতে বাসস ৥ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল তিনটি পার্বত্য জেলা সফর করিবে এবং ২৫শে ডিসেম্বর হইতে তিনদিনব্যাপী একটি ‘শান্তি মিছিলে’ অংশগ্রহণ করিবে। এই শান্তি মিছিল কর্মসূচীর মধ্যে ২৫শে ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় রাঙ্গামাটি সদর থানায় শান্তি সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৭শে ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় বান্দরবান সদর থানায় শান্তি সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত এই মিছিলের সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করিবেন। এই কর্মসূচীতে ১৪ জন টেলিভিশন শিল্পী, প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার এবং নাট্যকর্মী অংশগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তি লইয়া বিএনপি
রাজনীতি শুরু করিয়াছে
— এরশাদ

সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ বলিয়াছেন, স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি লইয়া বিএনপি রাজনীতি শুরু করিয়াছে। যে করিয়াই হউক তাহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিতে চায়। এদিকে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছে। জনগণ এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ চায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় জাতীয় পার্টির কোন বিকল্প নাই।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁও সার্কিট হাউসে জেলা জাতীয় পার্টি এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে দলীয় চেয়ারম্যান এরশাদ একথা বলেন। এর আগে তিনি সকালে সড়ক পথে রংপুর হইতে ঠাকুরগাঁও জেলার রানিসংকাইল থানার সীমান্ত এলাকা ধর্মগড়ে যান। এ সময় তিনি চিকনী, পারকুণ্ডা, বালিয়াডাঙ্গিসহ বিভিন্নস্থানে কয়েকটি পৃথক পথসভায় বক্তব্য রাখেন।

বিএনপি সরকারের দুর্নীতির বর্ণনা দিয়া জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে তাহারা সার ও চাল বিক্রয় করিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করিয়া ২০ বছর ক্ষমতায় থাকিতে চাহিয়াছিল। রিলিফ ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ করিয়া তাহারা নির্বাচন করিয়াছে। ওই সময় ছাত্রদলের নেতাকর্মী ছাড়া কেহ টেঙার পায় নাই। ১০০ কোটি টাকার মিল ৩ কোটি টাকায় বিক্রয় দেখাইয়া বাকী টাকা তাহারা আত্মসাৎ করে। এখন বিরোধী দলে থাকিয়া বিএনপি হরতাল আর নৈরাজ্যের রাজনীতি চালু করিয়াছে। ফলে মানুষের মনে বিএনপির প্রতি চরম বিতৃষ্ণা দেখা দিয়াছে।
—প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে বাঙ্গালীদের
স্বার্থের পরিপন্থী কিছু নাই
— জিল্লুর রহমান

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে বাঙ্গালীদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু নাই। বরং সেখানে

বসবাসরত বাঙ্গালী-পাহাড়ী জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং দেশের অর্থগতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা সুসংহত করিতে এই চুক্তি শক্তিশালী ভূমিকা রাখিবে।

মন্ত্রী গতকাল সোমবার খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িতে পার্বত্য শান্তিচুক্তির সাফল্যে স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙালীদের আয়োজিত এক স্বতঃস্ফূর্ত শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং স্থানীয় বাঙালী ও পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। জনাব জিল্লুর রহমান বলেন, বিগত একশ বছরের রাজনৈতিক সরকারগুলির নেতৃত্বে ব্যর্থতার কারণে পার্বত্য এলাকার জনগণের আস্থা অর্জন করিতে না পারায় সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির উপর বিরোধীদলের সংসদে কথা বলা উচিত। জিল্লুর রহমান বলেন, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের প্রশংসা করিয়াছে এবং তিন পার্বত্য জেলার প্রশাসনিক অবকাঠামো ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাঙালী ও পাহাড়ী জনগণের পুনর্বাসন, পর্যটন, কুটির শিল্প স্থাপন, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণে দাতাদেশ ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা সহযোগিতা তহবিল গঠনে আগাইয়া আসার আশ্রয় প্রকাশ করিয়াছে। —তথ্য বিবরণী

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তির প্রশংসায় ডাচ মন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৯ নেদারল্যান্ডের সমাজকল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এপিডব্লিউ মেলকার্ট ছয়দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফরশেষে স্বদেশের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে গতকাল (শুক্রবার) শেরাটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন : এদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারের পাশাপাশি সরকারী সংস্থার তৎপরতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রশংসা করিয়া তিনি বলেনঃ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শুধু এতদঞ্চলের উন্নয়নই ত্বরান্বিত করিবে না— বিদেশী সাহায্য এবং বিনিয়োগও উৎসাহিত করিবে। শিশু শ্রম অবসানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এ, পি, ডব্লিউ বেলকার্ট বলেন, আইএলও সনদে স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড শিশু শ্রম অবসানে অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৯৮ সনে অনুষ্ঠিতব্য আইএলও সম্মেলনেও বাংলাদেশ

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। বর্তমান বাংলাদেশ সফরকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ উল্লেখ করিয়া সমাজকল্যাণ ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী বলেন : উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অধিকতর উন্নতি হইবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান এবং শ্রম ও জনশক্তি সচিবও বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

খাগড়াছড়িতে শান্তি সম্মীতি অভিযাত্রা অনুষ্ঠান

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ৥ গতকাল (শুক্রবার) বিকালে জেলা সদরস্থ হাইস্কুল মাঠে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে “শান্তি সম্মীতি অভিযাত্রা” শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে দেশের খ্যাতনামা কয়েক জন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, নাট্যকার, সাংবাদিক ও শিল্পী পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-সম্মীতি কামনা করিয়া বক্তব্য রাখেন।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সম্পাদক ও সমন্বয়কারী আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে খাগড়াছড়ির এমপি কল্লরঞ্জন চাকমা, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক ও নাট্যকার হাসান ইমাম, অভিনেতা খালেদ খান, আসাদুজ্জামান নূর, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবির, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল ও জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক মোঃ জাহেদুল আলম বক্তব্য রাখেন। বক্তারা উল্লেখ করেন, পার্বত্যঞ্চলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ গড়িয়া তোলাই আমাদের অঙ্গীকার। শান্তির আবাসভূমি হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আমরা দেখিতে চাই। তাহারা বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলের অশান্তি আর সন্ত্রাস বন্ধ করা হইয়াছে।

সংসদ সদস্য কল্লরঞ্জন চাকমা তাহার বক্তব্যে বলেন, বিরোধী দল পার্বত্য চট্টগ্রামে অপপ্রচার আর বিভ্রান্তি ছড়াইয়া অশান্তি সৃষ্টির পায়তারা করিতেছে। চুক্তিতে বাঙ্গালীদের ভোটাধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী অবস্থানের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া যাহারা গত দুই যুগ ধরিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি জিয়াইয়া রাখিয়াছিল তাহরাই আজ শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিতেছে।

পরে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পী খুরশীদ আলম, কদ্দুস বয়াতী, ফকির সাহাবুদ্দিন, কল্লনা লালা, বিপুল ভট্টাচার্য প্রমুখ সংগীত পরিবেশন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পক্ষে ৫৫০ জন বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বিরোধী দলের সাম্প্রদায়িক তৎপরতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার আহ্বান জানাইয়া দেশের ৫৫০ জন বিশিষ্ট নাগরিক গতকাল (শুক্রবার) এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, একাত্তরে যাহারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী ছিল তাহারা কখনও বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম সত্তা মানিয়া নিতে পারে নাই। তাহারা সুযোগ পাইলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠনের উপর হামলা চালাইয়াছে। তাহারা দেশবরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মুরতাদ বলিয়াছে, ফতোয়াবাজি করিয়া গ্রামাঞ্চলে নারী সমাজের স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা চালাইয়াছে এবং বিভিন্নভাবে আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চক্রান্ত করিয়াছে। শতাব্দী প্রাচীন জটিল ও বহুমাত্রিক জাতিগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে একটি মাইলফলক হিসাবে উল্লেখ করিয়া বিবৃতিতে বলা হয়, এই শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র সংঘাত ও অশান্ত পরিবেশ শান্ত ও স্বাভাবিক করার পথ সুগম হইয়াছে। একই সঙ্গে এ এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছে। ঘোষণায় বলা হয়, গত আঠার বৎসর যাবৎ এ এলাকার যুদ্ধাবস্থা, সামরিক তৎপরতা, পাহাড়ী সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ ইত্যাদি ঘটনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করিয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিবে বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, সংবিধানের ৯, ১১, ২৬, ২৮, ৪২, ৫৯ ও ৬০ ধারা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সম্পাদিত এই চুক্তি দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইলেও বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলসমূহ ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিতে চাহিতেছে। আমরা বিজয় দিবসের ২৬তম বার্ষিকী উদযাপনকালে ঘোষণা করিতেছি, যে মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়া আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিয়াছি, সেই আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনের পরিপন্থী যে কোন প্রয়াস আমরা প্রতিহত করিব। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন—বেগম সুফিয়া কামাল, কথাসিল্পী শওকত ওসমান, বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বিচারপতি কে এম সোবহান, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, কবি শামসুর

রাহমান, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম, এডভোকেট গাজীউল হক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সৈয়দ শামসুল হক, কবীর চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ।
-প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দল বিপরীত মেরুতে

চুক্তি বাতিলের প্রশ্নই উঠে না : মোহাম্মদ নাসিম

রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করিব : মান্নান ভূঁইয়া

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৷ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়া সরকারী দল ও বিরোধী দল বিএনপি এখনও বিপরীত মেরুতেই রহিয়াছে। জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশনে বিরোধী দলকে ফিরাইয়া নেওয়ার ব্যাপারে খুব শীঘ্র সরকারী দল আবারও উদ্যোগ নিবে বলিয়া ডাক, তার ও পূর্তমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম জানাইয়াছেন। তবে সংসদে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যাপারে বিএনপি চেয়ারপারসন ইতিপূর্বে বলিয়া দিয়াছেন, চুক্তি বাতিল করিতে হইবে। না হইলে সংসদে যাইব না। কিন্তু মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলিয়াছেন, চুক্তি বাতিলের প্রশ্নই উঠে না। দীর্ঘদিন আলোচনার পরে শান্তির লক্ষ্যে এই চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে। চুক্তি বাতিল করিব কোন যুক্তিতে? বিএনপি'র এই দাবী অযৌক্তিক। তিনি বলেন, ইহা বিদেশের সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি নহে, ইহা দেশের অভ্যন্তরের বিষয় নিয়া সম্পাদিত একটি সমঝোতা স্মারক। ইহা সংসদে উত্থাপনের কোন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নাই। তবুও এই বিষয়ে সকলের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইহা সংসদে উত্থাপিত হইতেছে। চুক্তির ব্যাপারে বিএনপি'র কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহা লইয়া আলোচনা হইতে পারে। আর আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যও তো হইতে পারে।

বিরোধী দলীয় নেত্রী বলিয়াছেন, চুক্তি সম্পাদনের পরে এই চুক্তি লইয়া আলোচনার কোন সুযোগ নাই। এ ব্যাপারে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, শান্তি চুক্তির কোথায় আপত্তি তাহা বলার উপযুক্ত স্থান হইতেছে সংসদ। আর গোলটেবিল বৈঠক হইলে তাহা হইবে গোপনে, ইহা দেশবাসী জানিতে পারিবে না। কিন্তু সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনা টেলিভিশন, বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হইবে। বিরোধী দল যতক্ষণ বলিতে চাহে বলিবার সুযোগ পাইবে।

এদিকে, সংসদে যাওয়ার ব্যাপারে বিএনপি মহাসচিব পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। ৪ দফা চুক্তি ও ১৪ দফা দাবী মানিয়া নেওয়া, মামলা বাতিল ও গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি, সভা-সমাবেশের নিষেধাজ্ঞা

বাতিল এবং পার্বত্য চুক্তি বাতিলের বিষয়টিই বিএনপি পরিবেশ সৃষ্টির পূর্বশর্ত বলিয়া মনে করে। মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, ইতিমধ্যেই অনেক দাবী মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহার পরেও যদি কোন বিষয়ে তাহাদের আপত্তি থাকে তাহা হইলে আমি কালকেই আলোচনায় বসিতে প্রস্তুত। তবে তাহাদের কোন দাবীটিই যে আসল তাহা বোঝা বেশ কঠিন।

বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি নিয়া সংসদে আলোচনায় যাইতে রাজী নয়। আবার সংবিধান বিরোধী হইয়াছে দাবী করে। অথচ আদালতে যাইতে চাহেন না। বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংবিধান বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইয়াছে। এই চুক্তির মাধ্যমে নাগরিকে নাগরিকে প্রভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। অ-উপজাতীয়দের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হইয়াছে সরকার ও সংসদের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। সর্বোপরি বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা উৎসাহিত দেওয়া হইয়াছে, যাহা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। ইহা সবগুলিই রাজনৈতিক বিষয়। ইহাকে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা ও ফয়সালা করা দরকার।

এদিকে, অনেকেই মনে করিতেছে যে, সরকার ও বিরোধী দলের আলোচনার মাধ্যমে যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বিরোধী দল চুক্তির ব্যাপারে কোন সাংবিধানিক অসংগতি উত্থাপন করিলে স্পীকার উহা সুপ্রীম কোর্টে পাঠাইবেন এবং সুপ্রীম কোর্টই ঐ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে।

আর ইহার মাধ্যমে জটিলতা নিরসন হইতে পারে বলিয়া সরকার ও বিরোধী দল বিএনপি'র অনেকে মনে করেন। এই উদ্যোগ এখনও চূড়ান্ত রূপ পায় নাই। তবে এমন যাহারা ভাবেন তাহারা প্রকারান্তরে হয় স্বগতি বা বাতিল করার কথাই ভাবিয়া থাকেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলে

উন্নয়নের পথ সুগম হইয়াছে

- ডঃ মহীউদ্দিন আলমগীর

পরিকল্পনা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর বলিয়াছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি দেশের অখণ্ডত্ব, সার্বভৌমত্ব, সংবিধান, মানবাধিকার ও মানবিক মূল্যবোধের আওতায় সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই চুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী পাহাড়ী ও বাঙ্গালীগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের পথ সুগম হইয়াছে। গতকাল (শনিবার)

রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু যুব পরিষদ আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক শীর্ষক এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

আবদুল জলিল ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তৎকালীন সরকার স্বীয় স্বার্থ হাসিল ও জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোর জন্য ঐ অঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তির ফলে ঐ এলাকায় শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বর্তমানে সেখানে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। – প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক

১ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তি বিরোধিতার নামে
কিছু দল সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়াছে
– মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ১ গত মঙ্গলবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলিয়াছেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি জাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মাইলফলক। নেতৃবৃন্দ শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের চেয়ারম্যান আবীর আহাদ, সেক্রেটারী জেনারেল এস এম ইউনুস আকবর, সহসভাপতি সিরাজউল হক, আয়েশা বেগম, শামসুল আলম দুদু, মাওলানা মোঃ সাদেক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যক্তি ও দল দেশে নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়াছে। যাহা দেশের অগ্রগতি ও সন্ত্রাসের পরিপন্থী। নেতৃবৃন্দ বলেন, সংকীর্ণ রাজনীতির ফল দেশকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে
সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়ার আহ্বান

গত দুইদিনব্যাপী পার্টি প্রধান দিলীপ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের (মা-লে) সভার প্রস্তাবে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছে। সভায় বলা হয়,

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়া বর্তমান সরকার জনসংহতি সমিতির সহিত যে শান্তি চুক্তি করিয়াছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে তাহা প্রাথমিক পদক্ষেপ। সভায় শান্তি চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিগুলির কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সভায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, একদিকে সরকার আমলা নির্ভর হইয়া পড়িয়াছেন, অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত হাত মিলাইয়া নীতিহীন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অস্থির। – প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক

২ জানুয়ারি ১৯৯৮

জনসংহতি সমিতির নিকট
যোগাযোগ কমিটির জরুরী পত্র

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ১ শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কতিপয় শর্তাবলী সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির মতামত জানিতে চাহিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি গতকাল (বৃহস্পতিবার) একটি জরুরী পত্র পাঠাইয়াছেন। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা স্বাক্ষরিত পত্রে জানিতে চাওয়া হয় যে, জনসংহতি সমিতি তাহাদের সদস্যদের নামের তালিকা এবং সমিতির আয়ত্তাধীন নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা কবে নাগাদ সরকারের নিকট জমা দিবেন।

আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানান, চুক্তি অনুযায়ী এসব তালিকা চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। তিনি জানান, জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্যে সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে। হংসধ্বজ চাকমা সাংবাদিকদের বলেন, চুক্তি অনুযায়ী সেই মেয়াদ শেষ হইতে আর মাত্র দুই সপ্তাহ বাকী। তিনি অবশ্য ইহাও বলেন যে, শান্তি বাহিনীর ক্যাম্পগুলি ইতিমধ্যে গুটাইয়া ফেলা হইয়াছে। অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলিও সামরিক হাইকমান্ড জমা নিয়াছে। তিনি বলেন, তাহার জানা মতে জনসংহতি সমিতি তাহাদের ৬টি সেক্টরের মধ্যে ৪টি সেক্টরের যথাক্রমে ঢাকা, সিলেট, যশোর ও বগুড়ার সদস্যদের তালিকা চূড়ান্ত হইয়াছে। জনসংহতি সমিতির নির্দেশের প্রেক্ষিতে শান্তি বাহিনীর চাঁদা

আদায়, কর আদায় ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিয়া স্বাভাবিক জীবন যাত্রার খুব কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে।

এদিকে উপজাতীয়দের মধ্য হইতে কল্লরঞ্জন চাকমা এমপিকে মন্ত্রী নিয়োগ করায় হংসধ্বজ চাকমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, চুক্তি অনুযায়ী একটি পৃথক মন্ত্রণালয় (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক) গঠন এবং তাহাকে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। হংসধ্বজ চাকমা ইত্তেফাককে গতকাল সন্ধ্যায় বলেন, অস্ত্র সংবরণ এবং চুক্তির বিভিন্ন দিক বাস্তবায়ন লইয়া জনসংহতি সমিতি সম্মত হইলে খুব শীঘ্রই খাগড়াছড়িতে জাতীয় কমিটির সহিত একটি বৈঠক হইতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

আরও ৯৬৯ জন শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার আশ্রয় শিবির হইতে চাকমা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার ষষ্ঠ পর্যায়ের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (শুক্রবার) আরও ১ শত ৯৪ পরিবারের ৯ শত ৬৯ জন শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। জেলার রামগড় থানার ডাকবাংলো ঘাট দিয়া সকাল ৯টা হইতে বিকাল পৌনে ৪টা পর্যন্ত প্রত্যাবাসন কাজ শুরু হয়। গত দুইদিনে এই সীমান্ত পথে ৩ শত ৭৮ পরিবারের ১ হাজার ৯ শত ১১ জন শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আজ (শনিবার) সীমান্তের ওপারের সাত্ৰম মহকমার কাঠালছড়ি শরণার্থী শিবির হইতে আরও ১ শত ৭৩ পরিবারের এক হাজার ২৭জন শরণার্থী দেশে ফিরিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়িতে শান্তিচুক্তির

পক্ষে-বিপক্ষে সমাবেশ মিছিল

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ শান্তি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে গত শুক্রবার খাগড়াছড়ির বিভিন্ন স্থানে সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শান্তি চুক্তির সমর্থনে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে জেলা সদর খাগড়াছড়ি ছাত্রলীগ-এর উদ্যোগে সালকাতাল ক্লাবে এক ছাত্র সমাবেশ ছাত্রনেতা নবরত্ন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতা শক্তি ত্রিপুরা, যুবলীগ নেতা রণজিত দে, ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, স্বপন চৌধুরী,

রফু মারমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা উল্লেখ করেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে বাঙ্গালী-পাহাড়ী সকল সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

এদিকে গতকাল (শুক্রবার) পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (ক্ষোয়াই অং পলাশ) খাগড়াপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে শান্তি চুক্তির পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়া এক সভা মধু কুমার ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বলা হয়, দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশী সময়ের রক্তাক্ত সংঘর্ষের অবসান ঘটাইবার জন্যই সরকার ও জনসংহতি সমিতি শান্তি চুক্তি করিয়াছে। বক্তারা শান্তিচুক্তিকে ঐতিহাসিক চুক্তি আখ্যায়িত করিয়া চুক্তির বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং শান্তি চুক্তির দ্রুত যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় ব্রজকিশোর ত্রিপুরা, অংক্যজাই মারমা, সুকুমার দেওয়ান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

গতকাল সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি জেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে, দলীয় কার্যালয়ে পার্বত্য শান্তি চুক্তির সমর্থনে সাদা পতাকা উত্তোলন করিয়াছে। এই উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সভায় ছালেহ আহমদ, রণজিত দে, আকবর হোসেন, শিবু শংকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

অপরদিকে গতকাল দুপুরে জেলার মাটিরাঙ্গা থানা শহরে শান্তি চুক্তি বাতিলের দাবীতে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আবু ইউসুফ চৌধুরী ও মোঃ নাসির উদ্দিন অবিলম্বে চুক্তি বাতিলের জন্য আন্দোলন আরও বেগবান করার জন্য সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ও

সাংবিধানিক ক্ষমতা বিন্যাস

– ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি সমঝোতায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাতে বহুদিনের একটি জটিল এবং পুরাতন সমস্যা সমাধানের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যা বিদ্যমান। এর উৎপত্তি ঘটে ঘাট দশকের তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকদের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে। কাণ্ডাই হাইড্রোলিক প্রজেক্ট নির্মাণ করতে যেয়ে লক্ষ লক্ষ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, জমি-জমা, বাগান, এক অর্থে জীবন-জীবিকার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ তা সবই পানির নিচে তলিয়ে দেওয়া হয়। আজও

পর্যন্ত তা জলমগ্ন। পাহাড়ের টিলায় টিলায় কোন রকমে জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার অদম্য প্রয়াস নিয়ে বেঁচে আছে এগারটিরও অধিক উপজাতি। জীবিকার সুব্যবস্থা করার জন্য যেসব উপযোগী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন এ সবই পাহাড়ী অঞ্চলে অসম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উপজাতিরা তাদের ক্ষুদ্র জাতি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সোচ্চার হচ্ছিল ৭৫-এর পরবর্তী সময়ে বাঙালীদের বসতি স্থাপনের ফলে উপজাতিদের মনে নতুনভাবে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি ঘটে। অউপজাতীয়দের অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে আগত লোকসংখ্যা যখন প্রায় ৪৪% (চুয়াল্লিশ ভাগ) দাঁড়ায় তখন উপজাতীয়রা শংকিত হয়ে পড়ে। জন্ম নেয় গভীর অবিশ্বাসের। সময় ও কাজের আবর্তে শান্তি বাহিনীর ক্যাডাররা আইনশৃংখলায় নিয়োজিতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সামরিক বাহিনী, বি, ডি, আর এরাও পাল্টা জবাব দেয়। গুরু হয় অশান্ত পরিবেশ। যা কোনভাবেই কারও কাম্য নয়।

দীর্ঘদিন ধরে মানবতাবিরোধী ও অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষ চলতে থাকে। ঐ অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজ, খনিজ সম্পদ আহরণ এসবে বাধাগ্রস্ত হয়ে অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় স্থবিরতা। যার দরুন উন্নয়নমূলক কাজগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের দলমত নির্বিশেষে সকল জনগণ এবং ওয়াকিফহাল মহল বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে একটি ঐকমত্য সৃষ্টি হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং প্রকৃতপক্ষে এর কোনও সামরিক সমাধান নেই। এই উপলব্ধির সূত্র ধরে জেনারেল এরশাদ। ক্ষমতা দখলের পর ১৯৮২ সালে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালে শান্তি বাহিনীর নেতাদের সাথে আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা হতে থাকে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯ সালে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত পদ্ধতিতে জেলা পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে ১৯৮৯ পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চিটাগাং হিলট্রান্স রেগুলেশন ১৯০০ দ্বারা শাসিত হতো। ১৯৮৯ সালে এই চিটাগাং হিলট্রান্স রেগুলেশন রহিত করা হয়। এর পূর্বে প্রায় ১০০ বছর ধরে যে সকল আইন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল অথবা পাকিস্তান আমলে কিংবা বাংলাদেশ হওয়ার পরও যে সকল আইন প্রণীত হয়েছিল তার অনেক আইনই এই অঞ্চলে প্রযোজ্য ছিলো না। চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ এর অন্তর্ভুক্ত যে সকল আইন প্রয়োগযোগ্য শুধু সেগুলিই প্রযোজ্য ছিল এ অঞ্চলে। চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাসমূহে চাকমা রাজা, মং রাজা, মুরাং রাজাদের যে সকল অধিকার তা অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখা হয় এবং তারা যে সকল প্রথা

পালন করেন তা বলবৎ থাকে। এছাড়া হেড ম্যানেজার প্রথা বলবৎ থাকে এবং তাদেরকে তহশীলদারের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র ফাঁসির আসামী ছাড়া হাইকোর্টে বা অন্য কোনও উচ্চ আদালতে কারও আপীল করার সুযোগ ছিল না। ডেপুটি কমিশনারের জেলা ও সেশন জজের এখতিয়ার এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার হাইকোর্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকতো। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এটিই ছিলো আইন।

১৯৮৯ সালে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়। ঐ আইন দ্বারা প্রত্যেকটি জেলাতে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। এবং ঐ আইনে এটা বলা হয় যে, এর চেয়ারম্যান হবেন উপজাতীয়। উনিশ জন উপজাতীয় সদস্য এবং ১১ জন অউপজাতীয়। এই সকল আইনের মাধ্যমে ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতি এই ব্যবস্থা মেনে নেয়নি। তাদের দাবী ছিল অউপজাতীয়দের সরিয়ে নেওয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন মেনে নিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করে ঐ অঞ্চলকে বিশেষ স্টেটস ও ক্ষমতা প্রদান। বেগম খালেদা জিয়ার আমলে ১৩টি বৈঠক হয় এবং জনাব অলি আহমদের নেতৃত্বে যে সকল ছাড় দিতে চেয়েছিলেন তা বর্তমান চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছাড়ের চেয়েও অনেক বেশি।

জেনারেল এরশাদের সময় যেমন ক্ষমা প্রদর্শন, পুনর্বাসন সুবিধা দেওয়া হয় এ চুক্তিতেও তেমনি বিধান বিদ্যমান। তাই বর্তমান যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এর সার্থক সমাপ্তির জন্য যেমন এই সরকারের কৃতিত্ব তেমনি এর পূর্ববর্তী দুই সরকারেরও যে ধারাবাহিক অবদান রয়েছে তা কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে পাহাড়ীদের সমস্যা সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর যে মূল্যায়ন তা অনেকাংশে তিনটি সরকারকেই সাহায্য করেছিলো। রাজনৈতিক কারণে যে কোন দল যাই বলুক না কেন ১৯৮৫ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে কোন সরকারেরই নীতিগত মতপার্থক্য চোখে পড়ে না। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতি সরকারকে অস্ত্র জমা দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করবে। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র জমা দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করায় ঐ সকল পরিবারের সকল প্রকার নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এবং যারা অস্ত্র জমা দেবে তাদের ক্ষমা ঘোষণা করা হবে। জেনারেল এরশাদের শাসনামলেও এমনি ক্ষমা ঘোষণা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তখন এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়নি। আজ এ প্রশ্ন কেন তোলা হচ্ছে? এই অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টি অতি জরুরী একটি বিষয়। অথচ এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে দেশে নানা প্রকারের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাতে কাদের লাভ হচ্ছে? অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের না শান্তিপ্ৰিয় জনগণের তা

পাঠকদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। মূল সমস্যার সমাধান থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কার স্বার্থে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনকে এভাবে নস্যাত করার অপচেষ্টা নিশ্চয় দেশ বা জনগণের স্বার্থে নয়। তাই সচেতন জনগণকে হুজুগ সৃষ্টির বেড়া জাল ভেদ করে বহুদিনের জমে থাকা বিক্ষুব্ধ এক জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের অশেষায় সমাধানের মনোভাব নিয়ে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা যদিও আমাদের নিকটতম পড়শী। কিন্তু অনেক হাজার বছর ধরে এরা বিচ্ছিন্ন। এদের প্রকৃতি, আচার-আচরণ, আইন-কানুন, এদের বিবাহ, চাষাবাদ, জীবন-জীবিকার ব্যবস্থাপনা, সামাজিকতা সবকিছু ভিন্নধর্মী। ইতিহাসের কোন এক সময়ের খাঁচায় এরা হিমায়িত ছিলো। এদেরকে আমাদের রাষ্ট্রীয় সত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করার সূচনা করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এদেশের নাগরিক/ সমতার অংশীদারিত্ব আমাদের স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য। অথচ ১৯৭৬ সালে পাহাড়ী-বাঙ্গালীকে মুখোমুখি করার ভ্রান্তনীতি ও জনসংখ্যার আধিক্যের বলে উপজাতীয়দের কৃষ্টিগত সামাজিক স্বাতন্ত্র্য আঘাত করার যে প্রবণতা তা স্বাভাবিকভাবেই উপজাতীয়দের মনে ভীতি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। এই ভীতি ও সংঘাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের সবচাইতে বড় অর্জন সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা বিন্যাসের মাঝেই স্থানীয় সরকার কাঠামোর ভেতরে একটা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া। বহু দেশ শত শত বছর ধরে এমনি সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় রত। তামিল ও সিংহলীদের ভেতরে যে জাতিগত বিভেদ তার সমাধান হয়নি। শ্রীলংকার দক্ষিণ অঞ্চলে একটি যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে আজ ২৫ বছর ধরে। যার ফলে শ্রীলংকার উন্নয়ন নানাভাবে ব্যাহত। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের শিকার হয়েছে সে দেশের রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সহিংস এই যুদ্ধের দ্বারা শ্রীলংকার জাতিগত বিরোধ নিয়ে মাগাল্যান্ড, আসাম, মিজোরাম অঞ্চলে এখনো সমাধান সুদূর পরাহত। পশ্চিম বঙ্গের জ্যোতি বসুর দূরদর্শীতার কারণে দার্জিলিং-এর উপজাতি সমস্যার দ্রুত সমাধানের ফলে সশস্ত্র বিদ্রোহ দানা বাঁধতে পারেনি। এমনি সমস্যা ইন্দোনেশিয়াতে, ফিলিপিনে। এমনি হাজারো সমস্যা রুয়ান্ডা, সুদান, ইরান, ইউরোপে, হার্জোগোভিনিয়ায়, কানাডাতে, যুক্তরাজ্যে, আমেরিকাতে। এসকল সমস্যা সমাধান করতে হলে দরকার উদার মানবিকতার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির। সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান অঙ্গ। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, যারা সশস্ত্র সংগ্রামে রত ছিল তাদের সাথে চুক্তি

হয়েছে। এদেশের বার কোটি মানুষ তাদের কাছে টানতে চায়। অথচ সেখানে অবরোধের কর্মসূচী দিচ্ছে একটি মহল। কেউ চান না এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করতে। অথচ যানবাহন অবরোধ করে এ অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা করছে এবং তা কাদের স্বার্থে?

এ চুক্তি করার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়া হচ্ছে বা চুক্তি সংবিধান বিরোধী আখ্যায়িত করে এ চুক্তিকে বিতর্কিত করা সহজ। আইন ও সংবিধানকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি কোনও কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন সেটা হলো আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই কিনা। এ ব্যাপারে সকলেই নিশ্চয় একমত।

দ্বিতীয়তঃ এ সমস্যা সমাধান করতে ক্ষমতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তা করা সম্ভব কিনা?

তৃতীয়তঃ এরশাদ আমলে জেলা পরিষদ গঠন, উপজাতীয়দের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব, চাকুরীতে বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি, শান্তি বাহিনীর সদস্যদের ক্ষমা প্রদর্শন, অস্ত্র সমর্পণ করলে আর্থিক অনুদান, চাকরি দান, অথবা বেগম জিয়ার আমলে আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাব এসব যদি অসাংবিধানিক না হয়ে থাকে বা তা নিয়ে যদি কোনও প্রশ্ন অতীতে না উঠে থাকে তবে আজ এ প্রশ্ন উঠছে কেন?

চতুর্থতঃ চুক্তি প্রত্যাখ্যানের দাবী কতখানি যৌক্তিকতার দাবী রাখে নাকি চুক্তির যে সকল জায়গায় বেগম জিয়ার আপত্তি সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা প্রয়োজন হলে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান আসতে পারে, এর কোনটা যুক্তিযুক্ত এগুলি বিবেচনায় আনতে হবে।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এটা কোন বিদেশী বা ভিনদেশী মানুষের সঙ্গে চুক্তি নয়। নিজের দেশের এক জনগোষ্ঠীর সাথে চুক্তি আর জনগণই এদেশে সার্বভৌম। তাই এ চুক্তিটিকে বিতর্কিত করলে নিজ দেশের মানুষের মাঝেই বিরোধ-বিভক্তির সৃষ্টি হবে। সার্বভৌম জনগণের সাথে সংঘাত, বিরোধ কারও কাম্য হতে পারে না। বর্তমান চুক্তির প্রথম ছত্রেই বলা হয়েছে যে, “বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য” রেখে এ চুক্তি করা হলো।

সাথে সাথে বলা হয়েছে যে, “পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নতমানের লক্ষ্যে” চুক্তি প্রণীত হয়েছে। তাই সমগ্র চুক্তিটিকে সাংবিধানিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার আলোকে ব্যাখ্যা দান করতে হবে। অথচ চুক্তি বিরোধীরা এটাকে সংবিধান সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আখ্যায়িত করছে। এটা কতটুকু যুক্তিসম্মত তা পাঠকগোষ্ঠীই বিবেচনা করবেন।

বিরোধী দলের ১৮ দফা আপত্তির প্রথম দাবীতে দেশকে এক-কেন্দ্রীক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই চিন্তাধারাই সংবিধান বিরোধী। বাংলাদেশ একক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এর এডমিনিষ্ট্রিটিভ ইউনিট অর্থাৎ প্রশাসনিক একাংশ থাকতে পারবে না। প্রশাসনিক একাংশ সংবিধানেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে “প্রশাসনিক একাংশ” অর্থ জেলা কিংবা ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা।” এর অর্থ দাঁড়ায়, জেলাসমূহ আমাদের প্রশাসনের একাংশ। এছাড়া আরও প্রশাসনিক অংশ তৈরী করা সম্ভব। এতে আমাদের প্রজাতন্ত্রের, আমাদের সংবিধানের যে একক চিত্র তা কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হয় না। আমরা যদি প্রশাসনিক একাংশগুলোর হাতে স্থানীয় ক্ষমতা অর্পণ করি তবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বাস্তবায়ন ঘটবে। ৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করবেন।” ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “প্রজাতন্ত্র হইবে এমন একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানব সত্তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।” প্রশাসনের সকল পর্যায়গুলিতে জেলা এবং অন্য অঞ্চল যেটা আইন দ্বারা তৈরী হবে, সেগুলোকে বুঝায়। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার সুষ্ঠু বিন্যাস সাধনের জন্য “নির্বাহী বিভাগকে” তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতা বিন্যাস আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থানীয় শাসনের ক্ষমতা বিন্যাস করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে এই সকল স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহকে কি কি ধরনের ক্ষমতা দেয়া যাবে তার একটি রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পাঠক তাই স্পষ্ট করে অনুধাবন করতে পারবেন যে, প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য তদারকি, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের অধিকার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানকে দেয়া যেতে পারে।

এছাড়া জনশৃংখলা রক্ষা-অর্থাৎ স্থানীয় পুলিশ ব্যবস্থাপনা এবং সেই সাথে জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকার পরিষদের আয়ত্তে থাকার কথা। ৬০ অনুচ্ছেদে

স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানকে কর আরোপ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ৯, ১১, ৫৯, ৬০ এবং ১৫২ অনুচ্ছেদের আলোকে ১৯৮৯ সালের ১৯, ২০ ও ২১নং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে স্থানীয় সরকার যদি অসাংবিধানিক বিবেচিত না হয় তবে বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী প্রস্তাবিত ক্ষমতা প্রদান, কাঠামো বিন্যাস ও আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন অসাংবিধানিক হবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। এই চুক্তিতে এসকল জেলা পরিষদ এই আইনের কিছুটা সংস্কার সাধন করে আরো কিছু ক্ষমতা অর্পণ ও বিভিন্ন উপজাতি-অনুপজাতীয়দের প্রতিনিধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সেগুলো করবে সংসদ। অতএব, সংসদের ক্ষমতার কোন অংশ খর্ব করা তো দূরের কথা, সংসদকে এ ক্ষমতা অর্পণের ভার যেমন সংবিধানে আছে, চুক্তিতে সংসদের এ ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আসলে বিএনপি অতীতে স্থানীয় শাসনের ব্যাপারে সংবিধানের নির্দেশ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে তাদের ১৯৮৯ সালে প্রণীত পার্বত্য জেলাগুলির বিষয়ে আইন এবং তার ভাবধারায় গঠিত চুক্তির প্রস্তাব বুঝতেও তাদের অসুবিধা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে যে, এরশাদ কর্তৃক গঠিত উপজেলা বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই এক কলমের খোঁচায় ভেঙ্গে দেয়। এর বিরুদ্ধে উপজেলা চেয়ারম্যানগণ মামলা দায়ের করে। কুদরতে-খুদা-পনির ও আহসানউল্লাহ মাস্টার এই মামলা দায়ের করে। সেই মামলার রায়ে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট-এর এপিলেট ডিভিশন বলেন যে, উপজেলা যেহেতু ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনদ্বারা অভিহিত নয় সেহেতু সাংবিধানিক অর্থে এটাকে ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের অধীনে এটা স্থানীয় সরকার বলা কঠিন। তবে জেলাগুলো অবশ্যই স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। জেলাসমূহ ছাড়া অন্য প্রকার প্রশাসনিক একাংশ তৈরী করার সর্বময় ক্ষমতা সংসদের। ছয় মাসের মধ্যে এইসকল প্রশাসনিক একাংশ সৃষ্টিসহ জেলাগুলোতে স্থানীয় শাসন বলবৎ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু সরকার দফায় দফায় সময় নিয়েছে। অথচ সুপ্রীমকোর্টের এই নির্দেশ আজও পালিত হয়নি। সর্বোচ্চ আদালত থেকে বলা হয়েছে যে, “স্থানীয় সরকার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সংসদের এখতিয়ারভুক্ত। এর স্তরবিন্যাস কি হবে, কয়টি স্তরে ভাগ করা হবে এ বিষয়ে কার কোন স্থায়ীকৃত অধিকার থাকতে পারে (Vested Right) না। সংবিধানে ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে সংসদের উপরই এ ক্ষমতা ন্যস্ত। পরিক্রমিকভাবে অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় স্তরবিন্যাস করবার

ক্ষমতা সংসদের আছে। সুপ্রীমকোর্টের এই রায়ে বলা হয়েছে যে “এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, স্থানীয় সরকার সাংবিধানিক আইনে চতুর্থ ভাগের ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ একটি (অকার্যকর) বিধান মাত্র নয়।”

এরই আলোকে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ সরকারকে নির্দেশ দেন যে, বিদ্যমান স্থানীয় সরকারগুলোকে ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের স্তরবিন্যাস করতে হবে এবং অনির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এইসকল প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই আদেশের আলোকে অনির্বাচিত যে সকল মেয়র ছিলো সেগুলোতে চারজন মেয়র নির্বাচিত হয়। কিন্তু আজও পর্যন্ত এই রায়ের আলোকে জেলা পরিষদগুলো ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের আলোকে পুনর্বিন্যাস করা হয়নি। ছয় মাসের মধ্যে এই আদেশ বাস্তবায়ন করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বেগম খালেদা জিয়ার সরকার একটার পর একটা সময় নিয়েছেন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক আলোকে ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে হয়তোবা বেগম খালেদা জিয়া সরকারের অনীহারই এটা বহিঃপ্রকাশ। সেই কারণেই হয়তো বা পার্বত্য পার্বত্য ৩টি জেলাতে স্থানীয় সরকারগুলোকে ক্ষমতা অর্পণের ব্যাপারে তাদের বিভ্রান্তির শেষ নেই। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, জেনারেল এরশাদের আমলে ১৯৮৯ সালে গঠিত জেলা পরিষদের বিষয়ে বেগম জিয়া বা তার সরকার কোন প্রশ্ন তোলেননি কেন? তাদের আমলেও এই পরিষদ কার্যকর ছিল এবং আজও আছে। আজকে নতুন করে এ প্রশ্ন তোলার অর্থ কি? (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)। **অনুলিখন: রাজু আলীম**

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ জানুয়ারি ১৯৯৮

সমঝোতার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৥ পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে যে সব আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে হইবে সে সব সংসদে পাসের আগে বাছাই কমিটিতে পাঠানো হইবে। বাছাই কমিটিতে যুক্তিসংগত কোন পরামর্শ কাহারও থাকিলে কমিটি তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে, প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেও পারিবে। বিরোধী বিএনপি'র সংগে আলোচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম গতকাল (শনিবার) ইত্তেফাককে একথা বলেন। উল্লেখ্য, বিএনপি সংসদে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসাবে শান্তি চুক্তি বাতিলের দাবী জানাইয়া আসিতেছে। মোহাম্মদ নাসিম বিএনপিকে সংসদে ফিরাইয়া আনার জন্য তাহাদের কয়েকজন নীতি নির্ধারকের সংগে আলোচনা করিতেছেন। প্রেসিডেন্ট সংসদের অধিবেশন আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিএনপি

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। সূত্র জানায়, প্রতিদিনই সরকারী দল ও বিরোধী বিএনপি'র মধ্যে কমবেশী যোগাযোগ হইতেছে। মতামত আদান-প্রদান হইতেছে। বিএনপি শান্তি চুক্তি বাতিলসহ তাহাদের পূর্বের ১৪ দফা বিশেষ করিয়া সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন, নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা, রাজপথে জনসভা নিষিদ্ধকরণ এবং জিয়াউর রহমানের কবরে যাওয়ার জন্য ক্রিসেন্ট লেকের মাঝখানের সেতুটি অপসারণের প্রসংগ বার বার আনিতেছে। সরকারী দলের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে কোন আইন সংসদে পাসের আগে সংসদে বাছাই কমিটিতে পাঠানো হইবে। এ কমিটিতে বিএনপি সদস্যরাও আছেন। তাহারা এ সময় তাহাদের যেকোন ধরনের পরামর্শ দিতে পারিবেন।

মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম গত শুক্রবার রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎ করিয়া বিএনপি'র সংগে তাহার আলাপ-আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেন। সূত্র জানায় প্রধানমন্ত্রী বিএনপির সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে আলোচনা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।

সূত্র জানায়, সরকার বিরোধী বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দুর্নীতি ও অস্ত্র মামলা ছাড়া অন্য মামলাগুলি প্রত্যাহারে রাজী আছে। বিএনপি এমপি'দের বিরুদ্ধেও দুর্নীতি ছাড়া অন্য মামলা প্রত্যাহারের কোন জটিলতা থাকিবে না বলিয়া সূত্র জানায়। তবে এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপি এমপিদের নিয়া মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন হইয়াছে সে কমিটিতে বসিয়াই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। সূত্র মতে ইতিমধ্যেই সরকারী দল বিরোধী এমপিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়াছে। এদিকে বিএনপি নেতৃবৃন্দকে জানান হইয়াছে যে, রাজপথে জনসভা নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত সরকার পরিবর্তন করিতে পারিবে না তবে বিএনপি যদি বর্তমান চিহ্নিত মাঠ ছাড়া অন্য কোন মাঠের প্রস্তাব করে তবে সরকার তাহা গ্রহণ করিবে। সূত্র মতে গতকালও বিএনপি'র সংগে সরকারী দলের যোগাযোগ হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ জানুয়ারি ১৯৯৮

১৫ই জানুয়ারী বৈঠকে বসার জন্য

সরকারের নিকট শান্তি বাহিনীর প্রস্তাব

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য ৥ শান্তি বাহিনীর হাইকমান্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আগামী ১৫ই জানুয়ারী সরকারের জাতীয় কমিটির সহিত

আরেক দফা বৈঠকে বসার প্রস্তাব দিয়া একটি পত্র পাঠাইয়াছে। জনসংহতি সমিতি তাহাদের পত্রে সমিতির দেওয়া প্রস্তাবিত তারিখে সরকার বৈঠকে বসিতে সম্মত কিনা সে বিষয়ে আগামী ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সরকারের জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে গত ২রা ডিসেম্বর ঢাকায় যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে উহারই পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তির কয়েকটি শর্ত পূরণের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার লক্ষ্যে এই বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে বলিয়া যোগাযোগ কমিটির একটি সূত্র জানান। শান্তি চুক্তিতে বলা হইয়াছিল যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যেই জনসংহতি সমিতি তাহাদের সদস্যদের নামের তালিকা এবং সমিতির আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র গোলাবারুদের তালিকা দাখিল করিবে এবং তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য দিন-তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবে। সমিতির এই পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, প্রস্তাবিত বৈঠকেই জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্তাধীন অস্ত্র-গোলাবারুদের বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ অস্ত্র জমাদানের দিন-তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হইবে। ইহাছাড়াও ঐ বৈঠকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশ রাইফেলস সংক্ষেপে বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়ার বিষয়টিও আলোচনা করা হইবে এবং এই বৈঠকে তাহার সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। সমিতি ১৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাবিত বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠানের আগ্রহ ব্যক্ত করিয়া এই বলিয়া অনুরোধ করে যে, সমিতির প্রতিনিধিদের যেন সরকারী নিরাপত্তায় সীমান্তবর্তী দুদকছড়া হইতে হেলিকপ্টারে করিয়া আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সমন্বয়কারী পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে পাঠানো জনসংহতি সমিতির এই পত্রে সমিতির পক্ষে স্বাক্ষর করেন উষাতন তালুকদার। উল্লেখ্য যে, চুক্তির কতিপয় শর্তের উপর সমিতির মতামত জানিতে চাহিয়া গত ১লা জানুয়ারী যোগাযোগ কমিটি যে পত্র দিয়াছিল তাহা সমিতির হস্তগত হইবার আগেই তাহাদের পক্ষ হইতে বৈঠকের প্রস্তাব করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

আরও ১ হাজার ৫১ জন

উপজাতীয় শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন

খাগড়াছড়ি ও রামগড় সংবাদদাতা ॥ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আশ্রয় শিবির হইতে বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অব্যাহত রহিয়াছে। ষষ্ঠ পর্যায়ের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার তৃতীয় দিনে গত শনিবার রামগড় ডাকবাংলো ঘাট দিয়া সীমান্তের ওপারের সাক্রম মহকুমার কাঁঠালছড়ি শরণার্থী শিবির হইতে ১ শত ৯৩ পরিবারের ১ হাজার ৫১ জন শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করে। এই নিয়া গত তিনদিনে ৫ শত ৭১টি পরিবারের ৩ হাজার ২ জন পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসে। গত শনিবার প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দীঘিনালা থানার বাসিন্দা। ইহাছাড়াও লক্ষ্মিছড়ি, মানিকছড়ি ও মাটিরাংগা থানার কিছু শরণার্থীও প্রত্যাবর্তন করে গত শনিবার। তাহাদের সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ ও রেশনসামগ্রী প্রদান করিয়া সরকারী পরিবহনে স্ব-স্ব গ্রামের নিকটবর্তী ট্রানজিট ক্যাম্প পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এদিকে গত শনিবার রামগড় সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া প্রত্যাবাসন চলাকালে প্রচণ্ড শীতে দীঘিনালার বাবুছড়া গ্রামের বাসিন্দা দেবায়ন চাকমা ও তাহার স্ত্রী মায়াদেবী চাকমার ৩ মাসের এক শিশু সন্তান মারা গিয়াছে।

শরণার্থী শিবিরে অগ্নিসংযোগ

মিরপুর স্থানীয় প্রশাসন শরণার্থী পরিবার শূন্য শিবিরগুলি নিলাম দেওয়ার আগেই কে বা কাহারা অগ্নিসংযোগ করিলে গত শুক্রবার রাতে সাক্রম মহকুমার কাঁঠালছড়ির লখুয়া শিবিরের প্রায় তিনশতটি ঘর পুড়িয়া যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ও

সাংবিধানিক ক্ষমতা বিন্যাস

– ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম

(গত সংখ্যার পর)

বর্তমানে প্রচলিত ১৯৮৯ সালের আইনের অধীনে বিদ্যমান পার্বত্য জেলা পরিষদে ১৯ জন উপজাতীয় এবং ১১ জন অ-উপজাতীয় সদস্য রয়েছেন। অতএব বর্তমানে বলবৎ আইনেও পার্বত্য জেলা পরিষদে কতজন উপজাতীয়

এবং কতজন অ-উপজাতীয় সদস্য হবেন তা নির্ধারিত আছে। এ বিষয়টি '৮৯ সাল থেকে বিদ্যমান। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ একে অসম বলে প্রশ্ন তোলেন নি। তাহলে আজ কেনো এ প্রশ্ন উঠেছে সেটা বিবেচনার বিষয়। প্রথমত : আমাদের মনে রাখতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ঐতিহাসিক, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত এবং আইনগত দিক থেকেই ভিন্ন। সেখানে সমাজ, আচার-বিচার সব কিছুতেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা সব সময় বিরাজমান। ১৯৭৬ সাল থেকে সেখানে বিপুলহারে অ-উপজাতীয়দের বসতি তৈরীর চেষ্টা হয়। লক্ষ্য ছিলো অ-উপজাতীয়রাই সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করবে। তাই উপজাতীয়দের দাবি ছিলো যে, সেখান থেকে বসতি স্থাপনকারী অ-উপজাতীয়দের সরিয়ে নিতে হবে। এরকম একটা বিবদমান অবস্থাতে অ-উপজাতীয়দের সরিয়ে আনার বিষয়টি যদি এমনভাবে নিষ্পত্তি হয় যে, আঞ্চলিক পরিষদে অ-উপজাতীয়রা ৭টি আর উপজাতীয়রা ১৪টি আসন পাবে, তাহলে অ-উপজাতীয়দের কি ক্ষতি হয়েছে তা বোঝার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : উপজাতীয়দের ভেতরে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব যেমন গণতান্ত্রিক সেখানে ১১টি উপজাতিকেই প্রতিনিধিত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনসংখ্যাভিত্তিক নির্বাচন হলে কোনো উপজাতি হয়তো জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদে একটা সদস্যও পাবে না। সে কারণে সবাইকে অংশীদারিত্ব দেয়ার জন্যে যদি সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বিতরণ না করে সংরক্ষণের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে তাহলে সমঝোতা, সম্পৃক্ততা ও অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়।

তা'ছাড়া অ-উপজাতীয় জনসংখ্যা শতকরা ৪৪ ভাগ হলেও তারা উপজাতীয় অ-উপজাতীয় অনুপাতে সংখ্যালঘু। তাই তাদের সদস্য সংখ্যা ২১ জনে ৭ জন হলেও তারা সংখ্যালঘু এবং ৮ বা ৯ জন হলেও সংখ্যালঘুই থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হলে বা তাদের মতামতের প্রাধান্য সৃষ্টি করতে হলে ১১টি উপজাতির সবার সঙ্গে বা অন্তত কারো কারো সঙ্গে সন্ধান ও সমঝোতার গভীরতা তৈরী করতে হবে। সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। পার্বত্য রাজনীতির কৌশলগত দিক এখানেই যে, সহযোগীতা ও সমঝোতা ছাড়া সেখানে রাজনৈতিক সমাধান দুরূহ।

তৃতীয়তঃ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো এলাকায় স্থানীয় লোকের বসতি স্থাপন নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ আমাদের দেশের সামাজিক বাস্তবতা। কোনো বিশেষ অঞ্চলের লোক যখন পূর্বাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে রংপুর, দিনাজপুর বসতি স্থাপন করে তখন সেখানেও এ ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদ লক্ষ্য করা গেছে। ২০, ৩০ বা ৫০ বছর পর এটা স্থিতি লাভ করতে

শুরু করে। এটা স্বাভাবিক ও সামাজিক বাস্তবতা। বাংলাদেশে এটা বিশেষ করে প্রযোজ্য একারণে যে, এটা গ্রাম সভ্যতার দেশ। নগরায়ণ এখানে নতুন ঘটনা। সে কারণে আমাদের এখানে কসমোপলিটন আবহাওয়া গড়ে ওঠেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামতো ঐতিহাসিকভাবে আরো হিমায়িত এলাকা। তাই এ সমঝোতার শেকড় আরো গভীরে আনতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।

সংখ্যালঘিষ্ঠতা-সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে ফিজিতে। সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী ফিজিয়ানদের চেয়ে বেশী। নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে সরকার গঠন করে। ফিজিয়ানরা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেই নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে দেয়। পরে নতুন সংবিধান রচিত হয়। এ সংবিধানে ফিজিয়ানদের বিশেষ 'ওয়েটেজ' দিয়ে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সংসদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করা হয়েছে। এটা অবশ্য একটি চরম (এক্সট্রিম) দৃষ্টান্ত। তবে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে এ ধরনের দৃষ্টান্তকে উপেক্ষা করা যায় না।

বান্দরবানের অধিবাসী যাতে খাগড়াছড়িতে বা খাগড়াছড়ির অধিবাসী রাঙ্গামাটিতে প্রার্থী হতে না পারে অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের কোনো লোক এসে যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে এই কারণে হয়তো এ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যাতে কাউকে কোনোরকম অন্যায় বা হয়রানির শিকার না হতে হয়। এ ধরনের সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকৃতি জানালে আপিলের বিধানও খতিয়ে দেখবে যাতে জনমনে কোনো বিভ্রান্তি না ঘটে। আইন প্রণয়নের সময় এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিরোধীদল সংসদে গিয়ে এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবে- এটাই প্রত্যাশা। তা না করে হরতাল-অবরোধের মাধ্যমে তারা জনগণের সুবিধার বদলে অসুবিধা সৃষ্টি করছে। এটা অনভিপ্রেত।

ইতিমধ্যে বলেছি যে, দেশের অনগ্রসর নাগরিকদের জন্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন সংবিধানসম্মত। তাই চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী যাদের প্রজাতন্ত্রে কার্যে প্রতিনিধিত্ব খুবই কম, তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান করা যেতে পারে। ভারতে যেমন তফসিলীদের জন্যে শিক্ষা থেকে শুরু করে চাকরিতে সকল ক্ষেত্রে কোটা তৈরী করা হয়েছে। সমতা সৃষ্টির জন্যে এটা উপযুক্ত উদ্যোগ। সংবিধানের ২৯(৩) অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশেষ বিধান প্রণয়নের কথা উল্লেখ আছে।

আমরা ভূমি উন্নয়ন কর ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দিয়ে থাকি। সেটা করপোরেশনের তহবিলেই জমা হয়। তেমনি অন্যান্য স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান

যেমন পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদেও এ ধরনের করের বিধান রয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের কর আরোপ এবং তার মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “সংসদ আইনের দ্বারা- স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।” এতে সরকারের কোনো ক্ষমতা খর্ব হয়, একথাটা ঠিক নয়।

এ ধরনের প্রশ্ন তোলার আসল কারণ হলো যে, ১৯৫৮ সালের পর থেকে অর্থাৎ প্রায় ৫০ বছর যাদের বয়স, তারা কেউই এখানে প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকারের কার্যবিধির সঙ্গে পরিচিত নয়। ব্রিটিশ আমল থেকে জেলা কাউন্সিল বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ছিলো। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইনের সে সব স্থানীয় সরকার বিধানকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পুরনো ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় সরকার যদি এখানে চালু থাকতো তাহলে এটা হয়তো সামগ্রিক ও যথার্থ স্থানীয় সরকারের রূপ পরিগ্রহ করতো। যেহেতু আমাদের জনগোষ্ঠী এ ধরনের স্থানীয় শাসনের সঙ্গে পরিচিত নয়, তাই স্থানীয় সরকারের শাসন বিন্যাসের এ ব্যবস্থাপনা তাদের কাছে অবাক লাগছে। এটা আশা করা অন্যায় হবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সব জেলাতেই নির্বাচিত জেলা পরিষদ হবে। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের আলোকে ঐ সব জেলা পরিষদের ‘প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের’ দায়িত্ব দেয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ‘স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ, বাজেট প্রস্তুত ও নিজস্ব তহবিল গঠনের ক্ষমতা’ও দেয়া হবে।

যুক্তরাজ্যের নর্থ সী’তে যে তেল উত্তোলন হয় তার অংশ স্কটল্যান্ড পায়। এ দৃষ্টান্ত অনেক জায়গায় বিদ্যমান আছে। এতে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্তা ও সহযোগিতা বাড়ে এবং এলাকার সম্পদ লুণ্ঠন করে অন্য জায়গায় নেয়া হচ্ছে- এ ধরনের চিন্তার অবসান ঘটে। এটা অর্থনৈতিক সাম্য ও সুবিচার বলে আমি মনে করি। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ‘সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে’।

সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত

করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৯ (২) অনুচ্ছেদের এ নির্দেশের আলোকে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদ উত্তোলনের রয়্যালটির অংশ পার্বত্য জেলা পরিষদে দেয়া হয় তবে তা সংবিধানের নির্দেশিত সম্পদের সুষম বণ্টন, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী নয়। বরং তার অনুকূলেই এ ধরনের বিধান থাকা সমীচীন।

প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, চুক্তির এ দফায় শর্তাংশে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ‘রক্ষিত বনাঞ্চল, কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।’ অতএব বেশীরভাগ এলাকার জনসংখ্যার ভারসাম্য এবং উপজাতীয়, অ-উপজাতীয় সংখ্যানুপাতভিত্তিক যে অবস্থান, তা উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে কাজ না করে এটা একটা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বাস্তবতা। উপজাতীয়রা যেখানে বসতি স্থাপনকারী অ-উপজাতীয়দেরকে পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছিল সেখানে এখন নতুন কোনো বসতি স্থাপন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাঠকরা বিবেচনা করবেন এটা যৌক্তিক কিনা। উপজাতীয়দের অবস্থানে থাকলে পাঠক বিষয়টিকে কিভাবে ভাবতেন?

সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।’ অতএব যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার ‘জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষ’, একেবারে অবাধ নয়। সংসদ আইনের দ্বারা এ যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারবে। শান্তির জন্যে, বিরোধ কমানোর জন্যে এবং সংঘাতের নতুন কারণ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার জন্যে কোনো বিধান করা হলে তা অবশ্যই জনস্বার্থের কারণে হবে। তাই বাধা-নিষেধ যুক্তিসঙ্গত ও জনস্বার্থে হলে তা আরোপে কোনো বাধা সংবিধান ও আইনের নেই।

একইভাবে সংবিধানের ৪২ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর করার অধিকারও ‘আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষ’।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি হস্তান্তর ও বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সব সময়ই বাধা-নিষেধ আরোপিত ছিলো। আগে এক্ষেত্রে অনুমোদনের ক্ষমতা ভিসির ওপর ন্যস্ত ছিলো। ‘৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে এ ক্ষমতা উপজেলা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। আইন বর্তমানে বলবৎ

আছে। তাই এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে বর্তমানে বলবৎ আইনে এ বাধা-নিষেধ শুধু যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থায়ী বাসিন্দা নন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন সেটা সকলের জন্যে প্রযোজ্য হবে। উপজাতীয়দেরও জমি ইজারাসহ বন্দোবস্ত-ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তরের অনুমোদন লাগবে যেমন লাগবে অ-উপজাতীয় ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের জন্যে। আর এ অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর। নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে এ ক্ষমতা দেয়ার ব্যাপারে সংবিধানের ১ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। তাছাড়া শতকরা ৪০ ভাগ আবাদি জমি বর্তমানে বিদ্যমান আছে তাতে বর্তমান জনসংখ্যার চেয়ে বেশী জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে অনুপস্থিত। বিশেষ করে জনবসতি বাড়লে রক্ষিত বনজসম্পদের যে ক্ষতি হবে তা সার্বিকভাবে বাংলাদেশের পরিবেশ ও আবহাওয়ার জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এ কারণে সুন্দরবন এলাকায়ও জনবসতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ প্রযোজ্য। ভূমি হস্তান্তরের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই নয় রাজউক-এর জমি হস্তান্তরেও রাজউকের অনুমোদন প্রয়োজন। তেমনি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি হস্তান্তরের জন্যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদন লাগে। তাই এ ধরনের অনুমোদনের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত ও আইনানুগ বিবেচনার দাবি রাখে। এর আগেও এরশাদ আমলে শান্তিবাহিনীর প্রীতিফ্রন্টের সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা করা এবং আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছিলো। এ চুক্তিতে সাহায্য দেয়া হচ্ছে এক সময়ে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া পরিবারকে। পরিবার প্রতি এককালীন টাকা দেয়া হয়েছে। অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পরই তাদের মামলা-হুলিয়া প্রত্যাহার বা সাজা মওকুফ করা হবে। এদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হবে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও একটি সঠিক পদক্ষেপ। যে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলো সে হাতে দ্রুত কর্মের উপকরণ তুলে দেয়া হবে যথার্থ পদক্ষেপ। এতে তো আপত্তির কিছু দেখা যায় না।

চুক্তিতে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সব সময়ই একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবেই চিহ্নিত ছিলো। এখানে ১১টি উপজাতি হাজার বছর ধরে বাস করে আসছে। তাদের জীবন-জীবিকা, রীতিনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সমাজ, আইন-কানুন, আচার-বিচার সবই ভিন্ন প্রকৃতির। বৃটিশ আমল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ফাঁসির আসামী ছাড়া হাইকোর্টের এখতিয়ার ছিলো সীমিত। হাইকোর্টের ক্ষমতা

প্রয়োগ করতো চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার। আর দায়রা জজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতো ডিসি। তাদের জমি-জমার মালিকানা ও উত্তরাধিকারও ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির। বৃটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অবিভক্ত বাংলার অংশ হলেও সেখানকার শাসন-প্রশাসনের জন্যে ভিন্ন বিধি-পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০’ চালু ছিলো। এ আইনেও পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের মূল শাসন থেকে ‘বহির্ভূত এলাকা’ (এক্সক্লুডেড এরিয়া) হিসেবে চিহ্নিত ছিলো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামগ্রিকভাবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি জমিতি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। এখানে বলে নেয়া দরকার যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা আমাদের খুব নিকট পড়শী হলেও নাগরিক সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন এ জনগোষ্ঠী তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্যে সন্তর্পণে তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ‘৬২ সালে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অথবা যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরীর ফলে এ অঞ্চলের ৪০ ভাগ আবাদি জমি, বসতবাড়ী ডুবে যায়। এটা তাদের জীবন-জীবিকার ওপর এবং স্বকীয়তার ওপর আঘাত হিসেবে বিবেচিত হয়। পার্বত্য সমস্যার সূত্রপাত হয় সেখান থেকেই।

‘৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসন জারি হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখলের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সামরিক সমাধানের উদ্যোগ নেন। একই সঙ্গে তিনি পার্বত্য অঞ্চলে ডেমোগ্রাফি বদলে দেয়া তথা অ-উপজাতীয়দের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এজন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় ও জমিজমা বন্দোবস্ত দেয়া হয়।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামগ্রিকভাবে সংবিধানের আওতায় আনা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সাংবিধানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমগ্র দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৯ সালে। এ সময় পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সামরিক সমাধানের উদ্যোগ নেন। একই সঙ্গে তিনি পার্বত্য অঞ্চলে ডেমোগ্রাফি বদলে দেয়া তথা অ-উপজাতীয়দের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এজন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় ও জমিজমা বন্দোবস্ত দেয়া হয়।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামগ্রিকভাবে সংবিধানের আওতায় আনা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সাংবিধানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমগ্র দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৯ সালে। এ সময় পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০

বাভিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের আইনের সঙ্গে এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটি যোগসূত্র ও আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়। তারই অনুসরণে শান্তি চুক্তি একটি স্থায়ী সমাধানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সকলকে তাই বুঝতে হবে যে, একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন সমাজকে দীর্ঘদিনের ইতিহাসে হিমায়িত সমাজ ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের মূল ধারায় অর্থাৎ নগর সভ্যতার দিকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন সহানুভূতি। সবচে' বড় প্রয়োজন উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক কৃষ্টি সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা বিশ্বাস অর্জনের জন্যে আমরা চরম আত্মত্যাগে স্বাধীনতা এনেছি। সে শ্রদ্ধা বিশ্বাস আমরা কি করে অস্বীকার করি। আমাদের অতি নিকট পড়শী তথা ঐতিহাসিক জ্ঞাতীদের ক্ষেত্রে? সুতরাং ঐতিহাসিক বিবেচনায় সামাজিক ও আইনগত দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকা। তাই এরূপ স্বীকৃতি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এতে কোনো সমস্যার কারণ নেই।

সরকারের উচিত দেশের সমগ্র জনগণকে এ চুক্তির ব্যাপারে আস্থায় আনা। সেজন্যে সকল দল ও শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করা উচিত। তাদের কাছে চুক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রেক্ষিত তুলে ধরতে হবে। আর কেউ যেন এ চুক্তি নিয়ে সস্তা রাজনীতি না করেন। সেজন্যে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রধান বিরোধী দল কিছু স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রচার-প্রচারণা-সন্ত্রাস-অবরোধ করেছে। তাদের উচিত এ চুক্তি....তাই উত্থাপন করা। তবে আমার বিশ্বাস, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের জাঘত বিবেকই দলীয় নেতা-নেত্রীদের বিবেককে নাড়া দিতে পারবে। এ বিবেক ও মানবতাবোধবর্জিত কোনো গোলটেবিল বৈঠকে সমস্যার সমাধান হবে না। জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আলোচনা নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু বিবেকবর্জিত হরতাল, অবরোধ, সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে এর সমাধান হতে পারে না। **অনুলিখন :** রাজু আলীম

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর সহিত বৈঠক ১২ কিংবা

১৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠানের প্রস্তাব

তরুণ ভট্টাচার্য ॥ ১৫ই জানুয়ারী নয়- ১২ কিংবা ১৩ই জানুয়ারী বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সরকার শান্তি বাহিনীর নিকট প্রস্তাব দিয়াছে। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাকে স্পেশাল এ্যাক্ফোর্স ডিভিশন হইতে

টেলিফোনে জানান হয় যে, ১৫ই জানুয়ারী ঢাকায় ত্রিদৈশীয় বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন শুরু হইবে। ১৪ই জানুয়ারী শুরু হইবে সংসদ অধিবেশন। এ কারণে জাতীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য ব্যস্ত থাকিবেন। তাই শান্তি বাহিনীর প্রস্তাবিত ১৫ই জানুয়ারী বৈঠক ১২ কিংবা ১৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। গতকাল হংসধ্বজ চাকমা সাংবাদিকদের এ তথ্য জানাইয়া বলেন, সরকারের চিঠি বিশেষ দূত মারফত পাঠানো হইয়াছে বলিয়া তাহাকে জানানো হইলেও এখনো উহা তাহার হস্তগত হয় নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্যোগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রণালয়ের রূপরেখা তৈরী করিতে আজ (মঙ্গলবার) সরকারের উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, বৈঠকে মন্ত্রী পরিষদ ও স্পেশাল এ্যাক্ফোর্স বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ উপস্থিত থাকিবেন। মন্ত্রণালয়ের ধরন সম্পর্কিত একটি রূপরেখা এই বৈঠকে চূড়ান্ত করা হইবে এবং তাহা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের প্রস্ততি

রাজ্যমাটি সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে গত ২রা ডিসেম্বর '৯৭ ঢাকায় চুক্তি স্বাক্ষরের পর শান্তি বাহিনী অস্ত্র সংবরণের প্রস্ততি নিতেছে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যমাটি জেলার বিভিন্ন আস্তানা হইতে শান্তি বাহিনী ক্যাম্প বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রের মতে রাজ্যমাটি জেলার সুভলং এলাকা হইতে শান্তি বাহিনীর পি-কমাণ্ড পোস্ট-১ হইতে এবং বরকল জুরাছড়ি এলাকার বি-কমাণ্ড পোস্ট-২ হইতে অস্ত্র ক্রোজ করিয়া আস্তানা গুটাইয়া ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে চলিয়া গিয়াছে। যাওয়ার পূর্বে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বি-কমাণ্ড পোস্ট-২ এর সকল সদস্য বরকল থানার সীমান্তবর্তী ভালুইক্যাছড়ি নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে। বরকল থানার বিভিন্ন এলাকা হইতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দেখা করিয়াছে। -তথ্যবিবরণী

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ জানুয়ারি ১৯৯৮

জাতীয় কমিটি ও শান্তিবাহিনীর জনসংহতি সমিতি ১৬ই জানুয়ারী খাগড়াছড়িতে বৈঠকে মিলিত হইবে

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য্য ॥ সরকারের জাতীয় কমিটি ও শান্তিবাহিনীর হাইকমান্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি উভয় পক্ষ অবশেষে আগামী ১৬ই জানুয়ারী খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে বৈঠকে বসিতে সম্মত হইয়াছে। ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গত ৩০শে ডিসেম্বর প্রেরিত এক পত্রে জাতীয় কমিটির সহিত ১৫ই জানুয়ারী বৈঠকে বসার প্রস্তাব দিয়াছিল। কিন্তু সরকার পক্ষ সমিতির প্রস্তাবিত তারিখে ত্রিদেশীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বৈঠক এবং জাতীয় সংসদ অধিবেশন সংক্রান্ত ব্যস্ততার জন্য বৈঠকে বসা সম্ভব নহে বলিয়া জানাইয়া দেয় এবং ১২ অথবা ১৩ই জানুয়ারী বৈঠকের পাল্টা প্রস্তাব দেয়। সরকারের জাতীয় কমিটির এই পাল্টা প্রস্তাব সম্মিলিত পত্রটি পাওয়ার আগেই পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা স্পেশাল এ্যাক্সেস ডিভিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরামর্শে সমিতির নিকট একটি জরুরী পত্র পাঠান। যাহাতে ১২ অথবা ১৩ই জানুয়ারীর যে কোন একদিন বৈঠকে বসার জন্য সম্মতি জ্ঞাপনের অনুরোধ করা হয়। সমিতি সরকারের ঐ প্রস্তাবে রাজী না হইলেও গতকাল (মঙ্গলবার) যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়কের কাছে লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্রে সমিতির পক্ষে শীর্ষ নেতা উষাতন তালুকদার ১৬ই জানুয়ারী তারিখে শেষ পর্যন্ত বৈঠকে বসার সম্মতি জ্ঞাপন করে। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ সমিতির এই পত্র পাওয়ার পর জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদের টীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ'র সহিত কথা বলিয়া বিষয়টি অবহিত করিলে তিনিও ১৬ তারিখে বৈঠকে বসিতে সম্মতি দেন। ফলে প্রস্তাবিত বৈঠকের তারিখ লইয়া যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল তাহার অবসান হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের তালিকা এবং অস্ত্র-গোলাবারুদদের বিবরণ সরকারের কাছে পেশ করার এবং এই সকল তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তরের পর অস্ত্র সংবরণের স্থান ও দিনক্ষণ ঠিক করার কথা। জনসংহতি সমিতি ইতিপূর্বে এক চিঠিতে জানাইয়াছিল যে, প্রস্তাবিত বৈঠকেই সমিতির সদস্যদের এবং অস্ত্র-গোলাবারুদদের তালিকা হস্তান্তর করিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পর্যালোচনা স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়ার বিষয়ে সময়সীমা নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবে।

এদিকে জাতীয় কমিটির একটি সূত্র জানান, সদ্য সম্পাদিত শান্তি চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবারের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে। কেননা এই বৈঠকেই অস্ত্র সংবরণের দিন-তারিখ ঠিক করার পাশাপাশি পার্বত্য তিনটি জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ করিয়া অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠনের বিষয়াদি আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি ইতিমধ্যে এই বৈঠকের প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। সমিতির নেতা-কর্মীদের সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ি অবস্থানকালীন এবং বৈঠকস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানান, জাতীয় কমিটির পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দিবেন টীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এমপি এবং সমিতির ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দিবেন সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

রাষ্ট্রপ্রধানের সহিত মান্নান ভূঁইয়ার বৈঠকের পর বঙ্গভবন হইতে বিবৃতি শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট গোল টেবিল বৈঠক ডাকিবেন না

বাসস ॥ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক গত ২রা ডিসেম্বরের চুক্তি সম্পর্কে নিজে কোন গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করিবেন না। গতকাল বুধবার বঙ্গভবন হইতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে একথা বলা হয়। প্রেসিডেন্ট অবশ্য ইহাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় হিসাবে তাঁহার অভিমত পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্টকে কোন বিতর্কে না জড়াইয়া বিষয়টি লইয়া সরকার ও বিরোধীদল সংসদে অথবা সংসদের বাহিরে আলোচনা করিতে পারেন বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। পূর্বাঙ্কে সকালে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

আমাদের রিপোর্টার জানান ॥ বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া গতকাল (বুধবার) দুপুরে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের সহিত বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে প্রেসিডেন্ট বিএনপি'র প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক ডাকা সম্ভব নহে বলিয়া জানান। গত মঙ্গলবার রাতে প্রেসিডেন্টের

পক্ষ হইতে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব নহে জানাইয়া দেওয়ার পরে বিএনপি মহাসচিব প্রেসিডেন্টের নিকট গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে পুনরায় অনুরোধ জানাইবার জন্য বঙ্গবনে যান। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট বিএনপি মহাসচিবকে শান্তি চুক্তির ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সংসদে আলোচনার জন্য পরামর্শ দেন। বিএনপি অবশ্য বারবার বলিয়া আসিতেছে যে, শান্তি চুক্তি বাতিল করা না হইলে বিএনপি সংসদে যাইবে না। এ ব্যাপারে বিএনপির অনড় মনোভাবের কারণে প্রেসিডেন্ট নিজেকে ইহার সহিত জড়ানো শ্রেয় মনে করিতেছেন না।

এদিকে বিএনপি'র একটি সূত্র হইতে অবশ্য জানান হয়, প্রেসিডেন্ট বিএনপি মহাসচিবকে ডাকিয়া পাঠান এবং এজন্যই তিনি বঙ্গবনে গিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট বিএনপি মহাসচিবকে জানান, যেহেতু সরকারী দল গোলটেবিল চাহে না, এই জন্য তাঁহার পক্ষে গোলটেবিল ডাকা সম্ভব নহে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তিতে সংবিধান পরিপন্থী
কোন ধারা থাকিলে সংসদে পাসের
সময় সংশোধন করা হইবে

শাহজাহান সরদার ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও সংবিধানের পরিপন্থী কোন ধারা থাকিলে সংসদে আইন পাসের সময় উহার সংশোধন করা হইবে। সংবিধানের পরিপন্থী কোন আইন সংসদে পাস করা সম্ভব হইবে না। আইন মন্ত্রণালয় সূত্র একথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে, স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির প্রথম অংশটিই হইতেছে এমন, “বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতি নিম্নেবর্ণিত চারি খণ্ড সম্মিলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন”। মন্ত্রণালয় সূত্র বলিয়াছে, চুক্তিতে যেকোন ধারায় যাহাই থাকুক না কেন প্রথমই উভয় পক্ষ সংবিধান, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি অবিচল থাকার অঙ্গীকার করিয়াছে। এ অবস্থায় কোন কিছু সংবিধান ও

সার্বভৌমত্ব বিরোধী হইলে স্বাভাবিকভাবেই তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। কোন পক্ষেরই কোন কিছু বলার থাকিবে না। সর্বোপরি সংবিধান, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বিরোধী কোন আইন এভাবেই সংসদে পাস করা যাইবে না। পাস করিলেও আদালতে চ্যালেঞ্জ হইলে টিকিবে না। সূত্র জানায়, এ ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয় সতর্ক।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির আলোকে জাতীয় সংসদে আইন পাসের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ কার্যাদি বিভাগ শান্তি চুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করিয়াছে। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে ৪টি বিল প্রণয়নের কাজ চলিতেছে। ইহার মধ্যে একটি আইন হইবে নূতন। যাহা মূল আইনও হইবে।

আইন বলে চুক্তির বর্ণনা মতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইবে। এ পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অপিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহাছাড়া, অপিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই বলিয়া পরিগণিত হইবে। আগামী ১৪ই জানুয়ারী জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরুর দিনই এ বিলগুলি সংসদে উপস্থাপন করা হইবে।

ইহাছাড়া, ১৯৮৯ সালের রাংগামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, বাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ও বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ— এ তিনটি পরিষদের সংশোধনী বিল আনা হইবে। চুক্তি মতে এ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হইতে স্থানীয় সরকার অংশটি বাদ যাইবে এবং প্রতিটি জেলায়ই পার্বত্য জেলা পরিষদ হইবে। চুক্তি মতে, ১৯৮৯ সালের বিভিন্ন ধারা পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধন করা হইবে। যাহার মধ্যে থাকিবে পার্বত্য জেলায় উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় ভোটার কিভাবে, কাহাদের দ্বারা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবে। যেমন ১৯৮৯ সালে এরশাদ সরকারের আমলে গৃহীত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে ছিল কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা স্থির করিবেন ডেপুটি কমিশনার। নূতন আইন মোতাবেক ইহা নির্ধারণ করিবেন সার্কেল চীফ। ১৯৮৯ সালের আইনে জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য কোন আসনের ব্যবস্থা ছিল না। নূতন আইনে মহিলাদের জন্য তিনটি আসন থাকিবে এবং ইহার মধ্যে একজন অ-উপজাতীয় থাকিবেন। কোন

ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট দিবেন এবং তাহাদের সার্টিফিকেট সাপেক্ষ সার্কেল চীফ নির্ধারণ করিবেন। বর্তমান আইনে আছে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে চট্টগ্রাম বিভাগের ডেপুটি কমিশনার শপথ গ্রহণ করাইবেন। নূতন আইনে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারপতি শপথ গ্রহণ করাইবেন। ১৯৮৯ সালের আইনে জেলা পরিষদের মেয়াদ ছিল তিন বছর। প্রস্তাবিত নূতন আইন মোতাবেক মেয়াদ হইবে ৫ বছর।

পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের বর্তমান আইনের ৫০, ৫১ ও ৫২ ধারায় পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যকলাপের উপর সরকারের সাধারণ তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, আইনের সংগে সংগতিপূর্ণ নহে এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী হইলে সরকার পরিষদের কার্যক্রম বাতিল, স্থগিত, নিষিদ্ধ করার ক্ষমতার বিধান ছিল। শান্তি চুক্তির আলোকে যে নূতন আইন হইতে যাইতেছে, ইহাতে এমন থাকিবে যে, “এই আইনের উদ্দেশ্যের সংগে পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ দান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সংগে সংগতিপূর্ণ নয় অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারিবে”। ১৯৮৯ সালের আইনের ৬২ ধারায় জেলাগুলিতে পুলিশের সহকারী সাবইন্সপেক্টরসহ তদনিম্ন স্তরের সকল পুলিশ সদস্য পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করার বিধান বিদ্যমান আছে। সে আইনে উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় অউপজাতীয় ও বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংখ্যানুপাত বজায় রাখার ব্যবস্থা ছিল। নূতন আইনে উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্তমান আইনেও পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যদের পার্বত্য জেলা পরিষদগুলির নিকট দায়বদ্ধ করার ব্যবস্থা আছে। নূতন আইনেও তাহাই থাকিবে।

১৯৮৯ সালের আইনে পার্বত্য এলাকায় ভূমি হস্তান্তরে বিধিনিষেধ সম্পর্কিত ৬৪ ধারায় আছে জেলা পরিষদের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন জায়গা-জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না এবং অনুরূপ জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এমন কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না, নূতন আইনে সংশোধনপূর্বক থাকিবে পার্বত্য এলাকাধীন “বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা

প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রয়োগ হইবে না।” নূতন আইনে একটি অংশ সংযোজিত থাকিবে যাহাতে বলা হইয়াছে, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে ও আওতাধীন কোন প্রকার জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সংগে আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করিতে পারিবে না। ইহাছাড়া, কাণ্ডাই-হুদে প্রাপ্ত জমি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে। ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কে বিদ্যমান আইনের বিধান হইতেছে সরকার, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জেলায় আদায়কৃত উক্ত করের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিষদের তহবিলে অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ জানুয়ারি ১৯৯৮

সর্বশেষ

পার্বত্য এলাকায় কয়েকটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক তৎপরতা জোরদার করার পরিকল্পনা

বাসস ৥ বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও সীমান্তবর্তী এলাকায় অস্ত্র চোরাচালান, মাদক পাচার ও অন্যান্য নাশকতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত কমপক্ষে ১০টি ক্ষুদ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে তাহাদের নাশকতামূলক তৎপরতা জোরদার করার পরিকল্পনা করিতেছে। জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সূত্রমতে, সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সাম্প্রতিক শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মুখে উক্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীসমূহের তৎপরতা শুরু করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শুরুর পর হইতেই মূলতঃ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার মদদপুষ্ট এই দশটি গোষ্ঠী শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম অঞ্চলে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটনের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হইতেছে। বান্দরবানের বাসিন্দাদের নিকট এইসব গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সূত্র একথা জানাইয়াছে। এই দশটি সংগঠনের মধ্যে রহিয়াছে আরাকান আর্মি, আরাকান লিবারেশন পার্টি, আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট, কাইয়াং আর্মি, ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রন্ট অব রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন এবং কেওং পার্টি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সহিত এসব সংগঠনের পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহারা এখন হত্যাকাণ্ড, অপহরণ, খুন-খারাবি, ডাকাতি, লুটপাট ইত্যাদির মাধ্যমে চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া নস্যাত্ত করার জন্য সর্বশেষ পন্থা হিসাবে সহিংসতার পথ বাছিয়া নিয়াছে। সূত্রমতে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পর হইতে গত দেড় বছর যাবত এইসব গোষ্ঠী সাধারণভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। তাহারা এসময়ে মোটামুটিভাবে বান্দরবান এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংগঠন করে। বান্দরবানে কর্মরত গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, চট্টগ্রাম অঞ্চলে একবার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, পাকিস্তানের মদদপুষ্ট এইসব গোষ্ঠীর অবৈধ অপতৎপরতা বন্ধ হইয়া যাইবে। উপজাতীয় জনগণ বাংলাদেশ-বিরোধী মহলগুলির এই ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক তৎপরতা দমনে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর আরও অস্ত্র ক্রোজ

রাজ্যমাটি সংবাদদাতা ৥ জেলার কাউখালী থানার ঘিলাছড়ি নামক স্থানে গত ৩০শে ডিসেম্বর কে, আই (কাউখালী-ইছামতি) এরিয়ার সকল শান্তিবাহিনী সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র ক্রোজ করিয়াছে।

ইহাছাড়া গত ২৫শে ডিসেম্বর চন্দ্রঘোনা থানার ওয়াস্যা এরিয়া এবং ২১শে ডিসেম্বর নানিয়ার চর থানার এফ, এম, (ফুরামোন) এরিয়ার অস্ত্র ক্রোজ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আস্তানা এবং এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর বিভিন্ন স্থানে এক শ্রেণীর সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি শুরু করিয়াছে। তাহারা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী, বেবী টেক্সি চালক ও পণ্যবাহী যানবাহন এবং মৎস্য ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতেছে বলিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের ৭-দফা

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ৥ শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারীভাবে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের গুচ্ছগ্রামভিত্তিক সংগঠন 'বাঙ্গালী কৃষক

শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ' ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব লইয়া শঙ্কিত ৪০ সহস্রাধিক বাঙ্গালী পরিবারকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পুনর্বাসনে তাহাদের দাবীসমূহের উপর জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য সরকারী ও বিরোধীদলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে।

গতকাল (সোমবার) খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষক-শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ ৭ দফা দাবী ব্যাখ্যা করেন। দাবীসমূহ হইতেছে : গুচ্ছগ্রামবাসীর বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিতে এবং ভূমিহীনদের নতুন ভূমি বন্দোবস্ত দিয়া চাকমা শরণার্থীদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধায় ন্যায় ক্ষতিপূরণ পূর্বক প্রদান পুনর্বাসন করা, (২) সরকারীভাবে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের নামে প্রদত্ত কৃষি ও উদ্যান ঋণ মওকুফ করিয়া হয়রানি হইতে রেহাই দেওয়া এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য নতুন করিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করা, (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে পরিবারগুলির পুনর্বাসনে বন্দোবস্ত প্রদান ও গৃহ নির্মাণের জন্য এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়া, (৪) নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত অনেক বাঙ্গালীর বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমি বন বিভাগ ও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অবৈধ দখলীয় ভূমি ফেরত দেওয়া অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, (৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্ত পরিস্থিতির কারণে শান্তিবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ঘটনায় নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা প্রণয়নপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, (৬) পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদকে গ্রহণযোগ্য ও গণমুখী করিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে সদস্য পদ বন্টনের ব্যবস্থা করা এবং পাহাড়ী-বাঙ্গালীর আনুপাতিক হার নির্ণয় করিয়া জনসংখ্যার ভিত্তিতে চাকুরী ও শিক্ষা কোটা নির্ধারণ করা এবং (৭) ১৯০০ সালের হিলট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল বাতিল করা।

সংবাদসম্মেলনে বাঙ্গালী কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আউয়াল লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এ কে এম শহীদুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান মামুন, আবদুল মালেক প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ জানুয়ারি ১৯৯৮

সংসদীয় দলের বৈঠক

জাতীয় পার্টি শান্তি চুক্তি সংবিধানের

পরিপন্থী বিষয়ের সংশোধনী আনিবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৥ জাতীয় পার্টির সংসদীয় দল বলিয়াছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে সংবিধান পরিপন্থী কোন কিছু থাকিলে জাতীয় পার্টি উহার

বিরোধিতা করিবে। সংসদে এ সংক্রান্ত কোন বিল আনা হইলে জাতীয় পার্টি ইহার উপর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনিবে। গতকাল (মঙ্গলবার) সংসদ ভবনে দলীয় চেয়ারম্যান ও সংসদীয় দলের নেতা এইচ, এম, এরশাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংসদীয় দলের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সংসদীয় দলের উপনেতা ও দলীয় মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, বেগম রওশন এরশাদ, হুইপ এডভোকেট ফজলে রাব্বীসহ ২০ জন এমপি উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

সংসদ অধিবেশনে ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট :

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন

জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্য ও ভিন্ন মতের

প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতীয় ইস্যুতে সহিষ্ণুতা, ঐকমত্য এবং বিরোধী মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সহিষ্ণুতা, ঐকান্তিকতা, জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্য এবং ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংযম আমাদের জাতীয় সংহতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এ জন্যে দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সচেষ্ট হইতে হইবে। সংসদকে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি এবং দেশের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে অভিহিত করিয়া বলেন, সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সংসদকে কার্যকর করিতে হইবে। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করিয়া প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন, শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলকে আগাইয়া আসিতে হইবে। জাতিসংঘসহ দেশে-বিদেশে এই শান্তি চুক্তি প্রশংসিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আস্থা রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্মুখত ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এ চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হইয়াছে। গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিঘোষিত অঙ্গীকার এই চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট গতকাল শেরেবাংলা নগর জাতীয় সংসদে বর্তমান সংসদের ৭ম অধিবেশন তথা ১৯৯৮ সালের প্রথম অধিবেশনের প্রথমদিনে তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে বলেন, দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে দেড় বছর আগে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকার জনসেবায় নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। সরকারকে এই জন্য প্রতিনিয়তই অনেক প্রতিকূলতার মোকাবিলা করিতে হইতেছে। বাংলাদেশে এখন গণতন্ত্রের বিকাশ হইতেছে এবং ক্রমেই তাহা সাফল্যের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশকে আগাইয়া নিয়া একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। বছরের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নীতিনির্ধারণী ভাষণ প্রদান প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সেই লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট গতকাল সংসদের ৭ম অধিবেশনের প্রথম দিনে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া ৩২ পৃষ্ঠার নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শোনে। এ সময় গ্যালারীতে বিপুল সংখ্যক দর্শক ছাড়াও বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সংসদ সদস্যদের মৃদু টেবিল চাপড়াইয়া সমর্থনের মাধ্যমে সকলকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা জানান। ভাষণ শুরুতে প্রেসিডেন্ট গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। একই সঙ্গে স্বাধীনতার নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, তাহাদের অনুপম দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ফলে আমরা অর্জন করিয়াছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। প্রেসিডেন্ট গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ২০ মাসের সরকারের কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করিয়া জাতির জনকের হত্যার বিচারকার্য শুরু এবং জাতীয় ৪ নেতার হত্যার বিচার প্রক্রিয়া শুরু, গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘকালের অশান্তি নিরসনে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্থাপন, মানবাধিকার লঙ্ঘন নিরসনকল্পে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া, শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সচেতনতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ২১ বছরের ইতিহাস বিকৃতির ধারার অবসান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণস্থলে শিখা চিরন্তন প্রজ্জ্বলন করাসহ নানাবিধ কার্যক্রমের উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের জনগণ অনন্য ইতিহাস রচনা করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যত্র এমন ইতিহাস বিরল। স্বাধীনতা যুদ্ধ ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁহারা আত্মহত্যা দিয়াছেন তাঁহাদের আত্মত্যাগ যাহাতে ব্যর্থ না হয় উহার প্রতি আমাদের সচেতন থাকিতে হইবে। আগামী শতাব্দীর সম্ভাবনার সফল ব্যবহার এবং চ্যালেঞ্জের কার্যকর মোকাবিলার মাধ্যমে নূতন প্রজন্মের জন্য সুখী, সমৃদ্ধশালী উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা বিধানই হউক আমাদের ব্রত।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

‘শান্তি বাহিনী’র সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র
সমর্পণের তারিখ নির্ধারণের প্রশ্নে
আজ খাগড়াছড়িতে বৈঠক

তরুণ ভট্টাচার্য ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ বিষয়টি খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত হইতে যাইতেছে। এই উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য সরকারের জাতীয় কমিটির সহিত শান্তিবাহিনীর শীর্ষনেতারা আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে এক বৈঠকে মিলিত হইবেন। শান্তিবাহিনীর হাইকমান্ড জনসংহতি সমিতি এই বৈঠকে তাহাদের সশস্ত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের তালিকা এবং অস্ত্র-গোলাবারুদের বিবরণ জাতীয় কমিটির কাছে দাখিল করিবেন। গত ২রা ডিসেম্বর ঢাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী সরকারের কাছে ৪৫ দিনের মধ্যে সমিতি এই সকল তালিকা হস্তান্তর করিবে বলিয়া কথা রহিয়াছে। আজ (বৃহস্পতিবার) হইতে মেয়াদ শেষ হইবে। বৈঠকে তালিকা জমা হইবার পর উভয়পক্ষ তালিকা অনুযায়ী শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির প্রস্তাব অনুযায়ী এই বৈঠকে শান্তিবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করার পর পর (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পগুলিকে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়ার বিষয়টিও আলোচনা করা হইবে। বৈঠকের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান, বৈঠকে অস্ত্র সমর্পণ, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসার পর শান্তি বাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসনে পদ্ধতি নিয়া আলোচনা করা হইবে। ইহা ছাড়াও চুক্তির শর্ত আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠন এবং পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন লইয়াও আলোচনা চলিবে। বৈঠকে সরকারের জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব

দিবেন কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এমপি এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দিবেন সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ জানুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র গোলাবারুদের হিসাব ও সদস্য তালিকা পেশ

৯ই ফেব্রুয়ারী শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ শুরু

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য ॥ আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়া ১৯৭৩ সনের ৭ই জানুয়ারী গঠিত শান্তি বাহিনী তাহাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) শান্তি বাহিনীর হাই কমান্ড জনসংহতির নেতৃবৃন্দ কর্তৃক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়া জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমার নেতৃত্বে ১ম দলটি অস্ত্র সমর্পণ করিবে।

প্রথম দলে ৪ শত জন অস্ত্রসহ এবং ২ শত জন গোলাবারুদসহ মোট ৬ শত জন আত্মসমর্পণ করিবে। সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে গতকাল বৈঠকশেষে বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে এক প্রেস ব্রীফিং-এ প্রথম দিনের সমর্পণের সংখ্যার কথা উল্লেখ করেন। প্রেস ব্রীফিং-এ আরও জানা যায়, আজ ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার হাই স্কুল মাঠে ২য় দফায়, ২২ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ির দীঘিনালার বরাদম স্কুল মাঠে ৩য় দফায় এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী সীমান্তবর্তী দুদুকছড়িতে সর্বশেষ ৪র্থ দফায় শান্তি বাহিনী আত্মসমর্পণ করিবে। বৈঠকের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা যায়, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ৬শত জন এবং পরবর্তী দুই দফায় ৪ শত জন করিয়া শান্তিবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করিবে।

গতকাল জনসংহতি সমিতি সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির নিকট শান্তি বাহিনীর মোট সংখ্যা এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকা প্রদান করে বলিয়া জানা যায়। তবে সাংবাদিকদের প্রেস ব্রীফিং-এ তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা যায়, জনসংহতি সমিতি ১৯ শত ৩৪ জনের একটি তালিকা সরকারের নিকট পেশ করিয়াছে।

গতকাল দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে বৈঠক শুরু হইয়া ১২ মিনিট স্থায়ী হয়।

ইহার পর উভয়পক্ষের ৩ জন করিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুরু হইয়া ৩টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলিতে থাকে। বৈঠকে সীমিত পর্যায়ে অস্ত্র সমর্পণের পদ্ধতি ও সাধারণ ক্ষমা এবং পুনর্বাসনের বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর শান্তিবাহিনীর বর্তমান অবস্থান বিবেচনায় রাখিয়া অস্ত্র সমর্পণের স্থান নির্ধারণ করা হয়। বৈঠকে গত ২রা ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর চুক্তি বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে সমিতির পক্ষ হইতে জানিতে চাওয়া হয়। সরকারী পক্ষ এ ব্যাপারে সরকারীভাবে গৃহীত পদক্ষেপ ও সরকারী মনোভাব ব্যক্ত করে। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে ছিলেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এবং দপ্তরবিহীন মন্ত্রী বাবু কল্পরঞ্জন চাকমা। অপরদিকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে ছিলেন চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা এবং রক্তোৎপল ত্রিপুরা।

১৯৮৩ সনের ২রা অক্টোবর হইতে ১৯৯৭ সনের ৩১শে আগস্ট ৫ম দফায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় মোট অস্ত্রসহ ১১৯৮ জন, অস্ত্রবিহীন ১৭৯৬ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য আত্মসমর্পণ করে। ১৯৮০ সন হইতে '৯৭ সন পর্যন্ত ১ হাজার ২ শত ৯৯ জন বাঙ্গালী ও উপজাতি বিভিন্ন সময় সংঘর্ষে নিহত এবং ৮৬১ জন আহত হয়। তাহাছাড়া ৭৮৩ জন নিখোঁজ হয়। এ সময় সংঘর্ষে ৩৪৩ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য প্রাণ হারায়।

গতকাল সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে পার্বত্য বিষয়ক সরকারি কমিটির পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, বীরবাহাদুর, জাতীয় কমিটির সদস্য সাবেক অতিরিক্ত যুগ্ম সচিব এস, এস চাকমা, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াত হোসেন, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জানেবুল হক ও আশিকুল হক, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক জাফরুল হোসেন, এসপি আমিনুল ইসলাম, যোগাযোগ কমিটির হংসধ্বজ চাকমা, নকুল ত্রিপুরা, ফেড শুমেং, বিশ্বজিৎ চাকমা ও মোহাম্মদ শফি উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ জানুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়িতে অবরোধ পালিত

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ সরকারের জাতীয় কমিটি ও শান্তি বাহিনীর হাইকমান্ড জনসংহতির মধ্যে অস্ত্র সংবরণ প্রশ্নে অনুষ্ঠিত খাগড়াছড়ি বৈঠকের প্রতিবাদে পার্বত্য সর্বদলীয় (শুক্রবার) অবরোধের শেষদিনেও চট্টগ্রাম ও

ফেনী সড়কে যানবাহন চলাচল করে নাই। তবে জেলাশহরসহ পানছড়ি মহালছড়ি সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। অবরোধের প্রথমদিনে রামগড়ের সোনাইপুলে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ রামগড় বাস স্ট্যান্ডে সমাবেশ করে। ঐক্য পরিষদ নেতা এ কে এম নূরুল আবছার, দাউদুল ইসলাম ও নূরুল ইসলাম মেম্বার বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যায় পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে শান্তিচুক্তি বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল জেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে এক সভায় সৈয়দ আব্দুল মোমেন, রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আব্দুস ছালাম, নূরুল আবছার, আবুল কাসেম, জাকির হোসেন ও নূরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা কথায় কথায় বিরোধীদলীয় মিটিং-মিছিলে বাধা দান, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সহিত অসৌজন্যমূলক আচরণ, আইন-আদালতে ন্যায় বিচারে হস্তক্ষেপের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কঠোর সমালোচনা করেন। সমাবেশে কালো পতাকা উত্তোলনকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে কেনা-কাটা না করার ব্যাপারে গত ১৫ই জানুয়ারী সরকারী দল আয়োজিত এক সমাবেশের ঘোষণার প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তারা সরকারী দলের ঘোষণার পাল্টা বক্তব্য হিসাবে যে সকল দোকান পাট কালো পতাকা উত্তোলন করে নাই ঐ সকল দোকান হইতে কেনা-কাটা না করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গত বৃহস্পতিবার প্রবলছড়ি সড়কে রেড ক্রিসেন্টের একটি জীপ গাড়ি পোড়াইয়া দেওয়ার ঘটনায় তাহারা জড়িত নয় বলিয়া দাবী করিয়াছে। দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এক বিবৃতিতে রেড ক্রিসেন্টের গাড়িতে অগ্নি সংযোগের জন্য বিএনপি ও জামায়াতকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি এ ঘটনাকে মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য নাশকতামূলক কাজ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের পদ্ধতি

নির্ধারণে পুনরায় যোগাযোগ

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ শান্তি বাহিনীর হাইকমান্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ি গ্রামে ৪ দিন অবস্থান করার পর গতকাল (শনিবার) সহকর্মীদের লইয়া তাহার গোপন ঘাঁটিতে ফিরিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির প্রধান সন্ত্রাস লারমার নেতৃত্বে ৬ শত সদস্যের প্রথম অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান হইবে ৯ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি জেলা সদরের নবনির্মিত চৌকস স্টেডিয়ামে। সন্ত্রাস লারমার সহিত প্রথম দিনের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে সমিতির রাজনৈতিক উইং-এর প্রথম সারির নেতা সুধাসিন্ধু খীসা, রাজোৎপল ত্রিপুরা, উষাবিন্দু খীসা ও নিটু দেওয়ানসহ আর্মড ক্যাডারের বেশ কয়েকজন নেতা সশস্ত্র সাধারণ সদস্যদের সহিত থাকিবেন বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে। আর্মড ক্যাডারের ঐ সকল সদস্যের মধ্যে শান্তি বাহিনীর বিশেষ কোম্পানীর কমান্ডার মেজর নৈতিক, ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার মেজর ইতার ও বিশেষ কোম্পানীর ডেপুটি কমান্ডার ক্যাপ্টেন রেনন, মেজর দেবশীষের নাম শোনা যাইতেছে। জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র জানান, ইতিমধ্যে এই সকল নেতার পরিবার-পরিজনকে গোপন ঘাঁটি হইতে নিজেদের বাড়ী-ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে। অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়া শুরু হইয়া ৪টি পর্যায়ের মাধ্যমে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। অবশিষ্ট তিনটি পর্যায়ের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান হইবে যথাক্রমে রাংগামাটির বাঘাইছড়ি হাইস্কুল মাঠে, ২২শে ফেব্রুয়ারী দীঘিনালার বড়াদম হাইস্কুল মাঠে এবং সবশেষে ২৮শে ফেব্রুয়ারী দুদুকছড়ায়। তবে সবকিছুর আগে অস্ত্র সংবরণের পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকতার ধরন-ধারণ ও বহর নির্ধারণ প্রশ্নে সরকারের জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির নেতারা আগামী দুই একদিনের মধ্যে লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে পত্র বিনিময় করিবেন। লিয়াজোঁ কমিটির একটি সূত্র জানায়, অস্ত্র সমর্পণের পদ্ধতি বিশেষ করিয়া সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের তাহাদের নিজস্ব ঘাঁটি ও অস্থায়ী আস্তানা হইতে অনুষ্ঠানস্থলে সরকারী নিরাপত্তায় আনার ব্যাপারে প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য সমিতির একাধিক শীর্ষনেতৃবৃন্দ আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অবস্থান করিবেন।

প্রথমদিনের অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য আয়োজন রাখার বিষয়টি লইয়া সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণকরা এখন হইতে ভাবিতেছেন। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজন মন্ত্রী, বিদেশী কূটনৈতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হইবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানাইয়াছে।

এদিকে শান্তি চুক্তির আলোকে পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠনের বিষয়টি সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। যদিও সরকার ইতিমধ্যে ঐ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্তির উদ্দেশ্যে উপজাতীয়দের মধ্য হইতে এমপি কল্লরঞ্জন চাকমাকে মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাছাড়াও সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নীতি-নির্ধারণকরা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্তিকালীন

চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ এবং আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্ভুক্তিকালীন দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রক্রিয়া চালাইয়া যাইতেছেন। সরকারী একটি সূত্র নিশ্চিত করিয়াছেন, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে সন্ত্রাস লারমাকে দায়িত্ব দেওয়া হইবে। অন্যদিকে ৯ই ফেব্রুয়ারী অস্ত্র সমর্পণের পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা হইতে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবরটিও পার্বত্য রাজনৈতিক অঙ্গনকে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮ জানুয়ারী ১৯৯৮

খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ১০ই ফেব্রুয়ারী শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের খুঁটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে গতকাল (মঙ্গলবার) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

প্রথম পর্যায়ে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তি বাহিনীর সদস্যগণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করিবে। শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের এক ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করিতে চাই।

বৈঠকে উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাংগামাটি ও বান্দবানের স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানদ্বয়, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক মোবায়দুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট ব্রিগেড ও সেক্টর কমান্ডারগণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। -তথ্যবিবরণী

দৈনিক ইত্তেফাক

১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

গতকাল ফিরিয়াছে ১০২৫ উপজাতীয়

বাসস ৯ আট দিন বিরতির পর চলতি প্রত্যাবাসনের ষষ্ঠ পর্যায়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবির হইতে ১৮০ পরিবারের ১০২৫ জন উপজাতীয় গতকাল খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রত্যাবাসন পুনরারম্ভ হইয়াছে ১লা জানুয়ারী।

খাগড়াছড়ির ডেপুটি কমিশনার এ কে এম জাফরুল হোসেন জানাইয়াছেন, ১৯৯৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ১০১২৪ পরিবারের ৫১৪৬২ জন উপজাতীয় দেশে ফিরিয়াছে। তন্মধ্যে একটি বড় সংখ্যা স্বেচ্ছায় প্রত্যাগমন করিয়াছে। ভারতে শরণার্থী শিবির হইতে প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় রহিয়াছে আরও ২৪৫৮ পরিবারের ১৩০৫৮ জন উপজাতীয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আজ খাগড়াছড়িতে উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক

তরুণ ভট্টাচার্য ॥ আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করার জন্য আজ (বুধবার) উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হইবে।

বৈঠকে যোগদান করিবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, দফতরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডা. এম এ মালেক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়দ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, বান্দরবানের সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর ও সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানগণ এবং তিনি জেলার কর্মকর্তাগণও এই বৈঠকে যোগদান করিবেন। তাহারা অস্ত্র সমর্পণের কেন্দ্রস্থল পরিদর্শন এবং আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিবেন।

পূর্বের কর্মসূচীতে কিছুটা পরিবর্তন করা হইয়াছে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করার কথা ছিল। এখন ৮ই ফেব্রুয়ারী স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করিবেন দফতরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। অবশ্য অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত পুলিশ লাইনের উদ্বোধন করিবেন।

এদিকে, গোয়েন্দা সংস্থা চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের খুঁজিতে শুরু করিলে তাহাদের প্রায় সকলেই এলাকা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া গা ঢাকা দিয়াছে। তবে পুলিশ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে খাগড়াছড়ি, রামগড় ও মাটিরাঙা হইতে ইতিমধ্যেই ১৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিরাপত্তা

নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় এক হাজার অতিরিক্ত আর্মড পুলিশ খাগড়াছড়ি পৌঁছিয়াছে।

গত এক মাস আগেও শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ির সর্বত্র কালো পতাকা উড্ডীন থাকিলেও এখন আর তাহা তেমন দেখা যাইতেছে না। তবে আদালত সড়কের ভাঙ্গব্রীজ ও কলেজ গেট এলাকায় এখনও কালো পতাকা দৃশ্যমান। রামগড় ও মাটিরাঙার দোকান-পাটে কালো পতাকা উড়িতেছে। অবশ্য ইদানীংকালে খাগড়াছড়িতে চুক্তি বিরোধীদের কোন সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় নাই।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম ১০ই ফেব্রুয়ারী জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। তবে উহার ভিতরে ও বাহিরে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্টেডিয়ামে ১৬ হইতে ২০ হাজার দর্শকের বসার জন্য আসন থাকিলেও এক হাজার আসন আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাগড়াছড়ি শহরটিকে তিলোত্তমার মতো করিয়া সাজানো হইতেছে। সরকারী অফিস-আদালত চুনকাম করা হইতেছে। আর সেই সঙ্গে দেওয়ালের লিখন পরিষ্কার করা হইতেছে। পৌরসভা আজ শহরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করিবে। শহরের রাস্তা-ঘাট মেরামত এবং স্টেডিয়াম এলাকায় রাত-দিন কাজ চলিতেছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান রঙিন পতাকা, ফেস্টুন, ব্যানার ও তোরণ দিয়া সাজাইয়া খাগড়াছড়িকে একটি উৎসবমুখর শহরে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়ির গহীন অরণ্য এখন স্বদেশ প্রত্যাগত উপজাতীয়দের পদচারণায় মুখরিত

রামগড় সংবাদদাতা ॥ দীর্ঘ এক যুগ পর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শিবির হইতে সদ্য স্বদেশ প্রত্যাগত উপ-জাতীয় শরণার্থীদের পদচারণায় খাগড়াছড়ি জেলার ৮টি থানার পরিত্যক্ত গহীন অরণ্য নতুন করিয়া মুখর হইয়া উঠিয়াছে। জেলা ও থানা সদরের হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, যানবাহনে শরণার্থী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী এখন মুক্তবহঙ্গের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরিয়া পরিত্যক্ত উপজাতিদের পাড়া-গ্রামগুলিতে নতুন করিয়া প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। সরকারের ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধায় এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়াধীনে নতুন নতুন ঘর-বাড়ী আর জনপদ গড়িয়া উঠিতেছে।

দীর্ঘকালের পতিত জমির বন-জঙ্গল পরিষ্কার এবং চাষাবাদযোগ্য জমি আবার আবাদ করা হইতেছে। স্বদেশ প্রত্যাগত উপজাতি জনগোষ্ঠী নূতন আশায় বুক বাঁধিয়াছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ফেনী নদীর ওপারে রামগড় সীমান্ত শহরের পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম মহকুমার কাঁঠালছড়ি শরণার্থী শিবির হইতে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৯ই জানুয়ারী পর্যন্ত রামগড় পয়েন্ট দিয়া সর্বমোট ১ হাজার ৫ শত ৮৮টি পরিবারের ৭ হাজার ৮ শত ৯৬ জন উপজাতীয় শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের সুবিধার্থে দুই দেশের মধ্যবর্তী রামগড় সীমান্তের ফেনী নদীতে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি অস্থায়ী কাঠের পুল নির্মাণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রামগড় ও তবলছড়ি ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়া ৩ শত ৭৯টি পরিবারের ১ হাজার ৮ শত ৪১ জন, ২১শে জুলাই হইতে ৫ই আগষ্ট পর্যন্ত ১৬ দিনে ৬ শত ৪৮টি পরিবারের ৩ হাজার ৩ শত ৪৫ জন উপজাতীয় শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও তৎকালীন সরকারের প্রতিশ্রুতি মতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যাগতদের জন্য সরকারের দেওয়া ১৬ দফা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য উপজাতি শরণার্থী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য ১৯৯৫-এর ১৪ই মার্চ পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলায় আসেন। কিন্তু তৎকালীন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শরণার্থীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম যথাযথভাবে হয় নাই বলিয়া পর্যবেক্ষক টিম অভিযোগ করেন। ফলে প্রত্যাবাসন কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি দল ১৯৯৭ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ দিনব্যাপী ত্রিপুরা রাজ্য সফর করেন এবং উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সহিত পৃথক পৃথক বৈঠক ও আলোচনার শেষে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা স্মারক চুক্তি মতে, তৃতীয় পর্যায়ে রামগড় ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়া ১৭ সনের ২৮শে মার্চ এবং তবলছড়ি পয়েন্ট দিয়া ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ১ হাজার ২ শত ৪৮টি পরিবারের ৬ হাজার ৭ শত ৩ জন শরণার্থী স্বদেশে ফিরিয়া আসে। পরবর্তীতে ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে ২১শে নভেম্বর '৯৭ হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ হাজার ৫ শত ৪৭টি পরিবারের ১৩ হাজার ২৪ জন উপজাতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন কাজ এখনও চলিতেছে।

সরকারের ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধাধীনে প্রত্যাগত সকল পরিবারকে নগদ ২১ হাজার টাকা, পর্যাপ্ত রেশন, গৃহ নির্মাণের জন্য ২ বাঙলি ডেউটিন প্রদান করা হইয়াছে।

সদ্য প্রত্যাগত রামগড় সদর থানার সোনাই আগা গ্রামের উপজাতি পরিবারগণ সারিবদ্ধভাবে গৃহ নির্মাণ করিয়া পাহাড়, বন-জঙ্গল আবাদ করিতেছে। উপজাতিদের পরিধেয় বস্ত্র কোমর তাঁতে তৈরী করা হইতেছে। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত করা হইতেছে। অনুরূপভাবে নাকাপা মৌজার বৈদ্য পাড়া, হাজাছড়া ও রামগড় মৌজার রূপাইছড়ি, লালচানপাড়া, কুমারী গুজা এবং পরশুরাম ও নাডাঙ্গা মৌজার পাতাছড়া, মানিকচন্দ্র পাড়া, বুদ্ধলাল পাড়া, তৈচাকমা, বেলছড়ি, সালদা এবং রামগড় সদর দারগাপাড়া যৌথ খামার ও কারবারী পাড়ায় বসবাসকারী সদ্য প্রত্যাগত উপজাতিগণ বাসস্থান নির্মাণ, কৃষি কাজ করিয়া শান্তিতে দিন কাটাইতেছে। সোনাইআগা গ্রামে সদ্য প্রত্যাগত পরিবারের অজীত কুমার ত্রিপুরার স্ত্রী অম্মা চা-পান ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয়ের একটি ছোট্ট দোকানও খুলিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী চূড়ান্ত

হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥ গতকাল (বুধবার) সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এক পর্যালোচনা বৈঠকে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিতব্য শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হয়।

খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রথমদিনের অনুষ্ঠানকে বর্ণাঢ্য ও উৎসবমুখর করিয়া তোলার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রফিকুল ইসলাম।

গত ২রা ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শান্তিবাহিনীর সদস্যগণ সরকারের নিকট অস্ত্র জমা দিবেন। শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির মোট এক হাজার ৯৩৩ জন সদস্য মোট পাঁচ দিনে অর্থাৎ ১০, ১১, ১৬, ২২ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া যাইবেন। পুনর্বাসনের জন্য সরকার তাহাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করিয়া প্রদান করিবে। তাহাদিগকে সরকারী পরিচিতি কার্ডও দেওয়া হইবে।

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনা। স্টেডিয়ামে একটি বিরাট মঞ্চ স্থাপন করা হইবে। ইহাতে ১৬টি আসন থাকিবে।

ঐদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিবেন। তাঁহার ভাষণের অব্যবহিত পরই অস্ত্র জমাদান পর্ব শুরু হইবে। প্রথমেই প্রধানমন্ত্রীর হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিবেন জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভু)। সম্ভু লারমার এই অস্ত্রটি জাতীয় যাদুঘরে রাখা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। শেখ হাসিনা সম্ভু লারমার নিকট হইতে অস্ত্রটি গ্রহণ করার পর তিনি তাহার হাতে তুলিয়া দিবেন এক গুচ্ছ সাদা গোলাপ। ঠিক ঐ সময়ে স্টেডিয়াম অঙ্গন হইতে ছাড়া হইবে শান্তির দূত পায়রা ও বেলুন। ইহার পর জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচীতে কিছুটা রদবদল করা হইয়াছে। এখন আর তিনি নবনির্মিত পুলিশ লাইন উদ্বোধন করিবেন না।

অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, প্রধান বিচারপতি, কূটনীতিক, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ, সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবী, উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান হইতেছে। বিমান বাহিনীর পাঁচটি হেলিকপ্টার মন্ত্রীবর্গ, কূটনীতিক ও দাতা প্রতিনিধিদের ঢাকা ও চট্টগ্রাম হইতে খাগড়াছড়ি নিয়া যাইবে।

ঐদিন খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ২০ সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইবে। সেজন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, খাবার পানি সরবরাহ এবং সৌচাগারের ব্যবস্থা থাকিবে।

অন্য দুই পার্বত্য জেলা হইতে অতিথিদের আনার জন্য সরকার যানবাহনের ব্যবস্থা করিবে। তিনটি ক্যাম্প হইতে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের লইয়া আসার জন্য ৪৫টি বাস ও ট্রাক ভাড়া করা হইয়াছে। স্টেডিয়ামের ভিতরে অনুষ্ঠান চলাকালে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনের জন্য একশত জন স্কাউট ও গার্ল গাইড নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সূষ্ঠাভাবে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়িতে তিনটি মনিটরিং সেল স্থাপন করিয়াছে।

তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ৬ই হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্কবস্থায় রাখা হইবে। তিন জেলার তিনজন সেনা রিজিয়ন কমান্ডারের নেতৃত্বে সম্মিলিত নিরাপত্তা কমিটি সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারক করিতেছে।

খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, দফতরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দিন যোগদান করেন। কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব শফিকুর রহমান, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব, সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, বিডিআর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ও পুলিশের ডিআইজি, বিডিআর-এর সেক্টর কমান্ডার, চার ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানগণ ও তিন পার্বত্য জেলার কর্মকর্তাবৃন্দ। ইহাছাড়া তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামান বাবুও এই বৈঠকে যোগদান করেন।

বৈঠকের শুরুতে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এ, কে, এম জাফরুল হোসেন প্রস্তুতির রিপোর্ট পেশ করেন। স্বরাষ্ট্র সচিব শফিকুর রহমান অনুষ্ঠানের সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থাপন করেন। বৈঠক শুরুর পূর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যরা স্টেডিয়াম ঘুরিয়া দেখেন এবং কতিপয় নির্দেশ দেন।

শান্তিবাহিনীর সদস্যগণ ৯ই ফেব্রুয়ারী খিলাছড়ি হাইস্কুল মাঠ, মাইকছড়ি হাইস্কুল মাঠ ও দুদকছড়িতে নিরাপত্তা বাহিনীর নিকট অস্ত্র জমা দিবেন। এই অস্ত্রগুলি পরদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাহারা সমর্পণ করিবেন।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রথমদিনের অনুষ্ঠানটিকে উৎসবমুখর ও সার্থক করিয়া তোলার জন্য সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ অনুষ্ঠানটিকে সফল করিয়া তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। পর্যটন মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন জানান যে, আমন্ত্রিত অতিথিদের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করিবে পর্যটন কর্পোরেশন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, বেতার ও টিভি যাহাতে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করিতে পারে সে ব্যাপারে চেষ্টা চালানো হইতেছে।

মন্ত্রীরা একটি ক্যাম্পও পরিদর্শন করেন। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রথম সেখানেই সমবেত হইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য এলাকায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে পোস্টার

রাজ্যমাটি সংবাদদাতা ॥ শান্তিবাহিনীর সদস্যগণের অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তুতির পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়া উপজাতীয়দের চুক্তি বিরোধী একটি অংশ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা পার্বত্য এলাকায় চুক্তি বিরোধী শ্লোগান লিখিয়া পোস্টার লাগাইতেছে। রাজ্যমাটি সদর থানার ঘিলাছড়ি বাজার ও কুতুবছড়ি ইউনিয়নে পোস্টারিং হইয়াছে। সড়কের উপরও চুক্তি বিরোধী শ্লোগান লেখা হইয়াছে। ঘিলাছড়িতে লাগানো পোস্টার ছিঁড়িয়া ফেলা হইলেও কুতুবছড়িতে গাছের সহিত লাগানো পোস্টার রহিয়াছে। পোস্টারে “পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান” ছাড়াও আপত্তিকর কিছু শ্লোগান লেখা হইয়াছে।

একই এলাকায় ও কুতুবছড়ি ইউনিয়নে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের শান্তিচুক্তি বিরোধী অংশের তৎপরতায় স্থানীয় জনমনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

‘শান্তিবাহিনী’র সদস্যদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ যে সকল সদস্য তাহাদের দখলে, নিয়ন্ত্রণে বা আয়ত্তাধীনে থাকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরকারের কাছে জমা দিবেন তাহাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার তারিখ হইতে সাধারণ ক্ষমা কার্যকর হইবে।

গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, সাধারণ ক্ষমার আওতায় জনসংহতি সমিতির সদস্যের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুঁলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে। যে সকল সদস্যকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে বিচারে সাজা প্রদান করা হইয়াছে সে সাজা মওকুফ করা হইবে। যে সকল সদস্য জেলে আটক রহিয়াছেন তাহাদের মুক্তিদানের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত ছিলেন এমন সকল স্থায়ী বাসিন্দার

ক্ষেত্রেও সরকারের সাধারণ ক্ষমা কার্যকর হইবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোন সদস্যের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়া ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর সে সমিতির সদস্য ছিলেন কেবল এই কারণে তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হইবে না, তাহাকে গ্রেফতার করা যাইবে না ও শাস্তি প্রদান করা হইবে না।

সরকার নির্ধারিত তারিখ সময় অনুযায়ী আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রথম গ্রুপ খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে, ১৬ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় গ্রুপ বাঘাইছড়ি হাইস্কুল ময়দানে, ২২শে ফেব্রুয়ারী তৃতীয় গ্রুপ বরদাম হাইস্কুলে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী চতুর্থ গ্রুপ দুদুকছড়িতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবে।

সরকার আশা করে যে, স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর জনসংহতি সমিতির সদস্যগণ বাংলাদেশের সুনামগরিক হিসাবে জীবনযাপন করিবেন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি চুক্তি : যে সকল আইন

পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বিলোপ করা হইবে

হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥ দেশের বিরোধীদলগুলির প্রতিবাদ অব্যাহত থাকিলেও গত ডিসেম্বর মাসে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরকার উপজাতীয়দের মধ্য হইতে খাগড়াছড়ির সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমাকে মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছে।

তবে এখনও প্রস্তাবিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় নাই। ত্রিপুরা হইতে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন অব্যাহত রহিয়াছে। রাজ্যমাটির সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদারকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়া শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হইতেছে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট পাঁচ দফায় শান্তি বাহিনীর ১,৯৩৩ জন সদস্য সরকারের নিকট অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবেন। তাহারা সকলেই সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার আওতায় আসিবেন এবং যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইবে। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আত্মসমর্পণকারী সকল সদস্যকে পরিবার প্রতি ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে। চুক্তির প্রধান শর্ত হইল পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, বর্তমানে বলবৎ ১৯৮৯ সালের তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার

পরিষদ আইনের কতিপয় ধারা পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বিলোপ সাধন এবং জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন গঠন। আইনগুলি সংশোধনের লক্ষ্যে সরকার শীঘ্রই নয়া বিল উত্থাপন করিবে। যে সকল আইনের পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বিলোপ সাধন করা হইবে সেগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইলঃ

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
১	পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ	পার্বত্য জেলা পরিষদ
২	(ক) অ-উপজাতীয় অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন	অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা যিনি উপজাতীয় এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।
৪	(৫) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন জাতির সদস্য তাহা জেলার ডেপুটি কমিশনার স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট	কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা 'সার্কেল চীফ' স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট
৪	(৬) নাই।	কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
		সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।
৭	চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন।	চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে ডিভিশনের কোন বিচারপতি কর্তৃক সদস্যেরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন।
৮	চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দাখিল করিবেন।	চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দাখিল করিবেন।
১০	পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে তিন বৎসর। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নূতন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।	পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ পাঁচ বৎসর। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নূতন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।
১৪	অস্থায়ী চেয়ারম্যান: চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা বা অন্য	চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে নূতন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।	নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।
১৭	ভোটার তালিকা: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আপাতত: বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ পার্বত্য জেলাভুক্ত এলাকা সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সেই অংশ পরিষদের যে কোন নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে।	আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন, (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের বেশী হয়, (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন, (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।
২৫	(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।	পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।
৩১	পরিষদের সচিব: (১) পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকারবলে পরিষদের সচিব হইবেন।	পরিষদের সচিব: (১) পরিষদের সরকারের উপসচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয়

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
		কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
	(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে পরিষদের সভা আহ্বান, সভা পরিচালনা ও সভার কার্যসূচী নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।	(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে পরিষদের সভা আহ্বান, সভা পরিচালনা ও সভার কার্যসূচী নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।
৩২	(১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।	(১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।
	(২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।	(২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।
	(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান	(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	করিতে পারিবে।	করিতে পারিবে।
৩৩	(৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ সরকার পূর্বানুমোদনক্রমে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।	(৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে বিধি অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হইবে।
৩৬	(১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারি ট্রেজারীতে বা সরকারি ট্রেজারীর পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে রাখা হইবে।	(১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারি ট্রেজারীর পরিচালনাকারী কোন ব্যাংক রাখা হইবে।
৩৭	(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা-প্রথমতঃ, পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান; দ্বিতীয়তঃ এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়; তৃতীয়ঃ এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ কোন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়; চতুর্থঃ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের	চতুর্থতঃ মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	উপর দায়যুক্ত ব্যয়; পঞ্চমতঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।	
৩৭	(২) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত যে কোন ব্যয়।	(২) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত যে কোন ব্যয় বিধি অনুযায়ী হইবে।
৩৮	(৩) উপধারা (১)-এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার আদেশ দ্বারা বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।	(৩) বাতিল
৪২	(৪) নাই।	(৪) পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থ হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।
৪৫	(২) কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।	(২) কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে পরিষদ যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।
৫০	পরিষদের উপর তত্ত্বাবধানঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত	এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপ সামঞ্জস্য

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।	সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনে সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
৫১	পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ: (১) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার আদেশ দ্বারা—	বাতিল
৫২	পরিষদের বিষয়াদি সম্পর্কে তদন্ত: (১) সরকার স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা তৎসংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে	বাতিল

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্যও নির্দেশ দিতে পারিবে। (২) উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণের জন্য Code of Civil Procedure 1908 (Act V of 1908)-এর অধীন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।	
৫৩	(৩) বাতিল করার মেয়াদ শেষ হইলে এই আইন ও বিধি মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।	পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।
৬১	আপীল: এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।	আপীল: এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।
৬২	(১) জেলা পুলিশ: আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পাবর্ত্য জেলা পুলিশের সাব-	(১) আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পাবর্ত্য জেলা পুলিশের সাব-

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	জেলা পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দার মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।	ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।
৬২	(৩) পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।	(৩) পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে যথা, আইন ও বিধি অনুযায়ী পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।
৬৪	ভূমি হস্তান্তরে বাধা-নিষেধ: আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ	(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	কোন জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত (Protected) ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাণ্ডাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা-জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা-জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।	(Reserved) বনাঞ্চল, কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না। (২) আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রাকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না। (৩) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। (৪) কাণ্ডাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।
৬৫	ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত বিশেষ বিধান: আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলায় আদায়কৃত উক্ত	আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিশোধের তহবিলে থাকিবে।

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	করের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিষদের তহবিলে অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।	
৬৭	পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ; সরকার প্রয়োজন হইলে আদেশ দ্বারা পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয় বিধান করিতে পারিবে।	পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা হইবে।
৬৯	(১) প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।	এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ এই আইন বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয়, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে, তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।
৭০	ক্ষমতা অর্পণ: সরকার এই আইনের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।	বাতিল
৭৯	কোন আইনের বিষয় সম্পর্কে আপত্তি: পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের	পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
	জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার নিকট লিখিত আবেদন পেশ এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে। এই আবেদন বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।	কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।
২২	প্রথম তফসীল: পরিষদের কার্যাবলী ৬। কৃষি ও বন- (খ) সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বা রক্ষিত নহে এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।	প্রথম তফসীল: পরিষদের কার্যাবলী ৬। কৃষি ও বন (খ) সরকার কর্তৃক রক্ষিত নহে এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।
২২	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্ব	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদি প্রথম তফসীল এবং (ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা (খ) পুলিশ (স্থানীয়) (গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার (ঘ) যুব কল্যাণ (ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (চ) স্থানীয় পর্যটন (ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান

ধারা	বর্তমান আইনে যাহা আছে	চুক্তির ফলে নয়া আইনে যাহা থাকিবে
		(বা) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা (এ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ (ট) মহাজনী কারবার (ঠ) জুম চাষ
৪৪	দ্বিতীয় তফসিল: পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস ১। স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ। ২। বিজ্ঞাপনের উপর কর। ৩। পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল। ৪। পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট। ৫। পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস। ৬। পরিষদ কর্তৃক কৃত মানবকল্যাণমূলক কাজ হইতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস। ৭। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস। ৮। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।	দ্বিতীয় তফসীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস-এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে: (ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি (খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর (গ) ভূমি ও দালানকোঠার উপর হোল্ডিং কর (ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর (ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস (চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর (ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশবিশেষ (জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর (ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বাপাটাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ (এং) ব্যবসার উপর কর (ট) লটারীর উপর কর (ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

‘দীর্ঘদিনের সংকট নিরসনে শেখ হাসিনা

সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন’

পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতি ম্যাডেলার অভিনন্দন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৯ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যাডেলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট প্রেরিত এক বার্তায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তিকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন। বার্তায় তিনি বলিয়াছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের নেতাদের সহিত উপনীত শান্তি চুক্তির খবরে তিনি গভীরভাবে অভিভূত হইয়াছেন এবং অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের এই অবিসম্মাদিত নেতা বলেন, তাহার সংলাপ ও সমঝোতাকে বিরোধ মীমাংসার সর্বোত্তম পন্থা হিসাবে গণ্য করেন এবং এই পথে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সংকট নিরসনে শেখ হাসিনা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করিয়া বলেন, বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা পত্রে মিঃ ম্যাডেলা তাহার বাংলাদেশ সফরের কথা স্মরণ করিয়া বলেন, “জাতি হিসাবে আপনাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। কারণ আপনারা অতীতের সমস্ত দায়বদ্ধতা কাটাওয়া উঠিতে এবং শান্তিপূর্ণ জীবন ও জনগণের সমৃদ্ধির পথে বর্তমানের বাধাবিপত্তি মোকাবিলায় এক অসম সাহস ও অঙ্গীকারের পরিচয় দিয়াছেন।” গত ২৫শে জানুয়ারী লেখা এই পত্রে নেলসন ম্যাডেলা বিশেষ করিয়া পবিত্র রমজান মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা স্মরণ করার বিষয়টি উল্লেখ করিয়া তাঁহার কুশল ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আগামীকাল জনসংহতি

সমিতি ও ‘শান্তিবাহিনী’ বিলুপ্ত হইবে

বান্দরবান হইতে মিলন চক্রবর্তী ৯ আগামীকাল (মঙ্গলবার) ২৬ বছরের পুরাতন রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র গ্রুপের আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্তি ঘটিবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি মানুষ অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা হইতে পরিত্রাণ

পাইবে। সংঘাতের পরিবর্তে পাহাড়ী-বাঙালীর সহাবস্থান আর মিলন ঘটিবে। পার্বত্য বিদ্রোহের যবনিকাপাতের সাথে সাথে পাহাড়ে পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস ছড়াইয়া পড়িবে।

১৯৭২ সালের ২৯শে জানুয়ারী চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে ১টি দল এবং তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে আরেকটি ১০ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে। ২য় দলটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে চার দফা দাবী পেশ করে। দাবীগুলি ছিল ১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হইবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকিবে। ২. উপজাতি জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকিবে। ৩. উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করিতে হইবে। ৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এইরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী ঐ সময়কার পরিস্থিতিতে দাবীনামাসমূহ সমীচীন নয় বিধায় ৪ দফা দাবী মানেন নাই। পরে ৭২ সালের ২৪শে এপ্রিল মানবেন্দ্র লারমা এককভাবে জনসংহতি সমিতির আহ্বায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারী সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গঠিত হয়।

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর যে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান হইতে যাইতেছে এই ধরনের অনুষ্ঠান ১২ বছর পূর্বে একবার হইয়াছিল। ১৯৮৫ সালের ২৯শে এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসেন। তবে ঐ সময়ে অস্ত্র সমর্পণের জন্য চুক্তি হইয়াছিল সেনাবাহিনীর সাথে এবং অস্ত্র সমর্পণও হইয়াছিল সেনাবাহিনীর কাছে। এবারে চুক্তি হইয়াছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে এবং প্রথম দফা অস্ত্র সমর্পণ হইবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে।

১৯৭৮ সালের দিকে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা প্রীতি কুমার চাকমার বক্তব্য ছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তি অর্জিত হইবে। অপরদিকে মানবেন্দ্র লারমা মার্কসবাদ ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পথ সমর্থন করেন। দীর্ঘ বিতর্কের এক পর্যায়ে ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে বিভক্তি সৃষ্টি হইয়া প্রীতি গ্রুপের আবির্ভাবের মধ্য দিয়া জনসংহতি সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়।

১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের একটি সুইসাইড স্কোয়াড মানবেন্দ্র লারমাকে গহীন বনে নিজ আস্তানায় বিশ্রামরত অবস্থায় হত্যা করে। মানবেন্দ্র লারমাকে হত্যার পর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ

লারমা) তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইহার পর হইতে মানবেন্দ্র লারমার গ্রুপ শান্তিবাহিনীর মূল শ্রোতধারা সম্ভ লারমার সাথে একসঙ্গে কাজ করিয়া আসিতেছে। বান্দরবান হইতে দলে দলে বিভিন্ন পেশার লোক খাগড়াছড়ি চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের ধারণা এই ধরনের দুর্লভ, বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান জীবনে আর দেখা নাও হইতে পারে। তাই হরতালকে সামনে রাখিয়া তাহারা ছুটিতেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপজাতীয় নেতারা জানান, পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস ফিরাইয়া আনিতে শেখ হাসিনার সরকার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

**১লা জানুয়ারী হইতে ১২৫৯ জন
উপজাতি শরণার্থী দেশে ফিরিয়াছে**

বাসস ॥ খাগড়াছড়ি জেলার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে গত ১লা জানুয়ারী হইতে প্রত্যাবাসনের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে দ্বিতীয় দফার ৫ম দিনে গতকাল শনিবার পর্যন্ত ২০০ পরিবারের মোট ১২৫৯ জন শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কর্মকর্তাগণ জানান, ১৯৯৪ সালে প্রত্যাবাসন শুরু হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত ৯৭৪১টি পরিবারের ৫৯৫৬৭ জন উপজাতি শরণার্থী দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। কর্মকর্তাগণ জানান, আগামী মঙ্গলবার অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান এবং ভারতের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ৮ হইতে ১০ই এবং ১২ হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার কাজ স্থগিত থাকিবে।

আজ রবিবার ১৯৭টি পরিবারের ১১৮৪ জন উপজাতি তাহাদের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবির হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার কথা রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

**শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান
বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হইবে**

শান্তি বাহিনী আগামীকাল (মঙ্গলবার) বেলা ১১টায় খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করিবে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র ১০০০ কিঃ ওঃ মধ্যম তরঙ্গ অর্থাৎ ৬৯৩ কিলোহার্জে সরাসরি প্রচার করিবে। -তথ্য বিবরণী

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
আজ ‘শান্তিবাহিনী’র অস্ত্রসমর্পণ

খাগড়াছড়ি হইতে হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥ উপজাতীয় জনগণের জাতিসত্তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিককাল শান্তিবাহিনীর যে সকল সদস্য অস্ত্র হাতে নিয়া গেরিলা যুদ্ধ শুরু করিয়াছিলেন, আজ (মঙ্গলবার) হইতে তাহাদের সেই সংঘাতময় জীবনের অবসান ঘটবে। গত ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিদ্রোহীরা আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট অস্ত্র সমর্পণ করিয়া আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী, শান্তিবাহিনী, উপজাতীয় ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের ২০ হাজারেরও বেশি সদস্য প্রাণ দিয়াছেন।

এদিকে এই ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করিয়া বিএনপিসহ ৭ দল আজ শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের দিনে চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন এবং দেশের অন্যান্য স্থানে বিক্ষোভ-সমাবেশের ডাক দিয়াছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার আজ শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করিবে। প্রায় ২ শত দেশী-বিদেশী সাংবাদিক অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য উপস্থিত থাকিবেন।

আজ সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ির নবনির্মিত স্টেডিয়ামে বহু প্রতীক্ষিত এই অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান শুরু হইবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারযোগে সরাসরি ঢাকা হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছাইবেন। আরও আসিবেন মন্ত্রীবার্গ, বিচারপতিগণ, বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দ, সিনিয়র সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, দফতরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ইতিমধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমনের ১৫ মিনিট পূর্বে অস্ত্র জমাদানকারীরা অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করিবেন। খাগড়াছড়ি জেলার ডিসি কে এম জাফরুল হোসেন জানান, প্রায় ২৫ হাজার লোক স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিবে।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর পরই পবিত্র কোরান, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠের পর প্রধানমন্ত্রী তাহার ভাষণ প্রদান করিবেন। ইহার

অব্যবহিত পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্ত্রিয় লারমা (সন্ত) প্রধানমন্ত্রীর নিকট সর্বপ্রথমে তাঁহার অস্ত্রটি সমর্পণ করিবেন। জানা গিয়াছে যে, ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে এই অস্ত্রটি জাতীয় জাদুঘরে রাখা হইবে। অতঃপর শান্তিবাহিনীর অন্যান্য সদস্য অস্ত্র জমা দিবেন। প্রধানমন্ত্রী শান্তির প্রতীক শ্বেত কপোত উড়াইয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানিবেন।

গতকাল সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি জেলা সদর মিছিলের শহরে পরিণত হয়। শত শত লোক ‘পাহাড়ী-বাঙ্গালী ভাই ভাই আমরা সবাই শান্তি চাই’ ইত্যাদি শ্লোগান দিয়া এবং শান্তির প্রতীক সাদা পতাকা উড়াইয়া আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। মিছিলকারীদের মধ্যে যেমন ছিল বাঙ্গালী তেমন ছিল উপজাতীয়। ইহাছাড়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সম্বলিত বিশাল রঙ্গীন পোষ্টার শহরের বিভিন্ন স্থানে শোভা পাইতেছে।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ও অন্য এই অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি নামে পরিচিত বঙ্গুর পাহাড় আর সবুজ অরণ্যে ঘেরা খাগড়াছড়ি এখন উৎসবের শহরে পরিণত হইয়াছে। একদিকে যেমন সরকারী কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনে উন্মুখ শান্তিবাহিনী সদস্যদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত; অপরদিকে তেমনি ৪০ হাজার লোক অধ্যুষিত এই ছোট্ট পাহাড়ী শহরটি উপজাতীয় ও বাঙ্গালীদের মিলন কেন্দ্রের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। খাগড়াছড়ি রঙ্গে-রূপে সাজিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নির্মাণ করা হইয়াছে সুদৃশ্য তোরণ। যে নবনির্মিত স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিয়া শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তাহাদের অরণ্য-জীবনের যবনিকাপাত টানিবেন, উহা লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ও সাদা পতাকায় সুশোভিত। সেখানে শোভা পাইতেছে হরেক রং-এর ব্যানার ও ফেটুন। কে, কোথায় এবং আগে ব্যানার লাগাইবে তাহা লইয়া বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে পুরাদস্তুর প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। সরকারী অফিস-আদালত ও বাসভবন চুনকামের পালা শেষ হইয়াছে। আজ সেই সঙ্গে পরিষ্কার করা হইয়াছে দেওয়ালের লিখন। প্রথমদিকে খাগড়াছড়িতে শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইলেও ইতিমধ্যেই তাহা স্তিমিত হইয়াছে। যাহারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও দোকান-পাটে এতদিন কালো পতাকা উঠাইয়াছিলেন, তাহারাই এখন তাহা নামাইয়া ফেলিয়াছেন। এখন সারা খাগড়াছড়ি শহর শান্তির প্রতীক সাদা পতাকায় ছাইয়া গিয়াছে-উড়িতেছে গাছের ডালে, পাহাড়ের শীর্ষে, ল্যাম্প পোষ্টের গায়ে, বাড়ী-ঘর ও দোকানপাটে।

আজ হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট পাঁচ দফায় শান্তিবাহিনীর ১,৯৩৩ জন সদস্য সরকারের নিকট অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবেন। তাহারা সকলেই সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার আওতায় আসিবেন এবং যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইবে। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আত্মসমর্পণকারী সকল সদস্যকে পরিবার প্রতি ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে।

চুক্তির প্রধান শর্ত হইল পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, বর্তমানে বলবৎ ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের কতিপয় ধারা পরিবর্তন-সংশোধন সংযোজন ও বিলোপ সাধন এবং জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন গঠন। আইনগুলি সংশোধনের লক্ষ্যে সরকার শীঘ্রই জাতীয় সংসদে নয়া বিল উত্থাপন করিবে।

চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরকার উপজাতীয়দের মধ্য হইতে খাগড়াছড়ি সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমাকে মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছে। তবে এখনও প্রস্তাবিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় নাই। ত্রিপুরা হইতে শরণার্থীদের প্রত্যাশন ও পুনর্বাসন অব্যাহত রহিয়াছে। রাঙামাটির সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদারকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়া শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হইয়াছে। বান্দরবানের সংসদ সদস্য বীর বাহাদুরকে উপ-মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হইতেছে।

আজকের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিয়াছে গহীন অরণ্যেও। স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাশায় জঙ্গলের গোপন আস্তানাকে চিরবিদায় জানাইয়া শান্তিবাহিনীর সদস্যরা গতকাল (সোমবার) খাগড়াছড়ির পথে পাড়ি জমাইয়াছেন। কাঁধে অস্ত্র, মাথায় ক্যাপ, পিঠে ব্যাগ নিয়া জলপাই রং-এর গেরিলা পোশাক পরিহিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা দলে দলে দুদুকছড়া, মাইলছড়ি ও ঘিলাছড়িতে সমবেত হয়। সেখানে তাহাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা জমা নেন। অভূতপূর্ব এই দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার পার্বত্যবাসী ও বাঙ্গালী সেখানে ভিড় জমায়। তবে নিরাপত্তা রক্ষীরা তাহাদিগকে ধারে-কাছেও ঘেঁষিতে দেয় নাই। এমনকি ঢাকা এবং অন্যান্য স্থান হইতে আগত সাংবাদিককেও অনেক দূর হইতে এই দৃশ্য অবলোকন করিতে হয়। অবশ্য শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যখন সমাবেশস্থলে সারিবদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিতে থাকে তখন উপস্থিত নারী-পুরুষ হাত নাড়িয়া ও করতালি দিয়া তাহাদিগকে স্বাগত জানায়। ছড়ার দুই ধারে

ছিল দুইটি তোরণ। তাহাদের আগমনের সুবিধার জন্য ছড়ার উপর একটি অস্থায়ী গাছের সাকোও নির্মাণ করা হয়।

জমাকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হওয়ার পর এই তিন কেন্দ্র হইতে বাস, ট্রাক ও জীপে করিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসা হয় খাগড়াছড়ি হইতে চার কিলোমিটার দূরে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে। তাহাদের এক পলক দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে এবং টিলায় হাজার হাজার উপজাতীয় ও বাঙ্গালী ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকেন। অস্ত্র জমাদানকারীরা পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে বিশ্রাম নেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের খোশ মেজাজে দেখা গিয়াছে এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে গাল-গল্প করিয়া সময় কাটান।

অস্ত্র সমর্পণের জন্য ৭ শতাধিক উপজাতীয় গেরিলা তাহাদের গভীর জঙ্গলের ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া গতকাল দুদুকছড়িতে সমবেত হয়। গাড় সবুজ পোশাক পরিহিত কাঁধে অস্ত্র নিয়া এই সকল গেরিলা সেখানে পৌঁছিলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাহাদের অভিনন্দন জানায়। পরে তাহাদের ৩টি সামরিক শিবিরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। অস্ত্র গোলা-বারুদ জমাদানের জন্য তাহাদের আজ এই শিবির হইতে স্টেডিয়ামে নিয়া যাওয়া হইবে।

বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে সমবেত উপজাতীয় গেরিলাদের আত্মসমর্পণের জন্য ইতিমধ্যে তালিকা প্রস্তুত শুরু হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সকল ক্যাম্প খুলিয়াছেন।

নির্ধারিত কর্মসূচী মোতাবেক উপজাতীয় বিদ্রোহীরা ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করিবেন। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রস্তুত তালিকা মোতাবেক তাহারা সেখানে তাহাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবে।

৩টি অঞ্চল হইতে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পেরাছড়ার ট্রানজিট ক্যাম্পে একত্রিত হইলে উহা তাহাদের এক মহামিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাহাদের ইতিপূর্বে একে অন্যের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই। কারণ তাহারা বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন।

দুদুকছড়া হইতে পেরাছড়া পর্যন্ত প্রায় ৩৬ কিলোমিটার রাস্তায় আটটি তোরণ নির্মাণ করা হইয়াছে। “জন সংহতি সমিতি জিন্দাবাদ”, “শান্তি চুক্তি জিন্দাবাদ”, “শান্তিবাহিনীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম” এবং “ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সফল হউক” ইত্যাদি লেখা তোরণগুলিতে স্থান পায়। পানছড়ি ও পুজগাং-এ মারমা, ত্রিপুরা ও চাকমা সম্প্রদায় তিনটি তোরণে তাহাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলিয়া ধরে। তাহাদের নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সম্ভ) নেতৃত্বে আজ ৭৩৯ জন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিকট অস্ত্র ও গোলা-বারুদ সমর্পণ করিবেন। মোট ৪৫৬টি অস্ত্রের মধ্যে তাহারা গতকাল ২৫৬টি জমা দেন দুদুকছড়া, ৭৭টি মাইজছড়িতে ও ১২৩টি ঘিলাছড়িতে। অস্ত্রগুলির মধ্যে রহিয়াছে এল এম জি, এ আর একে ৪৭, ৩০৩ রাইফেল ও পাইপ গান। দুই শত জন সদস্যের পক্ষ হইতে জমা দেওয়া হইবে মর্টার ও বিস্ফোরকসহ বিভিন্ন প্রকারের গোলাবারুদ। অধিকাংশ অস্ত্রই চীন ও চেক রিপাবলিকের তৈয়ারী বলিয়া জানা গিয়াছে। সন্ত্র লারমা কোন ট্রানজিট ক্যাম্পে যান নাই। কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়া তিনি সরাসরি আসিবেন তাহার গোপন আস্তানা দুদুকছড়ির গহীন অরণ্য হইতে। সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর চাকমা তাহাকে দুদুকছড়া হইতে খাগড়াছড়ি লইয়া আসিবেন। তবে তিনি আবার তাহার আস্তানায় ফিরিয়া যাইবেন। পরে এই মাসের ২৮ তারিখে সর্বশেষ দলটিকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য খাগড়াছড়ি আগমন করিবেন। শহরের লোক সমাগম অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু পার্বত্য অঞ্চল হইতেই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থান হইতেও শ্রোতের মতো লোক আসিতেছে আজকের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করিতে। উৎসবের পোশাকে সজ্জিত হইয়া উপজাতীয় তরুণ-তরুণী ও গৃহবধূরা শিশু সন্তানসহ রাস্তা ঘাটে ও দোকানপাটে রাত অবধি ভিড় জমাইয়াছে। বাঙালীরাও এই আনন্দে সামিল হইতেছে। হোটেল তিল ধারণের জায়গা নাই এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পালে লাগিয়াছে নূতন হাওয়া। বাঙালী ব্যবসায়ী বিন্দু বড়ুয়া বলিলেন, আগে আমরা দুই সপ্তাহে একবার চট্টগ্রাম হইতে মালসামানা আনিতাম। এখন সপ্তাহে দুইবার চট্টগ্রাম আসা-যাওয়া করিতে হইতেছে। শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ ও অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির প্রত্যাবর্তনই এখন মোড়ে মোড়ে ও চায়ের দোকানে প্রধান আলোচ্য বিষয়। আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকা হইতে জাতীয় শিল্পীদের একটি দল ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যান্ডদল অর্কেস্ট্রা গ্রুপ, মাইপ ও ব্রাশ ব্যান্ডদলও এখন খাগড়াছড়িতে। “শোন একটি মুজিবুরের কণ্ঠে”, “জয় বাংলা বাংলার জয়”সহ বিভিন্ন দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সেনাবাহিনীর ব্যান্ডদল পরিবেশন করিবে। অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণী বর্ণনার জন্য ঢাকা হইতে আসিয়াছেন হাসান ইমাম, আলী জাকের, আবেদ খান ও শাহরিয়ার কবীর।

গত ডিসেম্বরে সম্পাদিত যে শান্তি চুক্তির আওতায় অস্ত্র সমর্পণ করা হইবে উহার প্রতিবাদে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন সাত দলীয় ঐক্যজোট আজ খাগড়াছড়িসহ চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করিয়াছে। খাগড়াছড়ির বিভিন্ন স্তরের জনগণের সহিত আলাপকালে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অন্ততঃ এই শহরটিতে হরতাল ব্যর্থ হইবে। তবে জেলার কোন

কোন স্থানে প্রসিত খীসা ও সঞ্চয় চাকমার নেতৃত্বাধীন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে হাতে লেখা পোষ্টার লাগাইয়াছে। খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান শান্তিবাহিনীর নেতা সন্ত্র লারমার বিরুদ্ধেও পোষ্টার পুড়িয়াছে। এমন একটি পোষ্টারের বক্তব্য ঃ ‘সন্ত্র-সমীরণ ভাই ভাই, এক রশিতে ফাঁসি চাই’। গত রবিবার রাতে সিংঘিনালা খাগড়াছড়ি পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত একটি তোরণের কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। ইহা ছাড়া, পেরাছড়া, জোর মড়ং, লোগাং ও পুজগাং-এ শান্তি চুক্তি ও সন্ত্র লারমার বিরুদ্ধে শ্লোগান সম্বলিত হাতে লেখা পোষ্টার লাগান হয়। একজন তরুণ বাঙালী হোটেল মালিক মনে করেন, শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য এলাকার বাঙালীদের কোন ক্ষতি হইবে না। বরং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বলেন, শুধু তাহারাই শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করিতেছে, যাহারা উপজাতীয়দের ঘরবাড়ী ও জমিজমা এতকাল জবর দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। তবে কর্তৃপক্ষ শান্তিভঙ্গের ব্যাপারটি খাটো করিয়া দেখিতেছে না। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ট্রাকে চড়িয়া সারা শহর প্রদক্ষিণ এবং যানবাহন তল্লাশী করিতেছে। পুলিশ এ পর্যন্ত ২৪ জন চুক্তি বিরোধিতাকারীকে গ্রেফতার করিয়াছে। পাহাড়ী গণপরিষদের সাবেক সভাপতি বিজিসার খীসা অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাইয়াছেন। তবে তিনি বলেন, আমাদের দেখিতে হইবে চুক্তিটি কিভাবে বাস্তবায়িত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়ি প্রস্তুত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘকালের অশান্তির অবসান পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি এখন খাগড়াছড়ির দিকে। আনন্দমুখর খাগড়াছড়ি এখন অতিথির সাদর অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আজ সকালে হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ি যাইবেন। মাসাধিককাল ধরিয়া অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তুতি চলিতেছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি সংক্রান্ত কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ সপ্তাহ ধরিয়া খাগড়াছড়িতে অবস্থান করিতেছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মধ্য ও মাঠ পর্যায়ের অসংখ্য নেতা-কর্মী ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ি পৌঁছিয়াছেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ গতকাল হইতে খাগড়াছড়ির পথে

রহিয়াছেন। রহিয়াছেন আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা ও কর্মী, এই অভাবনীয় দৃশ্যটি উপভোগ করার জন্য। দেশী-বিদেশী দুইশত সাংবাদিকের বিরাট গাড়ীবহর গতকাল খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছে। ডিপ্লোম্যাটিক কোরের ডীন ঢাকাস্থ ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ভারত, পাকিস্তান, সৌদী আরবসহ ঢাকায় নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের ৩৪ জন রাষ্ট্রদূত ও চার্জ দ্য এফেয়ার্স, বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার প্রধান, জাতীয় সংবাদপত্র ও সংস্থার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক-কলামিষ্ট, বিদেশী সাংবাদিক, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবীসহ ২ শতাধিক অগ্রহী ব্যক্তিবর্গ আজ ভোরে এয়ারবাসে চট্টগ্রাম ও সেখান হইতে সড়কপথে খাগড়াছড়ি পৌঁছিবেন। অনেক অতিথি যাইবেন হেলিকপ্টারে। অনুষ্ঠানটিকে বর্ণাঢ্য করিয়া তুলিবার জন্য দেশের বিশিষ্ট শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের একটি বিরাট দল খাগড়াছড়িতে রহিয়াছেন। অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা নিয়োজিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল ১০টার দিকে হেলিকপ্টারে যাইয়া খাগড়াছড়ি পৌঁছিলে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রকিফুল ইসলাম বীর উত্তম তাঁহাকে স্বাগত জানাইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ইউএনবি ॥ আজ শান্তি বাহিনীর আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণের সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। এজন্য উপত্যকা শহর খাগড়াছড়িতে নেওয়া হইয়াছে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মোতামেন করা হইয়াছে ১৫ হাজারের অধিক নিরাপত্তা কর্মী।

খাগড়াছড়ির ডেপুটি কমিশনার জাফরুল হোসেন বলিয়াছেন, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে এখানকার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় বাসিন্দারা উদ্‌যীব অপেক্ষায় রহিয়াছে।

জ্যোতির্বিদ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর ছয় শতাধিক সশস্ত্র সদস্য আজ অস্ত্র সমর্পণ করিবেন। তাহাদের অস্ত্রের অধিকাংশ টানে তৈরী একে-৪৭ রাইফেল, মর্টার ও নানা ধরনের বন্দুক।

শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহীরা আজ ঐতিহাসিক অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের পূর্বে সামরিক বাহিনী কর্তৃক যাচাই করার জন্য তাহাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা

দিবে। স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাগণ বলেন, প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও উহার মিত্র দলসমূহ আহূত হরতালের কারণে ১৫ সহস্রাধিক নিরাপত্তা কর্মীকে সতর্কবস্থায় রাখা হইবে। ইহাছাড়া আরও অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

চট্টগ্রাম শহর হইতে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত গোটা সড়কপথে পুলিশ নিয়োগ করা হইবে। অনুষ্ঠানের নিকটবর্তী স্থানসমূহে ৬ ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

কূটনীতিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকদের ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম হইয়া এখানে আসিয়া পৌঁছানোর কথা। পুলিশ ছাড়াও সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে। সুউচ্চ পাহাড় আর আঁকাবাঁকা চাঙ্গি নদী ঘেরা সুদৃশ্য পাহাড়ী শহরে এখন উৎসবের আমেজ নামিয়াছে। নিরাপত্তা বাহিনী শহরে প্রবেশকারী অতিথিদের জন্য আমন্ত্রণলিপি ও নিরাপত্তা পাস করিতেছে। শহরে পত পত করিয়া উড়িতেছে শান্তির প্রতীক সাদা পতাকা। তবে কিছু কিছু ক্ষুদ্র এলাকায় বিরোধী দল ও তাহাদের সমর্থকরা কালো পতাকা উড়াইয়াছে। গোটা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবীও প্রশাসনকে সহায়তা করিতেছে বলিয়া কর্মকর্তারা জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
আজ চট্টগ্রাম বিভাগে বিএনপিসহ ৭ দলের
সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আঙ্গান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ৭ দলীয় জোট আজ (মঙ্গলবার) চট্টগ্রাম বিভাগের সর্বত্র সকাল-সন্ধ্যা হরতাল এবং দেশের অন্যান্য মহানগরী, জেলা ও থানায় সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী দিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের হরতালে খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওতামুক্ত রহিয়াছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ঢাকা মহানগর বিএনপি আজ বিকাল সাড়ে ৩টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মাঠে সমাবেশ ও সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিবে। ঢাকা মহানগরী আঙ্গায়ক সাদেক হোসেন খোকা এম, পি এই কর্মসূচী সফল করার আঙ্গান জানাইয়াছেন।

জামায়াতে ইসলামী বিকাল সাড়ে ৪টায় পুরানা পল্টন মোড়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী দিয়াছে।

জাতীয় পার্টির (জাফর) জমায়েত বিকালে ঢাকার মুজাঙ্গনে। ডেমোক্রাটিক লীগের সমাবেশ ও মিছিল বিকালে বিজয়নগর পানির ট্যাঙ্কির সম্মুখ হইতে। ইসলামিক পার্টির সমাবেশ ও মিছিল বিকালে পুরানা পল্টনে।

ইসলামী ছাত্র সমাজ, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল আজকের হরতাল ও বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করার জন্য পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছে।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দল আজ (মঙ্গলবার) বৃহত্তর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করিয়াছে। হরতালের সমর্থনে চট্টগ্রাম ৭ দলীয় ঐক্য জোটের বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা-সমাবেশে আজকের হরতাল সফল করার আহ্বান জানানো হয়। হরতালের সমর্থনে চট্টগ্রামে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোটসহ সহযোগী ৭ দলের উদ্যোগে গতকাল সোমবার পর্যন্ত সম্মিলিত এবং পৃথক পৃথক বিক্ষোভ মিছিল ও মশাল মিছিল অব্যাহত থাকে।

চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের উদ্যোগে গতকাল সোমবার নাসিমন ভবন দলীয় কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বক্তাগণ বিরোধীদল আহূত আজকের সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালনের মাধ্যমে ‘তথাকথিত’ শান্তি চুক্তি বাতিলে সরকারকে বাধ্য করা হইবে বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। চট্টগ্রাম মহানগরী বিএনপি ও সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ ওয়াহিদুল আলম এমপি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তাগণ উল্লেখ করেন, সরকার ভারতের স্বার্থে শান্তি বাহিনীর সহিত এই চুক্তি করিয়াছে এবং ইহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তিই বৃদ্ধি পাইবে। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব দস্তগীর চৌধুরী, শামসুল আলম কমিশনার, শাহজাদা এনায়েত উল্লাহ খান, আবু সুফিয়ান প্রমুখ। সমাবেশের পূর্বে বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনসমূহের এক বিরাট মশাল মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।

বান্দরবান সংবাদদাতা ॥ আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বিভাগে পূর্ণদিবস হরতালের সমর্থনে গতকাল বান্দরবান প্রেসক্লাব চত্বরে বিএনপি ও জামায়াতের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতে ইসলামী বান্দরবান জেলা আমীর রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ইহাতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোঃ ওসমান গনি, এডভোকেট মহতুল হোসাইন আব্দুল মাবুদ, মোঃ ইলিয়াছ প্রমুখ। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে আজকের হরতাল সফল করার জন্য শহরে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণকে অভিনন্দিত

করিয়া ছাত্রলীগের মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ অস্ত্র সমর্পণকে অভিনন্দন জানাইয়া ছাত্রলীগের উদ্যোগে গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাজেয় বাংলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, অস্ত্র সমর্পণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ঐতিহাসিক সাফল্য। তিনি বলেন, বিএনপিসহ কতিপয় স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক দল ইহার বিরোধিতা করিতেছে কেবল বিরোধিতার খাতিরে। তাহাদের রাজনৈতিক বৈকল্য ছাত্রসমাজ প্রতিরোধ করিবে। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা সুজিত রায় নন্দী, গোলাম সারোয়ার টুকু ও আঃ ওয়াদুদ খোকন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ

খাগড়াছড়ি হইতে হাসান শাহরিয়ার ॥ শত শত রঙিন বেলুন ও শ্বেত কপোত উড়াইয়া এক আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের হর্ষোধনি এবং সামরিক ব্যান্ডের মূর্ছনার মধ্য দিয়া গতকাল (মঙ্গলবার) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর সদস্যরা দীর্ঘ দুই যুগের সশস্ত্র বিদ্রোহের পর অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করিয়াছেন। তাহাদের নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত)-এর নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ে মোট ৭৩১ জন বিদ্রোহী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট অস্ত্র সমর্পণ করিয়া এক নব যুগের সূচনা করেন। লারমার নিকট হইতে তাহার চাইনিজ এসএমজিটি গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে শেখ হাসিনা তাহাকে উপহার দেন শান্তির প্রতীক এক গুচ্ছ সাদা গোলাপ। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপজাতীয় ও বাঙালী নর-নারীদ্বারা কানায় কানায় পরিপূর্ণ নব-নির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।

এই অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পীকার, মন্ত্রীবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জাতীয় সংসদের সদস্যগণ, বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দ, উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাসহ তিন বাহিনীর প্রধান, বিভিন্ন বিদেশী সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ, উপজাতি নেতৃবৃন্দ এবং সাহিত্যিক, দুই শতাধিক সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক

কমীবন্দ। গত ডিসেম্বরে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ও উহারই ফলশ্রুতিতে অস্ত্র সমর্পণকে স্বাগত জানাইয়া নানা বর্ণের অজস্র ফেস্টুন, পোষ্টার ও ব্যানার এবং শান্তির প্রতীক সাদা পতাকা স্টেডিয়ামের গ্যালারীগুলিকে সুশোভিত করিয়া তোলে। অস্ত্র সমর্পণের সার্বিক দায়িত্বে ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম দুইদিন পূর্ব হইতেই খাগড়াছড়ি উপস্থিত থাকিয়া সব কিছু তদারক করেন।

গতকাল কাক ডাকা ভোর হইতেই পাহাড় ও বন-বাদাড়ে ঘেরা খাগড়াছড়িতে উচ্ছল জনতার ঢল নামে। মিছিলের পর মিছিল করিয়া কোমলমতি বালক-বালিকাসহ আবাল-বৃদ্ধবণিতা স্টেডিয়ামে আসিতে থাকে। অনুষ্ঠান শুরু হইবার কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগেই স্টেডিয়ামটি সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া যায়। আরও শত শত উনুখ জনতা স্টেডিয়ামের আশেপাশের মাঠ ও খালি জায়গায় সমবেত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এত বৃহৎ আয়োজন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনগণ অতীতে আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। শুধু খাগড়াছড়ি হইতেই নয়, বাস, ট্রাক ও বিভিন্ন যানবাহন পরিপূর্ণ করিয়া আরও হাজার হাজার পার্বত্যবাসী ছুটিয়া আসেন রাঙামাটি, চট্টগ্রাম এবং আশেপাশের জেলাগুলি হইতে।

কাহারও মনেই হয় নাই যে, গতকাল ঐতিহাসিক এই শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে বিএনপিসহ সাতটি রাজনৈতিক দল চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকিয়াছিল। যাহারা স্টেডিয়ামে ঢুকিতে পারে নাই তাহারা বাসা-বাড়ী ও দোকান-পাটে টেলিভিশনের সেটের সামনে বসিয়া পড়ে। বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রথমবারের মত এই উন্নত ব্যবস্থায় বিশ্বব্যাপী স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করে। এক প্রতিমন্ত্রী দুইদিন পূর্ব হইতে খাগড়াছড়িতে থাকিয়া বিটিভির সম্প্রচার নিশ্চিত করেন। দেশের কোটি কোটি মানুষ বিটিভির মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে জলপাই রং-এর গেরিলা পোশাক পরিহিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যখন একের পর এক স্টেডিয়ামে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন দর্শকরা মুহূর্মুহ করতালির মাধ্যমে তাহাদের স্বাগত জানায়। তাহাদের অনেকেরই কাঁধে বুলিতেছিল স্টেনগান বা রকেট লাঞ্চার।

অনেকটা লেফট-রাইটের ভঙ্গিতে প্রবেশ করিয়া তাহারা নির্ধারিত আসনে বসিয়া পড়েন। তাহাদের কাহারো মাথায় ছিল ক্যাপ, কাহারো পায়ে কেটস, কাহারো পায়ে রবারের কালো জুতা। সর্বমোট ৪৬৩টি অস্ত্র নিয়া শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ জন সদস্য স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে। তাহাদের মধ্যে অনেকে অস্ত্রহীনও ছিল। ইহার কিছুক্ষণ পরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামে আগমন করিলে সমবেত বিশাল জনতা দাঁড়াইয়া করতালির

মাধ্যমে তাঁহাকে সম্ভাষণ জানায়। ঐ সময়ে গ্যালারীগুলি “জয় বাংলা” ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠে। ঘিয়া পাড় সবুজ শাড়ী পরিহিত হাস্যোজ্জ্বল শেখ হাসিনা হাত নাড়িয়া সম্ভাষণের জবাব দেন। সামরিক বাহিনীর বাদক দল ব্যান্ড অর্কেস্ট্রায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে আরো মনোজ্ঞ করিয়া তোলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রধান ও চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীরোত্তম), কল্লরঞ্জন চাকমা, পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, শরবিন্দু শেখর চাকমা, সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি আবু ফজলুল কবীর মঞ্চের উপস্থিত ছিলেন।

সম্ভ লারমা অস্ত্র সমর্পণের পর মঞ্চের গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী সমর্পিত অস্ত্র পরিদর্শন করেন ও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সহিত কথাবার্তা বলেন। শেষ পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীগণ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের শিল্পীরা অংশ নেন।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনকালে সমবেত জনতার সঙ্গে শান্তিবাহিনীর সদস্যরাও দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করে। ইহার পর পবিত্র কোরআন তোলাওয়াত, ত্রিপিটক, গীতা ও বাইবেল পাঠ করা হয়।

এক আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে শেখ হাসিনা বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই দিনটি স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার লিখিত ভাষণ হইতে বিচ্যুত হইয়া শুরুতেই তিনি বলেন, আত্মঘাতী সংঘাতে বিরাজমান ছিল এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। আমরা রক্তপাত চাই না, সংঘাত চাই না, চাই শান্তি। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন— পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালীদের কেহ কখনো উৎখাত করিতে পারিবে না।

ভাষণের পরপরই শেখ হাসিনা নিজেই সম্ভ লারমাকে অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুনীল আকাশে মুক্ত করেন একঝাঁক শ্বেত কপোত ও রং-বেরং-এর বেগুন। বেগুনের সঙ্গে বাঁধা ছিল একটি সুদৃশ্য ব্যানার। যাহার গায়ে লেখা ছিল : শান্তি চিরন্তন হউক। সম্ভ লারমার অস্ত্র সমর্পণের পরপরই অন্য বিদ্রোহীরা মঞ্চ হইতে একটু দূরে তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে লাইন ধরিয়া তাহাদের অস্ত্র জমা দিয়া স্ব স্ব আসনে ফিরিয়া আসে। ইহার পর সম্ভ লারমাকে সঙ্গে লইয়া শেখ হাসিনা অস্ত্র পরিদর্শন এবং স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাগত বিদ্রোহীদের সহিত কুশল বিনিময় করেন। ইত্যবসরে চলিতে থাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ির উপজাতি ও বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।

এক পর্যায়ে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা সম্ভ্র লারমাকে ঘিরিয়া ধরে। এই মুহূর্তে কেমন লাগিতেছে : এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, খুব ভাল। তিনি বলেন, আজ হইতে শান্তিবাহিনী উহার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই বিলুপ্ত হইয়া গেল। শুধু জনসংহতি সমিতি পার্বত্য এলাকার জন্য রাজনৈতিকভাবে নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। পার্বত্য এলাকায় স্থানীয় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি কতটা আশাবাদী এ প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলে, মানুষ এই ব্যাপারে আশাবাদী। তবে ইহা নির্ভর করিবে শান্তি চুক্তি কতটা বাস্তবায়িত হয় উহার উপর।

অস্ত্র সমর্পণকারী কয়েকজন বিদ্রোহীর সহিত আলাপ করিয়া জানা যায়, তাহাদের জীবন ছিল খুব কষ্টের। সুমন নামের এক বিদ্রোহী আলাপকালে বলেন, আমি আট বছর যাবত শান্তিবাহিনীতে যোগদান করিয়াছি। এতদিন শুধু এক পাহাড় হইতে আরেক পাহাড়ে, এক জঙ্গল হইতে আরেক জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আজ বড় ভাল লাগিতেছে।

আনন্দঘন সফল এই অনুষ্ঠানটির পরিবেশন করাটা ক্ষুণ্ণ হয় যখন স্টেডিয়ামের পূর্ব গ্যালারিতে কয়েকজন উপজাতীয় তরুণ-তরুণী কালো পতাকা নাড়িতে থাকে এবং একটি কালো রঙের ব্যানার টানিয়া ধরে। উহার মধ্যে ইংরেজিতে লেখা ছিল : নো ফুল অটোনমি, নো রেষ্ট অর্থাৎ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না। দুইটি তরুণীর মুখ কালো কাপড় দিয়া বাঁধা ছিল। আরেকজন তাহার বুকে শ্লোগান লেখা একটি কালো কাপড় জড়াইয়া রাখে। নিরাপত্তা কর্মীরা উহা বন্ধ করিতে গেলে কিছুক্ষণের জন্য হট্টগলের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকজন বিক্ষোভকারী তাহাদিগকে কিল, ঘুষি, লাথি মারিতে থাকে। অতঃপর সেনাবাহিনীর সদস্যরা হস্তক্ষেপ করিলে পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তে চলে আসে। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন প্রধানমন্ত্রী স্টেডিয়ামে আসিয়া পৌঁছান নাই। এর একটু পরেই অন্য আরেক প্রান্তে উত্তর-পূর্ব আরেকটি গ্যালারীতে লাল শালু কাপড়ে একটি ব্যানার তুলিয়া ধরা হয় যাহাতে লেখা থাকে কল্লনা চাকমার অপহরণের জবাব চাই।

স্টেডিয়ামের বাহিরে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিকামী জনতার নামে কিছু লিফলেট বিলি করা হয়। উহাতে বলা হয়ঃ জনসংহতি সমিতির নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ জনগণের সহিত আমাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

গ্যালারীতে সম্ভ্র লারমার বিরুদ্ধে শ্লোগান

খাগড়াছড়ি হইতে মিলন চক্রবর্তী ॥ খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম। ১১টা ২৫ মিনিটে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা বিষণ্ণ মন নিয়া সারি করিয়া মাঠে প্রবেশ করিতেছিল। হঠাৎ উত্তর দিকের গ্যালারীতে উত্তেজনার মুহূর্ত। ছোট-বড় কালো বেশ কয়েকটি ব্যানার এবং চুক্তি বিরোধী ও সম্ভ্র লারমার বিরুদ্ধে শ্লোগান। ব্যানারের ভাষা ছিল ‘আপোষ চুক্তি মানি না পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই।’ পাশের গ্যালারীতে ছিল উইমেন ফেডারেশনের ব্যানারে কিছু সংখ্যক উপজাতীয় মহিলা “কল্লনা চাকমা অপহরণের জবাব চাই” শ্লোগান লিখিত ব্যানার নিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্যরত সাংবাদিকরা ব্যানারগুলির ছবি তোলা নিয়া ব্যস্ত। নিরাপত্তা কর্মীরা আসিয়া গ্যালারীর উচ্ছৃংখল যুবক-যুবতীদের নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয়। কল্লনা চাকমা ১৯৯৬ সালের ১১ই জুন বাঘাইছড়ির লাইল্যাঘোনা হইতে অপহৃত হইয়াছিলেন। এখন পর্যন্ত তাহার খোঁজ নাই।

এদিকে শান্তি চুক্তি বিরোধী উপজাতীয়দের একটি অংশ খাগড়াছড়িতে এখনো কাজ করিতেছে। তাহারা বলেন, সম্ভ্র লারমার একদিন বিচার হইবে। সম্ভ্র লারমা ইতিহাসে জাতীয় বেঙ্গমান হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

অনুষ্ঠান শেষে দর্শকরা যখন স্টেডিয়ামের বাহির হইতেছিল তখন শান্তি চুক্তির বিরোধিতাকারী কিছু সংখ্যক উপজাতীয় যুবক চুক্তি বিরোধী প্রচারপত্র মানুষের হাতে হাতে বিলি করিতেছিল। প্রচারপত্রের ভাষা ছিল এলাকায় এলাকায় সংগঠিত হোন। ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিন। জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর মাতব্বরী এবং বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করা হইবে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর স্বাভাবিক অবলুপ্তি ঘটিল

— সম্ভ্র লারমা

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ্র লারমা) বলিয়াছেন, শান্তিবাহিনী বলিয়া আমাদের আর কিছুই নাই। ইহার স্বাভাবিক অবলুপ্তি ঘটিল। এখন জনসংহতি সমিতিই হইতেছে আমাদের একমাত্র সংগঠন।

গতকাল (মঙ্গলবার) খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে বিদ্রোহী নেতা সম্ভ্র লারমা ও তাঁহার সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট

জমাদান অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর সাংবাদিকরা সন্ত লারমাকে ঘিরিয়া ধরিলে এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সন্ত লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আজ হইতে নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিল। দীর্ঘ ২ দশকের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া সন্ত লারমা তাঁহার অনুভূতির কথা জানাইয়া বলেন, দারুণ, খুব ভাল লাগিতেছে। দীর্ঘদিনের বিদ্রোহ প্রশ্নে তিনি বলেন, আমরা বিদ্রোহ করি নাই। আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম ও লড়াই করিয়াছি। কিন্তু কেন অস্ত্র সমর্পণ করিলেন এই প্রশ্নের জবাবে সন্ত বলেন, এ বিষয়টি সরকার হইতে জানিয়া নিলে ভাল হয়। শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে সন্ত বলিয়াছেন, আমরা একটি চুক্তি করিয়াছি। চুক্তি কতটুকু বাস্তবায়িত হইবে তাহার উপরই নির্ভর করিতেছে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে কি হইবে না। চুক্তি বাস্তবায়নে আপনি আশাবাদী কিনা, প্রশ্নের জবাবে বলেন, মানুষ মাত্রই আশাবাদী। তবে শান্তি বিষয়টি আপেক্ষিক।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আমরা আর রক্তপাত চাই না-সংঘাত
চাই না ॥ আমরা শান্তি চাই, সমৃদ্ধি চাই
অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

খাগড়াছড়ি হইতে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংঘাতের পথ পরিহার করিয়া শান্তির পথ বাছিয়া নেওয়ার আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন, আমরা আর রক্তপাত চাই না, সংঘাত চাই না, চাই শান্তি, চাই সমৃদ্ধি। কারণ শান্তির পথেই গণতন্ত্র চুক্তিকে সংবিধান সম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হইবে না, তাহাদিগকে পুনর্বাসিত করা হইবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য একটি প্যাকেজও ঘোষণা করেন। তিনি শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের জন্য সকল মহলের প্রতি সহযোগিতার ডাক দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ উপলক্ষে গতকাল (মঙ্গলবার) খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক এক বিশাল সমাবেশে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অস্ত্র জমাদান দেশের ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এক নবদিগন্তের সূচনা এবং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করিবে। তিনি

বলেন, পাহাড়ী-বাঙালী এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিবে। সমিতির সদস্যরাও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখিবেন বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। তবে বিএনপিসহ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মহলকে একপেশে মিথ্যা বক্তব্য দিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করা এবং অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস না চালাইবার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, আপনারা অশান্তির পথ পরিহার করিয়া শান্তির পথে আসুন। দেশ ও জাতি যাহাতে স্থিতিশীল হয় সেজন্য সহযোগিতা করুন। অবশ্য সেই সঙ্গে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টাকে কঠোর হস্তে দমনের দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলাসহ স্বাভাবিক অবস্থা যে কোন মূল্যে বজায় রাখা হইবে। আমাদের সরকার সকল নাগরিকের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত)-এর নেতৃত্বে ৭৩৯ জন সদস্য দুই যুগেরও বেশি সংঘাতের অবসান ঘটাইয়া গতকাল প্রধানমন্ত্রীর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করিয়া স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহাকে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ হাসিনা বলেন, এখন পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিনের অস্থিতিশীল অবস্থার অবসান ঘটিবে এবং শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন, আত্মঘাতী সংগ্রামের অবসান হইয়াছে। আর কোন বোনের অশ্রু বিসর্জন, কোন সন্তানহারা মাতার আহাজারী এবং পিতৃহারা সন্তানের ক্রন্দন আমরা শুনিব না। এজন্য আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আল্লাহ রাক্বুল আল-আমিনের কাছে শোকরিয়া আদায় এবং তাহার রহমত কামনা করেন।

শান্তি চুক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, সমগ্র দেশবাসী ও বিশ্ববাসী ইহাকে স্বাগত জানাইয়াছেন। ইহার সমালোচকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য সমুন্নত রাখিয়াই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কাহারো কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি, অস্পষ্টতা, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচীন নয়, এ মন্তব্য করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সকল নাগরিকের, বিশেষ করিয়া পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ী বাঙালী সকলের প্রতি অধিকার অতীতে যাহা ছিল তাহাই নিশ্চিত করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, তিন পার্বত্য জেলায় ডিসি- এসপি থাকিবেন, থাকিবেন পূর্বের ন্যায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী। বাঙালীরা যেমন আছেন তেমনি থাকিবেন। গুচ্ছ গ্রামবাসীরাও স্বভূমিতে থাকিবেন এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পাশাপাশি তাহাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে। তিনি

দ্বার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ী-বাঙালী সকলেই থাকিবেন, কোন বাঙালীকে বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হইবে না।

চুক্তির বিরোধিতাকারীদের সম্পর্কে তিনি বলেন, যাঁহারা ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের দূরভিসন্ধি রহিয়াছে। আপনারা সকলে এ ব্যাপারে সজাগ থাকুন। তিনি বলেন, এই চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। এ ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা জানাইবার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

যে কারণেই হউক, পাহাড়ী জনগণের সীমান্ত অতিক্রম এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকে অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ হাসিনা বলেন, বিগত সরকারগুলি শরণার্থীদের অন্তরে আস্থার ভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই বলিয়াই অধিকাংশ শরণার্থীই ভারতে থাকিয়া যান। তিনি বলেন, আমাদের দেশের নাগরিক অন্য দেশে শরণার্থী হইয়া থাকিবেন তাহা আমরা মানিয়া নিতে পারি না। এ প্রসঙ্গে তাঁহার সরকারের ২০-দফা সুযোগ-সুবিধা প্যাকেজ এবং এ পর্যন্ত সাত হাজার ২৬৭টি শরণার্থী পরিবারের ৩৭ হাজার ৯৯৬ জনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, উপজাতীয় শরণার্থী আমাদের জীবন হইতে চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইবে বলিয়া আমি আশা করি। শরণার্থী প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার জন্য তিনি ভারতকে ধন্যবাদ জানান।

শেখ হাসিনা জানান যে, তাঁহার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। আশু কার্যক্রম বাবদ ১৫৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হইয়াছে। স্বল্প মেয়াদী চাহিদা বাবদ ২৮৮ কোটি টাকা, মধ্য মেয়াদী চাহিদা বাবদ ৪৬৬ কোটি টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা বাবদ এক হাজার ২৩৭ কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ সকল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে সর্বমোট দুই হাজার ১৪৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতিও প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। ইহাছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের একটি ফিরিস্তি তিনি প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের ১১০ দিনের মধ্যেই তাঁহারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়া জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি গঠন করেন। তিনি বলেন, তাঁহার দলের নির্বাচনী ইশতীহারে বলিয়াছিল, ক্ষমতায় গেলে এই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবে। তিনি বলেন, সাতটি বৈঠকের পর জনসংহতি সমিতির সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন করিতে হইলে বাংলাদেশ যাহাতে বিশ্বের দরবারে সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে সেজন্য তিনি দল-মত-নির্বিশেষে সকলকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাইয়া বলেন, এ দেশ আমার, আপনার এবং আমাদের সকলের। আমরা আর কোন বুভুক্ষু নারীর আর্তনাদ শুনিতে চাই না। আসুন, আমরা সকলে একাত্ম হইয়া কাজ করি।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য দিক:

- * অস্ত্র জমাদান জাতির, বিশেষ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করিবে।
- * ধর্ম-বর্ণ, উপজাতীয় অ-উপজাতীয় নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এই শান্তি প্রক্রিয়ার সুফল ভোগ করিবে।
- * স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যরা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখিবেন।
- * বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় দেশের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সমেত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।
- * পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী সকল উপজাতীয় এবং বাঙ্গালীর অধিকার যেমন ছিল তেমন থাকা নিশ্চিত করা হইয়াছে।
- * তিন পার্বত্য জেলায় আগের মতই ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী বহাল থাকিবেন।
- * বাঙ্গালীরা নিজেদের জমিতে গুচ্ছগ্রামে বৈধ বাসিন্দা হিসাবে বহাল থাকিবে।
- * গুচ্ছগ্রামবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সাথে পুনর্বাসিত করা হইবে।
- * পার্বত্য এলাকায় উপজাতীয় এবং বাঙ্গালীরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করিবে। বাঙ্গালীরা কোন অবস্থায়ই জবরদস্তি অপসারিত হইবে না।
- * প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য ২০টি উৎসাহ সংবলিত একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হইয়াছে।
- * পার্বত্য এলাকায় একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে।
- * পুনর্বাসন, পার্বত্য জেলাগুলির মানুষ ও তাহাদের উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী একটি বিশাল কর্মসূচীর আওতায় ২১৪৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

- * আওয়ামী লীগ কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ কমিটির অধীনে বিএনপি সরকারের সূচিত শান্তি প্রক্রিয়ার সাথে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করিয়াছিল।
- * চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বর্তমান জাতীয় কমিটিতে বিএনপি'র দুইজন সদস্য থাকিলেও বিএনপি শান্তি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা তো করেই নাই বরং সমগ্র বিষয়টি তাহারা দেখিয়াছে তাহাদের সন্ধীর্ন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে।
- * শান্তি প্রক্রিয়ার আওতায় এ যাবৎ ৭২৬৭ শরণার্থী পরিবারের ৩৭ হাজার ৯৯৬ জন স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।
- * শান্তি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চুক্তির প্রতিবাদে চট্টগ্রাম

বিভাগে হরতাল পালিত

পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার বিএনপিসহ ৭ দলের আহ্বানে চট্টগ্রাম বিভাগে হরতাল পালিত হইয়াছে। তবে খাগড়াছড়িতে হরতাল হয় নাই। আমাদের চট্টগ্রাম অফিস জানায়, শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি এবং সাত দলের আহ্বানে গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায় নাই। তবে মহানগরীর বহদ্রারহাট, ষোলশহর ২নং গেট, ওয়াসা মোড়, কাজীর দেউড়ী মোড় ও অলংকার মোড়ে পুলিশের সহিত পিকেটার ও হরতাল বিরোধীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এই সময় ১০/১২ জন আহত হয়। পুলিশ ৩০ জনকে আটক করে। বিএনপি জানায়, পুলিশ বিভিন্ন স্থানে উস্কানিমূলকভাবে অর্ধশতাধিক কর্মীকে গ্রেফতার করিয়াছে। হরতাল চলাকালে বিকালে বিএনপি এবং সাত দলের যৌথ উদ্যোগে নিউমার্কেট চত্বরে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নগর বিএনপি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এমপি সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন নগর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক দস্তগীর চৌধুরী, শাহজাদা এনায়েতুল্লাহ খান, নাজিমুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, কাজী বেলাল প্রমুখ। সমাবেশে বলা হয়, শান্তি চুক্তি ও অস্ত্র সমর্পণ একটি সাজানো নাটক। সফল হরতাল পালনের মাধ্যমে জনগণ ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বলা হয়, বিকালে ডাবলমুড়িং থানার রামপুরা এলাকায় ছাত্রদলের একটি বিক্ষোভ মিছিলের উপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালাইলে ছাত্রদল নেতা নেছারসহ ১০ জন আহত হয়।

ইহাছাড়া বিএনপি এবং উহার অঙ্গ সংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে বহদ্রারহাট মোড়ে নগর বিএনপি নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়। অলংকার মোড়, কাজীর দেউড়ী মোড়, দেওয়ানহাট ও আখ্য়াবাদ এলাকায় অনুরূপ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

বিকালে লালদীঘির মোড়ে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশে নগর জামায়াত আমীর অধ্যক্ষ আবু তাহের সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন মাওলানা মোমিনুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, শামসুল ইসলাম প্রমুখ। জামায়াতের উদ্যোগে চকবাজার, ফকিরহাট ও বহদ্রারহাট এলাকায় পৃথক পৃথকভাবে সমাবেশ ও মিছিল করা হয়।

বান্দরবান হইতে ইউএনবি ৯ পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাতিলের দাবীতে বিএনপি ও তাহার মিত্রদের আহূত দিনব্যাপী হরতাল গতকাল বান্দরবানে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ ছিল। রাস্তায় কোন যান চলে নাই। অঘটন প্রতিরোধের জন্য শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় শহরের ট্রাফিক মোড়ে বিএনপি প্রতিবাদ সমাবেশ করে। জেলা বিএনপি আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট কাজী মোহিতুল হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর মাওলানা রুহুল আমিন এবং খলিলুর রহমান, আবদুল মাবুদ, লুসাই মং ও আবদুল মালেক বক্তব্য রাখেন।

রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা ৯ বাঙ্গালী স্বার্থবিরোধী কালো চুক্তি বাতিল ও কথিত অস্ত্র সমর্পণের নামে সাজানো নাটকের প্রতিবাদে ৭ দলীয় ঐক্যজোট আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হইয়াছে। জেলার লংগদু, বাঘাইছড়ি, কাপ্তাই, কাউখালী থানা সহ সকল থানায় হরতাল পালিত হইয়াছে। বিকালে আলিফ মার্কেট চত্বরে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে নুরুল আমিন পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বক্তব্য রাখিয়াছেন পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের সভাপতি এ.এস.এম শহীদুল্লাহ, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম ও ইসলামী ছাত্রশিবির সভাপতি মোহাঃ ইউনুছ।

সন্ধ্যায় রিজার্ভ বাজার চৌমুহনীতে মাওলানা ওবায়দুল হকের সভাপতিত্বে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বক্তব্য রাখিয়াছেন এডভোকেট মোজ্জার আহমদ, জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আলমগীর, আবদুল মান্নান প্রমুখ। তবলছড়িতেও অনুরূপ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শান্তি চুক্তি বিরোধী পরিষদ ও পাহাড়ী গণপরিষদ রাঙ্গামাটি সদর থানার কুতুকছড়ি ও নানিয়ারচর থানা সদরে বিক্ষোভ সমাবেশ করিয়াছে। সমাবেশ

দুইটিতে তাহারা সস্ত্র লারমার কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়াছে। সমাবেশে স্বাধীন জুমল্যান্ড কায়েম করিবার জন্য শপথ নেওয়া হয়।

কক্সবাজার সংবাদদাতা ॥ কক্সবাজার শহর হইতে চট্টগ্রাম ও ঢাকার উদ্দেশ্যে কোন চেয়ারকোচ ছাড়ে নাই। দুপুর হইতে শহরের দোকানপাট খোলা ছিল ও বেবী, রিকশা, গাড়ী, প্রাইভেট যানবাহন চলাচল করিয়াছে। জেলার অন্যান্য থানা সদরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল। দোকানপাট খোলা ছিল। অফিস-আদালতের কাজকর্ম অন্যান্য দিনের মতো হইয়াছে।

কুমিল্লা ॥ শান্তিপূর্ণভাবে সাত দল আহৃত হরতাল পালিত হয়। হরতাল শেষে কান্দিরপাড় পূবালী চত্বরে জেলা বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ মোঃ সেলিমের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

ছবির মতো সাজানো খাগড়াছড়ি :

আনন্দঘন অনন্য একদিন

গোলাম সারওয়ার ॥ খাগড়াছড়ির দূরবিস্তৃত বন-বনানী, পাহাড় ও সমতলভূমিতে শান্তির শ্বেত-গুহ্র পতাকা যেন আসন্ন বসন্তের সৌরভ ছড়াইয়াছে গতকাল নবনির্মিত ষ্টেডিয়ামের প্রায় ৪০ হাজার আনন্দমগ্ন মানুষের হৃদয়ে। সর্বত্র প্রসারিত শেষ মাঘের ঈষদুষ্পন্ন রৌদ্রের বিলিমিলি। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ রূপসী খাগড়াছড়িতে গতকাল পাহাড়ী-বাঙ্গালীর মহামিলন মেলা বসিয়াছিল। দীর্ঘ ২৬ বছর পর 'নির্ব্বারের স্বপ্নভঙ্গ' হইয়াছে। 'গুহার আঁধারে' আবার শোনা গিয়াছে 'প্রভাত পাখীর গান'। ছোট জেলা শহর খাগড়াছড়িতে ধ্বনিত হইয়াছে সারাদেশের প্রাণস্পন্দন।

২৬ বছরের রক্ত ও অশ্রুপাতের প্রেক্ষাপটে গতকাল পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সিংহদরোজা উন্মোচন করিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বেদনাবিন্দু স্মৃতির মর্মর ধ্বনি সহসাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বাতাসে হয়তো মিলাইয়া যাইবে না- বুকের গভীর হইতে উৎসারিত দীর্ঘশ্বাসে এখনো ভারী। পাহাড়ের টিলায়, গভীর অরণ্যে, অসুখী গৃহকোণে সেইসব প্রিয়জনের প্রিয় মুখচ্ছবি বারবার ভাসিয়া উঠিবে যাহারা প্রতিপক্ষের জিঘাংসার শিকার হইয়াছে। তাহাদের কেহবা বাঙ্গালী, কেহবা পাহাড়ী। তাহাদের প্রত্যেকের ধমনীতে একই রক্তধারা প্রবাহিত। স্মৃতির মিনারে শোকের চাদরে আচ্ছাদিত সেইসব তরুণের কথা প্রধানমন্ত্রী গতকাল খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে প্রদত্ত ভাষণে বেদনাবিন্দুকণ্ঠে স্মরণ করিলেন। বলিলেন, আর যেন পাহাড়ের পাদদেশে, গভীর অরণ্যে কোন ভাইয়ের রক্ত না ঝরে।

ছবির মতো সাজানো মাত্র ৫ বর্গমাইলের জেলা শহর এই খাগড়াছড়ি। ছোট-বড় পাহাড়, সমতলভূমি, ক্ষীণ ধারার নদী- সহজ-সরল ৫০ হাজার মানুষ- এই লইয়া খাগড়াছড়ি শহর। ষ্টেডিয়ামের কিছু দূরে খাগড়াছড়ির অন্যতম উঁচু পাহাড় আলুটিলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮ হাজার ফুট উঁচুতে। দূর হইতে দেখিয়া মনে হয় কোন এক মৌন ঋষি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সূর্য যেন আলুটিলা শীর্ষ স্পর্শ করিয়া যায়। আষাঢ়-শ্রাবণে হয়তো ভবঘুরে মেঘও। প্রকৃতির অপরূপ রূপের মাধুর্য সমগ্র খাগড়াছড়িকে যেন ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

সংঘর্ষ-সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত পার্বত্য চট্টগ্রামে গতকাল ইতিহাসের যে অবিস্মরণীয় অধ্যায় সূচিত হইল উহা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যাহাদের হইয়াছে তাহারা ভাগ্যবান।

'শান্তিবাহিনী'র যে ৭৩৯ জন তরুণ সদস্য গতকাল খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে অস্ত্রহাতে দণ্ডপদভারে প্রবেশ করিল তাহারা বয়সে একেবারে তরুণ। কাহারো বয়স ১৫/১৬ বছরের বেশী নয়। কাহারোবা ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। অস্ত্র সমর্পণের জন্য প্রস্তুত মূল মঞ্চের সামনে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বসিয়াছিল তাহারা। পিছনে, দুই পাশে এবং সামনে ষ্টেডিয়ামের গ্যালারীতে হাজার হাজার দর্শক। নানা বাহারী রঙের পোশাক পরিয়া আসিয়াছিল পাহাড়ী তরুণ-তরুণীরা। সেনাবাহিনীর বাদকদল দেশাত্মবোধক গানের সুর বাজাইতেছিল চমৎকার ছন্দমাধুর্যে। মঞ্চের উত্তর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন সস্ত্র লারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান সরকার দলীয় চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, পশ্চিমের গ্যালারীতে বসিয়াছিলেন মন্ত্রী, কূটনীতিক ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। দক্ষিণে বিটিভির সম্প্রচার কেন্দ্র। সেখানে হাসান ইমাম, আলী যাকের, আবেদ খান, শাহরিয়ার কবির প্রমুখ। দুই শতাধিক সাংবাদিক-ফটো সাংবাদিক। কেহ মাঠে কেহবা গ্যালারীতে। মাঠের উত্তরে শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা ছাড়াও স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙ্গালী শিল্পীরা। প্রবল করতালির মধ্যে মঞ্চ প্রবেশের পর আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ ভাষণ। ভাষণ ছিল লিখিত। তবে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার স্বভাবসুলভ অভ্যাসবশে আবেগজড়িত প্রসঙ্গ আসিলে লিখিত ভাষণ পাশে রাখিয়া মন খুলিয়া বক্তব্য রাখেন। গতকালও উহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। 'আর রক্ত নয়, আর হানাহানি নয়, এখন ভাইয়ে ভাইয়ে শান্তিতে বসবাসের সময়'-এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবেগপ্রবণ হইয়া পড়েন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে গ্যালারী হইতে ধ্বনিত হয় 'পাহাড়ী-বাঙ্গালী ভাই ভাই, আমরা সবাই শান্তি চাই' শ্লোগান। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর সস্ত্র লারমা মঞ্চ গিয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্বীয় অস্ত্র সমর্পণ করেন। অস্ত্রের বদলে প্রধানমন্ত্রী সস্ত্র লারমার হাতে তুলিয়া দেন সাদা গোলাপ। তারপর শান্তিবাহিনীর সদস্যরা

দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব অস্ত্র নির্দিষ্ট স্থানে জমা রাখেন। এ সময়ে সেনাবাহিনীর বাদকদল ‘সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি- ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি’ শীর্ষক দেশাত্মবোধক গানের সুর ইথারে ছড়াইয়া দেয়- সমগ্র স্টেডিয়ামে ছড়াইয়া পড়ে আনন্দের সুরলহরী। প্রধানমন্ত্রী শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা নীল আকাশে ছাড়িয়া দেন। দর্শকদের গ্যালারী হইতেও শত শত সাদা পায়রা ও রং-বেরংয়ের বেলুনও ছাড়া হয়। এ সময় সমগ্র স্টেডিয়াম আনন্দ-উৎসবে মাতোয়ারা হইয়া উঠে।

প্রধানমন্ত্রী অস্ত্রের বদলে ফুল তুলিয়া দিয়াছেন, অস্ত্রের বিপরীতে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক উন্নয়নের আশ্বাস দিয়াছেন। গতকালের অনুষ্ঠানটি ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার উপক্রমণিকা মাত্র। আরও কয়েকদিন অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়া চলিবে। ভারতের বিভিন্ন আশ্রয় শিবির হইতে উপজাতীয় শরণার্থীরা নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়া আসিবেন। তাহাদের মধ্যে আস্থা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এই আস্থা ও বিশ্বাস এবং সকল মহলের সদিচ্ছা শান্তির দীর্ঘ পটপরিক্রমকে কণ্টকমুক্ত করিতে পারে বলিয়া পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে

৫টি উদ্দেশ্য অর্জিত হইয়াছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গত বছর ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ৫টি উদ্দেশ্য অর্জিত হইয়াছে বলিয়া গতকাল পর্যবেক্ষক মহল মন্তব্য করিয়াছেন।

তাহাদের মতে এই চুক্তি দেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তাহাদের সকল সমস্যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসাবে এবং সংবিধানের আলোকে এসবের সমাধান হইবে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলাদেশ সরকার এই প্রেক্ষিতে এই চুক্তির আওতায় তাহাদের কথিত ও প্রচারিত বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী বা প্রবণতা প্রত্যাহ্বান করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত এই চুক্তির আওতায় ১৯৭৫ সালে জাতির জনকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর গোষ্ঠীগত স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় উপজাতীয়দের মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করার যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তাহা প্রত্যাহ্বার করা হইয়াছে। পাহাড়ী ও বাঙ্গালী এক সাথে একই ভূমিতে অবস্থান করিয়া

দেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সকল নাগরিক ও মানবিক অধিকার ভোগ করিবেন বলিয়া নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয়ত এই চুক্তির আওতায় সমতল ভূমি হইতে যাহারা পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৫ সালের পর হইতে তৎকালীন স্বৈরশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের সমতল ভূমি হইতে স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন পরিবারসমূহকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় যাহারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমির মালিকানা পাইয়াছেন এবং বসতি স্থাপন করিয়াছেন তাহাদেরকে উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে তোপের মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই চুক্তির আওতায় শান্তিবাহিনীর সকল সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া যাইবেন। বলিয়া পার্বত্য এলাকায় বৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী ও ভূমির মালিকগণ পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা পাইবেন।

চতুর্থত এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পার্বত্য এলাকায় স্থাপিত শান্তির ভিত্তিতে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিস্তৃতভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হইবে।

সর্বশেষ এই চুক্তির আওতায় পার্বত্য এলাকায় গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাপনার ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত পার্বত্য এলাকার জনগণ বিশেষতঃ উপজাতীয়রা রীতি, নিয়ম ও ঐতিহ্য অনুযায়ী তাহাদের হেডম্যান, কারবারী, সার্কেল চীফ এবং রাজা দ্বারা মূলতঃ শাসিত ও পরিচালিত হইতেন। এখন হইতে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে তাহারা তাহাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করিবেন। এইসব নির্বাচিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে সার্কেল চীফ ও রাজারা পদাধিকারবলে সদস্য থাকিবেন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বাধীন থাকিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণ দেখার জন্য

টিভির সামনে ভীড় ॥ আনন্দ মিছিল

খুলনা অফিস ॥ শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের দৃশ্য টেলিভিশনে দেখার জন্য নগরী বেশ কিছু সময় পর্যন্ত থমকিয়া গিয়াছিল। অফিস, ব্যাংক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আনা হইয়াছিল টেলিভিশন। অনেকেই কাজকর্ম ছাড়িয়া

টেলিভিশনে অস্ত্র সমর্পণের দৃশ্য দেখিয়াছিল। ঐ সময় রাস্তাঘাট অনেকটা ফাঁকা হইয়া গিয়াছিল।

বরিশাল অফিস ॥ শান্তি চুক্তি ও অস্ত্র সমর্পণকে স্বাগত জানাইয়া গতকাল ছাত্রলীগ শহরে আনন্দ মিছিল বাহির করে। পরে এক সমাবেশে গোলাম আকাস চৌধুরী দুলাল, সৈয়দ আনিছ, তালুকদার মোঃ ইউনুস, নজরুল ইসলাম, তারিক-বিন-ইসলাম বক্তৃতা দেন। পরে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান দেখার জন্য বরিশালে টি, ভি, সেটগুলির সামনে ছিল ভীড়। বাসাবাড়ীর সেট ছাড়াও টিভি বিক্রয়ের দোকান, ক্লাব, সংগঠন, অফিসের প্রতিটি সেটে ছিল দর্শকদের ভীড়।

পিরোজপুর অফিস ॥ ছাত্রলীগের উদ্যোগে শহরে আনন্দ মিছিল বাহির হয়। শেষে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাকসুদুল ইসলাম লিটন, শফিউল হক মিঠু, নাজিম উদ্দিন সোহেল প্রমুখ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল খালেক গভীর স্বস্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ॥ জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ যৌথভাবে শহরে শান্তি মিছিল বাহির করে। শেষে শহীদ চত্বরে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রশংসা

বাংলাদেশের জন্য সহযোগিতার হাত

সম্প্রসারিত করিব

—ডাউনার

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করিতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ও অস্ট্রেলিয়ার সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাউনার গতকাল বিমানবন্দরে যৌথভাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইহা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অভূতপূর্ব। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হইবে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধু অস্ট্রেলিয়া প্রয়োজনের সকল সময় আমাদের পাশে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া আবদুস সামাদ আজাদ উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাউনার বলেন, আমরা বাংলাদেশের জন্য সর্বদাই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং

ভবিষ্যতেও ইহা অব্যাহত থাকিবে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করিতে অস্ট্রেলিয়া তাই আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে। বাংলাদেশের সাথে আলোচনাক্রমে ইহা শীঘ্র নির্ধারণ করা হইবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাহিয়াছেন পার্বত্য কৃষি খাতে সাহায্য। আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা নিশ্চিতভাবে এজন্য প্রদান করিব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষের সাথে মত বিনিময়কালে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ ছাড়াও ইন্ডিয়ান ওসান রিম-এর সদস্যপদের জন্য অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের সদস্য লাভের বিষয়টিতে সমর্থন দান করিবে।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাউনার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তৃতীয় কোন পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়া এই ধরনের চুক্তি সাম্প্রতিককালে এই প্রথম। তাই বলা যায়, ইহা অভাবনীয়। এই প্রসঙ্গে তিনি নিউজিল্যান্ড ও ফিলিপাইনের সংঘাত অবসানে সম্পাদিত দুইটি চুক্তির উল্লেখ করেন।

আলেকজান্ডার ডাউনার বাংলাদেশের ২৪ জন ছাত্রকে অস্ট্রেলিয়ায় অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি, দুইজন ক্রিকেটারকে অস্ট্রেলিয়ায় তাহার নিজ এলাকা এ্যাডেলাইডে প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনের জন্য অস্ট্রেলিয়া দুই লক্ষ ডলার প্রদান করিবে। দুইদিনের সরকারী সফর শেষ করিয়া গতকাল অপরাহ্নে আলেকজান্ডার ডাউনার স্বদেশের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমানবন্দরে তাহাকে বিদায় জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

‘শান্তিবাহিনী’র অস্ত্র সমর্পণের প্রতি

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিনন্দন

নিউইয়র্ক হইতে মঞ্জুরুল ইসলাম ॥ মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ কার্ল ইন্দারফার্থ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নে অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাইয়াছেন। তিনি এই চুক্তি আন্তরিকভাবে বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন।

গত বুধবার ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সহিত এক টেলিফোন যোগাযোগকালে মিঃ ইন্দারফার্থ এই কথা বলেন বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কে এম শিহাবুদ্দিন জানান।

এইদিকে পার্বত্য অঞ্চলের খাগড়াছড়িতে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের সংবাদ গত বুধবারের ওয়াশিংটন টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে ফলাও করিয়া প্রচার হয়।

ওয়াশিংটন টাইমস ‘বাংলাদেশী রেবেলস এন্ড ২৪ ইয়ার আপরাইজিং-বুডিডিস টার্ন-ইন আর্মস টু গভর্নমেন্ট’ শিরোনামে সুদীর্ঘ সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ও বাংলা টিভি চ্যানেলগুলি সুবিস্তারিত প্রতিবেদন প্রচার করে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের প্রতি অভিনন্দন

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন স্বাগত জানাইয়াছে।

জাসদ সভাপতি আ, স, ম, আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু এক বিবৃতিতে অস্ত্র সমর্পণকে ইতিবাচক প্রাথমিক পদক্ষেপ অভিহিত করিয়া বলেন, ইহা পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র তৎপরতার অবসান ঘটাইয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে কার্যকর ভূমিকা রাখিবে। তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরী।

জাতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান হিরু এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাওলানা এ, কে, এম নুরুল ইসলাম শাক্তিচুক্তির প্রেক্ষিতে শান্তিবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণের পর ‘শান্তিবাহিনী’র সদস্যরা

নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছে

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য ॥ খাগড়াছড়ি জেলা সদরস্থ পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে এখন আর একজন শান্তি বাহিনীর সদস্য নাই। সকলেই ফিরিয়া গিয়াছে স্বাভাবিক জীবনে। আপন আপন বাড়ী-ঘরে ফিরিয়া যাইবার অপেক্ষায় অস্থির ২৭৬ জন শান্তি বাহিনী সদস্যকে গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ নিরাপত্তায় তাহাদের গ্রামের বাড়ী-ঘরে

পৌছাইয়া দেওয়া হয়। ট্রানজিট ক্যাম্প ছাড়িয়া যাইবার প্রাক্কালে সেনাবাহিনী শান্তি বাহিনীর সদস্যদের জন্য প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করে। গত ১০ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সম্মত লারমা ও তাহার সমিতির ৭৩৯ জন সদস্য অস্ত্র জমাদানের পর তাহাদেরকে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখা হয়। এখানে তাহাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হয় এবং সরকারী ভাড়া করা গাড়ীতে করিয়া বিভিন্ন থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। গতকাল প্রথম পর্যায়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনকারী সকল শান্তি বাহিনী সদস্যকে স্ব স্ব বাড়ী-ঘরে পৌছাইয়া দেওয়ার পর পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পটিও গুটাইয়া ফেলা হইয়াছে।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক জাফরুল হোসেন জানান, আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি হাইস্কুল মাঠে দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হইবে। এইজন্য জনসংহতি সমিতির দুইজন শীর্ষনেতা সুধাসিন্দু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা এখনও খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অবস্থান করিতেছেন। অপর একটি সূত্র জানান, বাঘাইছড়ির অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম উপস্থিত থাকিবেন। আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত করা হইবে সমিতির পক্ষে সমন্বয়কারী ২ নেতা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সেনা কর্মকর্তাদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে

কানাডা সম্ভাব্য সকল সাহায্য দিবে

ইউএনবি ॥ কানাডীয় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল সাহায্য দিবে। ঢাকাস্থ কানাডীয় রাষ্ট্রদূত নিকোলাস এইচ এথেরিজ গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া এ কথা জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করিয়া বলেন, বাহিরের সাহায্য ছাড়া একটি বিদ্রোহী গ্রুপকে আলোচনার টেবিলে বসানো এক অনন্য কাজ। তিনি বলেন, চুক্তির ফলে ঐ এলাকা এবং সমগ্র বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসনে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য সরকার তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন

পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হইবে।

রত্নীদূত বলেন, তাহার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সকল সাহায্য দিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
পার্বত্য জেলাগুলিতে স্বস্তি
ফিরিয়া আসিতেছে

রাজ্যমাটি হইতে বাসস ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের সামরিক সমাধানের পরিবর্তে রাজনৈতিক সমাধানের ফলে এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে তিনটি পার্বত্য জেলায় স্বস্তি ফিরিয়া আসিতেছে। এই তিনটি জেলার মোট এলাকা ১৩ হাজার ১৮১ বর্গ কিলোমিটার। রক্তক্ষয়ী সংঘাতকালে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত দুইটি জেলা খাগড়াছড়ি এবং রাজ্যমাটিতে এই স্বস্তির মনোভাব সবচেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। বিগত দুই দশকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে শুধু হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি এবং আহতের ঘটনাই ঘটে নাই বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের-জনগোষ্ঠীকে উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

বাসস-এর সংবাদদাতা হারুন হাবিব এই দুইটি জেলা সফর করিয়া দেখিতে পান যে, সাধারণ উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়গণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে আস্থা ফিরিয়া পাইতে শুরু করিয়াছে। বিগত দুই দশকে শান্তিবাহিনীর গেরিলাদের অবাধ বিচরণের ফলে বিশেষ করিয়া এই দুই জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়গণ সহাবস্থানের ব্যাপারে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

শান্তি চুক্তিবিরোধী মহল এমর্মে ব্যাপক প্রচারণা চালাইয়াছিল যে, শেষ পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর সদস্যগণ আত্মসমর্পণ এবং অস্ত্র জমা দিবে না। কিন্তু গত ১০ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে বিশেষ করিয়া বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের ভুল ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। এই সকল পার্বত্য জেলায় সফরকালে যে সার্বিক ধারণা পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ বাঙালী বসতি স্থাপনকারীগণ একথা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছেন যে, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অবদান রাখিবে। বিগত বহু বৎসর যাবৎ এই এলাকায় শান্তি ছিল না।

শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্রশস্ত্র জমাদানের ফলে বিশেষ করিয়া মাটিরাঙ্গা, রামগড় এবং খাগড়াছড়িতে উদ্ভেজনা বহুলাংশে প্রশমন করিয়াছে। এই তিনটি স্থানে শান্তি চুক্তি বিরোধীরা খুব বেশী তৎপর ছিল। মাটিরাঙ্গার একজন দোকানদার বলেন, যখন আমাদের কোন সমস্যা নাই তখন আর কাল পতাকা উত্তোলনের কি প্রয়োজন। গত মধ্য ডিসেম্বরে মাটিরাঙ্গায় শান্তি চুক্তি বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলীতে দুই ব্যক্তি নিহত হয়। মাটিরাঙ্গার অপর একজন বাংলাভাষী ব্যবসায়ী বলেন, আমি রাজনীতি করি না, আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি কেন সাদা পতাকা উড়াইব না যখন আমি বিশ্বাস করি যে, উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়দের সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করিতে হইবে।

রাজ্যমাটি জেলা সদর এবং কাউখালীতে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। এখানে চুক্তি বিরোধীরা বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের চুক্তির বিরুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করিতেছিল। স্থানীয় প্রশাসনের ধারণা, আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যমাটি জেলার বাঘাইছড়িতে শান্তিবাহিনী সদস্যদের পরবর্তী অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়ের সমাগম হইবে। ঐদিন প্রায় ৫ শত শান্তিবাহিনী সদস্য বাঘাইছড়ি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে অস্ত্র সমর্পণ করিবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন।

গত বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যমাটিতে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীদের হাতে নিহত পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি সংগঠনের সভাপতি সুবিনয় চাকমার বিধবা পত্নী মীরা চাকমা বলেন, আসুন আমরা সবকিছু ভুলিয়া যাই এবং পরস্পরকে ক্ষমা করি।

খাগড়াছড়ি এবং রাজ্যমাটির অনেক শিক্ষিত লোক ইঙ্গিত দেন যে, বৈদেশিক পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার জন্য মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতেছে। খাগড়াছড়ির একজন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী বলেন, তাহারা ঘোলাপানিতে মৎস্য শিকার করার জন্য এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করিতে চায়।

দেশে ও বিদেশে বহুল প্রশংসিত শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিতেছে উপজাতীয় ছাত্রদের একটি অংশ। কিন্তু পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং উহার সংশ্লিষ্ট সংগঠন পার্বত্য মহিলা ফেডারেশন ও পাহাড়ি গণপরিষদের মূল সংগঠনগুলি বিরোধিতাকারীদের কায়েমী স্বার্থবাদীদের লেলাইয়া দেওয়া একটি ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। তাহারা এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার বৃহত্তর স্বার্থে এই ক্ষুদ্র অংশটির তৎপরতা দমনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছে। শক্তিশালী জনসংহতি সমিতির

সমর্থনপুষ্ট এই তিনটি সংগঠন শান্তি চুক্তির দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পক্ষে পার্বত্য অধিবাসীদের বিপুল সমর্থন আদায়ে সমর্থ হইয়াছে।

১৯৮০ সালে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পার্বত্য এলাকা সংক্রান্ত উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ান বলেন, এক্ষণে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসিয়াছে। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে এই প্রবীণ উপজাতীয় নেতা এবং চাকমা রাজা দেবশীষ রায় উপস্থিত ছিলেন। চাকমা রাজা দেবশীষ রায় বলেন, উপজাতীয়দের মধ্যে যাহারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিতেছে তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তিনি আরও বলেন, শান্তি আমাদের একান্ত প্রয়োজন এবং উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় উভয়েরই একান্ত প্রয়োজন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১৬ই ফেব্রুয়ারী ‘শান্তি বাহিনী’র

আরও ৬ শত সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করিবে

রাজ্যমাটি সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তি মোতাবেক ২য় ধাপে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি থানার বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রায় ৬০০ সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করিবে।

দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছে। শান্তিবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলের ‘বি’ কমান্ড পোস্টের সহকারী ফিল্ড কমান্ডার মেজর প্লে’র নেতৃত্বে প্রায় ৬ শত সদস্য ৪০০ অস্ত্র ও সহস্রাধিক গোলাবারুদ জমা দিবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলামের নিকট মেজর প্লে তাহার অস্ত্র তুলিয়া দিবেন। অস্ত্র সমর্পণের জন্য শান্তিবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সকল সদস্য ইতিমধ্যে বাঘাইছড়ির স্বনির্ভর গ্রাম বটতলি, সিজাদমুখ এলাকাসহ বাঘাইছড়ির আশেপাশে জমায়েত হইয়াছে। অনেক সদস্য তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের বসত বাড়ীতেও অবস্থান করিতেছে।

এই দিকে প্রশাসন বাঘাইছড়ি হাইস্কুল ট্রানজিট ক্যাম্প চালু করিয়াছে। অস্ত্র সমর্পণের আগের দিন আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিতে শুরু করিবে।

বাঘাইছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে প্রশাসন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

প্রথম পর্যায়ে জমা পড়িয়াছে

৪৬৮টি অস্ত্র, গোলাবারুদ ৩৯ হাজার

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদান প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে শান্তিবাহিনী ৪শত ৬৮টি অস্ত্র এবং সাড়ে ৩৯ হাজার বিভিন্ন প্রকারের গোলাবারুদ জমা দিয়াছে। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে সমিতির চেয়ারম্যান সন্ত লারমার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট ৭ শত ৩৯ জন সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনুষ্ঠানিকভাবে জমাদানের আগে ৯ই ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা বাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিশেষজ্ঞরা এইসব অস্ত্র বুঝিয়া নেন। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে শুধু অস্ত্রগুলিই আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে জমাকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে যথাক্রমে ৩০৩ রাইফেল বল ৮৬টি, ৯ এমএম এসএমসি ২৮টি, ৯ এমএম এসএমজি ৩০টি, ৭.৬২ এমএম-এলএমজি ১৭টি, ৭.৬২ এমএম এসএমজি ১০টি, এসএলআর ৬৬টি, পাইপগান ২৬টি, ৬০ এমএস মর্টার ৭টি, ৭.৬৩ এমএমজি ৩, রাইফেল ১১৮টি, ৭.৬২ এমএম রাইফেল ১৩টি, ৯.৬২ এমএমএসএলআর (য়ুগোস্লাভিয়ান) ১৪টি, ৩০৩ এলএমজি ৪টি, ২ ইঞ্চি মর্টার ১টি, রকেট লাঞ্চার ১টি, এসল্ট রাইফেল ১০টি, ১২ বোর এসবিবিএল ১৯টি, ১২ বোর ডিবিবিএল ৬টি, ৭.৬২ এমএম রিভলভার ৫টি, ২২ বোর রাইফেল ১টি, ৬০ এম এম ব্রিটিশ রাইফেল ১টি ও স্পেয়ার বেরেল ৫টি। ইহাছাড়া গোলাবারুদের মধ্যে রহিয়াছে রাইফেল ও এসএমজির গুলী ২৫,৩০৮টি, ৬০ এমএম মর্টার গোলা ৪০টি, এমএমএসএমসির গুলী ৫২২২টি, ৩০৩ রাইফেল এলএম গুলী ৩৩১৮টি, হেভিগ্নেড ১৩০টি, জি-৩ রাইফেলের গুলী ৩৯৯১টি, এলএমজি’র গুলী ৩০০টি, ১২ ও ২২ বোর রাইফেলের গুলী ৭১৪টি, আরচেজ-৭২ গ্নেড ৪টি, কার্তুজ ৪০০টি। অন্য সরঞ্জামাদির মধ্যে রহিয়াছে প্লাটিক বিস্ফোরক সাড়ে ৮৭ কেজি, করডেকা-৪২৭টি, ইগনেটর সেট ফর গ্নেড ১০৩টি, ডেটোনেটর ১০০টি, সুইচ হেড ১৭টি ও সেফটি ফিউজ ১১টি।

এদিকে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট সন্ত লারমা যে অস্ত্রটি জমা দিয়াছিল সেই অস্ত্রটি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, টেবিল ক্লথ ও বক্তৃতার ডায়াসটিও জাদুঘরে পাঠানোর জন্য প্রক্রিয়া শুরু

হইয়াছে। জানা যায়, পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিষয়টিকে ঐতিহাসিক ও বাঙ্গালী জাতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্যেই সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা এই সিদ্ধান্ত খুব শীঘ্রই কার্যকর করিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে পার্বত্য শান্তি চুক্তির
ফলাও প্রচার ও ভূয়সী প্রশংসা

বাসস ॥ আন্তর্জাতিক খবর মাধ্যমে সাবেক শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই দশকের বিরোধ অবসানের খবর ফলাও প্রচার ও ব্যাপক প্রশংসা পাইয়াছে।

উপসাগরের প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদপত্র “খালিজ টাইমস” এক সম্পাদকীয়কে লিখিয়াছে, “উপজাতীয় বিদ্রোহীদের সহিত শান্তি চুক্তি এবং বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণের ঘটনা দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক নেতাদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাইয়া এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে।” খালিজ টাইমস-এ আরো বলা হয় : “দুই বছর আগে আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিল, তখন খালেদা জিয়া সরকারের পতনের জন্য দলটি হরতালসহ যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করে উহাতে মনে হইয়াছিল, দেশটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলার মুখে থুবড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয় এই ইতিহাসে একটি বিভাজন রেখা টানিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। নির্বাচনে বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেব গৌড়ার সহিত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন। শেখ হাসিনা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সঙ্গেও সুন্দর একটি কার্যকর সুসম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে তিনি উষ্ণ সম্ভাষণ লাভ করেন এবং কার্যত ঐসব দেশের সহিত ঢাকার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আর, এবার সংসদীয় রাজনীতির পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে আদিবাসী লোকদের সহিত স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি এবং ৫০ সহস্রাধিক শরণার্থীর সফল প্রত্যাবসান ইতিমধ্যেই সুফল দিতে শুরু করিয়াছে। গর্বিত জনগণ অধ্যুষিত এই বিশাল দেশটিতে স্বাধীনতার ২৭ বছর পর আবার সবকিছু ঠিক মত চলিতে শুরু করিয়াছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামরিক নেতৃত্ব এবং ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের নেতারা এই সুযোগকে হাত ছাড়া করিতে পারেন না ”।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বহুল প্রচারিত আনন্দবাজার পত্রিকা “বাংলাদেশে শান্তির নবযুগ” শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছে, “অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই দশকের ‘গেরিলা সত্ত্বাসবাদ’ তথা ‘গৃহ যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটিল। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া বিষয়টি গুরুত্ব প্রমাণ করিয়াছে।”

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্ট “বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের বিগত ২৪ বছরের বিদ্রোহের অবসান” শিরোনামে এক ডবল কলাম নিবন্ধ প্রকাশ করে।

পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক ‘আজকাল’ পত্রিকা এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদনের শিরোনাম দিয়াছে “শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ, শেখ হাসিনার বিজয় পতাকা।”

তুরস্কের ডেইলী নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত এক দীর্ঘ তিন কলামের নিবন্ধের শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে, ‘বিদ্রোহের অবসানে বাংলাদেশের উপজাতীয় বিদ্রোহীদের অস্ত্রসমর্পণ।’ ভারতের দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় ইহার উপর পাঁচ কলামের প্রতিবেদন ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণে
বিভিন্ন সংগঠনের অভিনন্দন

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির প্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণকে বিভিন্ন সংগঠন অভিনন্দন জানাইয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন ঐ এলাকায় শান্তি স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য ইহা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। জাসদের সভাপতি আসম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু এক বিবৃতিতে অস্ত্র সমর্পণকে স্বাগত জানাইয়াছেন। তাহারা বলেন, ইহা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ ঐ এলাকায় সশস্ত্র তৎপরতার অবসান ঘটাইয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করিবে। তাহারা আশা প্রকাশ করিয়া বলেন, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নিবেন।

গত বৃহস্পতিবার ন্যাপ (ভাসানী) কার্যালয়ে কার্যনির্বাহী সভাপতি একেএম গোলাম কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দলের প্রেসিডিয়াম ও সম্পাদক মণ্ডলীর যৌথ সভায় দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় গৃহীত শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া রক্তক্ষয়ী সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান হয়। সভায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ইহাছাড়া চাল ডাল তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া উহা নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান হয়। সভায় ১০ টাকা মণ দরে ওএমএস-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে চাউল বিক্রয়ের দাবী জানান হয়। –প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী এমপি এক বিবৃতিতে অস্ত্র সমর্পণকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে অস্ত্রসমর্পণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, পার্বত্য এলাকায় শান্তি ও উন্নয়নের নয়ামুগের সূচনা হইল।

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সাধারণ সভায় পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদন ও শান্তিবাহিনীর অস্ত্র জমাদান প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতির প্রতি অভিনন্দন জানান হয়। সভায় বলা হয়, শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হইবে। সভায় ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার ঘোষণায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভানেতৃত্ব করেন আমিনা আহমেদ। বক্তব্য রাখেন আজিজুল ইসলাম খান, কালীরঞ্জন শীল, শওকত হোসেন। –প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা জানান, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর নিকট অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। তিনটি সংগঠন সরকারের নিকট শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও চুক্তির সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদানের দাবী জানাইয়াছে। তাহারা পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের উপর সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী এবং অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের সময় স্টেডিয়ামের প্রবেশপথে পুলিশের লাঠি চার্জের তীব্র নিন্দা করিয়াছে। স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে তিন সংগঠনের নাম ভাঙ্গাইয়া কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী শান্তিচুক্তি বিরোধী ব্যানার ও পতাকা প্রদর্শনের সময় বিডিআর ও পুলিশের নির্লিপ্ত

ভূমিকায় তাহারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। আরও যেসকল সংগঠন অভিনন্দন জানাইয়াছে উহা হইল ঃ মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সংস্থা, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ঢাকা সিটি করপোরেশন শ্রমিক কর্মচারী লীগ, তরুণ লীগ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ শেখ রাসেল মঞ্চ, তফসিল জাতি ফেডারেশন।

গ্রেফতার

অশ্বিনী কুমার চাকমা হত্যা মামলার অন্যতম আসামী সচিব চাকমাকে শুক্রবার পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে। রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর থানা সদরের বাজার হইতে দুপুর ১২টায় তাহাকে গ্রেফতার করিয়া বেলা দেড়টায় আদালতে আনা হইলে আদালত জেল হাজতে থেরণের নির্দেশ দিয়াছে।

সম্প্রতি ঘিলাছড়ি, কুতুবছড়িসহ কর্ণফুলী হ্রদের বিভিন্ন এলাকায় চুক্তি বিরোধী গ্রুপটির অপতৎপরতায় জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজ রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

এ কে এম মকসুদ আহমদ ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥ আজ সোমবার শান্তি বাহিনীর সদস্যদের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐতিহাসিক অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি নামে পরিচিত রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানা এখন উৎসবের শহরে পরিণত হইয়াছে। একদিকে সরকারী কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনে উন্মুখ শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সাদর অভ্যর্থনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, অপরদিকে ১০ সহস্রাধিক লোক অধ্যুষিত এই ছোট্ট পাহাড়ী শহরটি উপজাতীয় ও বাঙ্গালীদের মিলন কেন্দ্রে রূপ নিয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে বহু ঘটনা-দুর্ঘটনার নীরব সাক্ষী বাঘাইছড়ি এখন রংয়েরূপে সাজিয়া উঠিয়াছে। বাঘাইছড়ির বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হইয়াছে সুদৃশ্য তোরণ। যে বাঘাইছড়ি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অস্ত্র জমা দিয়া আরও কয়েকশত শান্তি বাহিনীর সদস্য দুই যুগেরও বেশী সময়ের গেরিলা যুদ্ধের অবসান ঘটাইবে উহা লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ও সাদা পতাকায় সুশোভিত। সেখানে শোভা পাইতেছে হরেক রংয়ের ব্যানার, ফেটুন।

ছোট্ট এই শহরে লোক সমাগম অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু পার্বত্য অঞ্চল হইতেই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থান হইতেও নৌ এবং স্থলপথে লোক আসিতেছে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করিতে। উৎসবের পোশাকে সজ্জিত হইয়া উপজাতীয় তরুণ-তরুণী ও গৃহবধূরা শিশু সন্তানসহ রাস্তাঘাট

ও দোকানপাটে ভীড় জমাইয়াছে। বাঙ্গালীরাও এই আনন্দে शामिल হইতেছে। হোটেল ও শহরের অধিকাংশ বাসা-বাড়ীতে তিল ধারণের ঠাই নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের পালে লাগিয়াছে নূতন হাওয়া। শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ ও অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি বাহিনীর প্রত্যাবর্তনই এখন মোড়ে মোড়ে ও চায়ের দোকানে প্রধান আলোচ্য বিষয়। গহীন জঙ্গলের গোপন আস্তানা ছাড়িয়া শান্তি বাহিনীর সদস্যরা ইতিপূর্বেই বাঘাইছড়ি ট্রানজিট ক্যাম্পে উঠিয়াছে। তাহারা এখন নিজ নিজ বাড়ীর পথে পাড়ি জমাইবার প্রস্তুতি নিতেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি জানায়, শান্তি বাহিনীর গোপন আস্তানাগুলি গুটাইয়া ফেলা হইয়াছে। যে সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়া হইবে সেগুলিও একত্রিত করা হইয়াছে। আজ সকাল ৯টার মধ্যে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা রাঙ্গামাটির সাংসদ ও টাঙ্গ ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদারের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে নিজেদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবে। শান্তি বাহিনীর দক্ষিণ অঞ্চলের নেতা তাতীন্দ্র লাল চাকমা ওরফে মেজর পেলের নেতৃত্বে ৫৫৫ জন সদস্য সকাল সোয়া ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বীরভূমের নিকট অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করিবে। তাহারা মোট ৩৮৬টি অস্ত্র জমা দিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এগুলির মধ্যে রহিয়াছে এল এম জি, এস এম জি, এ আর, এ কে-৪৭, ৩০৩ রাইফেল ও পাইপগান। ইহাছাড়া অন্যান্যের পক্ষ হইতে গোলাবারুদ জমা দেওয়া হইবে।

এদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে আড়ম্বরপূর্ণ করার জন্য জেলা প্রশাসন ও সেনা রিজিওন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করিলেও জনসংহতি সমিতির আপত্তির কারণে আয়োজকরা অনুষ্ঠানসূচীতে অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। সমিতি আর জৌলুসপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় আগ্রহী না হওয়ার কারণে অনুষ্ঠানসূচী হইতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হইয়াছে।

গত ২রা ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে শান্তি চুক্তির আওতায় অস্ত্র সমর্পণ করা হইতেছে, উহার প্রতিবাদে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট গত ১০ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়িসহ চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করিলেও বাঘাইছড়ির অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে ঘিরিয়া এখানে এই ধরনের কোন কর্মসূচী দেওয়া হয় নাই। তবে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির কোন কোন স্থানে প্রসীত খীসা ও সঞ্জয় চাকমার নেতৃত্বাধীন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশন পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে হাতে লেখা পোষ্টার লাগাইয়াছে, শান্তি চুক্তির পক্ষের লোকজনকে আক্রমণ করিতেছে। রাঙ্গামাটির ঘিলাছড়ি ও

কুতুবছড়ি এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছে। তবে শান্তি চুক্তি বিরোধীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। শুরুতে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়িতে শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইলেও ইতিমধ্যেই তাহা স্তিমিত হইয়াছে। যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও দোকানপাটে এতদিন কালো পতাকা উঠাইয়াছিল, তাহারাই এখন তাহা নামাইয়া ফেলিয়াছে। অনেকেই শান্তির প্রতীক সাদা পতাকা তুলিয়াছে। তবে কর্তৃপক্ষ শান্তিভঙ্গের আশংকার ব্যাপারটি খাটো করিয়া দেখিতেছেন না। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, বিডিআর, পুলিশ যৌথভাবে বাঘাইছড়িসহ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বান্দরবানে বিভিন্ন আরাবানী সশস্ত্র গ্রুপ

শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তৎপর

বান্দরবান হইতে মিলন চক্রবর্তী ॥ পার্বত্যঞ্চলে জনসংহতি সমিতির নেতা ও সদস্যরা তিন পর্যায়ে অস্ত্র সমর্পণের পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসার প্রস্তুতি নিতেছে বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে। সূত্র জানায়, তিন পর্যায়ে অস্ত্র সমর্পণের পর সন্ত লারমাসহ শান্তি বাহিনীর নেতারা সরকার, জনগণ ও অস্ত্র জমাদানকারীদের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য শেষ অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান পিছানোর চিন্তাভাবনা করিতেছে। এদিকে সর্বশেষ অস্ত্র জমাদানের দিন হইতে তিন পার্বত্য জেলায় জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেই সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সহিত সমমনা বিভিন্ন সংগঠনকে সক্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

২৬ বছরের পুরানো সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি অনেক সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তপাতের বিনিময়ে গত বছর ২রা ডিসেম্বর সরকারের সাথে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। চূড়ান্ত অস্ত্র জমাদানের শেষের দিন হইতে চিরদিনের জন্য সশস্ত্র শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সূত্র জানায়, চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠন প্রক্রিয়ায় জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্ত লারমা তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে বান্দরবান জেলাকে নিয়া বিপাকে পড়িয়াছেন। বান্দরবান জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

উপজাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে শতাধিক দরখাস্ত সম্ভ লারমার কাছে জমা পড়িয়াছে। ইহাতে সম্ভ লারমা খুবই চিন্তিত। তাই আঞ্চলিক পরিষদে সদস্যপদ মনোনয়নে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাকে আগাইতে হইতেছে। সম্ভ লারমা চান তিন পার্বত্য জেলার আগামী স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন হউক রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাবমুক্ত। যদি দলীয় নির্বাচন হয় তাহা হইলে শান্তি চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে এবং এলাকায় পুনরায় অশান্তি সৃষ্টির আশংকা দেখা দিবে।

যোগাযোগ কমিটির একজন সদস্য ক্যশৈঅং মারমা জানান, বান্দরবান জেলায় গত কয়েক বছর ধরিয়া যে সমস্ত খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি ঘটিয়াছে সবগুলি বিচ্ছিন্ন আরাকানী গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা স্থানীয় বখাটে উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের সহায়তায় ঘটাইয়াছে। নাম দিয়াছে শান্তিবাহিনীর। মূলতঃ বান্দরবানের কোন সন্ত্রাসী ঘটনায় শান্তিবাহিনী জড়িত ছিল না। তাহার মতে, শান্তি চুক্তি ও প্রথম দফা অস্ত্র সমর্পণের পর তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন স্থানে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হইলেও বান্দরবানের থানছি, রুমা ও রোয়াংছড়ি থানায় শান্তি ফিরিয়া আসে নাই। এখনও নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় সপ্তাহে দুইবার থানা সদরে যাতায়াত করিতে হয়। থানছি থানায় গত ১ বছর ধরিয়া কোন সরকারী কর্মকর্তা যান না। জেলা সদরে বসিয়া নামেমাত্র দাপ্তরিক কাজকর্ম চলে। এখনও উক্ত তিন থানায় শান্তিবাহিনীর নাম ব্যবহার করিয়া বর্মী বাহিনীর দল টাকার অংক উল্লেখ করিয়া অহরহ চিঠি ছাড়িতেছে। চাঁদা প্রদান না করিলে মারিয়া ফেলার হুমকি প্রদান করিতেছে। থানছি থানায় দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হইতেছে না। কিছু কিছু প্রকল্প জেলা সদরে বসে নেওয়া হইলেও মাঠ পর্যায়ে কোন কাজ না করে পরস্পর যোগসাজশে সকল অর্থ আত্মসাৎ করা হইতেছে।

সূত্র জানায়, বান্দরবানের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এতদাঞ্চলে বসবাসরত ১২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি সম্প্রদায়ের নেতাদের নিয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পার্বত্যঞ্চলে ১২টি উপজাতির বসবাস হইলেও মূলতঃ উক্ত ১২টি উপজাতি শুধু বান্দরবানে রহিয়াছে। রাজ্যমাটি ও খাগড়াছড়িতে আছে ৩/৪টি উপজাতি সম্প্রদায়। তাই বান্দরবানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে সরকারের ব্যাপক শান্তি প্রক্রিয়ার কার্যক্রম ব্যাহত হইবে বলিয়া উপজাতীয় নেতাদের ধারণা।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

‘শান্তিবাহিনী’র আরও ৫৪৩

সদস্যের অস্ত্র সমর্পণ

বাঘাইছড়ি হইতে এ.কে.এম মকসুদ আহমেদ/তরুণ ভট্টাচার্য ॥ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে গত ২রা ডিসেম্বর সম্পাদিত শান্তি চুক্তির প্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার দ্বিতীয় পর্যায়ে শান্তিবাহিনীর আরো ৫ শত ৪৩ জন সদস্য বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ ‘সরকারের নিকট জমা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২শত ৪১জন জমা দিয়াছে অস্ত্র ও অবশিষ্ট ৩ শত ২ জন জমা দিয়াছে বিভিন্ন প্রকার গোলাবারুদ।

গতকাল দ্বিতীয় পর্যায়ের এই অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান পার্বত্য রাজ্যমাটি জেলার বহুল আলোচিত ও দুর্গম থানা বাঘাইছড়ির হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর দক্ষিণ অঞ্চলের ‘বি-কমান্ড পোস্টের’ কমান্ডার তাতিন্দ্রলাল চাকমা ওরফে মেজর পেলে অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্যদের নেতৃত্ব দেন। তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম-এর নিকট একটি অত্যাধুনিক রিভলবার জমা দেন। ইহার আগে সকালে গহীন অরণ্যের আন্তানা ছাড়িয়া স্কুল প্রাঙ্গণে আগত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিকট হইতে এক এক করিয়া সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা নেওয়া হয়। রাজ্যমাটি হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদারের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া এই সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ বুঝিয়া নেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে এইসব অস্ত্রশস্ত্র বুঝিয়া নেওয়ার জন্য মাঠের একদিকে পৃথক দুইটি শেড নির্মাণ করা হয়। যে শেডটিতে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রসহ বসিয়াছিল সেখানে লেখা ছিল ‘অহিংসা পরম ধর্ম’ এবং যে শেডটিতে অস্ত্র জমা রাখা হয় সেখানে বড় করিয়া লেখা ছিল ‘এসো দেশ গড়ি’। অস্ত্রশস্ত্র বুঝিয়া নেওয়ার পর মাঠে রাখা র্যাকে অস্ত্রগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখা হয় এবং নিকটেই শান্তিবাহিনীর সদস্যদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাছাড়া স্কুলের অপরিসর মাঠের বাকি তিনদিকে অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রিত অতিথি ও সাধারণ দর্শকের বসার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল ১০টার মধ্যেই হাজার হাজার উপজাতীয় ও বাঙ্গালী নারী-পুরুষ অনুষ্ঠানস্থলে আসিয়া পৌঁছিলে চারিদিকে লোকে-লোকারণ্য হইয়া উঠে। অনুষ্ঠান দেখিতে পারা না পারা লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্থান সংকুলান না হওয়ায় সকাল ৯টা ২০ মিঃ সমবেত জনতা নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিলে পুলিশ বাধা দেয়।

তখন পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া জনতা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ইহাতে পুলিশের এসআই আবদুল আজিজ (৪৫), সুবেদার ওয়াহেদ (৪৮) ও স্কুলছাত্র সুপন চাকমা (১৬) আহত হয়। এক ঘণ্টা পর উপজাতীয় বাঙ্গালী জনতা সম্মিলিতভাবে পুলিশের বাধা চেলিয়া অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চের নিকটে চলিয়া আসে। সকাল ১১টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথি অনুষ্ঠানস্থলে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে তিনদিক হইতে আরো দর্শক মাঠে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং সেনাবাহিনীর সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

পবিত্র কোরআন, ত্রিপিটক, গীতা ও বাইবেল পাঠের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ দেওয়ার কথা থাকিলেও তিনি কোন ভাষণ দেন নাই। জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে নিরাপত্তা ও বিশৃংখলাজনিত কারণে আপত্তি থাকায় অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবেই গতকালের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। সকাল সাড়ে ১১টায় সুন্দর সভামঞ্চ ছাড়িয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্য অতিথিদের সঙ্গে লইয়া মাঠের মধ্যে যান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

জনগণ শান্তি প্রক্রিয়ার পক্ষে

—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাঘাইছড়ি হইতে বাসস ॥ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম বলেন, শান্তিবাহিনী সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গতকাল দ্বিতীয় দফায় অস্ত্র সমর্পণ সকলের মধ্যে এই উৎসাহ সৃষ্টি অব্যাহত রাখিয়াছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আগত একদল সাংবাদিককে মন্ত্রী বলেন, অস্ত্র সমর্পণের সময় তাহারা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং যত শীঘ্র সম্ভব নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হইতে তাহাদের গভীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, এই অঞ্চলে যে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে উহার ফলে জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ২ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিবে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা এই অঞ্চলে আর কোন অশান্তি চায় না।

শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কতিপয় ক্ষুদ্র গ্রুপের কার্যকলাপ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে

তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না। রফিকুল ইসলাম বলেন, জনগণই হইতেছে মূল শক্তি এবং তাহারা এই শান্তি প্রক্রিয়ার পক্ষে। শান্তি প্রতিষ্ঠা ছিল তাহাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, যাহা বর্তমান সরকারের কার্যকালে বাস্তবায়িত হইয়াছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই গ্রুপগুলি শীঘ্রই মূলধারায় ফিরিয়া আসিবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অঙ্গীকার পূর্ণবৃত্ত করিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চলতি মাসে চার পর্যায়ে অস্ত্র সমর্পণ সমাপ্ত হওয়ার পর ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে নবযুগের সূচনা হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্যঞ্চল হইতে আনসার

ভিডিপি সদস্যদের প্রত্যাহার শুরু

বান্দরবান সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তির আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় অবস্থানরত নিয়মিত আনসার বাহিনীর ১৯টি ব্যাটেলিয়নের ৭৬৭৬ জন সদস্যকে পাহাড়ী এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে প্রত্যাহার করা শুরু হইয়াছে।

স্বাধীনতার পর হইতে আনসার বাহিনীর সদস্যরা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাথে একসাথে কাজ করিয়া আসিতেছিল।

বান্দরবান জেলায় মোট ৩টি ব্যাটেলিয়ন আছে। সদস্যসংখ্যা ১২১২ জন। প্রতি ব্যাটেলিয়নে ৪ শত ৪ জন সদস্য থাকে। বান্দরবানের ২৯টি ইউনিয়নে গ্রাম পর্যায়ে আনসার ভিডিপির সদস্যসংখ্যা ৮৭৬৪ জন। ইহাদের মধ্যে মাত্র ২৯ জন মহিলা ও পুরুষ দলপতি প্রতিমাসে ১৮০ টাকা হিসাবে ভাতা পাইয়া থাকে। অবশিষ্ট ৮৭৩৫ জন সদস্য কোন অর্থ পায় না। তাহাদেরকে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আপদকালীন সময়ে এবং নির্বাচনের সময় কাজে লাগাইয়া থাকেন এবং দৈনিক হিসাবে কিছু অর্থ প্রদান করে মাত্র। জেলার মুরং বাঙ্গালী মিলিয়া ভিডিপি'র সদস্যসংখ্যা ১৯৫৫ জন।

সূত্র জানায়, বান্দরবানের পাহাড়ী এলাকায় পর্যাপ্ত মাঠ না থাকায় আনসার ভিডিপি সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বরাবরই ব্যাহত হয়। আনসার ভিডিপি'র সদস্যরা এতদঞ্চলের গণশিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, পশু পালন, বনায়ন, মৎস্য চাষ, আইন-শৃংখলা ও পরিবার পরিকল্পনার উন্নয়নে দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে। অথচ সরকার তাহাদের জন্য ন্যূনতম রেশন ব্যবস্থা পর্যন্ত চালু করে নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী
দুই দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিরক্ষা খাতের
ব্যয় প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ৥ নিহত ৯৩৭

ইত্তেফাক রিপোর্ট ৥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে জানাইয়াছেন যে, পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্ব পর্যন্ত ১৯৭৭ হইতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত অশান্ত তিনটি পার্বত্য জেলায় সহিংসতায় মোট ১৩৭ জন প্রাণ হারাইয়াছে। এ সময়ে প্রতিরক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় হইয়াছে একশত পাঁচ কোটি চুরানব্বই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত টাকা।

জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরকালে তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য বেগম মেহের আফরোজের এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান। মূল প্রশ্নের উপর জাতীয় পার্টির সদস্য ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজীর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য সমস্যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল। তাই অভ্যন্তরীণভাবেই আমরা সমস্যার সমাধান করিয়াছি। তিনি বলেন, বৈদেশিক মধ্যস্থতায় আমরা যাই নাই। কেননা নিজস্ব বিষয়ে বৈদেশিক সহায়তার বা হস্তক্ষেপের প্রশ্ন আসিবে কেন? তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের মত সমস্যা আছে। তিনি এ সম্পর্কে যুক্তরাজ্য, ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, বাংলাদেশ ব্যতিক্রমীভাবে নিজস্ব উদ্যোগে রাজনৈতিক এ সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে সক্ষম হইয়াছে। তিনি বলেন, সমঝোতার আগেই সংসদে আলোচনা করিলে সমঝোতার ভাগ্য কি হইত অনেকেই অনুমান করিতে পারেন। তিনি বলেন, চুক্তিতে সংবিধান লংঘন হইয়াছে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এমন প্রচারণা ভিত্তিহীন। কোন দেশের চাপের অভিযোগও ভিত্তিহীন। সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের আওতায় চুক্তি করা হইয়াছে। সংসদে অবশ্যই এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। চুক্তির আলোকে আইন করিতে হইবে। আইনগুলি সংসদে অনুমোদনের জন্য আসিলেই আলোচনা হইবে। আর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, সংবিধান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা ইহা চুক্তি বাস্তবায়নেই প্রমাণ হইবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে দলের সদস্য এ প্রশ্নটি তুলিয়াছেন শান্তি আলোচনায় তাঁহার দলেরও একজন সদস্য ছিলেন। অন্য বিরোধী দলেরও ছিল। আর চুক্তির পর সংগে সংগে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়।

সরকারী দলের সদস্য হাজী মোঃ সেলিমের অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, পার্বত্য চট্টগ্রামের সহিংসতায় নিহতদের পরিবার-

পরিজনকে বিভিন্ন সংস্থা ইতিমধ্যে সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছে। ইহার পরও যদি কোন পরিবার সমস্যায় থাকে তাহা হইলে সরকার অবশ্যই দেখিবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জালালউদ্দিন তালুকদারের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে জানাইয়াছেন, চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা সাহায্য প্রদানে আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ হইতে আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে অর্থায়নের নিমিত্তে উন্নয়ন সহযোগীদের আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে তাহাদের সংগে আলোচনা চলিতেছে। এ প্রশ্নের উপর ফেনী হইতে নির্বাচিত সরকারী দলের সদস্য জয়নাল হাজারী সম্পূর্ণক প্রশ্নে খালেদা জিয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, তাঁহার মতে এ চুক্তির ফলে ফেনী হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারত হইয়া যাইবে। ইহাতে জনগণ বিভ্রান্ত হইতেছে, জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চুক্তির পর জনগণ নিজেরাই দেখিতেছে তাহার কথা সত্য নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার সাধ্য কাহারও নাই। সবই বিভ্রান্তি। আসলে তাহারা শান্তি চায় না। তিনি বিরোধীদের শান্তির পথে ফিরিয়া আসার আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতি ক্রিনটনের অভিনন্দন

বাসস ৥ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকা দীর্ঘদিনের সংঘর্ষ অবসানে 'বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য ও চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছেন। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এক অভিনন্দন বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি বিশেষ আত্মহের সহিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সহিত আপনার সরকারের সম্পাদিত চুক্তিটি পড়ি। এই দুর্ভাগ্যজনক ও দীর্ঘদিনের সংঘর্ষ অবসানে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

বাংলাদেশ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণের স্মরণ করিয়া প্রেসিডেন্ট ক্রিনটন বলেন, তিনি বাংলাদেশ সফরের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করিবেন। প্রেসিডেন্ট ক্রিনটন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার পুত্র জয়ের প্রাজুয়েশন লাভের জন্য অভিনন্দন জানান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ইহা তাহার এবং সকল যুক্তরাষ্ট্রবাসীর নিকট আনন্দের বিষয় যে, জয় এবং অন্যান্য দেশ হইতে অনেকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট কার্ল এবং ইন্ডারফার্থ প্রেসিডেন্ট দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের চিঠি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কে, এম, শেহাবউদ্দিনকে হস্তান্তর করেন। চিঠি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ইন্ডারফার্থ পাহাড়ী জনগণের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাহার দেশকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ইহা এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটাইয়া শান্তি নিশ্চিত করিবে। রাজনীতি বিষয়ক আড্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট টমাস পিকারিং এ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পার্বত্য এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারীদের ক্রমান্বয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশাবাদ প্রকাশ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
ভারতে ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকায়
শান্তি চুক্তি প্রশ্নে বেগম জিয়ার সমালোচনা

বাসস ॥ ভারতের ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পাবর্ত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির প্রশংসা করিয়া এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী লিখিয়াছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতীয় ও বাঙ্গালী বসতিদের উপস্থিতিতে এক অভূতপূর্ব আনন্দ পরিবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ শান্তি চুক্তির প্রতি সাধারণভাবে মানুষের একটি স্বস্তিদায়ক মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটাইয়াছে। “টক আব্দুর” শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় : “বিএনপি ও মুসলিম মৌলবাদীদের আহূত হরতাল উপেক্ষা করিয়া এই অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিতে ও উহাকে স্বাগত জানাইতে বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীর উপস্থিতি আরো প্রমাণ করে যে শান্তি চুক্তি ভুল্ল করার এবং বাঙ্গালী-উপজাতীয় অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য বেগম খালেদা জিয়া ও তাহার বিএনপি’র সাংগঠনিক কৌশল ভেঙে গেছে।” পত্রিকা লিখিয়াছে, ইহা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সার্কের সাবেক চেয়ারপারসন ও সংসদে বিরোধীদলের নেতা বেগম জিয়ার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব রহিয়াছে এবং তিনি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অথচ অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর একটি অঞ্চলের শান্তি, সম্প্রীতি ও অগ্রগতি নিশ্চিতকারী একটি চুক্তিকে স্বাগত জানানোর ব্যাপারে সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তাধারার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই।

সম্পাদকীয় নিবন্ধে আরো বলা হয়, জেদ ও সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিয়া বেগম জিয়া এখনো মনে হয়, ১৯৯৬ সালের জুন মাসের সংসদীয় নির্বাচনে তাহার পরাজয় এবং তাহার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনাকে মানিয়া নিতে কষ্ট বোধ করিতেছেন। তিনি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিরও কঠোর বিরোধিতা করেন এই বলিয়া যে উহাতে ভারতের নিকট দেশ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত-বিরোধী মাতাম সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি এই রটনা শুরু করেন। এখনও তিনি প্রায় একবছর যাবৎ তুচ্ছ বিষয়ে সংসদ বর্জন করিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাতের চেষ্টা করিতেছেন। স্টেটসম্যান লিখিয়াছে-বেগম জিয়া হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাহার সরকারও শান্তি বাহিনীর সহিত ২২ দফা নিষ্পল আলোচনা করিয়াছিলেন। তবে কি ইহা সেই কাহিনী : ‘আব্দুর ফল টক?’

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
আজ চাকমা শরণার্থীদের
প্রত্যাবর্তন শুরু হইবে

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ একটানা ১২ দিন বন্ধ থাকার পর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আশ্রয় শিবির হইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শরণার্থীদের সর্বশেষ পর্যায়ে প্রত্যাবাসন আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় পুনরায় শুরু হইবে। জেলার মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্তপথে আজ ১৯৮টি পরিবারের ১১শত ৮৪ জন শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবে। এই পর্যায়ের প্রত্যাবাসন কাজ শেষ হইবে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী। এই সময়ে ত্রিপুরায় ঠাকুমবাড়ী আশ্রয় শিবির হইতে মোট ১২৭৯টি পরিবারের ৭৪৮৬ জন শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিবে। আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী শরণার্থীদের সর্বশেষ দলে শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপজাতীয় নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমাসহ প্রথম সারির বেশ কয়েকজন নেতা থাকিবেন। বলাবাহুল্য ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তনকে কেন্দ্র করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নেতৃত্বে নয়া মেরুকরণ দেখা দিলে উপেন্দ্র লাল চাকমা ঐ বছর ৪ঠা এপ্রিল সপরিবারে এবং কয়েক হাজার উপজাতীয় লইয়া দেশ ত্যাগ করেন। তিনি ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়া শরণার্থীদের নেতৃত্বে দেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ এবং ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর হামলা ও পাল্টা হামলাজনিত কারণে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হইয়া উঠিলে ৬০

হাজারেরও বেশী চাকমা উপজাতীয় পালাইয়া গিয়া ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহাদের মধ্য হইতে ১৯৯৪ সালে শুরু হওয়া প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার আওতায় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট ৬টি পর্যায়ে ১০,৯৪৮টি পরিবারের ৫৬ হাজার ৯শত ৫৮ জন শরণার্থী নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

এদিকে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন ইত্তেফাককে জানান, ২৫শে ফেব্রুয়ারী শরণার্থী প্রত্যাবাসনের সর্বশেষ দিনটিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে স্মৃতি হিসাবে ধরিয়া রাখার জন্য আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হইতেছে। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়া আসার পাশাপাশি ২৫শে ফেব্রুয়ারী চাকমা শরণার্থী সমস্যারও সমাধান ঘটিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

ত্রিপুরা হইতে আরও ১১৭৬ জন

চাকমা শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ গতকাল (বৃহস্পতিবার) জেলার মাটিরাংগা থানার তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া সপ্তম ও সর্বশেষ পর্যায়ের চাকমা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হইয়াছে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অমরপুর মহকুমার ঠাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবির হইতে গতকাল ১ শত ৯৫ পরিবারের ১১শত ৭৬ জন শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসে। সর্বশেষ পর্যায়ের প্রত্যাবাসন চলাকালে তবলছড়ি সীমান্তে শরণার্থীদের সাদর সম্বর্ধনা জানান খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এ, কে, এম জাফরুল হোসেন। সীমান্তের ওপারে শরণার্থীদের বিদায় জানান অমরপুর মহকুমা শাসক শান্তিরায় রিয়াং। ত্রিপুরা হইতে প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের গতকাল সরকারী ভাড়া করা গাড়ীতে করিয়া তাহাদের নিজ নিজ থানার অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্পে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। ইহার আগে প্রত্যেক শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসন মঞ্জুরি হিসাবে ...২১ হাজার টাকা ও অগ্রিম রেশন হিসাবে ৫০ কেজি চাউল দেওয়া হয়। ইহাছাড়া বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পক্ষ হইতে প্রত্যেক শরণার্থী পরিবারকে ৩ মাসের জন্য ডাল, তৈল ও লবণ রেশন প্রদান করা হয়।

এদিকে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি উপলক্ষে তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্টে এক আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার বিষয় নির্ধারণ প্রণে অনির্ধারিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠক তবলছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ও ত্রিপুরার প্রশাসনিক

কর্মকর্তাসহ শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা, রবীন্দ্রলাল চাকমা উপস্থিত ছিলেন। ইহাছাড়া আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থানার বড়াদমে অনুষ্ঠিতব্য শান্তি বাহিনীর তৃতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর আরও

৪৪৩ জন সদস্যের অস্ত্র সমর্পণ

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য ॥ গতকাল (রবিবার) জেলার দীঘিনালা থানাধীন বড়াদম দীঘির পাড়ে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন ‘শান্তি বাহিনী’র আরও ৪ শত ৪৩ জন সদস্য তৃতীয় পর্যায়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর কাছে শান্তি বাহিনীর এ সকল সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করেন। তন্মধ্যে ১ শত ১০ জন জমা দেন অস্ত্র এবং অন্য সদস্যরা জমা দেন বিভিন্ন প্রকারের গোলাবারুদ। ইহা লইয়া মোট তিনটি পর্যায়ে ১ হাজার ৭ শত ২৫ জন শান্তি বাহিনীর সদস্য তাহাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিল।

নিরাপত্তা ও অব্যবস্থাজনিত সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে এই আশংকায় জনসংহতি সমিতি বড় ধরনের আনুষ্ঠানিকতার পক্ষপাতী না হওয়ায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে গতকালের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। তবে আয়োজক কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিলে সকাল সাড়ে ৯টায় শান্তি চুক্তি বিরোধী কিছুসংখ্যক পাহাড়ী ছাত্র ও যুবক অনুষ্ঠানস্থলে ও আশেপাশে এবং ট্রানজিট ক্যাম্পের নিকট চুক্তি বিরোধী ব্যানার, প্লাকার্ড ও কালো পতাকা লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করার চেষ্টা করিলে চুক্তির পক্ষের পাহাড়ী সমর্থকদের সহিত তাহাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও হামলা সংঘটিত হয়। এক পর্যায়ে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিতে গিয়া মৃদু লাঠিচার্জ করিয়া তাহাদের ছত্রভংগ করিয়া দেয়। কিছুক্ষণ পর একদল পাহাড়ী ছাত্র-জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া ট্রানজিট ক্যাম্পের খুব নিকট হইতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ইহাতে পরিস্থিতি খারাপ হইয়া উঠিলে পুলিশ পাহাড়ী ছাত্রদের ধাওয়া করিয়া দূরে সরাইয়া দেয়। সকালের এই ঘটনায় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৮ জনসহ কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়।

চুক্তি বিরোধী পাহাড়ী কতিপয় ছাত্রের বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর সমগ্র বড়াদম এলাকা চুক্তির সমর্থকরা দখলে নিয়া চুক্তির সপক্ষে মিছিল বাহির করে এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদের আগমনকে স্বাগত জানাইয়া শ্লোগান দেয়।

সকাল এগারটার মধ্যে বড়াদম দীঘির পাড় এলাকায় বর্ণিল পোশাকে সজ্জিত হইয়া হাজার হাজার উপজাতি ও বাঙালী পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইলে সকাল সোয়া এগারটা নাগাদ অস্ত্র সমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। গতকাল ৪ শত ৪৩ জন শান্তি বাহিনী সদস্যের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন সিলেট কমান্ড পোস্ট-এর কমান্ডার মেজর চতুরঙ্গময় খীসা ওরফে ক্রেভার। মেজর ক্রেভার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নিকট একটি চাইনীজ রাইফেল সমর্পণ করার পর জনাব আব্দুল্লাহ একগুচ্ছ সাদা গোলাপ হাতে তুলিয়া দেন। ইহার পর এক এক করিয়া অপরাপর সদস্যও চীফ হুইপ-এর নিকট অস্ত্র জমা দেন। পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় পায়রা ও বেলুন উড়ানো হয়। অস্ত্র সমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা শেষে চীফ হুইপ মঞ্চে ফিরিয়া গেলে সমাবেশের একটি অংশে ২০/২৫ জন উপজাতীয় যুবক ‘শান্তি চুক্তি মানি না’, ‘চুক্তির সাংবিধানিক গ্যারান্টি চাই’, ‘পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমাধান’ ইত্যাদি শ্লোগান দিয়া আনুষ্ঠানিকতায় বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করিলে চুক্তির পক্ষের পাহাড়ী সমর্থকরা তাহাদের উপর হামলা চালাইয়া অনুষ্ঠানস্থল হইতে তাহাদেরকে তাড়াইয়া দেওয়ার পর চীফ হুইপ নির্ধারিত ভাষণ দেন তিনি তাঁহার ভাষণে অস্ত্র জমাদানকারী শান্তি বাহিনী সদস্যদের স্বাগত জানাইয়া বলেন, শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব-অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আস্থা রাখিয়া এবং সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণের ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইবে। শান্তি চুক্তি বিরোধী তৎপরতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আসলে এই চুক্তি সংবিধান বিরোধী বা বাঙালী স্বার্থ পরিপন্থী নহে। তিনি বলেন, শরণার্থী এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন জোরদার হইবে।

গতকালের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান ও থোয়াই-চ-ফ্র মাস্টার, চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল এ কে

ফজলুল কবির, চীফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জানেবুল হক, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াৎ হোসেন, খাগড়াছড়ির রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী ও জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেনসহ অসংখ্য সামরিক-বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক-সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল সাড়ে সাতটায় গহীন অরণ্যের গোপন আন্তান হইতে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা বড়াদম হাইস্কুলস্থ ট্রানজিট ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিলে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা তাহাদের অভ্যর্থনা জানান এবং নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লিপিবদ্ধ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আরও ১০৯৮ জন শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ৥ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আশ্রয় শিবির হইতে গত (রবিবার) জেলার মাটিরাংগা থানার তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্টে দিয়া আরও ১শত ৭৭টি পরিবারের ১ হাজার ৯৮ জন চাকমা শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী সর্বশেষ পর্যায়ে শুরু হওয়া শরণার্থী প্রত্যাবাসন কাজে। গত শুক্রবার হঠাৎ বিদ্রোহ সৃষ্টি হইলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপে তাহা নিরসন হয়। ইহার পর ত্রিপুরার ঠাকুমবা শিবির হইতে গত শনিবার ১ শত ৯৯টি পরিবারের ১ হাজার ৪১ জন শরণার্থী ফিরিয়া আসে।

এদিকে শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার বলিয়াছেন, শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সমাপনী অনুষ্ঠান একদিন পিছাইয়া এখন ২৬শে ফেব্রুয়ারী তবলছড়ি সীমান্তে অনুষ্ঠিত হইবে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক জাফরুল হোসেন বলিয়াছেন শরণার্থী প্রত্যাবাসনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মন্ত্রীবর্গকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তুতি চলিতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

‘শান্তিবাহিনী’ তৃতীয় পর্যায়ে

যেসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়াছে

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ৥ গত রবিবার দীঘিলালা থানায় বড়াদমে অনুষ্ঠিত তৃতীয় পর্যায়ে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর ৪ শত ৪৩ জন সদস্য ১ শত ১০টি অস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ জমা দিয়াছেন। জমাকৃত

অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে যথাক্রমে চাইনিজ রাইফেল ১টি, জি-৩ রাইফেল ১টি, ৩০৩ রাইফেল ৩২টি, এসএলআর ১০টি, এসএমজি ৭টি, এমএমসি ৭টি, রিভলভার ২৫টি, ২২ বোর রাইফেল ৯টি, ১২ বোর বন্দুক ১৮টি। ইছাছাড়া গোলাবারুদ ও অন্যান্যের মধ্যে রহিয়াছে ৩০৩ রাইফেলের গুলী ১৮,২২৯টি, এসএমজির গুলী ৩৬০২৭টি, ৯ এমএম রাইফেলের গুলী ৭৪৭১৮টি, বিস্ফোরক ৬৮ কেজি, হ্যাণ্ড গ্রেনেড ৪৯৬টি, গ্রেনেড ডেটোনেটর ৭৬টি, ডি ফিউজ ৫০ ব্যারল, এনএসপি বিস্ফোরক ২০ কেজি, ডেটোনেটর ২টি, ফাইভার কর্ড ১২০ গজ, ইলেকট্রনিক ডেটোনেটর ৬৭০টি ও পেয়ার ব্যারেল ৩৫টি।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

‘শান্তি বাহিনী’র ৪৪৩ জন সদস্য বাড়ী ফিরিয়াছে

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ শান্তি চুক্তির আওতায় গত রবিবার দীঘিনালার বড়াদমে সরকারের নিকট অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণকারী শান্তি বাহিনীর ৪৪৩ জন সদস্যের সকলেই এখন পাহাড়ী গ্রামে-গঞ্জে স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফিরিয়া গিয়াছে। অস্ত্র সমর্পণের পর তাহারা বড়াদম স্কুল ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান নেয়। এখানে তাহাদের প্রত্যেককে নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় আহরের ব্যবস্থা এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা করিয়া প্রদান করা হয়। ডিসি জাফরুল হোসেন জানান, গতকাল তাহারা সরকারী বাসে করিয়া নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সহস্রাধিক চাকমা শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ গতকাল সোমবার জেলার মাটিরাঙা থানার তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া ত্রিপুরার ঠাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবির হইতে আরও ১৯৬ পরিবারের ১ হাজার ১৭ জন চাকমা শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই নিয়া সপ্তম ও সর্বশেষ পর্যায়ে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার ৫ দিনে মোট ৪ হাজার ৪২৫ জন শরণার্থী তাহাদের নিজ মাতৃভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসে। উল্লেখ্য যে, শরণার্থীদের সর্বশেষ দলটি প্রত্যাবর্তন করিবে আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী। আজ (মঙ্গলবার) এই সীমান্ত পয়েন্টে আরও ১ হাজার ২শত শরণার্থী ফিরিবার কথা।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির

প্রতি অলব্রাইটের অভিনন্দন

বাসস ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের শান্তি চুক্তির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অভিনন্দন অব্যাহত রাখিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে পত্র দিয়াছেন ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি, হল্জম্যান উহা প্রধানমন্ত্রীকে হস্তান্তর করেন। পত্রে অলব্রাইট ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টার প্রতি বিভিন্ন মহলের অভিনন্দনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আগেও বলিয়াছি যে, যুক্তরাষ্ট্র আপনার সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানায়। মিস অলব্রাইট বলেন, তাঁহার সরকার আশাবাদী যে, সকল পক্ষের সদিচ্ছা লইয়া শান্তি চুক্তি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হইবে যাহাতে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ শান্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উপভোগ করিতে পারে। অলব্রাইট দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিয়া যাওয়ার আহ্বহ ব্যক্ত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজ পার্বত্য শরণার্থীদের

সর্বশেষ দলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥ বিক্ষুব্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে যেসকল পার্বত্য জনগণ আশির দশকে ঘরবাড়ী ও জমি-জমার মায়া ত্যাগ করিয়া প্রাণের ভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতের ত্রিপুরায় গিয়া শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় লইয়াছিল, আজ (শুক্রবার) তাহাদের সর্বশেষ দলটির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে একযোগেও বেশী সময়ের শরণার্থী সমস্যার সমাধান হইবে। সেই সঙ্গে ৭ম ও শেষ পর্যায়ে তাহারা নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরিয়া আসিলে দীর্ঘদিনের শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। আজ (শুক্রবার) সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ির তবলছড়ি সীমান্ত দিয়া ৩২ পরিবারের দুই শতাধিক শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবে। এজন্য ব্যাপক আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন

করা হইয়াছে। সীমান্তের ওপারে ও এপারে বিভিন্ন রং-এর পতাকা, ফ্যাষ্টন ও ব্যানার লাগানো হইয়াছে। সেই সঙ্গে নির্মাণ করা হইয়াছে সুদৃশ্য তোরণ। আজ শরণার্থীদের একটি ব্যান্ড দল ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া ভারত হইতে বিদায় নিবে। সীমান্ত ফেনী নদী পার হইবার সময় সেতুতে উঠিয়া প্রথমে তাহারা ‘বন্দে মা তরম’ গান গাহিবে এবং এপারে পা রাখিবার পর গাহিবে বিশ্ব কবির রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করিতে করিতে তাহারা বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিবে।

সীমান্তের ভারতীয় অংশে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাদিগকে বিদায় জানানো হইবে। এজন্য একটি মঞ্চও নির্মাণ করা হইয়াছে। এপারে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইবার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, উপজাতি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্ধাস্ত পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকার তালুকদার, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান এ বান্দরবানের সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগ ও খাগড়াছড়ি জেলার পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকগণ সেখানে উপস্থিত থাকিয়া শরণার্থীদের শেষ দলটিকে স্বাগত জানাইবেন।

শরণার্থী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান উপেন্দ্র লাল চাকমা ও তাহার সংগঠনের নেতৃবর্গও আজ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবেন। ইতিপূর্বে উপেন্দ্র লাল চাকমা জানান যে, সকল শরণার্থী প্রত্যাবাসিত হইলেই তিনি স্বদেশ ফিরিয়া আসিবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণ শুরু হইলে ১৯৮৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল সপরিবারে ও বেশ কয়েকটি উপজাতীয় পরিবারের সদস্যসহ উপেন্দ্র লাল চাকমা ত্রিপুরা গমন করেন। সেখানে পৌঁছার পর তিনি শরণার্থীদের নেতৃত্ব দেন এবং ঠাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করেন। শিবিরে অবস্থানকালে তাহার স্ত্রী প্রাণত্যাগ করেন। পরে ৭৫ বছর বয়স্ক উপেন্দ্র লাল চাকমা যুগতারা দেওয়ান নাম্নী এক মহিলার পাণি গ্রহণ করেন।

শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় উপেন্দ্র লাল চাকমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদনে শরণার্থী প্রত্যাবাসন একটি বিরাট বাধা হইয়া দাঁড়াইলে গত ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকায় আসিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী ২০ দফা প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করার আশ্বাস দিলে তিনি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই-কমিশনার ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে সম্পৃক্তকরণের দাবী প্রত্যাহার করেন। ইহার পরই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়।

সরকারী হিসাব মতে, ৬০ হাজারেরও বেশী উপজাতীয় স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু ভারতে আশ্রয় নেয়। তাহাদিগকে ত্রিপুরার কাঁঠালছড়ি, শিলছড়ি, লেবাছড়া, ফরবুকু, পঞ্চরামপাড়া ও ঠাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবিরে রাখা হয়। শিবিরে অবস্থানকালে অনেক স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুর যেমন মৃত্যু হয়, তেমনি অনেক শিশু জন্মগ্রহণও করে। কোন কোন পুরুষ স্থানীয় মহিলাদের বিবাহ করে, আবার কোন কোন উপজাতীয় নারী ভারতীয় পুরুষের সহিতও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শিবির ত্যাগ করে।

শরণার্থীদের প্রথম দলটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১৯৯৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ঐ সময় প্রথম পর্যায়ে আট দিনে ৩৭৯ পরিবারের এক হাজার ৮৪১ জন শরণার্থী দেশে ফিরিয়া আসে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসন চলে ১৯৯৪ সালের ২১শে জুলাই হইতে ৫ই আগষ্ট পর্যন্ত। এসময়ে ৬৪৮ পরিবারের তিন হাজার ৩৪৮ জন সদস্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যাবাসন শুরু হয় ১৯৯৭ সালের ২৮শে মার্চ। ইহা ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐ পর্যায়ে মোট এক হাজার ৪১৬ পরিবারের সাত হাজার ৩০৫ জন সদস্য প্রত্যাবাসিত হয়। চতুর্থ পর্যায়ে ফেরত আসে ছয় হাজার ৭০৫ জন ও পঞ্চম পর্যায়ে ছয় হাজার ৩২২ জন। ইহাছাড়া, শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছে ৭৬৮ পরিবারের মোট দুই হাজার ৯৮৮ জন।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করিলে উহা শরণার্থীদের ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা দেয়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে : শরণার্থীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, গৃহনির্মাণ ও কৃষি অনুদান, এক বছরের জন্য রেশন, গৃহ-নির্মাণের জন্য ডেউটিন প্রদান, হালের গরু/গাভী খরিদের জন্য অনুদান, কৃষি ও অন্যান্য ঋণ মওকুফ, সাধারণ ক্ষমা প্রদান, শরণার্থীদের মালিকানাধীন জমি প্রত্যর্পণ, সিনিয়রিটিসহ চাকুরীতে পুনর্নিয়োগ, মামলা প্রত্যাহার ও হেডম্যানকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল ইত্যাদি।

প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, শরণার্থীদের শিবিরগুলি পরিত্যক্ত হইবার পর সেগুলি জবর দখল করার প্রতিযোগিতা শুরু হইলে সেখানে স্থানীয়ভাবে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। পরে কে বা কাহারো রাতের অন্ধকারে শিবিরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিলে তাহা ছারখার হইয়া যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তি চুক্তি সম্পাদনে
শেখ হাসিনার প্রতি ব্ল্যারের অভিনন্দন

নিউজ মিডিয়া ॥ বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্ল্যার গতকাল এক বার্তায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পার্বত্য শান্তি চুক্তি করায় অভিনন্দন জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় মিঃ টনি ব্ল্যার বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সমাধানে আপনার আন্তরিক উদ্যোগকে আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
চাকমা শরণার্থী সমস্যার অবসান
গতকাল সর্বশেষ দলের প্রত্যাবর্তন

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য ॥ ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণকারী চাকমা শরণার্থীদের সর্বশেষ দলটির পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে গতকাল (শুক্রবার) ১২ বছরের চাকমা শরণার্থী সমস্যার অবসান ঘটিয়াছে। ৩৩ পরিবারের ১ শত ৯৯ জন শরণার্থীর সর্বশেষ দলটির নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান উপজাতীয় নেতা সাবেক সংসদ সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমা। সকাল পৌনে এগারটায় বাগড়াছড়ির ডেপুটি কমিশনার জাফরুল হোসেন শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমাকে সীমান্তের ওপার হইতে অভ্যর্থনা জানাইয়া বাংলাদেশ সীমানায় নিয়া আসিলে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য বীর বাহাদুর এমপি, খাগড়াছড়ি পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা তাঁহাকে ফুলের তোড়া দিয়া স্বাগত জানান। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা দীর্ঘ ৯ বছর পর শরণার্থী জীবন ছাড়িয়া দেশের মাটিতে ফিরিয়া অশ্রুসজল নয়নে মাটি ছুঁইয়া প্রণাম জানান মাতৃভূমি বাংলাদেশকে। এই সময় সাংবাদিকরা তাঁহার অনুভূতি জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, ‘আমি আমার আনন্দ প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।’ পরে শরণার্থী সমস্যা সমাপ্তি উপলক্ষে অভ্যর্থনা শিবির প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সমাবেশে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তা এবং শরণার্থী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াৎ হোসেনের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন খাগড়াছড়ি ডিসি একেএম জাফরুল হোসেন।

ইহা ছাড়া মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর, ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী কেশব মজুমদার, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের মহাপরিচালক মোবাইদুল ইসলাম, ত্রিপুরা রাজ্যের রিলিফ কমিশনার ও প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী সুধীর শর্মা ও শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা বক্তব্য রাখেন। সভায় শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা বলেন, দীর্ঘদিন পর মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিতে পারায় সকল দুঃখ-বেদনা ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বাংলাদেশ সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির বাতাবরণ যে মুহূর্তে সৃষ্টি হইয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তে আরও একটি জাতীয় সমস্যা অর্থাৎ শরণার্থী সমস্যার পরিসমাপ্তি ঘটিতে যাইতেছে। উপেন্দ্রলাল চাকমা অতীত ইতিহাস ভুলিয়া সৃজনশীল ভবিষ্যতের জন্য, শান্তির বাতাবরণ ধরিয়া রাখার জন্য সকলকে ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া জাতীয় উন্নতির স্বার্থে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগের ফলে এখানে আর হানাহানি, দলাদলি, সংঘাত আর সংঘর্ষ হইবে না। সভায় মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান ও শরণার্থী সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের কথা স্মরণ করিয়া বলেন, শরণার্থী সমস্যার মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সনে বিএনপি সরকারের আমলে ৫১৮৯ জন এবং বর্তমান সরকারের আমলে মোট ৫৮২৫৪ জন শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। আর ইহার মাধ্যমেই এই সমস্যার পরিসমাপ্তি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ মার্চ ১৯৯৮
আজ ‘শান্তি বাহিনী’র
শেষ দফা অস্ত্র সমর্পণ

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য ॥ আজ বৃহস্পতিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ দলের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনী নামক সংগঠনটির স্বাভাবিক অবলুপ্তি ঘটিতে যাইতেছে। সেই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে

জনসংহতি সমিতি খুব শীঘ্রই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আজ পানছড়ি থানার সীমান্তবর্তী দুদুকছড়া গ্রামে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সমিতির সর্বশেষ দল তাহাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবে। সর্বশেষ দলে ২০৮ জন সদস্য থাকার কথা থাকিলেও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২২২ জনে দাঁড়াইয়াছে। সমিতির পক্ষ হইতে সরকারের নিকট প্রদত্ত তালিকা অনুসারে ১৯৩৩ জন সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করার কথা। সেই অনুসারে ইতিপূর্বে ১০, ১৬ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তিনটি পর্যায়ে, মোট ১৯২৫ জন শান্তিবাহিনী সদস্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে। আজকের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরিয়া দুদুকছড়ায় উৎসবের আমেজ দেখা দিয়াছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উপজাতি ও বাঙ্গালী নারী-পুরুষ এখানে সমবেত হইতে থাকায় দুদুকছড়া লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রশাসন অনুষ্ঠানস্থলে রঙিন পতাকা দিয়া এবং বিভিন্ন এলাকায় তোরণ নির্মাণ করিয়া এলাকাকে সজ্জিত করিয়াছে।

আজ সকালে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার উপস্থিতিতে শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ দলের সদস্যরা তাহাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এই সব অস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অনুষ্ঠানস্থলে লইয়া যাইবে। সেখানে সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমার উপস্থিতিতে এবং শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার মেজর সমিরনের নেতৃত্বে দলের সদস্যরা অস্ত্র জমা দিবেন।

সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিবেন।

এদিকে দুদুকছড়ার গভীর অরণ্যের গোপন ঘাঁটিতে শান্তিবাহিনীর নেতা সন্ত লারমা এবং তাহার দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতা তাহাদের দলের সদ্য অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্যদের এবং আজ যাহারা অস্ত্র সমর্পণ করিবে তাহাদের লইয়া এক দীর্ঘ বৈঠক করিয়াছেন। ঐ নেতৃবৃন্দ পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের দূর দূরান্ত হইতে আগত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের নিয়াও মতবিনিময় করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি বিরোধী পাহাড়ী ছাত্রদের একটি অংশের বিরোধিতার বিষয় নিয়া আলোচনা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাছাড়া শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়া অনুষ্ঠিত বৈঠকে শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়া আলোচনা হয় বলিয়া সমিতির একটি সূত্র জানাইয়াছে। এই সূত্র আরও জানাইয়াছে, গেরিলা সংগ্রামের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক উপায়ে উপজাতি জনগোষ্ঠীর দাবী আদায় এবং

অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম শহর হইতে গ্রাম পর্যন্ত সংগঠন গড়িয়া তোলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিয়াছে। শান্তি চুক্তির শর্ত অনুসারে পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত বিল সংসদে পাস করা এবং উহার যথাযথ বাস্তবায়ন হওয়ার পর সমিতি আঞ্চলিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করিবে। পরে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনে সমিতির মনোনীত প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামান হইবে। ইহার পরিত্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বে নয়া মেরুকরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠার পর বিভিন্ন মতাদর্শের নেতাকর্মীদের মধ্যে গ্রুপিং-লবিং পরিলক্ষিত হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ মার্চ ১৯৯৮

সর্বশেষ দলের অস্ত্র সমর্পণ :

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র বিলোপ

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য ॥ ১৯৭৩ সনের গোড়ার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর যে সকল সদস্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর দাবী আদায়ের লক্ষ্যে অস্ত্র হাতে তুলিয়া লইয়াছিল, গতকাল (বৃহস্পতিবার) তাহাদের সর্বশেষ দলটির অস্ত্র সমর্পণের মধ্যদিয়া শান্তিবাহিনী নামক ঐ সংগঠনটির স্বাভাবিক অবলুপ্তি ঘটিয়াছে। গতকাল খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার সীমান্তবর্তী দুদুকছড়িতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে ৪র্থ ও শেষ পর্যায়ে শান্তিবাহিনীর ২শত ২২ জন সদস্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়া স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। সর্বশেষ এই অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা হইতে গতকাল কয়েক হাজার উপজাতীয় ও বাঙ্গালী নারী-পুরুষ সমবেত হয় এই দুদুকছড়িতে। নানা রঙের পতাকা আর ব্যানার-ফেস্টনে সুশোভিত দুদুকছড়ি এলাকার অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানস্থল সকাল ১০টার মধ্যে হইয়া উঠে লোকে লোকারণ্য। শান্তিকামী মানুষের মিলন মেলার রূপ পরিগ্রহ করে দুদুকছড়ি। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দুদুকছড়ির গহীন অরণ্যের গোপন ঘাঁটি হইতে শান্তিবাহিনীর শীর্ষনেতা গৌতম চাকমা, সুধা সিদ্ধু খীসা, রূপায়ণ দেওয়ান, উষাতন তালুকদার ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা-এর নেতৃত্বে অপরাপর সদস্যরা অনুষ্ঠানস্থলের উদ্দেশ্যে আসার খবর ছড়াইয়া পড়িলে শত শত উপজাতি নারী-পুরুষ সমিতির নেতা-কর্মীদের একনজর দেখা ও অভিনন্দন জানাইবার জন্য রাস্তার দুই পাশে ছুটিয়া গেলে শান্তিবাহিনীর নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীরা মানব বন্ধন সৃষ্টি করিয়া পরিস্থিতি সামাল দেয়।

সারিবদ্ধভাবে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পায়ে হাঁটিয়া যখন অনুষ্ঠানস্থলের উদ্দেশ্যে আসিতে থাকে তখন জনতা করতালি ও শ্লোগান তুলিয়া তাহাদের অভিবাদন জানায়। সমিতির সদস্যরা হাত নাড়িয়া উহার জবাব দেয়। সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা আসেন সকলের শেষে। মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা গোপন ঘাঁটিতে গিয়া সন্ত লারমাকে অভ্যর্থনা জানান। পরে জেলা প্রশাসক এ, কে, এম জাফরুল হোসেন, পুলিশ সুপার লুৎফর রহমান বিশেষ স্কট দিয়া তাঁহাকে অনুষ্ঠানস্থলে নিয়া আসেন।

এই সময় দূর-দূরান্ত হইতে আগত জনতা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, গণপরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর নেতাকর্মীরা সন্ত লারমার আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম, জনসংহতি সমিতি জিন্দাবাদ ইত্যাদি শ্লোগান দিয়া সন্ত লারমাকে স্বাগত জানান। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বীর বাহাদুরের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার পর সমিতির তথ্য প্রচার বিভাগের প্রধান জগদীশ চাকমা একটি এসএমজি সকলের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের কাছে সমর্পণ করেন। জগদীশ পর্যটন মন্ত্রীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন একগুচ্ছ সাদা গোলাপ। জগদীশ চাকমার নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রামের সিটি মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দিন চৌধুরী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্য হইতে সন্ত লারমাকে মূল মঞ্চে লইয়া আসেন। পরে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও পর্যটন মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা তাহার ভাষণে সমিতির নেতাকর্মীদের প্রতি স্বাগত জানাইয়া বলেন, সমিতির সদস্যদের অস্ত্র জমাদানের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার এই প্রক্রিয়ার আরও এক ধাপ অগ্রগতি হইল। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রয়াসের কারণে এর ইঙ্গিত সাফল্য অর্জন সম্ভব হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি চুক্তি বিরোধীদের অপপ্রচারের অচিরেই অবসান হইবে বলিয়া আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং বলেন, অস্ত্র জমাদানের সফল পরিসমাপ্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত ৩০ মিনিটের এই অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর সেনাবাহিনী ও বি.ডি.আর-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় অতিথিদের ও জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। পরে সমিতির সদস্যদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করিয়া প্রদানের পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ নিরাপত্তায় তাহাদেরকে স্ব-স্ব গ্রামে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। সন্ত লারমাসহ প্রথম সারির ২৫ জন নেতা-কর্মীকে সরকারী নিরাপত্তায় খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন অতিথি ভবনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

গতকাল সর্বশেষ অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, বিশিষ্ট উপজাতীয় নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা, খাগড়াছড়ি, রাজ্যমাটি ও বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান যথাক্রমে সমীরণ দেওয়ান, চিংকিউ রোয়াজা, থোয়াইচত্র মাষ্টার, বান্দরবানের সাংসদ বীর বাহাদুর, চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল এ, কে, ফজলুল করিম, বিডিআর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স সচিব কাজী গোলাম রহমান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জানেবুল হক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াৎ হোসেন, খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী, রাজ্যমাটির রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাইফুল আলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা ও কমিটির সদস্যবৃন্দসহ অসংখ্য সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং তিন পার্বত্য জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে সমিতির নেতা সন্ত লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দেশের সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। তিনি গতকাল দুদকছড়িতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন, একটি আশা লইয়া চুক্তি করিয়াছি, সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এই ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই মুখ্য ভূমিকা পালন করিতে হইবে। জনসংহতি সমিতির করণীয় রহিয়াছে। আমরা সহযোগিতা দিতেছি, চুক্তি অনুসারে অস্ত্র জমা দিয়াছি। গ্রুপে গ্রুপে ফিরিয়া আসিয়াছি। তিনি শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে দেশের আপামর জনগণের সহযোগিতা কামনা করিয়া বলিয়াছেন, শান্তি চুক্তি সমগ্র জনগণ ও দেশের স্বার্থে এবং সকলের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।

জনসংহতি সমিতির কংগ্রেস

সশস্ত্র সংগ্রামের পথ হইতে স্বাভাবিক জীবনধারণ প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীরা খুব শীঘ্রই তাহাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠনের এক কংগ্রেসে মিলিত হইবেন। জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র জানান, সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা খুব শীঘ্রই তাঁহার পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া কংগ্রেসের তারিখ ও স্থান ঘোষণা করিবেন।

জাতীয় সংসদে শীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে বিল

শরণার্থী সমস্যার অবসান ও জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সকল সদস্যের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের মাধ্যমে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়া সহজ হইয়া উঠায় সরকার খুব শীঘ্রই জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে একাধিক বিল উত্থাপন করিতে যাইতেছে। সরকারের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের একটি সূত্র জানান, আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে এই সকল বিল উত্থাপন করা হইতে পারে। এইস বিলের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন, আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন সংক্রান্ত বিল থাকিবে বলিয়া জানা যায়। জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদে বিলসমূহ পাস হইবার পর পরই আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠনের ব্যাপারে তাহাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাইবেন। তবে, সমিতির নেতাদের সহিত আলোচনার মাধ্যমে সরকার চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়নের প্রক্রিয়া চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া সরকারী একটি সূত্র আভাস দিয়াছে।

জমাকৃত অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ

গতকাল (বৃহস্পতিবার) দুদুকছড়িতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর ২২২ জন সদস্যের মধ্যে ৫৬ জন নেতা-কর্মী অস্ত্র এবং অবশিষ্ট সদস্যরা বিভিন্ন প্রকারের গোলাবারুদ জমা দেয়। জমাকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আছে ৭৬২ এম,এম রাইফেল-৪টি এস,এল,আর ১৫টি, এস,এম,সি ২টি এস,এমজি ৭টি, ৩০৩ রাইফেল ৪টি, ২২ বোর রাইফেল ৯টি, এস,বি,বি,এল ২টি, ১২ বোর রাইফেল ১টি, ২২ বোর রিভলবার ২টি, জি-৩ রাইফেল ১০টি, ম্যাগজিন ১৯১টি, ইগনেটর ৭৭টি, ৯ এম.এম রাইফেলের গুলী ৫৪৮৯টি, ৭৬২ রাইফেলের গুলী ৪৪৭৯৯টি, ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ১২ বোর রাইফেলের গুলী ৩৫৫টি, ২২ বোর রাইফেলের গুলী ১৩২টি, ৩০৩ রাইফেলের গুলী ৯০০টি ও কর্ডেক্স ১১ গজ।

জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী এই লইয়া ৪টি পর্যায়ে গোলাবারুদসহ ৮শত ৭৬ টি অস্ত্র জমা দিয়াছে এবং ৪টি পর্যায়ে মোট ১৯৪৭ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

ଯୁକ୍ତ ଆମେ ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧରି
ଶ୍ରୀମତୀ କାମଜୀ

ভোরের কাগজ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
উন্নয়ন সহায়তা নিয়ে দাতা প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক আজ
পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে
কাজ শুরু হয়েছে

সানাউল্লাহ: পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরপরই তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন, চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর করতে কমিটি গঠন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে টার্কফোর্স গঠন, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি চুক্তি সম্পাদনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া আজ দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে উন্নয়ন সাহায্যের জন্য বৈঠক করবেন।

আগামী সপ্তাহে চুক্তির বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হবে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গঠনের চিন্তাভাবনাও আছে। সরকারি সূত্রে জানা যায়, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্পর্কিত আইনি তৎপরতা, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, ভূমি কমিশন ও জরিপ সংক্রান্ত কাজ ভূমি মন্ত্রণালয়, জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের হিসাব নেওয়া এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সম্পর্কিত কাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়— অর্থাৎ যে কাজটি যে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটি তারা করবে। এ কারণেই আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি করার প্রয়োজন অনুভব করেছে সরকার।

পাশাপাশি চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর করতে তিন সদস্যের কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য টার্কফোর্স আগামী সপ্তাহেই গঠন করা হবে বলে জানা যায়।

একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বিশেষ কার্যাদি বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সকল বিষয় বর্তমানে দেখাশুনা করে থাকে।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, এ বিভাগটিকেই মন্ত্রণালয়ে পুনর্গঠন করা হবে। বর্তমানে এ বিভাগে ১৩ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৪৫ জন লোকবল রয়েছে। মন্ত্রণালয় গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এবং চুক্তির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কাজ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোকবল বাড়ানোর চিন্তাও রয়েছে। এ মাসের মধ্যেই এই মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। মন্ত্রিসভায় কোনো উপজাতি

সদস্য মন্ত্রী না থাকায় এখানে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। এ ব্যাপারে একাধিক নাম শোনা গেলেও এখনো কিছু নিশ্চিত হয়নি।

চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা ছাড়াও ত্রিপুরায় অবস্থানরত উপজাতি শরণার্থীদের সকলের দেশে ফিরিয়ে আনা ও পুনর্বাসনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। আগামীকাল শুক্রবার পঞ্চম দফা শরণার্থী প্রত্যাশাসন সম্পন্ন হবে। এরপরই ষষ্ঠ দফা প্রত্যাশাসনের কাজ শুরু হবে। সরকারি সূত্রে জানা যায় জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধ নাগাদ ত্রিপুরায় অবস্থানরত সকল শরণার্থীর দেশে ফিরে আসা সম্পন্ন হবে। অন্যদিকে আগামী সপ্তাহে শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। রামগড় সীমান্তে সরকার, টার্কফোর্স, শরণার্থী নেতৃবৃন্দ এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এ বৈঠকে অংশ নেবেন। বৈঠকে ইতিমধ্যে দেশে ফিরে আসা শরণার্থীদের সামগ্রিক পুনর্বাসন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

এদিকে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া আজ সকাল সাড়ে ৯টায় দাতাদেশ ও সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক ডেকেছেন। অর্থমন্ত্রী সে বৈঠকে চুক্তি ও চুক্তি পরবর্তী বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে দাতাদের অবহিত করবেন। একই সঙ্গে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ এবং সে সকল প্রকল্পের জন্য দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা চাইবেন। জানা যায়, ইতিমধ্যে কয়েকটি দেশ চুক্তির পর সেখানে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে রেখেছে।

ভোরের কাগজ
৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭
এ চুক্তি স্থায়ী সমাধান নয়,
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ মাত্র
—অনন্ত বিহারী খীসা

পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, সংঘাত পরিহার করে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমি খুশি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি বহু মাত্রিক সমস্যা। পার্বত্য সমস্যা সমাধানে যে চুক্তি হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ মাত্র স্থায়ী সমাধান নয়, কারণ এ চুক্তিতে সাংবিধানিকভাবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বীকৃতির নিশ্চয়তা নেই। এ চুক্তি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের অনুরূপ। যেহেতু সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই সেহেতু যেকোনো সরকার এ আইনকে বাতিল করতে পারেন।

জনসংহতি সমিতি দীর্ঘদিন ধরে যে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে তা এ চুক্তির মাধ্যমে প্রকৃত অধিকারের পুরোপুরি আদায় করতে পারেনি। বর্তমানে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকে নমনীয় হতে বাধ্য হয়েছে। যার কারণে অনেক বেশি ছাড় দিয়ে এ চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। তারপরও চুক্তি হয়েছে সেটাই আশার কথা। এ চুক্তির মাধ্যমে বহু বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান হবে। রক্তঝরা বন্ধ হবে। অবস্থার পরিবর্তন হবে।

পাশাপাশি চুক্তি যাতে যথাযথ বাস্তবায়ন হয় সে দিকেই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকারের যেমন অধিকতর দায়িত্ব রয়েছে তেমনি জনসংহতি সমিতিতে চুক্তির শর্তানুযায়ী যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অনন্ত বিহারী খীসা: রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক খাগড়াছড়ি।

ভোরের কাগজ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সন্ত লারমাসহ নেতারা চলে গেছেন

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্ত) লারমাসহ শান্তিবাহিনীর নেতারা বুধবার রাতে দুদুকছড়ি ছেড়ে চলে গেছেন তাদের আশ্রয়ে। গতকাল দ্বিতীয় সারির নেতারাও চলে গেছেন। আজ শান্তিবাহিনীর সাধারণ সদস্যরাও চলে যাবে।

মঙ্গলবার ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির নেতা সন্ত লারমা ঢাকায় সরকারি কমিটির সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন।

গত ১১ নভেম্বর থেকে দুদুকছড়ি সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা বাহিনীর ৫টি ক্যাম্প প্রত্যাহার ও ৮টি ক্যাম্প নিষ্ক্রিয় ছিল। আজ শান্তিবাহিনীর সদস্যরা চলে যাওয়ার পর নিরাপত্তা বাহিনী উল্লিখিত ক্যাম্পগুলোতে ফিরে যাবে।

অপরদিকে শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে সভা-সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে। গতকাল মাটিরাঙ্গা ও দীঘিনালা থানা সদরে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। সমাবেশে পার্বত্যবাসী এ কালো চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে বলে দাবি করেছে। আজ জেলার সর্বত্র সভা-সমাবেশ হবে।

খাগড়াছড়ি উপজাতি পেশাজীবী ঐক্য পরিষদ ও জেলা নাগরিক কমিটি এক যুক্ত বিবৃতিতে আগামীকাল শনিবার শান্তিচুক্তির সমর্থনে বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল বের করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

ভোরের কাগজ

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতি আরো অভিনন্দন

কাগজ প্রতিবেদক: বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে গত ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন।

গতকাল শুক্রবার প্রদত্ত পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ যে সহিংসতা বিরাজ করছিল, এ চুক্তির ফলে তার অবসান ঘটবে ও পাহাড়ি-বাঙালি বাসিন্দারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের ২৪৩ জন প্রকৌশলী এক যুক্ত বিবৃতিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানান। বিবৃতিদাতারা হলেন, প্রকৌশলী এ এম ইসহাক বীরপ্রতীক, ড. গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ আলী, আবদুল ওয়াজেদ, ডা. রাশিদুল হাছান খান, মো. শাহজাহান গাজী প্রমুখ।

অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছে গণআজাদী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ সমন্বয় পরিষদ, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ঢাকা জেলা ইউনিট কমাণ্ড, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় ৪ নেতা সাংস্কৃতিক সংগঠন, নারী মুক্তি আন্দোলন, ঢাকা আন্তঃজেলা বাস, মাইক্রোবাস ও মিনিবাস সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, মুক্তিযুদ্ধ ও গণমুক্তি আন্দোলন প্রমুখ সংগঠন।

ওয়াকার্স পার্টির বক্তব্য

পার্টির স্ট্যান্ডিং কমিটি বলেছে, শান্তিচুক্তি অতীত সরকারগুলোর আলোচনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকার সংরক্ষণ না করা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারসমূহের এ বিষয়ে পরিচালিত ভ্রান্ত নীতি সংশোধন করার ক্ষেত্রে একটি অগ্রগতি।

পার্টির সভাপতি অমল সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, বিমল বিশ্বাস, নূরুল হাসান প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিএনপিসহ জামাত ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল মহলের চুক্তি সম্পর্কে বক্তব্য ও অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করে বলা হয়, তাদের বক্তব্য ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আরো অভিনন্দন জানিয়েছে নারী মুক্তি আন্দোলন, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পরিষদ, বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন পরিষদ, মেহেন্দিগঞ্জ উন্নয়ন পরিষদ, দক্ষিণ বাংলা যুব কল্যাণ সমিতি।

ভোরের কাগজ

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

খাগড়াছড়িতে সমাবেশ মিছিল

শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে খাগড়াছড়ি শহরে পক্ষে-বিপক্ষে সমাবেশ-মিছিল অব্যাহত রয়েছে। গতকাল সকালে চুক্তির পক্ষে শান্তির্যালি, আনন্দ মিছিল বের হয়। বিকেলে চুক্তির বিপক্ষে মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।

পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে গতকাল সকালে পাহাড়ি ছাত্র ও গণপরিষদ এবং উপজাতীয় হিল উইমেন ফেডারেশন যৌথভাবে শহরে আনন্দ মিছিল ‘শান্তির্যালি’ বের করে। র্যালিতে শত শত ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। পরে কড়ইতলায় পাহাড়ি গণপরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা শক্তিপদ ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এক সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগের অধিককাল ধরে জুম্ম জনগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন ও সেনাশাসনের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্যঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নেতৃবৃন্দ এ চুক্তিকে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথে একটি ধাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

বক্তাগণ অবিলম্বে এ চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। বক্তারা তাদের ও সংগঠনের আটককৃত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে তা সত্যের বাতিল করার জন্যও আবেদন জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন এডভোকেট শক্তিমান চাকমা, ডা. কনিষ্ক চাকমা, রূপক চাকমা, খোয়াই অং মার্মা, মৃগাংক খীসা, খগেশ্বর ত্রিপুরা, চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ।

অপরদিকে বিকেলে ‘পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ’ শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে আজ আহূত হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সন্ধ্যায় মশাল মিছিলের আয়োজন করে। শাপলা চত্বরে শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে ঐক্যপরিষদ নেতা শাহজাউদ্দিন সভাপতিত্ব করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ এ ওয়াদুদ ভূঞা অদুদ বলেন, পার্বত্য বাঙালিদের মৌলিক অধিকার, ভোটের অধিকার ও ভাতের হরণ করে গোপন এক কালোচুক্তি করা হয়েছে। দেশের স্বার্থবিরোধী এই চুক্তি

দেশপ্রেমিক জনতা জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে। তিনি বলেন, এ চুক্তির মাধ্যমে বাঙালি হত্যাকারী পার্বত্য সন্ত্রাসীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। পার্বত্যবাসী এ চুক্তি মানে না। সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান আবুল কাশেম, জামাত নেতা আবদুল মোমেন, মোস্তাফিজুর রহমান মিল্লাত, আবদুস ছালাম, জকির হোসেন, ইদ্রিছ আলী, তাজুল ইসলাম, আবুল কাশেম প্রমুখ।

এদিকে শান্তিচুক্তির পক্ষে খাগড়াছড়ি জেলা নাগরিক কমিটি ও পাহাড়ি পেশাজীবী ঐক্য কমিটির যৌথ উদ্যোগে গতকাল আহূত আনন্দ মিছিল স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপির দেশব্যাপী কর্মসূচি থাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য শান্তিবর্যালি স্থগিত করার কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা ব্যক্ত করে প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ভোরের কাগজ

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিরোধী দলের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

হরতাল ডেকে অশান্তি সৃষ্টি না করে

সংসদে এসে যতো খুশি কথা বলুন

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে হরতাল আহ্বানের জন্য বিরোধী দলের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা ভোট চুরি করিনি, দেশে কোনো অশান্তি করিনি, তাহলে কেন হরতাল ডেকে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিরোধী দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, অশান্তির পথ ছেড়ে সংসদে আসুন, যতো খুশি কথা বলুন। রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের বক্তব্য দেশের গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে যাবে।

আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মণির ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা একথা বলেন।

শেখ হাসিনা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মিথ্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত করে বলেন, উনি বলেছিলেন শান্তিচুক্তি হলে ফেনী পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে। ২ ডিসেম্বর, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আজ ৬ ডিসেম্বর। ফেনী কি ভারত হয়ে গেছে? আমি শুধু প্রশ্ন করতে চাই, তিনি কি ফেনী থেকে নির্বাচিত নাকি ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত? এর বেশি কিছু আমি বলতে চাই না। আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল

করিম সেলিম এমপি। জাহাঙ্গীর কবির নানক পরিচালিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যুবলীগের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আহমদ, নূরুল মজিদ হুমায়ুন, কাজী ইকবাল হোসেন, ডঃ মিজানুর রহমান, সাইদুর রহমান, আবুল কাশেম মন্টু ও এস এম জাহিদ।

বিরোধী দলকে একাধিকবার সংসদে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে সংসদে নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা ভুল করলে বিরোধী দল তা সংশোধন করে দিক। তাতে আমাদের কোনো লজ্জা নেই। তাদের বক্তব্য যদি সঠিক হয়, যদি তা বিভ্রান্তিমূলক না হয় তাহলে আমরা তা গ্রহণ করবো। সংসদে পাস হওয়া কোনো কোনো বিলে বিরোধী দলের ১৬টি পর্যন্ত সংশোধনী আমরা গ্রহণ করেছি। সরকারে থাকতে বিএনপি যা কখনও করেনি।

শেখ হাসিনা বলেন, আজ ৬ ডিসেম্বর। এক সঙ্গে আন্দোলন করেছি আমরা। অথচ আপনারা ১৯৯১ সালে নির্বাচনে জিতে নূর হোসেনের রক্তের বেঈমানী করেছিলেন। তাই জনগণ আপনাদের টিকে থাকতে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা অনেক হরতাল করেছি। হরতালের পক্ষে এতো বলেছি যে এখন হরতালের বিরুদ্ধে বলবো না। কিন্তু আমরা হরতাল করেছিলাম দেশবাসীর স্বার্থে, তাদের ভোটাধিকার আদায়ের জন্য। কিন্তু আজ দেশে অশান্তি জিইয়ে রাখার জন্য, গাড়ি ভেঙে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্যই হরতাল ডাকা হচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যুবসমাজকে প্রতিটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে হবে। বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত হয়ে যুবসমাজ যেন কারও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।

আলোচনা সভায় যুবলীগের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বলেন, শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে দেশ ভারত হয় না বরং ভারতের কাছে প্রাপ্য ন্যায় হিস্যা আদায় করা সম্ভব হয়।

ভোরের কাগজ

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সাংস্কৃতিক জোটের সম্প্রীতি সমাবেশে বক্তারা

পার্বত্য শান্তিচুক্তি দেশের উন্নয়নে

এক বিরাট পদক্ষেপ

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য শান্তিচুক্তি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ। শান্তিচুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্র তাই ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তারা একথা বলেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তির পক্ষে দেশব্যাপী সম্প্রীতি দিবস পালন উপলক্ষে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এ সমাবেশের আয়োজন করে।

এতে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদ, জোট নেতা নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, মামুনুর রশীদ ও গোলাম কুদ্দুস। সভাপতিত্ব করেন রামেন্দু মজুমদার।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এর বিরোধিতা কোনো দেশপ্রেমিক শক্তি করতে পারে না। বেগম খালেদা জিয়াসহ একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এর বিরোধিতা ও অপপ্রচার করছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। কারণ সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই এ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন, জিয়ার আমলে বিনীতা রায়, অংশ প্রা চৌধুরী, এরশাদের আমলে উপেন্দ্র নাথ চাকমা মন্ত্রিসভায় পার্বত্য উপদেষ্টা হিসেবে মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় কাজ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে শান্তিচুক্তিতে উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রী নিয়োগের যে বিধান রাখা হয়েছে তার বিরোধিতার কোনো কারণ দেখি না।

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বলেন, প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে পাকিস্তানি অপশক্তির সহযোগী কুখ্যাত সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আনোয়ার জাহিদ নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করতে পারায় দলটি এ চুক্তির বিরোধিতা ও অপপ্রচারে নেমেছে।

ভোরের কাগজ

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তির সংশোধন দাবি

করেছেন এরশাদ

সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিবাদ করে বলেছেন, এই পরিষদ

সরকারের ক্ষমতাকে খর্ব করবে। তিনি গতকাল রংপুরে জুম্মাপাড়া নূরুল উলুম মাদ্রাসায় এক সমাবেশে ভাষণদানকালে এ কথা বলেন। ইউএনবি।

এইচ এম এরশাদ বলেন, ‘আঞ্চলিক পরিষদের বদলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলাকে নিয়ে সেখানে একটি পার্বত্য ডিভিশন হওয়া উচিত।’ তিনি আবারো বলেন যে, তার দল জনস্বার্থবিরোধী কোনো চুক্তি মেনে নেবে না। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করা না গেলে এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা শান্তিচুক্তির পক্ষে। কিন্তু, শান্তিচুক্তির কিছু দিক আমরা মেনে নিতে পারি না। তাই আমরা এই চুক্তির সংশোধন দাবি করছি।

ভোরের কাগজ

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিরোধী দল চাইলে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে

আলোচনা আগের সরকারের আমলেই

গুরু হয়েছে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সব

সরকারের জন্যই প্রয়োজ্য : প্রধানমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে সংবিধান পরিপন্থী কিছু নেই বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যে চুক্তি হয়েছে তা সব সরকারের জন্যই প্রয়োজ্য। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তাদেরকেই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।

গতকাল রোববার গণভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী আগে শান্তি আলোচনা চালানোর জন্য বিগত সরকারগুলোর প্রতি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা চাই চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হোক। বিরোধী দল চাইলে যেকোনো সময় আমরা সংসদের অধিবেশন ডাকতে প্রস্তুত আছি। গণভবনের সবুজ প্রাঙ্গণে জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী চুক্তিকে সংবিধানবিরোধী বলে উল্লেখ করা বিএনপি উত্থাপিত ১৮ দফা নাকচ করেন। তিনি বলেন, বিএনপি ১৮ দফায় যে বক্তব্য তুলে ধরেছে তা বিভ্রান্তিকর। ১৮ দফায় চুক্তিকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা এবং সংবিধানকে খণ্ডিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিএনপির বক্তব্য সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছুই নয়, জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এগুলো বলা হয়েছে।

মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপির শাসনামলে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনায় কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদ স্বায়ত্তশাসনের দাবি পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। আর আমরা সংবিধানের মধ্যে থেকেই সব করেছি।

স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কে দেবে কিনা— এ প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, শান্তিবাহিনীর যে সংগ্রাম প্রথমে তা ছিল স্বাধীনতার জন্য। ধীরে ধীরে সমঝোতা হয়েছে। অলি আহমদের কমিটিও স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু শান্তিচুক্তিতে তা নেই। বরং তারা সংবিধান মেনেই শান্তিচুক্তি অনুযায়ী মূল ভূখণ্ডেই অবস্থান করবেন। তাই বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা কেন দেখা দিলো? অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখনো পার্বত্য এলাকার স্থানীয় সরকারগুলোর চেয়ারম্যানরা উপজাতীয়। বিএনপি বা জাতীয় পার্টির সরকার তো বাঙালিদের চেয়ারম্যান করেনি। আর এখন ভোটের হতে হলে তো সবাইকে অপশন দিয়ে যেকোনো একটি এলাকায় ভোটের হতে হবে। তাই পার্বত্য এলাকায় অ-উপজাতীয়দের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে উপজাতীয়দের মধ্য থেকেই করতে হলে প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক কর্তৃত্ব সঙ্কুচিত হবে কিনা— এ প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিনীতা রায়কে জিয়াউর রহমান মন্ত্রীর মর্বাদায় উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন, এরশাদও অং শু প্রু চৌধুরীকে মন্ত্রী করেছিলেন, তখন কি তাদের কর্তৃত্ব সঙ্কুচিত হয়েছিল?

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত যে, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। কারণ সবাই শান্তি চায়। কিন্তু বিএনপিসহ কিছু রাজনৈতিক দল উস্কানি দিয়ে কৃত্রিমভাবে কিছু ঘটাতে চাইলে তা দুর্ভাগ্যজনক হবে। শেখ হাসিনা বলেন, পরবর্তী কোনো সরকার যদি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে না চায়, সেই সিদ্ধান্ত তারাই নেবে। আমি আগে থেকে কিভাবে বলবো? জনগণই বিচার করবে যদি কেউ চুক্তি বাতিল করতে চায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি একের পর এক কৃত্রিম ইস্যু সৃষ্টি করে দেশে অশান্তি জিইয়ে রাখতে চাচ্ছে। পার্বত্য এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য সবাই চেষ্টা করেছে, বিএনপি ১৩টি বৈঠক করেছে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। আমরা মাত্র ৭টি বৈঠকেই চুক্তি করেছি, কারণ আমরা আন্তরিক ছিলাম।

গতকাল মত বিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাসিমুখে খোলামেলাভাবে সাংবাদিকদের সকল প্রশ্নের জবাব দেন। এ সময় কৃষি ও

খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. এস এ সামাদ, প্রেস সচিব জাওয়াদুল করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মতবিনিময়ে সূচনা বক্তব্যে সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে বলেন, দেশের কোনো বিশেষ অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিভিশনাল কাউন্সিল বা স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির বিধান সংবিধানে রয়েছে। তিনি বলেন, শান্তিচুক্তি, সার্বভৌম সংসদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের ভূমিকা অপরিবর্তনীয়। পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে জেলা প্রশাসকের পদ বিলুপ্তি সম্পর্কিত বিএনপি উত্থাপিত অভিযোগ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, জেলা প্রশাসকের পদ বিলুপ্ত বা কমিশনারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সীমিত করা হয়নি। আমরা জেলা, উপজেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা নিচ্ছি। এসব পরিষদ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ নিজ আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এবং সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে। বিবেচ্য ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকও থাকবেন এবং তিনি তার ওপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাবেন।

শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে হরতাল ডাকার জন্য বিএনপির সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, তাদের ইস্যুর কোনো ঠিক নেই। শান্তির বিরুদ্ধে হরতাল ডাকা কতোটা যুক্তিযুক্ত তার বিচারের ভার জনগণের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

ভোরের কাগজ

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তি : বিএনপির ১৮ দফা সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য

কাগজ প্রতিবেদক: সম্প্রতি সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিএনপির ১৮ দফা অভিযোগকে সরকারের পক্ষ থেকে ভিত্তিহীন অপপ্রচার এবং জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার কূটকৌশল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গত ৩ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনে তার দলের পক্ষ থেকে চুক্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ১৮ দফা যুক্তি উল্লেখ করেন। গতকাল রোববার গণভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়ের সময় বিএনপির ১৮ দফা বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পাঁচটা বক্তব্য লিখিত আকারে সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নিজের বক্তব্যেও এই ১৮ দফা লিখিত পাঁচটা যুক্তি থেকে কিছু

কথা উদ্ধৃত করেন। নিচে বিএনপির ১৮ দফার বিপরীতে সরকারের দেওয়া যুক্তি পেশ করা হলো:

বিএনপির বক্তব্য: ১। এই চুক্তির মাধ্যমে এই সরকার বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল হতে স্বাধীন সার্বভৌম এককেন্দ্রিক ক্ষমতা প্রত্যাহার করে দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েছে এবং স্বাধীনতার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে।

সরকারের বক্তব্য : অভিযোগটি সর্বতোভাবে সত্যবিবর্জিত এবং অপপ্রচার। অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিকও বটে। কেননা, সংবিধানের আওতায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আস্থা রেখেই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিএনপির বক্তব্য: ২। এই চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ‘বিষবৃক্ষ’ রোপিত হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য: এটি একটি অস্পষ্ট (Vague) অনির্দিষ্ট ও অপপ্রচারমূলক অভিযোগ। বরং এ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও জাতিসত্তার মধ্যে বিরাজমান বিভেদ দূরীভূত হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান ঘটবে। শান্তিবাহিনীর বৈরী তৎপরতা বন্ধ হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্য ও উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় উপজাতিদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বিএনপির বক্তব্য: ৩। চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। **সরকারের বক্তব্য:** এ বিষয়টা পূর্ব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য জিইয়ে রেখে বেআইনি ফায়দা লোটার অপকৌশল ও অপপ্রয়াস মাত্র।

বিএনপির বক্তব্য: ৪। সংবিধানের ১নং ধারায় বলা আছে, বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। সুতরাং সংবিধানে পৃথক কোনো আঞ্চলিক পরিষদ বা প্রদেশ করার বিধান নেই। চুক্তির ‘গ’ অধ্যায়ের ১নং পঙ্ক্তিতে যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের ১নং ধারার পরিপন্থী।

সরকারের বক্তব্য: বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অজ্ঞতাগ্রস্ত। সংবিধান সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে এমন কেউ এ বক্তব্য রাখতে পারেন না। আঞ্চলিক পরিষদ মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি স্থানীয় পরিষদের সমন্বয়কারী সংস্থা। যা আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী তো নয়ই, বরং সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৯ ও ১১ অনুচ্ছেদ, তৃতীয় ভাগের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ ও চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯(১) ও ৬০ অনুচ্ছেদের পরিপূরক। সুতরাং অভিযোগটি বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি অপকৌশল মাত্র।

বিএনপির বক্তব্য: ৫। বাংলাদেশের সংবিধানের অঞ্চলভিত্তিক মন্ত্রী নিয়োগের কোনো বিধান নেই। চুক্তির মাধ্যমে একটি বিশেষ অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রী নিয়োগ ও মন্ত্রণালয় সৃষ্টি এবং তাকে সহায়তা করার জন্য নির্দিষ্ট ঐ অঞ্চলভিত্তিক উপদেষ্টা পরিষদ এবং তার অধীনে একটি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নির্বাহী ও সর্বময় ক্ষমতার প্রয়োগ বাংলাদেশ সরকারের বিপরীতে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের সামিল বিধায় এই চুক্তি অবৈধ এবং গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকারের বক্তব্য: সংবিধানে মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল শর্তাবলী রয়েছে তা কোনোক্রমেই কোনো অঞ্চলভিত্তিক মন্ত্রী নিয়োগের পথে অন্তরায় নয়। বিশ্বের অনেক উন্নত ও গণতান্ত্রিক দেশে উপজাতি, আদিবাসী ও অঞ্চল বিশেষের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন ও মন্ত্রী নিয়োগের বিধান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাজ্যে স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড বিষয়ক মন্ত্রী আছেন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রী রয়েছেন। এমনকি মরহুম রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান চাকমা রাজমাতা বিনীতা রায়কে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী) নিয়োগ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত সংবিধানের নবম ভাগের ১ম পরিচ্ছেদের ১৩৬ অনুচ্ছেদের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে যে মন্ত্রণালয় গঠন ও পুনর্গঠনের বিষয়টি সম্পূর্ণ সংবিধানসম্মত। বর্তমানে যে ‘বিশেষ কার্যাদি বিভাগ’ রয়েছে— যা বিএনপি শাসনামলেও পূর্ণরূপে কর্মরত ছিল তা কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য বিশেষ অঞ্চল বিষয়ক একটি কর্ম বিভাগ বা মন্ত্রণালয়। অতএব বিএনপির এ বিষয়ক বক্তব্য কার্যত তাদের কৃত কর্মকাণ্ডের বিপরীত অবস্থান এবং পরস্পর বিরোধী।

বিএনপির বক্তব্য: ৬। এই চুক্তি বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করতে গিয়ে পাল্টা বৈষম্য সৃষ্টি করেছে যা সংবিধানের ২৯ নং ধারার পরিপন্থী।

সরকারের বক্তব্য: তাদের এ বক্তব্যটি সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী তো নয়ই, বরং ২৮(৪) অনুচ্ছেদের পরিপূরক। এ বক্তব্যে তারা ‘তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করতে গিয়ে’ কথা কয়টি উল্লেখ করে কার্যত বিশেষ বিধান প্রণয়নের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাই স্বীকার করে নিয়েছেন। বস্তুত অনগ্রসর শ্রেণীর গোষ্ঠীর জন্য কোনো বিধানই ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হতে পারে না। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, উপজাতি এবং জেলা কোটা— এই বিশেষ বিধানের অধীনেই কার্যকর আছে এবং এ কোটা পদ্ধতি সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এ কথা কেউ কখনো বলেননি বা বলার অবকাশও

নেই। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কোনো বিশেষ বিধান করা হলে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এমনটি ভাবা আবাস্তর।

বিএনপির বক্তব্য: ৭। চুক্তির ‘গ’ খণ্ডের ১৩ ধারার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় এবং জাতীয় সংসদের প্রধান ক্ষমতা খর্ব করার সুস্পষ্ট চক্রান্ত। জাতীয় সংসদের সম্মান এবং সার্বভৌমত্ব নস্যাত্ত করার এই প্রচেষ্টা দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকারের বক্তব্য: এটা কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীত। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো আইনের খসড়া সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে মন্ত্রণালয়, আন্তঃমন্ত্রণালয়, আইনবিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট মহল এবং মন্ত্রিসভা প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এমনকি, সংসদে আইনের খসড়া উপস্থাপনের পরও কমিটি পর্যায়ে তা যাচাই-বাছাই, আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, আইন প্রণয়নে এ সকল কর্মকাণ্ড সংসদের সার্বভৌমত্ব খর্ব করে। এমনকি সংসদও যেকোনো আইন প্রণয়নের পূর্বে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করতে পারে। বর্তমান সংসদেও বিএনপির সংসদ সদস্যগণ প্রায়শই বিভিন্ন আইনের খসড়া জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। সুতরাং তাদের এ বক্তব্যটি স্ববিরোধী।

বিএনপির বক্তব্য: ৮। সংবিধানের ৩৬ ধারাবলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার, বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন একটি মৌলিক অধিকার। চুক্তির ‘গ’ অধ্যায়ের ২৬নং পঙ্ক্তিতে সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে।

সরকারের বক্তব্য: বক্তব্যটি যেভাবে উত্থাপন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞতাপ্রসূত। সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সর্বত্র চলাফেরা, এর যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।’ বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ‘খ’ অধ্যায়ের ২৬নং পঙ্ক্তিতে বা চুক্তির অন্য কোথাও এমন কিছু নেই, যা সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদ বা অন্য কোনো অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। ৩৬ অনুচ্ছেদের বক্তব্য পাঠকালে সর্বদাই একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, ‘জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ—’ বলে যে কথা কয়টি রয়েছে তা গুরুত্বহীন নয়।

বিএনপির বক্তব্য: ৯। সংবিধানের ৪২(১) ধারার অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। চুক্তির ২৬নং পঙ্ক্তি বাংলাদেশের নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার খর্ব করেছে।

সরকারের বক্তব্য: এ অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যাচার এবং বক্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই। তাদের ৮ দফায় যা বলা হয়েছে এটিও অনুরূপ একটি বক্তব্য। কেননা, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২(১) এ আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে ‘কথা কয়টি দিয়ে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করবার’ অধিকারের শর্তাধীন করা হয়েছে। অধিকন্তু চুক্তির কোথাও অবাধ চলাচল বা সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা বিলি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি। আইনের অধীনে কতিপয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তা যথারীতি বহাল রাখা হয়েছে।

বিএনপির বক্তব্য: ১০। বাংলাদেশ সরকারের যে কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি অধিগ্রহণ, ইজারা এবং ক্রয় বিক্রয়ের ওপর রয়েছে সে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে এই সরকার এই চুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে সমর্পণ করেছে। এতে সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য: বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্যের অপলাপ মাত্র। এ বক্তব্যের সঙ্গে চুক্তির কোনো ধারা উপধারা বা বক্তব্যের কোনো মিল নেই। তাদের অভিযোগের ৯নং ধারা সম্পর্কে আমরা যে বক্তব্য রেখেছি ১০নং অভিযোগ সম্পর্কেও আমাদের বক্তব্য একইরকম। চুক্তির কোথাও ভূমি বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়নি। দেশের অন্যত্র ভূমি ব্যবস্থাপনায় সরকারের যে কর্তৃত্ব রয়েছে এক্ষেত্রেও তাই রয়েছে। কোনোরূপ ছাড় দেওয়া হয়নি। পার্বত্য জেলাসমূহে কর আদায়ের পদ্ধতি পূর্বে যা ছিল বর্তমানেও তাই রয়েছে।

বিএনপির বক্তব্য: ১১। এই চুক্তির মাধ্যমে ঐ দেশের নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলাভাষী নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার হরণ করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। তাদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সীমিত করে চাকরি, জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদিতে বাধা সৃষ্টি করে এ দেশের সাধারণ নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য: এ বক্তব্যটিও একটি মিথ্যা বিবৃতি। কেননা, এ চুক্তির মাধ্যমে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়নি। বাঙালিদের কোনো নাগরিক অধিকারও ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এর নির্দেশানুসারে কতিপয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। তাদের চাকরি, জীবিকা

নির্বাহ ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই কারো কোনো মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়নি।

বিএনপির বক্তব্য: ১২। জেলা প্রশাসক পদ বিলুপ্তি ও কমিশনারের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্য সীমিতকরণ ও সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি কর্মচারী, পুলিশ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীদের সরকারের অধীনে না রেখে বস্ত্ত পার্বত্য পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। এতে একই দেশে দুইটি ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থার জটিলতা সৃষ্টি এবং সরকারি/আধা-সরকারি কর্মচারীদের মর্যাদা বা নিম্নমুখী করা হয়েছে। সরকারি প্রশাসনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেশের বাকি অংশেও জটিলতা বৃদ্ধি করবে।

সরকারের বক্তব্য: এ বক্তব্যটি সর্বৈব মিথ্যা ভাষণ। জেলা প্রশাসক পদ বিলুপ্ত করা হয়নি বা কমিশনারের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্যও সীমিত করা হয়নি। আমরা দেশের প্রত্যেক জেলা-উপজেলা পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা নিচ্ছি। এসব পরিষদ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ নিজ আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এবং সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে। বিবেচ্য ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। একটি সমতল জেলায় জেলা পরিষদের পাশাপাশি যেমন জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব করে যাবেন, তেমনি পার্বত্য জেলা পরিষদের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকও থাকবেন এবং তিনি তার ওপর অর্পিত সরকারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাবেন। কমিশনারের দায়িত্ব, কর্তব্য বা ক্ষমতা কোনো অংশেই খর্ব বা সীমিত করা হয়নি। শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণের বিষয়ে কমিশনারের পরিবর্তে একজন বিচারপতি শপথ পাঠ করাবেন। এতে কমিশনারের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য কি করে খর্ব করা হলো তা আদৌ বোধগম্য নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা বা তিনি কোন উপজাতির সদস্য সে সম্পর্কে সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে সার্কুল চিফের ওপর দেওয়া হয়েছে এবং এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এতে জেলা প্রশাসকের পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে মর্মে যারা উচ্চকিত হচ্ছেন, তারা বস্ত্ত পক্ষেই বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে যাচ্ছেন মাত্র।

বিএনপির বক্তব্য: ১৩। উপজাতীয় মন্ত্রী নিয়োগ এই চুক্তিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংবিধান প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ওপর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর movement (চলাচল) সীমিতকরণ এবং তাদের পার্বত্য পরিষদের পরোক্ষভাবে অধীনস্তকরণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা, কর্তব্য ও দায়িত্ব

পালনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য সম্মান এবং মর্যাদাহানিকর।

সরকারের বক্তব্য: বিএনপি উত্থাপিত ৫নং অভিযোগ ও এ অভিযোগটি কার্যত একই অভিযোগ। মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ওপর কোনোরূপ শর্ত আরোপ করা হয়নি। এ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য তাদের অভিযোগনামার ৫নং ধারার উত্তরে যা বলেছি সেটাই এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিএনপির বক্তব্য: ১৪। সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সভাবসবহঃ (চলাচল) সীমিতকরণ এবং তাদেরকে পরোক্ষভাবে পার্বত্য পরিষদের অধীনস্তকরণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য সম্মান এবং মর্যাদাহানিকর।

সরকারের বক্তব্য: অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন। সামরিক, আধা-সামরিক বা শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো বাহিনীর চলাচলের ওপরই কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি বা সীমিতকরণ করা হয়নি। সামরিক-আধাসামরিক বাহিনী বা শান্তি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীসমূহ সর্বদাই তাদের নির্দিষ্ট বিধি বিধানের আওতায় চলাচল করে থাকেন। যুদ্ধকালীন অবস্থা বা সিভিল কর্তৃত্বের সহায়ক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় তাদের যে চলাচল শান্তিকালীন বা স্বাভাবিক সময়ে তাদের চলাচলে সর্বত্রই পার্থক্য থাকবে। যে কোনো আইনানুগ সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল সর্বত্রই ও সর্বসময়েই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম করা হয়নি।

বিএনপির বক্তব্য: ১৫। এ অঞ্চলের প্রোটেক্টেড বনাঞ্চলসহ বহু জমির ওপর সরকারের অধিকার থাকা সত্ত্বেও চুক্তিতে বহু স্থানে এই সরকারি স্বার্থ তথা সমগ্র দেশের জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। এমনকি সরকারের নতুন জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতাও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য: এ বক্তব্যটি সর্বৈব মিথ্যাচার এবং অপপ্রচার। চুক্তির কোথাও এমন কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে নতুন জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতাও পূর্ববর্তী রয়েছে।

বিএনপির বক্তব্য: ১৬। সরকার কর্তৃক নানা ধরনের ট্যাক্স, খাজনা, টোল আদায়ের ক্ষমতা প্রত্যাহার, ভূমি, পুলিশ, পর্যটন, বিচারের বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প স্থাপনের অনুমতি সংরক্ষণ, খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পরে লাভের কমিশন ব্যবস্থায় ইত্যাদি বহু বিষয় সরকার নিজস্ব অধিকার ক্ষমতা ও রাজকোষে অর্থ উপার্জন সঙ্কুচিত করেছে।

সরকারের বক্তব্য: এটি একটি উদ্ভট, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। চুক্তির কোথাও এমন কথা নেই।

বিএনপির বক্তব্য: ১৭। সরকার সহিংসতাবাদীদের পুরস্কার দিতে রাজী হয়েছে, নগদ অর্থ দান, জীবিকার ব্যবস্থার এবং মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছে— অন্যদিকে নিরীহ অ-উপজাতীয়দের মধ্যে যাদের স্বজন নিহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সরকারের বক্তব্য: প্রত্যাশীদেরকে পূর্বের সরকারসমূহও নগদ অর্থ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, জীবিকার ব্যবস্থা প্রদান করেছে। বর্তমান চুক্তিতেও তাই আছে। পূর্ববর্তী সরকারসমূহের সময়ে কোনোরূপ স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছাড়াই প্রত্যাশন প্রার্থীদের মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। চুক্তিতে সে ব্যবস্থাই অব্যাহত রাখা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, পূর্বে শান্তি স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান ব্যতিরেকেই আলোচ্য ব্যবস্থাসমূহ নেওয়া হয়েছিল আর বর্তমানে শান্তি স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান করে এ সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য তাদের পূর্বকৃত কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিএনপির বক্তব্য: ১৮। পরিষদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া জমি, পাহাড়-বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সরকার নিজস্ব ক্ষমতা পরিষদের কাছে সমর্পণ করেছে।

সরকারের বক্তব্য : অভিযোগের ১৫নং ধারায় যা বলা হয়েছে এ ধারাটি তার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট। তারা একটি কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে ধরেছেন।

ভোরের কাগজ

৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতি অভিনন্দন অব্যাহত

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এসব বিবৃতিতে বলা হয়, এ চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বিরাট অবদান রাখবে। বিবৃতিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে আহৃত হরতাল প্রত্যাখ্যান করে যেকোনো ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করারও আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিদাতারা বলেন, বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস-এর চেয়ারম্যান সাবেক বিচারপতি কে এম সোবহান, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, ঢাকা শাখার সভাপতি ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া ও সম্পাদক স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ প্রভৃতি।

ভোরের কাগজ

৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতি আরো অভিনন্দন

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় বিভিন্ন সংগঠনের অভিনন্দন অব্যাহত আছে।

গত রোববার বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বলেছে, অর্ধ শতাব্দীকালের অশান্তির অবসান ঘটাতে এই শান্তিচুক্তি।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম এক বিবৃতিতে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই চুক্তি পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বিরাট অগ্রগতি। বিবৃতিতে তারা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানান এবং চুক্তিকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সকল অপপ্রয়াস সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয়, পার্বত্য শান্তিচুক্তি একদিকে পাহাড়ি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে অন্যদিকে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ঐক্য ও সংহতি জোরদার করবে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ঐক্য পরিষদ আশা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

সতীর্থ '৭১ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার, মুক্তিযুদ্ধের শক্তি এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও কর্মশক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। গত ৬ ডিসেম্বর তাহমিদা সাঈদের সভাপতিত্বে নুহউল আলম লেনিনের সেন্ট্রাল রোডস্থ বাসায় সতীর্থ '৭১-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পুনর্মিলনীতে গৃহীত এক প্রস্তাবে একথা বলা হয়।

ভোরের কাগজ

৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সদস্য ও অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা তৈরি হচ্ছে

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর

শান্তিবাহিনী প্রকাশ্যে আসবে

সানাউল্লাহ: সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র সদস্যদের (শান্তিবাহিনী) প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা নেই। তবে চুক্তি অনুযায়ী জনসংহতি সমিতি তার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে সকল অস্ত্র ও গোলা বারুদের বিবরণী তৈরি করা শুরু করেছে বলে জানা যায়।

জনসংহতি সমিতির ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর সরকারের সঙ্গে তাদের আর বৈঠকে বসার সুযোগ নেই। তবে চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উভয়পক্ষের আলোচনা ও যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে চুক্তির বিভিন্ন বিষয় ও ধারা বাস্তবায়নে সরকার যা চিন্তা করছে সে সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির মতামতও প্রয়োজন। সরকারি সূত্রও স্বীকার করেন, এসব বিষয় আলোচনা না করে সরকার একতরফাভাবে করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। জনসংহতি সমিতি এমনকি আপত্তিও জানাতে পারে। তাই সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সবসময় কথাবার্তা, যোগাযোগ করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ২ ডিসেম্বর ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর সেদিনই জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ঢাকা ছেড়ে খাগড়াছড়ি জেলার দুদুকছড়ির গ্রামে ফিরে যান। দু'দিন পর তারা সেখানকার প্রকাশ্য অবস্থান ছেড়ে গোপন আস্তানায় চলে যান।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমাসহ জনসংহতি সমিতির নেতাদের আবারো আত্মগোপনে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে কিছু সমালোচনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয় সূত্রে যোগাযোগ করে জানা যায়, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে জনসংহতি সমিতির নেতাদের প্রকাশ্যে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ উভয়পক্ষের মধ্যে অস্ত্রবিরতি চললেও জনসংহতি সমিতির অনেক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দেশে অনেক ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অনেকেই ফেরারি আসামি হয়ে আছেন। ফলে এখনই প্রকাশ্যে আসলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

তাছাড়া জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের নিরাপত্তার প্রশ্নও এ ক্ষেত্রে জড়িত। চুক্তি অনুযায়ী সরকার জনসংহতি সমিতির সদস্যদের তালিকা পাওয়ার পর তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। তাই নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের স্বাভাবিক জীবনে আসার সুযোগ নেই।

শান্তিচুক্তির ‘ঘ’ অধ্যায়ের ১২ ধারা অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতি তাদের সদস্যদের তালিকা এবং নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণ সরকারের কাছে জমা দেবে। জনসংহতি সমিতির ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, তারা এ তালিকা প্রণয়নের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে। তবে এ তালিকা সরকারের কাছে জমা দেওয়ার আগে চুক্তির বিভিন্ন বিষয় বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা কতোটা আছে তার দিকে জনসংহতি সমিতি নজর রাখবে। এ সময়ের মধ্যে সরকারকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্পর্কিত আইন সংশোধন ও প্রণয়ন, চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর করার কমিটি গঠন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্কফোর্স গঠন, এরকম বহু কাজ করতে হবে।

এদিকে জনসংহতি সমিতির অস্ত্র সমর্পণ, সাধারণ ক্ষমার প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীকে সংশ্লিষ্ট করা হবে কিনা সে সম্পর্কে সরকার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে জনসংহতি সমিতি এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে সেনাবাহিনীর কাছে বেশ তথ্য রয়েছে বলে জানা যায়।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়কে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত করার কাজ শুরু হয়েছে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ, জনসংহতি সমিতির নেতাদের নিরাপত্তা প্রদানসহ এ সম্পর্কিত সকল কাজ মূলত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করবে। অন্যদিকে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, সংশোধনের কাজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা ও সমন্বয় করে করবে।

ভোরের কাগজ

১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

জাপা পার্বত্য চুক্তির সংশোধনী

সংসদে আনবে

দিনাজপুর প্রতিনিধি: কতিপয় সংশোধনীসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তি জাতীয় সংসদে পেশ করা না হলে জাতীয় পার্টি সংসদ অধিবেশন বয়কট করবে। সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে শান্তিচুক্তি হলে আমরা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অবশ্যই সরকারকে সাধুবাদ জানাবো।

গত মঙ্গলবার বিকেলে শহরের চারু বাবুর মোড়ে দিনাজপুর জেলা জাতীয় পার্টির নয়া অফিস উদ্বোধনকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির

চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এ কথা বলেন। জেলা জাপার আহ্বায়ক মোতালেবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক কর্মসভায় এইচ এম এরশাদ বলেন, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও তাদের কাছে দেওয়া অনেক কর্তৃত্ব সংবিধানের পরিপন্থী। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চলে সম্পাদিত চুক্তির সংশোধনী জাপা সংসদে বিল আকারে আনবে আর যদি সরকার আমাদের সংশোধনীসহ সংবিধানবিরোধী ধারাসমূহ আনয়ন না করে তবে শান্তিচুক্তি পাসের সময় আমরা সংসদ বর্জন করবো।

ভোরের কাগজ

১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে স্বাগত

জানিয়েছেন অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

অস্ট্রেলিয়া সরকার ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া আশা প্রকাশ করেছে যে, এই চুক্তির ফলে পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। বাসস।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক্সান্ডার ডাউনার এক বিবৃতিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘এই চুক্তিতে দুইদশকেরও বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান সশস্ত্র বিদ্রোহ অবসানের অঙ্গীকার করা হয় এবং সেখানকার উপজাতীয় জনগণের বর্ধিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণের জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়।’ বিবৃতিতে এই চুক্তিকে ‘উল্লেখযোগ্য অর্জন’ অভিহিত করে বলা হয়, আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে আলোচনায় বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার ও নিষ্ঠার কথা অস্ট্রেলিয়া সরকার স্বীকার করে।

ভোরের কাগজ

১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পাহাড়ি-বাঙালি বিভক্তি

উস্কানিদাতারা তৈরি করেছে

—হংসধ্বজ চাকমা

বিশেষ প্রতিনিধি: যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বলেছেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে যে পাহাড়ি-বাঙালি বিভক্তি, এটা উস্কানিদাতারা তৈরি করেছে। কিন্তু আমরা পাহাড়িরা কোনো সংঘাত চাই না। এতো বছরের সংঘাত, হানাহানি, রক্তপাত যে এবার আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়েছে এটাই বড়ো পাওয়া।’

গত প্রায় ৬ বছর ধরে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে নিয়মিত সম্পর্ক, আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা ভোরের কাগজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেছেন। ঢাকার গত সোমবার তার এক আত্মীয়ের বাসায় এ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ১৯১২ সালে বিএনপি সরকারের আমলে যোগাযোগ কমিটি গঠিত হয়েছিল। জনসংহতি সমিতির নেতারা প্রকাশ্যে চলে আসলে এই কমিটির কাজ ফুরিয়ে যাবে।

গত ৬ বছরের নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমি খুবই খুশি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসুক এটা সবাই চেয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এখন শান্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। শান্তি প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য তিনি এরশাদ সরকার, বিএনপি সরকারকেও ধন্যবাদ জানান। হংসধ্বজ চাকমা বলেন, ‘এ প্রক্রিয়া এরশাদ সাহেবের আমলে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। তিনি আমাদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। বিএনপি আমলে সে ধারা অব্যাহত ছিল। আমিও এর এক ছিলাম। বিএনপি সরকার বিশেষ করে অলি আহমদ সাহেব আমাদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।’ তিনি শান্তিচুক্তি অর্জনের ব্যাপারে বর্তমান ও সাবেক দুই সরকার কৃতিত্বের দাবিদার বলে উল্লেখ করেন।

বর্তমানে যে পাহাড়ি-বাঙালি বিভক্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে সে সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে চাকমা বলেন, এটা উস্কানিদাতারা তৈরি করছে। চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী থেকে লোকজন গিয়ে উস্কানি দিচ্ছে। গত ৬ বছর ধরে যখন আলোচনা চলেছে তখন তো তাদের টু-শব্দটি করতে দেখা যায়নি? এ আন্দোলনের ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য আছে। সরকার সবার প্রতি সহানুভূতি দেখালে এই সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পাহাড়ে বাঙালিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হচ্ছে এ অভিযোগের জবাবে হংসধ্বজ চাকমা প্রশ্ন তুলে বলেন, সার্বভৌম বাংলাদেশের বাঙালি রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালিরা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয় তাহলে আমরা পাহাড়িরা কোন শ্রেণীতে পড়বো? বাঙালিরা তো জাতি আমরা উপজাতি। এসব অবাস্তব কথার কোনো মানে হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পাহাড়ি-বাঙালি সভাব কিভাবে গড়ে উঠবে— এ প্রশ্নের জবাবে হংসধ্বজ চাকমা বলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার উৎস কোথায় তা চিহ্নিত করতে হবে। সুদূর অতীত থেকে পাহাড়ে আমরা দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে থেকেছি। আমরা বাঙালিদের বাড়ি পাহারা দিয়েছি, বাঙালিরা পাহারা দিয়েছে

আমাদের বাড়ি। সমস্যা তো পরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারিও হয়েছে। তিনি মনে করেন, সংকীর্ণ ফায়দা লোটার জন্য একশ্রেণীর মদদদাতা বসতিস্থাপনকারী গুচ্ছগ্রামের বাঙালিদের নিয়ে রাজনীতি করছে। কারণ শান্তিচুক্তি হওয়ায় তাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে। তিনি বলেন, এসব উস্কানিদাতাকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

ভোরের কাগজ

১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

চট্টগ্রামে হরতালের বিরুদ্ধে

সভা ও শান্তি মিছিল

চট্টগ্রাম অফিস: গতকাল বুধবার বিএনপি আহূত হরতাল চলাকালে হরতাল বিরোধী সভা ও শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে।

সরকারি দল আওয়ামী লীগ চট্টগ্রাম উত্তর, দক্ষিণ ও মহানগরী কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সভায় বক্তারা আহূত হরতালকে ইস্যুহীন বলে উল্লেখ করে হরতাল ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। নগর কমিটির সহসভাপতি ডা. সৈয়দুর রহমানের সভাপতিত্বে নিউমার্কেট চত্বরে উক্ত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন উত্তর জেলা কমিটির গিয়াসউদ্দিন, নগর কমিটির এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন বাবুল প্রমুখ। সভাশেষে একটি শান্তি মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ভোরের কাগজ

১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যার পেছনে ‘ভারতীয় ফ্যাক্টর’

-আবদুল গাফফার চৌধুরী

আজ এই লেখার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটা বড়ো রকমের শব্দাশ জনাতে চাই। শাব্দাশ বাপের বেটি! শেষ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই শান্তিচুক্তির সম্ভাবনায় বিএনপি-জামাত দেশময় যে ‘বেঙ্গলি জিক্কাইজম’ (বাংলাদেশী নয়) সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, যে সন্ত্রাসী-বিরোধিতা চালিয়েছে, তার মোকাবিলায় শেখ হাসিনা এবং তার গোটা সরকার যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। অভিনন্দন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জনসংহতি সমিতির নেতাদেরও। তারাও পর্বতপ্রমাণ বাধা, বাইরের ও ভিতরের অনেক আপত্তি,

অসুবিধা ও অসম্মতিকে অতিক্রম করে এসে এই শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। গত ২১ বছরের এই অহেতুক রক্তক্ষয়, সামরিক তৎপরতায় বাংলাদেশের বাৎসরিক বিরাট অর্থনাশ, হাজার হাজার পাহাড়ি নরনারীর বিদেশে শরণার্থী হিসেবে মানবতের জীবন যাপন, তাদের যুবকদের জীবন নাশ, নারীদের সম্ভ্রমহানি, পাহাড়ি এলাকায় অপাহাড়ি বসতিস্থাপনকারীদের নিরাপত্তাহীন জীবনযাত্রা— গোটা বাংলাদেশেরই সুনাম, সম্মান, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে এতো বড়ো একটা হুমকি ও সর্বনাশা সমস্যা থেকে দেশকে মুক্ত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারায়, দেশের সকল দলমতের মানুষেরই তাকে অভিনন্দন জানানো উচিত। এই শান্তিচুক্তি তার একার সাফল্য ও বিজয় নয়। এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারা বাংলাদেশের শান্তিপ্ৰিয় গণতন্ত্রপ্ৰিয় মানুষের সম্মিলিত সাফল্য ও বিজয়। যে চুক্তিটি গত ২১ বছর যাবৎ কোনো শক্তিমান সামরিক ডিক্টেটর অথবা নির্বাচিত সরকার সম্পাদন করতে পারেননি, অথবা সম্পাদন করতে চাননি, দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে সরকার পরিচালনায় পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত শেখ হাসিনা এতো বাধা, এতো বিপত্তি এবং এতো অসত্য প্রচারণার ডামাডোলের মধ্যে তা সম্পাদনের সাহস দেখালেন, এখানেই তিনি একজন পলিটিসিয়ানের ভূমিকার উর্ধ্বে উঠে স্টেটসম্যান-সুলভ চরিত্র-গুণের প্রমাণ দিলেন।

সত্যি, তিনি সাহস দেখিয়েছেন। এ কথাটা তার পরম শত্রুরও স্বীকার করা উচিত। গত ২১ বছর যাবৎ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ডান এবং বাম দুদিক থেকেই যে অসত্য প্রচারণা চালানো হয়েছে, তার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ধর্মহীনতা, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে দেশ বিক্রির চেষ্টা এবং তার অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ইসলাম-বিরোধিতা বলে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছে, তাতে ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সঙ্গে পানিচুক্তি করা, ট্রানজিট চুক্তির উদ্যোগ বা পাহাড়ি সমস্যার সমাধানে এগুনো নতুন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে ছিল বারুদের স্তূপে দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠির ছোঁয়া লাগানোর মতো। শেখ হাসিনা সাহস করে সেই ছোঁয়া লাগিয়েছেন এবং অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন— এখানেই তার বাহাদুরি। এখন প্রশ্ন, চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তী পর্যায়ে চুক্তি বাস্তবায়নে তিনি সমান দৃঢ়তা ও সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন কিনা? এই চুক্তির বিরোধিতা যতো বাঘের মূর্তি ধরেই গর্জাক, কিংবা হরতাল ভাঙচুরের রাজনীতি করুক, শেখ হাসিনা এই চুক্তি বাস্তবায়নে দৃঢ় ও আন্তরিক হলে এসব বাঘ যে পেপার টাইগার, তা প্রমাণ হতে বেশি দেরি হবে না।

উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আজ নতুন নয় এবং তার বিরোধিতাও কিছু নতুন ব্যাপার নয়। মহাত্মা গান্ধীকে যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী নাথুরাম গডসের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল, তার মূল কারণ, গডসে বলেছেন, ‘গান্ধী দেশ ভাগের প্রাপ্য সম্পদ ও অর্থ টালবাহানা না করে পাকিস্তানকে দেওয়ার জন্য নেহরু সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন, এমনকি অনশন ধর্মঘটও করেছিলেন। গান্ধী বেঁচে থাকলে চাইতেন ভারত সকল ব্যাপারে পাকিস্তানকে তোয়াজ করে চলুক।’ উপমহাদেশে শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই মনোভাব শুধু ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নয়, ছিল পাকিস্তানের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরও— এমনকি শাসক মুসলিম লীগেরও। উগ্র ভারত-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র রাজনৈতিক মূলধন। স্বাধীন বাংলাদেশে যে মূলধনের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে বিএনপি বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

এখন উগ্র মৌলবাদী জামাতিদের কোলে টেনে বিএনপি যেমন আওয়ামী লীগ সরকারের যেকোনো শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানে সেই একই ভূমিকা নিয়েছিল মুসলিম লীগ। তখন বর্তমানের বিএনপির মতো মুসলিম লীগও পাকিস্তানে ক্ষমতা থেকে অপসারিত। রিপাবলিকান পার্টির সহায়তায় সরকার গঠন করেছেন আওয়ামী লীগ প্রধান শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি বিদেশ সফরে গেছেন। অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল কেবিনেটের সিনিয়র সদস্য আবুল মনসুর আহমদের ওপর। তিনি দিল্লি সফরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সফর ছিল দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুভেচ্ছা সফর। ভারতের তখানকার রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সে সময় একটু অসুস্থ ছিলেন। আবুল মনসুর আহমদ তার জন্য শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ সুন্দরবনের এক কোটা তাজা মধু সঙ্গে নিয়েছিলেন।

আর যায় কোথা? করাচি ও ঢাকার মুসলিম লীগ নেতা ও পত্রিকাগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠলেন, ‘শত্রু দেশের রাষ্ট্রপতির জন্য মধু সঙ্গে নেওয়া কেন? ভারতের কাছে পাকিস্তানকে বিক্রিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। করাচির ‘মর্নিং নিউজ’ পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখলো, a secret honeymoon (একটি গোপন মধুচন্দ্রিমা)। ভাগিস, তখন কথায় কথায় হরতাল ডাকার রেওয়াজ ছিল না। থাকলে সারা পাকিস্তানে এই মধু নিয়ে ভারতে যাওয়ার বিরুদ্ধে হয়তো হরতাল ডাকা হতো। রাজপথে সম্ভ্রাস, ভাঙচুরের ফলে নিরীহ মানুষের সর্বনাশ হতো। মুসলিম লীগারদের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ দিল্লিতে গিয়েছিলেন। অসুস্থ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে সুন্দরবনের মধুর কোটা তুলে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

বলেছিলেন, ‘ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি প্রকৃত মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক শুভ কল্যাণধর্মী শক্তির উদ্ভব হবে।’

দিল্লি সফরশেষে আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচিতে ফিরে এলেন। বিমান বন্দরে সাংবাদিকরা তাকে ছেকে ধরলেন, কি হলো, কি হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? দেশে যে হৈচৈ, সমালোচনা হলো, তাতে ভারতের রাষ্ট্রপতি কি আপনার মধু গ্রহণ করলেন? মনসুর সাহেব উত্তর দিয়েছিলেন, ‘His Excellency has accepted my present. But during my journey to Delhi, honey lost its all sweetness’ (মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমার উপহার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দিল্লি যাওয়ার পথে আমার মধু তার সব মিষ্টত্ব হারিয়ে ফেলে)।

বহুদিন আগের ঘটনা। তবু মনে পড়লো সাম্প্রতিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে বাংলাদেশে বিএনপি-জামাতিরা যা শুরু করেছে তা দেখে। তাতে শান্তিচুক্তির ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে এই চুক্তির তাৎক্ষণিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জাদু শক্তির। এই জাদু শক্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ি ও অ-পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে সব সন্দেহ তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে যে সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব তৈরি করতে পারতো, বিএনপি জামাতিদের অপপ্রচার, সন্দেহ ও সংঘাত সৃষ্টির পক্ষে উস্কানি তা কিছুটা বিঘ্নিত ও বিলম্বিত করতে পারে। তবে সরকার দৃঢ়মনা হলে এবং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলগুলো এই চুক্তির পক্ষে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে অগ্রসর হলে সব অপপ্রচার ও চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই চুক্তি সম্পাদন বিঘ্নিত করার জন্য শুধু বিএনপি-জামাতিরা নয়, তাদের বাম-মার্গের কিছু দোসরও ‘পার্বত্য সমস্যার পিছনে ভারতীয় ফ্যাক্টর’ (জুজু) আবিষ্কার করে প্রচার চালিয়েছিলেন যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনের জন্য ভারত সরকার যে অভিযান চালাচ্ছে, পাহাড়ি শান্তিচুক্তির ফলে বাংলাদেশ সেই অভিযানের অংশ হয়ে যাবে। বাম-মার্কীয় জনৈক কলামিস্ট প্রশ্ন তুলেছেন, ‘বাংলাদেশ...ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অভিযানের অংশ হতে যাবে কেন?’

এই ধরনের প্রশ্ন শুনলে মধ্যযুগের গোপাল ভাঁড়-সদৃশ ‘নাইট-চরিত্র’ ডনকুইকজোটের কথা মনে পড়ে যায়। ডনকুইকজোট কল্পনায় নিজেকে ‘নাইট’ ভেবে একটি রুগ্ন ঘোড়ায় চেপে গাদা বন্দুক, তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন এবং রাস্তায় বহুদূর থেকে একটি উইন্ডমিলের পাখা ঘুরতে দেখে তাকেই শত্রু ভেবে হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর ভারতবিরোধী ‘বীর বিপ্লবীদেরও’ প্রায় একই অবস্থা।

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতীয় পার্বত্য রাজ্য ও এলাকাগুলো সন্নিহিত এলাকা হওয়াতে এবং তার অধিবাসীদের জাতিসত্তামূলক বৈশিষ্ট্য নৈকট্যমূলক হওয়ায় ‘৪৭ সালের ভারত ভাগের পর এই সমস্যার সমাধানে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। পার্বত্য জাতিসত্তার সমস্যা সমাধানে ভারত দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে। একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের জন্য কঠোর সামরিক অভিযান চালানো হয়, অন্যদিকে ভারতের অঞ্চল রাষ্ট্রসীমার মধ্যে নিজস্ব জাতিসত্তা নিয়ে বসবাসে ইচ্ছুক বিভিন্ন পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর জন্য মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ইত্যাদি নামে স্বতন্ত্র রাজ্য (দেশ) তৈরি করে তাতে বসবাসকারী জাতিসত্তাগুলোকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে বসবাসের জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। ভারতে কংগ্রেস সরকারের এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশের খালেদা জিয়ার মতো কেউ সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে, দেশের অঞ্চলতা নষ্ট করা হয়েছে বা ‘সন্ত্রাসীদের’ সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে বলে হাস্যকর চিৎকার জুড়ে দেয়নি।

সামরিক অভিযান চালানো সত্ত্বেও ভারত যেখানে তাদের পার্বত্য জাতিসত্তাসমূহের সমস্যা সমাধানে মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, ‘৪৭ সালের দেশ ভাগের পর পাকিস্তান সরকার সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে আঠারো শতকের নির্মম ঔপনিবেশিক নীতি ও বর্বর দমননীতি অনুসরণ করে। দেশ ভাগের র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার পর যখন জানা গেলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম বা চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাকটসের সীমানা বদল করে এই এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তখন নিজেদের স্বতন্ত্র মর্যাদা হারানোর ভয়ে কোনো কোনো পাহাড়ি সম্প্রদায় রাষ্ট্রমাটিতে ভারতীয় পতাকা এবং বান্দরবানে বোমাং রাজপরিবার বার্মিজ পতাকা উত্তোলন করেছিল। এই ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্কে পাহাড়ি নেতা ও রাজপরিবারের সঙ্গে কোনো প্রকার শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ছাড়াই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র আট দিনের মধ্যে সরকার ১৯৪৭ সালের ২১ আগস্ট তারিখে নুশংস বালুচ রেজিমেন্টকে পার্বত্য এলাকায় নিয়োগ করে নিষ্ঠুর দমন নীতি চালায়। ফলে এক বিরটসংখ্যক পাহাড়ি নরনারী তাদের জমি-জিরাত, বাড়িঘর ছেড়ে সন্নিহিত ভারতীয় এলাকায় পলায়ন করে।

পাকিস্তানি আমলে পাহাড়িদের জাতিসত্তা ধ্বংস করা এবং তাদের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র মর্যাদা নষ্ট করার জন্য যে অত্যাচার চালানো হয়, ব্রিটিশ-শাসনের ২০০ বছরেও তা করা হয়নি। মোগল আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল স্বাধীন রাজ্য (Independent Kingdom)। ১৭৮৭ সালে চাকমা রাজা

জান বখশ খান ব্রিটিশ রাজের আনুগত্য মানতে বাধ্য হন। বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন, পার্বত্য অধিবাসীরা ব্রিটিশ প্রজা (ইংরংরংয় ইনলবপঃ) নয়। এই এলাকা ব্রিটিশদের করদ এলাকা মাত্র। ১৮৮১ সালে চিটাগাং হিল ট্রাকটস পুলিশ রেগুলেশন পাস হয়। তাতে পার্বত্য অধিবাসীদের নিজস্ব পুলিশবাহিনী গঠনের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯০০ সালের ১ মে চিটাগাং হিল ট্রাকটস ম্যানুয়াল ল' পাস হয়। তাতে পার্বত্যবাসীর নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের সুবিধার জন্য এলাকাটিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের বাইরে 'এক্সক্লুডেড এরিয়া'র মর্যাদা দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলে ভাগ করা হয়। রেগুলেশন অনুযায়ী পার্বত্য এলাকায় অপাহাড়ি লোকজনের জন্য জমি দখল বা কেনা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩৫ সালে ১৯০০ সালের এই রেগুলেশনকে আবার অনুমোদন দেওয়া হয়।

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসনের সূচনায় পাহাড়িদের জীবনে আসল দুর্দৈব নেমে আসে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আট দিনের মাথায় পাহাড়িদের বশ্যতা শেখানোর নামে রাঙ্গামাটি-বান্দরবান এলাকায় বালুচ সৈন্য পাঠিয়ে চরম অত্যাচার চালানো হয়। এক বছরের মধ্যে- ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেন, রাষ্ট্রের প্রতি পাহাড়িদের আনুগত্যে আস্থা রাখা যায় না। সুতরাং ১৮৮১ সালের চিটাগাং হিল ট্রাকটস পুলিশ রেগুলেশন অর্থাৎ পাহাড়িদের নিজস্ব পুলিশবাহিনী রাখার অধিকার বাতিল করে দেওয়া হলো। পাহাড়ি পুলিশবাহিনী ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনমালের নিরাপত্তার ভয়ে হাজার হাজার পার্বত্য নরনারী প্রতিবেশী ভারতে এবং বার্মায় পালিয়ে যায়। পাকিস্তান সরকার তাতেই খুশি না থেকে ১৯০০ সালের চিটাগাং হিল ট্রাকটস ম্যানুয়াল ল' বাতিলেরও সিদ্ধান্ত নেন। শুরু হয় ভারত ও বার্মায় নতুন করে দলে দলে পাহাড়ি শরণার্থী গমন।

পরিস্থিতির এই পর্যায়ে ভারত ও বার্মা সরকার পাহাড়ি শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এই চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার চিটাগাং হিল ট্রাকটস ম্যানুয়াল ল'-এর বিধিবিধান মেনে চলার সম্মতি জানান। কিন্তু করাচির নির্দেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নূরুল আমিন সরকার ১৯৫০ সালেই ম্যানুয়াল ল'-এর বিধিবিধান ভঙ্গ করে নানাজাচর, লংদু ও বান্দরবানে শয়ে শয়ে অপাহাড়ি মুসলমান পরিবার পাঠিয়ে তাদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। শুরু হয় পাহাড়িদের জমি-জিরাৎ বৈধ ও অবৈধভাবে দখলের প্রক্রিয়া।

আমার বাম-মার্কীয় কোনো কোনো বন্ধুর অবগতির জন্য এখানে বলা দরকার যে, পাকিস্তানের জঘন্য সাম্প্রদায়িক ও নব্য ঔপনিবেশিক নীতির দরুন পার্বত্য চট্টগ্রামের যে হাজার হাজার পরিবার সেই '৪৭ সাল থেকেই ভারত ও বার্মায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, সেই শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি থেকেই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যায় 'ভারতীয় ফ্যাক্টর' যুক্ত হয়। বলা চলে, বার্মিজ ফ্যাক্টরও যুক্ত হয়। এই সমস্যাটি উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। এই 'ফ্যাক্টর' পাকিস্তানি শাসকদেরই সৃষ্টি।

১৯০০ সালের চিটাগাং হিল ট্রাকটস ম্যানুয়াল ল' ভঙ্গ করে পাকিস্তান সরকার পাহাড়ি সম্প্রদায়গুলোর উপর যে নিপীড়নমূলক ও দমনমূলক নীতি অনুসরণ করতে থাকে, তাতে কিছুটা ভাটা পড়ে ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকার উচ্ছেদ হওয়ার পর। যুক্তফ্রন্ট সরকার-বিশেষ করে শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধানে চিটাগাং হিল ট্রাকটস ম্যানুয়াল ল'-কে অনুমোদন করা হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুবের পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর '৫৬ সালের সংবিধান স্থগিত রাখার সুযোগে ম্যানুয়াল ল' অবৈধভাবে সম্পূর্ণভাবে বদল করা হয়। ম্যানুয়াল ল'তে সন্নিবেশিত 'স্বতন্ত্র শাসিত এলাকা', 'উপজাতি এলাকা' প্রভৃতি কথাগুলো তুলে দিয়ে পাহাড়িদের স্বতন্ত্র মর্যাদা এবং নিজস্ব ভূমির উপর তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

১৯৫৭ সাল থেকে যদিও কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট ড্যাম সংক্রান্ত পরিকল্পনার শুরু, আইয়ুবের সামরিক শাসনামলে তাকে পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়। এই বাঁধ তৈরির জন্য পাহাড়িদের জমি হুকুমদখল করা ছাড়াও তাদের কৃষি জমির শতকরা ৪০ ভাগ বাঁধের জন্য জলমগ্ন হয়। এজন্য নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দানের কথা বলা হলেও তা থেকেও পাহাড়িদের বঞ্চিত করা হয়। পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে যারা বাস্তহারী হয়, সেই পাহাড়িদের পুনর্বাসনের যে ব্যবস্থা করা হয়, তা ছিল মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ে মতো। ১৯৬৪ সালের দিকে ৫০ হাজার দুর্দশাগ্রস্ত পাহাড়ি পরিবার ভারতে চলে যায়। তাদের মধ্যে ২০ হাজার পরিবারকে ভারত সরকার অরুণাচল রাজ্যে আশ্রয় দেন। বাকি পরিবারগুলোকে ত্রিপুরা ও অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

এবার পার্বত্য সমস্যার দ্বিতীয় পর্ব। কাশ্মির বিরোধের সূত্র ধরে পাকিস্তানের সামরিক জাভা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উপদ্রব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই প্লান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম সন্নিহিত ভারতীয় পাহাড়ি রাজ্যগুলোতে- বিশেষ করে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলনে সাহায্য ও শক্তি

জোগাতে থাকে। ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিংদানের জন্য পাকিস্তানের সেনা অফিসারদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে অসংখ্য ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখান থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ট্রেনিং ও অস্ত্র সরবরাহ চলতে থাকে। বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের ধাওয়া করে ভারতীয় সেনারা কখনো সীমান্ত এলাকায় ঢুকে পড়লে পাকিস্তান সরকার প্রচার চালাতেন, ‘ভারতীয় সৈন্য বিনা উস্কানিতে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় ঢুকে অত্যাচার চালিয়েছে।’ আসলে নাগা-মিজো বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতীয় সৈন্যের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় তাদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পগুলোতে এসে আশ্রয় নিতো। বিচ্ছিন্নতাবাদী নাগা নেতা ফিজো ১৯৮৩ সালে লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে থাকার সময়ে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন, তিনি ছদ্মবেশে বহুবার পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকা হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে গেছেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী নাগাদের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করেছেন। তিনি সব সময় পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের অফিসারদের তত্ত্বাবধানে চলাফেরা করতেন। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ট্রেনিং দানের জন্য চীন থেকে কিছু বিশেষজ্ঞ এবং বার্মার মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর, কিছু লোকও এসব ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিল। ঢাকায় অবস্থান কালে ফিজোর একাধিক পিকিংপন্থী বাম নেতার সঙ্গে তার যোগাযোগের কথাও বলেন। ১৯৮৩ সালে ফিজোর এই সাক্ষাৎকারের ইংরেজি বয়ানের বাংলা অনুবাদ লন্ডনের বাংলা সাপ্তাহিক ‘জাগরণে’ পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়ি ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যেরা পলায়ন করে। তাদের কিছু কিছু অংশ দুর্গম বনাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী নাগা মিজোদের জন্য তৈরি করা ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নেয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাছে ভারত এই ক্যাম্পগুলো ভেঙে ফেলার এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধরার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে ‘যুক্ত কষিং অপারেশনের’ প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্ত কষিং অপারেশনে রাজি হননি। কিন্তু ভারত সরকারকে এই মর্মে দৃঢ় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারত-বিরোধী কোনো তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না। বস্তুত এখন যারা সাম্প্রতিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে প্রচার চালাচ্ছেন— এই চুক্তি দ্বারা ‘উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের জন্য ভারতীয় অভিযানে অংশগ্রহণ’ করা হবে— তারা যে ডাহা মিথ্যা প্রচার করছেন এ কথাটা নিজেরাও জানেন। বর্তমান পার্বত্য শান্তিচুক্তি হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের দু’অংশের মধ্যে। ভারত এ চুক্তির কোনো পক্ষ নয়। সুতরাং চুক্তির কোন শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতীয় অভিযানের অংশ হবে?

ভারত তিনদিক থেকে বাংলাদেশকে বেষ্টিনকারী বিরাট প্রতিবেশী দেশ। সে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতিগোষ্ঠীর দাবির প্রতি বাংলাদেশের কারো কারো সহানুভূতি থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে কোনো দায়িত্ববোধসম্পন্ন রাজনৈতিক দল বা নেতাই এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রকাশ্যে স্বাধীনতার সৈন্য, মুক্তিকামী জাতি ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের উচিত তাদের সাহায্য করা— এই ধরনের উক্তি করে ভারতকে গায়ে পড়ে চটাতে যাবেন না। বিএনপি নেতারা এসব দায়িত্ববোধহীন, অপরিণামদর্শী কথাবার্তা বলতে পারেন। কারণ, তারা নিজেদের খেলা খেলছেন না, অন্যের হয়ে খেলছেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তি হওয়ায় সেখানে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিগুলো উচ্ছেদ হয়ে গেলো বা যাবে। সেজন্যই নিজ দেশের পাহাড়িদের স্বার্থ, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রশ্নটি উপেক্ষা করে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর ‘স্বাধীনতা’ ও ‘স্বার্থের’ জন্য বিএনপি নেত্রীর এই অস্থিরতা কিনা কে বলবে? আশা করা যায়, সাম্প্রতিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, বাংলাদেশ যেমন পার্বত্য এলাকা থেকে ভারতের বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র তৎপরতা চলতে দেবে না, তেমনি ভারতও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে হানা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবে না। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো সশস্ত্র গ্রুপ বাংলাদেশে ঢুকে পড়লে, বাংলাদেশের দায়িত্ব হবে তাদের ভারতে পুষ ব্যাক করা। এটাই সাধারণ আন্তর্জাতিক নীতি ও প্রতিবেশ দেশগুলোর সম্পর্কের বাধ্যবাধকতা। একথা সবাই জানে, আইরিশ রেভলুশনারি— বা আইআরএ’র প্রতি আমেরিকান প্রশাসনের একটি শক্তিশালী অংশের সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু কথা প্রকাশ্যে বলার মতো বোকামি দেখিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে তারা শত্রুতা সৃষ্টি করেননি। বাংলাদেশের বিএনপি-জামাত ছাড়া অন্য কোনো দলের পক্ষে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদি কোনো গোষ্ঠীকে প্রকাশ্যে ‘স্বাধীনতাকামী’ আখ্যা দিয়ে তাদের ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে’ সমর্থন জোগানোর দায়িত্বহীন, অপরিণামদর্শী কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়। তাতে ভারতের ক্ষতি নেই। বাংলাদেশের ক্ষতি। ভারতের যে বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ বা এলাকাগুলোর প্রতি অহেতুক সহানুভূতি দেখানো হচ্ছে, তাদেরও কোনো উপকারে এই কথাগুলো লাগবে না। কারণ, সত্যি সত্যি তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কথাগুলো বলা হয়নি। বল হয়েছে, ভারতকে খোঁচা মারা এবং অনাবশ্যকভাবে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য। এই শত্রুর সৃষ্টিও নিজ দেশের স্বার্থে নয়। একথা বিএনপি নেতা-নেত্রীরা জানেন। জানেন, বাম-মার্গের বলে পরিচিত আমার কোনো কোনো বন্ধুও।

পার্বত্য সমস্যার বহুকথিত ‘ভারতীয় ফ্যাক্টরিটি’ তৈরি করেছিল পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দাচক্র। পার্বত্য এলাকায় তাদের গোপন তৎপরতা

কার্যকরভাবে বন্ধ হলে ভারতীয় ফ্যাক্টরিটিও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন প্রশ্ন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে বিএনপি-জামাত এবং বাম-মার্কীয় বলে পরিচিত কিছু কিছু দল ও নেতার এই ভারসাম্যহীন কথাবার্তা এবং আচার-আচরণ কেন? তার ইতিহাস জানতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সালের ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকাতে হবে। এই অধ্যায়টিকে নাম দেওয়া যায়, পার্বত্য সমস্যার পিছনে পাকিস্তানি ফ্যাক্টর। আগামী সপ্তাহে কোনো জরুরি বিষয় আলোচনার না থাকলে এ সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনার আশা রাখি। দেশে সুস্থ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থেই আমাদের অতীতের ভুল ও ভ্রান্তিগুলো জেনে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

(পাদটীকা: এই আলোচনাটি লেখায় ব্যাপারে হাতের কাছে পাওয়া কিছু বইপত্রের সাহায্য নিয়েছি। সাহায্য নিয়েছি নিউইয়র্কে HBO's International Media Group-এ কর্মরত নয়ীম মোহাইমেনের তথ্য থেকে। তার এই তথ্যনিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার The Daily Star পত্রিকায় গত ২৬ নভেম্বর বুধবার।)

লন্ডন ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার, ১৯৯৭ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী : লেখক ও সাংবাদিক।

ভোরের কাগজ

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

তেহরানে হাসিনার ব্যস্ত দিন অতিবাহিত

পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রশংসা করেছেন কফি আনান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিনটি গতকাল বৃহস্পতিবার খুব ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ, ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত, জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান, সৌদি ক্রাউন প্রিন্স আবদুল্লাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। বাসস।

বৈঠকে মাহাথির মোহাম্মদ ও শেখ হাসিনা দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ডি-৮ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করেন। আরাফাতের সঙ্গে হাসিনার দ্বিতীয় দফা বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। এর আগে মঙ্গলবার রাতে আরাফাত-হাসিনা প্রথম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সুদানি প্রেসিডেন্ট ওমর হোসাইন আহমেদ আল বাসির ও শেখ হাসিনা দুটি দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছান।

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে হাসিনার ভূমিকার প্রশংসা করেন। ভারতের সঙ্গে পানিবন্টন চুক্তির কথা উল্লেখ করে কফি আনান বলেন, 'এই অঞ্চলে শান্তি রক্ষার্থে আপনার এ উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।' এ ছাড়া পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রশ্নে তিনি বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য এরকম একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' প্রধানমন্ত্রী কফি আনানকে জানান, তার সরকার জাপানি সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর কাছ থেকে প্রস্তাবিত গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। সৌদি ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে আলোচনা হয়।

এদিকে, ওআইসি মহাসচিব ড. এজেদাহীন লারাকিও গতকাল সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। শেখ হাসিনা এ সংস্থার প্রতি তার দেশের অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে ওআইসি তার যথাযথ ভূমিকা রাখবে। ড. লারাকিও ওআইসিতে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, এ ভূমিকা মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবে। এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় শেখ হাসিনা সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম এবং গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াইয়া গামেহর সঙ্গে বৈঠক করেন।

দুদিনের বৈঠককালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, পররাষ্ট্র সচিব মোস্তাফিজুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জাওয়াদুল করিম এবং ইরানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ

১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

দায়িত্ব যখন নিয়েছি সঙ্কট

সমাধান করবো ইনশাআল্লাহ

কাগজ প্রতিবেদক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'রাজনীতি যখন করি, সরকার প্রধানের দায়িত্ব যখন পালন করছি তখন যে সঙ্কটই আসুক তার সমাধান করতে হবে। ইনশাআল্লাহ করবো।'

গতকাল শুক্রবার ইরান থেকে ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আন্দোলনকে অনুসরণ করতে

গেলে তারা ভুল করবে। একই ফর্মুলায় গেলে চলবে না। তাদের ইস্যু দরকার, আমরা কোনো ইস্যু দেবো না। তিনি বলেন, আমরা তাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছি তাই তারা যে ভুল করেছে আমরা সেই ভুল করবো না।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা যখন শান্তির অন্বেষণে ছুটে বেড়াচ্ছি তখন বিরোধী দল অশান্তি সৃষ্টির জন্য আন্দোলন করেছে। দেশবাসী এই আন্দোলন মেনে নেবে কিনা সেটাও এক প্রশ্ন। কাদের স্বার্থে বিএনপি এসব করেছে। শান্তি আলোচনা তারাও করেছে। ৫ বছরে বিএনপি শান্তি স্থাপন করতে পারেনি। আমরা ১৭ মাসে শান্তিচুক্তি করেছি। তাদের ব্যর্থতার গ্লানি কেন দেশবাসীকে বহিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শান্তিচুক্তি করার আগেই আমাদের মন্ত্রী ও দলীয় নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘুরেছেন। চুক্তি হওয়ার পর আনন্দ মিছিলও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অস্ত্র, সোনা ও মাদক চোরাকারবারীদের ব্যবসা নষ্ট হবে তাই শান্তি তাদের সহ্য হচ্ছে না। আর বিরোধী দল সবকিছুরই বিরোধিতা করতে হবে এ জন্য বিরোধিতা করেছে।

শান্তিচুক্তি আলোচনার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে কিনা— এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে সংসদনেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি তো বলেই দিয়েছে তারা পার্লামেন্টে আসবে না। আমরা বলেছিলাম, অধিবেশন ডাকবো। কারণ আমরা আলোচনার সুযোগ দিতে চাই। তারা কখনো সেই সুযোগ আমাদের দেননি। সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন ছিল বিরোধী দল যে আন্দোলন করেছে তাতে পাকিস্তানের কোনো ইন্ধন আছে কিনা, শেখ হাসিনা জবাব দেন ‘বিনা বাতাসে গাঙ্গের পানি নড়ে না।’ সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ ছাড়াও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জিল্লুর রহমান, অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া, আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমির হোসেন আমু, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, চিফ হুইপ আবুল হাসিনাত আবদুল্লাহ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি যে পথ নিয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। যারা আল্লা-রসুলের কথা বলে তারা কিভাবে এতো মিথ্যা কথা বলে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের থেকে ভালো কিছু কেউ করতে পারলে পরে ক্ষমতায় এলে করবে। কিন্তু এখন একই ভূখণ্ডে একই দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের একটি এলাকায় যুদ্ধাবস্থা, রক্তক্ষয় আমরা মেনে নিতে পারি না।

প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, বিএনপি কি চায় ভারতের মাটিতে আমাদের নাগরিকগণ শরণার্থী হিসেবে থাকুক। তারাতো এতো ভারতবিরোধী, তাহলে দেশের নাগরিক ভারতে শরণার্থী হলে কি তাদের আত্মসম্মানে লাগে না। আমাদের তো লাগে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার গঠনের পর আমরা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছিলাম। এখন বিএনপি চেষ্টা করেছে ভাবমূর্তি যাতে উজ্জ্বল না হয়। এতে তাদের কি লাভ হচ্ছে জানি না তবে দেশের মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইরানের ঐতিহ্যবাহী কালো বোরকা পরে নামেন বিমান থেকে। সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিক এ প্রশ্নটি উত্থাপন করলে প্রধানমন্ত্রী সহাস্যে বলেন, পোশাক যখন যা ভালো লাগে পরা যায়। তবে ওআইসি সম্মেলনে অন্যান্য সরকার প্রধানের মতো আমিও জাতীয় পোশাক শাড়িই পরেছিলাম। টেলিভিশনে তা দেখেছেন নিশ্চয়। খোলামেলা প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী গতকাল জানিয়েছেন যে, ইরানে সাংবাদিক ও ফটোসাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই মহিলা, যারা নাছোড়বান্দাও বটে— প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়। তিনি আরো বলেন যে, একমাত্র মহিলা সরকার প্রধান হিসেবে সকলের কাছেই সম্মান পেয়েছি। ইরানি প্রেসিডেন্টকে বলেছি, যেন আগামীতে আরো দু'একজন মহিলা সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানকে দেখি সম্মেলনে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিএনপি সমতলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াই করেছে আর পার্বত্য চট্টগ্রামে বলছে বাঙালিদের কথা। এভাবে বিএনপি নিজেরাই জাতিকে বিভক্ত করেছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন সেনাবাহিনী নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল তখন বিএনপি সরকার সিজ ফায়ার করেছিল কাদের স্বার্থে। জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের অংশীদার জাপা প্রধান এইচ এম এরশাদের পার্বত্য চুক্তির বিরোধিতা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ সাহেবকে কে না চেনে। উনি যখন যার তার কথাই বলেন। চুক্তির সময় তো জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সংবিধান ভালো করে পড়ার জন্য এরশাদের প্রতি আহ্বান জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চুক্তি কালো হলে বিরোধী দল তা পড়লো কিভাবে। আসলে চুক্তিটি সাদা কাগজে কালো অক্ষরে লেখা। কাশ্মির প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় সমস্যা। উভয় দেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই সমস্যার সমাধান করবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরিফের সঙ্গে আলোচনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন আবার যেকোনো সময় আয়োজন করা হলে তিনি আসবেন।

ভোরের কাগজ
১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে
আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রোববার রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ (ওআইসি) সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে সম্মেলন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে যান।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, ওআইসি সম্মেলন ছাড়াও রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বঙ্গভবনে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে প্রায় পৌনে ২ ঘণ্টা একান্তে কথা বলেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। জানা গেছে, আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বশেষ পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানিয়েছেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে কিনা সে সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি আলোচনা করেছেন বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের সাফল্য সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন যে, ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশের দেওয়া ইসলামী অভিন্ন বাজারসহ বেশ কয়েকটি প্রস্তাব তেহরান ঘোষণায় স্থান পেয়েছে। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০১ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সম্মেলন। তেহরানে অবস্থানকালে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ইসলামী দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ
১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
খাগড়াছড়িতে দিনভর মতিয়া চৌধুরীর মতবিনিময়
অপপ্রচারে কান দেবেন না, পাহাড়ি
বাঙালি সবাই থাকবে

বিশেষ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে: কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী গতকাল শনিবার খাগড়াছড়িতে বিভিন্ন স্তরের জনগণের সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিয়ে

মতবিনিময় করেন। বাঙালি ও পাহাড়িদের সঙ্গে এসব মতবিনিময়ে তিনি বলেন, শান্তিচুক্তি করে সরকার তার অঙ্গীকার পূরণ করেছে। এটার পূর্ণ বাস্তবায়নও করবে সরকার। তিনি বলেন, এখানে বাঙালি-পাহাড়ি আছে, সবাই থাকবে। শান্তিচুক্তি নিয়ে অপপ্রচার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে না।

মতিয়া চৌধুরী গত শুক্রবার দুপুরে এই জেলা শহরে আসেন। তিনি গতকাল সারাদিন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, পরিবহন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, উপজাতি নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শান্তিচুক্তি সম্পর্কে জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নেরও ব্যাখ্যা দেন তিনি। আজ রোববার সকাল ৯টায় তিনি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক মৌন মিছিলে যোগ দেবেন এবং সমাবেশে বক্তব্য দেবেন।

কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বাঙালিরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না বলে অপপ্রচার চলছে। কিন্তু চুক্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে পার্বত্য এলাকায় যাদের বৈধ জায়গাজমি আছে, যারা সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন এমন স্থায়ী বাসিন্দারা ভোটার হবেন। গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীদেরও অনেকের বৈধ জায়গাজমি আছে এবং সুনির্দিষ্ট ঠিকানা তো তাদের আছেই। সুতরাং এই অপপ্রচারের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বাঙালি-পাহাড়ি সবাই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। সেনাবাহিনী থাকবে না এমন কথাও অনেকে বলেছিলেন। কিন্তু চট্টগ্রামের জিওসি গত শুক্রবার প্রকাশ্যে বলেছেন, এখনো তাদের ৫৫০টি সেনা ক্যাম্পের সবগুলোই বহাল আছে। তিনি বলেন, যাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র আছে তাদের কজায় যদি এখন জমি নাও থাকে, তিনি তার দখল পাবেন।

ভোরের কাগজ
১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তিচুক্তি প্রশ্নে বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে
দিন দিন চুক্তির পক্ষে জনমত বাড়ছে

সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে: শান্তিচুক্তিকে ঘিরে স্পষ্ট বিভক্ত হয়ে পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমত। চুক্তির সমর্থনে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে সভা-সমাবেশ করছেন সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীরা। পাশাপাশি তাদের বিরোধীরাও সক্রিয়। চুক্তিবিরোধী বিএনপি-জামাত সমর্থিত পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আহূত লাগাতার সড়ক অবরোধ চলছে। তবে দিন দিন চুক্তির পক্ষে জনমতের পাল্লা ভারি হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাঙ্গামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার, তবলছড়ি, বনরুপায় এবং শহরের বাইরে ঘাঘরা ও বেতবুনিয়ায় শান্তিচুক্তির সমর্থনে টেলিযোগাযোগ ও গৃহায়ণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, দীপংকর তালুকদার, সাবেক ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, অসীম কুমার উকিল, এস এম কামাল হোসেন, ইকবালুর রহিম সভা-সমাবেশ করেছেন। এসব সমাবেশে অবশ্য পাহাড়ীদের চেয়ে বাঙালি জনগণকে বেশি দেখা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ বাঙালিকে চুক্তিবিরোধীরা তাদের পক্ষে টানতে সমর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রায় পুরোটাই শান্তিচুক্তির সমর্থক হলেও বাঙালিদের সঙ্গে কোনোরকম সংঘাতে না জড়ানোর স্বার্থে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। চুক্তির সমর্থক বাঙালিদের ক্ষুদ্র অংশটি এতদিন নীরব থাকলেও মন্ত্রী-নেতাদের উপস্থিতিতে সরব এবং ক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠছেন। তবে তিন পার্বত্য জেলার শতাধিক গুচ্ছগ্রামে চুক্তিবিরোধীরা এখনো শক্ত অবস্থানে আছেন। সরকারি দল এসব স্থানে এখনো ঢুকতে পারছে না। এমনকি সরকারি দল সমর্থক গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দারা তাদের প্রতিপক্ষের হুমকির মুখে রয়েছেন। খাগড়াছড়ির কুমিল্লা টিলা ও শালবন গুচ্ছগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মারধর করে বের করে দিয়েছে বিরোধীরা।

শান্তিচুক্তিবিরোধীদের আহৃত লাগাতার সড়ক অবরোধ কর্মসূচির সপ্তম দিন গতকাল অতিবাহিত হয়েছে। এর আগে ১০ ও ১১ ডিসেম্বর হরতাল থাকায় টানা ৯ দিন ধরে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে পার্বত্য তিন জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের সড়ক যোগাযোগ এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। তবে এ কর্মসূচিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলা। বাকি দুই জেলায় অবরোধ কর্মসূচি কিছুটা শিথিল হলেও খাগড়াছড়ির অবস্থা ভিন্ন। চুক্তিবিরোধীদের কর্মসূচিতে এ জেলা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে বিরোধীদের কর্মসূচির তীব্রতা প্রথমদিকে যতোটা ছিল এখন তেমন নেই। রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে বাঙালি দোকানপাটে কালো পতাকা উড়লেও বিরোধী মিছিল, সমাবেশ প্রকাশ্যে তেমন নেই। প্রশাসনের কড়া নজরদারির কারণে তারা এখন আর প্রকাশ্যে আসছে না।

রাঙ্গামাটি শহরে আওয়ামী লীগ কর্মীরা সাদা পতাকা নিয়ে মিছিল, সমাবেশ করছে। শহরের অনেক দোকানপাটে সাদা পতাকা তুলেছে চুক্তি সমর্থকরা। তবে কালো পতাকার প্রাধান্য এখনো স্পষ্ট। অনেক দোকান মালিক অভিযোগ করেছে চুক্তিবিরোধীরা তাদের কালো পতাকা তুলতে বাধ্য

করছে। ব্যবসার নিরাপত্তার কারণেও তারা এ পতাকা তুলতে বাধ্য হচ্ছেন। বিকেলে তবলছড়ি ও বনরুপায় বেশ বড়ো সভা করেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। চুক্তিবিরোধীদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত রিজার্ভ বাজারে সকালের সমাবেশে লোকজন কম ছিল।

এসব সমাবেশে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বর্তমান সরকার স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করে। তাই চুক্তিও প্রকাশ্য করে দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালি সবাই থাকবে। সেনাবাহিনী আছে, তারাও থাকবে। কেবল উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য শান্তিচুক্তি হয়েছে। কিন্তু বিরোধিতাকারীরা বিরোধিতার স্বার্থে চুক্তি সম্পর্কে কল্পকাহিনী ছড়াচ্ছে। মোহাম্মদ নাসিম বলেন, শান্তিচুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিরাজমান সংঘাত, হানাহানি, রক্তক্ষয়ের পরিস্থিতির অবসান ঘটেছে। নতুন পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলে যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, পর্যটনসহ সার্বিক উন্নয়নে বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, চুক্তির মাধ্যমে বাঙালি, পাহাড়ি উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, চুক্তিতে বাঙালি স্বার্থবিরোধী কিছু নেই। তিনি অবরোধ কর্মসূচি তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ কারণে এখানকার সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহনের মালিক, চালক, রিকশাচালক, দিনমজুর অধিকাংশই বাঙালি। বাঙালি স্বার্থরক্ষার নামে বিরোধীদের কর্মসূচিতে বাঙালিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি।

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর চুক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার চুক্তিতে রক্ষা করা হয়েছে। তারপরও কারও কোনো ন্যায্য আপত্তি থাকলে সরকার বিবেচনা করবে। তবে চাপ দিয়ে, অবরোধ করে দাবি আদায় হবে না। এজন্য কথা বলতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, বিরোধীদের গাত্রদ্রোহের কারণ আমরা একটা জাতীয় সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। তারা সমস্যার সমাধান চায় না, সমস্যা জিইয়ে রেখে তার থেকে ফায়দা লুটতে চায়।

দীপংকর তালুকদার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি-পাহাড়ি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শান্তি, সমৃদ্ধিতে এ অঞ্চল সারা দেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবে।

ভোরের কাগজ
১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রশংসা করেছেন
জাতিসংঘ মহাসচিব

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ মাসের শুরুতে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিশ্বের বহুল প্রচারিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকাগুলোও সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তিকে মাইলফলক স্থাপনকারী বলে অভিহিত করেছে। বাসস।

নিউইয়র্ক জাতিসংঘের সদর দপ্তরে গত বুধবার মহাসচিব আনানের মুখপাত্রের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় তিনি আনন্দিত। মহাসচিবের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ও বাংলাদেশের সকলের জন্য শান্তি, স্থিতিশীলতা ও বৃহত্তর সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। এর ফলে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সিকি শতকের সংঘাতের অবসান হবে। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও শরণার্থী প্রত্যাবাসন চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মহাসচিব চুক্তি সম্পাদনের জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

ভোরের কাগজ
২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শেষবারের মতো শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি চলছে
জনসংহতি সমিতি অস্ত্র
জমা নিতে শুরু করেছে

হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিতে শুরু করেছে। পাশাপাশি শেষবারের মতো শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি চলছে। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী আগামী ১৫ জানুয়ারি '৯৮-এর মধ্যে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নামের তালিকা এবং গোলাবারুদের হিসাব সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমা চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরই দুদকছড়িতে ফিরে নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা

করে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে অনুযায়ী সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন স্তরের কমান্ডারদের কাছে চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমানে ৫টি স্তরে বিভক্ত। এর সর্বনিম্ন স্তর গ্রাম পঞ্চায়েত। তার ওপরের স্তরগুলো হলো-এরিয়া, জোন, পোস্ট এবং কেন্দ্রীয়। প্রতিটি স্তরে রয়েছে একাধিক শাখা। এ শাখাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ছাত্র সমিতি, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি, কালেক্টর, সশস্ত্র ও রাজনৈতিক শাখা। এ ছাড়াও সরাসরি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্রচার বিভাগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগ।

সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে তিনটি পোস্টে বিভক্ত করেছে। পূর্বের একাধিক ডিস্ট্রিক্টকে একত্র করে পোস্ট সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব পোস্টে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ জমা নেওয়া হচ্ছে। কোনো সদস্য অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও সূত্র জানান। অস্ত্র জমা নেওয়ার পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন শাখার সদস্য সদস্যদের তালিকা প্রণয়নের কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী ৭ জানুয়ারি '৯৮ শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে।

সূত্রমতে, ৭ জানুয়ারি শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জনসংহতি সমিতির প্রধান সম্ভ লারমাসহ হাইকমান্ডের সবাই উপস্থিত থাকবেন। এ সময় নেতারা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের কাছে পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রেক্ষাপট, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে তাদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। সরকারের কাছে অস্ত্র সমর্পণের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করা হবে। তাই শেষবারের মতো প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে শান্তিবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত থাকবেন বলে সূত্র জানান।

অপর একটি সূত্রে জানা গেছে, শান্তিবাহিনীর সকল নেতাকর্মীর নাম এক সঙ্গে সরকারের কাছে জমা দেওয়া হলেও অস্ত্র সমর্পণ করবে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে। অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়া ৩ থেকে ৬ মাস চলতে পারে। তবে এ সময় জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীর সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ রাখা হবে। অপরদিকে বিভিন্ন সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ থেকে যে টাকা আদায় করা হতো তা ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্র জানান।

ভোরের কাগজ
২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭
তিন দিনের জাতীয় গোলটেবিল সমাপ্ত
আদিবাসী জাতিসত্তাগুলোর সাংবিধানিক
স্বীকৃতিসহ ৫৪ দফা সুপারিশ প্রণীত

কাগজ প্রতিবেদক: জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠকে পাহাড়িদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অবিলম্বে গুচ্ছগ্রামের বাঙালিদের সমতল ভূমিতে পুনর্বাসনের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও সমতলের আদিবাসী এলাকার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো পৃথক ভূমি কমিশন বা ট্রাইব্যুনাল গঠন, আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহকে আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানসহ ৫৪ দফা সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে।

নীলক্ষেতস্থ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠকের শেষ দিনে গতকাল শনিবার এসব সুপারিশমালার ওপর দিনব্যাপী আলোচনা হয়। এতে গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন, ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, চাকমা রাজা দেবশীষ রায়, খুশী কবির, প্রশান্ত ত্রিপুরা, দাদার ডি সুজা, সজীব দ্রং প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। গোলটেবিলের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন পিডিশন প্রধান সুহিয়াং।

এই গোলটেবিল আয়োজন করেছে একটি কমিটি যার আহ্বায়ক রাজা দেবশীষ রায়। দুটি জাতীয়ভিত্তিক এনজিও এবং লন্ডনভিত্তিক মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ সহযোগিতা করেছে।

প্রণীত সুপারিশগুলোর আরো উল্লেখযোগ্য হলো গারো, সাঁওতাল, হাজং ও চাকমা জনগোষ্ঠীর যারা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন এবং ভূমি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা। পৃথক একটি আদিবাসী মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে আদিবাসী এলাকা ঘোষণা করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবহার সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকর ক্ষমতা প্রদান করা, যাতে এই পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং পার্বত্য জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারকি করতে পারে, সংবিধানে আদিবাসী ভাষাসমূহের স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

সুপারিশে বলা হয়, আদিবাসীদের সাধারণ যৌথ ভূমি অধিকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। আদিবাসী ভূমি বেদখল

বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং বেদখল হওয়া এবং পরবর্তীতে খাস ঘোষণা করা জমি আদিবাসীদের ফেরত দেওয়ার পদক্ষেপও প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সমতলের আদিবাসী এলাকাগুলোর ভূমি বেদখল বিষয়ক তদন্ত এবং তার প্রতিকারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মত পৃথক ভূমি কমিশন বা ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ড. কামাল হোসেন এসব সুপারিশমালার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, সকল মানুষের অধিকারের প্রতি আমার সমর্থন রয়েছে। তবে আমি নিজেকেও অধিকার হারা মানুষ মনে করি। কারণ যে অধিকার সম্পন্ন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এখনো এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনেক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে একাত্ম করতে না পারলে তা অর্জিত হবে না।

রাশেদ খান মেননও উত্থাপিত সুপারিশের প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, এখানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই জরুরি। কারণ আমরা এ অঞ্চল নিয়ে তাদের স্বার্থের খেলার শিকার হয়ে যেতে পারি। রাজা দেবশীষ রায় বলেন, এ বৈঠকের লক্ষ্য হচ্ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাষ্ট্র ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংলাপ প্রক্রিয়া শুরু করা।

দাদার ডি সুজা বলেন, বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র দুটো দেশ নিউজিল্যান্ড ও পেরুর আদিবাসীরা প্রকৃত অধিকার নিয়ে বসবাস করছে। তাই পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে তাড়াহুড়া নয়, ধীরস্থিরভাবে চলতে হবে। কারণ এখানে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র চলছে।

ভোরের কাগজ
২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭
সরজমিনে সফর শেষে সাংস্কৃতিক জোটের সংবাদ সম্মেলন
পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বাঙালি
সবাই শান্তি চায়

কাগজ প্রতিবেদক: সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি সবাই শান্তি চায়। একটি বিশেষ মহল সেখানে শান্তি চায় না বলেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে জোট নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সম্প্রতি তাদের একটি প্রতিনিধিদল পার্বত্য অঞ্চল সফর করায় বিভ্রান্তি কিছুটা কমেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেয়ে জোটের প্রতিনিধিদলকে স্থানীয় জনগণ বেশি আস্থায় নিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী পার্বত্য তিন জেলা সদর সফর করে এসে জোটের প্রতিনিধিদল গতকাল রোববার বিএমএ ভবনের দোতলায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জোটের পক্ষ থেকে সৈয়দ হাসান ইমাম, আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, মামুনুর রশীদ, শাহরিয়ার কবির, খালেদ খান, হাসান আরিফ ও আফজাল হোসেন পার্বত্য অঞ্চলে ‘শান্তি সম্প্রীতি অভিযাত্রা’য় নেতৃত্ব দেন। তাদের সঙ্গে কণ্ঠশিল্পী ও বিশিষ্ট আবৃত্তিকারদের একটি দলও ছিল। এ সফরের সমন্বয়কারী ছিলেন গোলাম কুদ্দুস।

সংবাদ সম্মেলনে জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস এক লিখিত বক্তব্য বলেন, সম্পাদিত শান্তিচুক্তি দেশে ও বিদেশে শান্তিকামী ব্যক্তি, সংগঠন এবং সরকারসমূহের দ্বারা প্রশংসিত হলেও ঘাতক দালালদের দল জামাত ও সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিয়ে বিএনপি চুক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, আমরা সেখানে রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে নয়, মানবিক বক্তব্য নিয়ে শান্তির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে গিয়েছিলাম। স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালিরা এতে বিপুল সাড়া দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, একটি বিশেষ মহলের মিথ্যা প্রচারণা ও দু’একটি পত্রিকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিপোর্টের কারণে জনমনে যে শঙ্কা ছিল পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে সে ধরনের কোনো কিছুই অনুভূত হয়নি।

আলী যাকের বলেন, সেখানকার সকলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেয়ে সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দকে বেশি আস্থায় নিয়েছেন। সে কারণে আমাদের সমাবেশগুলো জনারণ্যে পরিণত হয়েছিল।

শাহরিয়ার কবির বলেন, চুক্তি বাস্তবায়িত হলে চোরাচালানসহ অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। এতে জামাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই চুক্তির বিরোধিতা করার বীজ তারা বিএনপির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জোট নেতৃবর্গ পার্বত্য শান্তিচুক্তির সফল বাস্তবায়নের জন্য সচেতন সকল মহলের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

ভোরের কাগজ

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

গোলটেবিল নয়, সংসদে পার্বত্য

চুক্তির আলোচনা চায় সরকার

প্রণব সাহা: রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে গোলটেবিল আলোচনার পরিবর্তে সরকার সংসদেই পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে চায়। গতকাল সোমবার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরকারের এই অবস্থান জানিয়েছেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি তাঁর কাছে আগের দিন রোববার দেওয়া বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানালে প্রধানমন্ত্রী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রপতিকে ব্যাখ্যা করেন বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিসংবলিত স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে রোববার খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ও জামাতের সাংসদরা সংসদের অচলাবস্থা নিরসনসহ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে গোলটেবিল ডাকার জন্য অনুরোধ করেন।

গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে যান। এ সময় পূর্ত এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আগের দিন রাষ্ট্রপতির কাছে বিএনপির দেওয়া স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার মূল্য বিষয়বস্তু ছিল। বঙ্গভবনের সূত্র উল্লেখ করে বাসস জানিয়েছে যে, আলোচনাকালে বিরোধী দলের গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবের প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন এবং তিনি নিজে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে চান বলে জানান। গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি পরে জানান।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী সংসদকেই পার্বত্য চুক্তি আলোচনার সবচেয়ে উত্তম স্থান হিসেবে উল্লেখ করেন। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে সংসদের পরিবর্তে কোনো গোলটেবিল বৈঠকে একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার কোনো সুযোগ আছে কিনা তা নিয়েও রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কথা হয়েছে। বিরোধী দল চাইলে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন এগিয়ে আনা এবং বিরোধী দলের চাওয়া অনুযায়ী আলোচনার সময় নির্ধারণ করার কথাও প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রয়োজনে পার্বত্য শান্তিচুক্তি আলোচনা সরাসরি রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আলোচনা হলে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতিও সংসদে উপস্থিত থেকে তা প্রত্যক্ষ করতে পারেন— এমন কথাও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন যে, সরকার চায় রাষ্ট্রপতির সর্বজনশ্রদ্ধেয় পদটি একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থাকুক। গোলটেবিলে সরকার ও বিরোধীপক্ষের নির্ধারিত সীমিতসংখ্যক কয়েকজন নেতার পরিবর্তে সংসদে

পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা হলে সকল দলের সাংসদগণ সেই আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন। দেশবাসীও চুক্তি সম্পর্কে উভয়পক্ষের বক্তব্য জানতে পারবেন। সংসদে আলোচনার পক্ষে এসব যুক্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেন বলে জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে বসে রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

ভোরের কাগজ

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

মন্ত্রিসভা বৈঠকে

পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুমোদিত

কাগজ প্রতিবেদক: গত ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। গতকাল সোমবার সকালে সচিবালয়ের কেবিনেট কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকে ১৯৯৮ সালের সরকারি ছুটির তালিকাও অনুমোদিত হয়েছে।

ভোরের কাগজ

২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তিচুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে

খাগড়াছড়িতে প্রচারণা চলছে

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: জেলায় শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণা ও পথসভা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, পানছড়ির তাইদং ও তবলছড়িতে পথসভা করে শান্তিচুক্তি ব্যাখ্যা করেছে।

তিনি বলেছেন, শান্তিবাহিনী দীর্ঘদিন পর অনেক কিছু ছাড় দিয়ে বাঙালিকে মেনে নিয়েই চুক্তি করেছে। সুতরাং পাহাড়ে বাঙালি আছে, বাঙালি থাকবে, এটাই বাস্তবতা। শান্তিচুক্তি যতো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে ততোই আমাদের সকলের জন্য মঙ্গল হবে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন, একটি মহল অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সাময়িক লাভবান হলেও শান্তিরই জয় হবে। তিনি বলেন, বিরোধীরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বাঙালিদের ভোটাধিকার থাকবে না, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

অপরদিকে মানিকছড়িতে আব্দুল মজিদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন এম কে আজাদ, আরব আলী, এম.এ. করিম, কাশেম প্রমুখ। শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে তবলছড়ি ও তাইদং কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়।

ভোরের কাগজ

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তিচুক্তির পক্ষে ব্যাপক প্রচারণায়

বান্দরবানে জনমনে আস্থা বাড়ছে

বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, বান্দরবান থেকে: পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রীর সফর ও ব্যাপক জনসংযোগের কারণে বান্দরবানে শান্তিচুক্তি বিরোধীদের অবস্থান আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে এসেছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে এতোদিন যে দ্বিধা-সংশয় ছিল মন্ত্রীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এখন তা অনেকটা দূর হয়েছে। চুক্তি নিয়ে জনমনে ধীরে ধীরে আস্থা ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। শান্তিচুক্তির পক্ষের জনসংযোগ সভা-সমাবেশগুলোতে পাহাড়ি-বাঙালি, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। চুক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর বিশাল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা জন্ম দিচ্ছে। তাদের মনে চুক্তি সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণার জন্ম দিচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সালাহউদ্দীন ইউছুফ এবং সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোজাম্মেল হক গত বৃহস্পতিবার ও গতকাল শুক্রবার বান্দরবান সফর করেছেন। মন্ত্রীরা স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা, সাংবাদিক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

গতকাল সার্কিট হাউসে মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দীন ইউছুফ বলেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে উন্নয়নের দ্বারও উন্মোচিত হবে। কিন্তু '৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধীরা শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে এই এলাকায় রক্তপাত ও সংঘাত জিইয়ে রাখতে চায়। মন্ত্রী বলেন, সংসদ হচ্ছে সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং চুক্তি নিয়ে আমরা সংসদে আলোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনা করবো। তিনি বিরোধী দলকে সংসদে পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নিতে আহ্বান জানান। মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাংসদ বীর বাহাদুর, স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান খোয়ায়চক্র মাস্টার, শৈক্যচিং হেডম্যান প্রমুখ।

এর আগে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোজাম্মেল হক সমাজসেবা অধিদপ্তরের এক ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে ঋণ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক পাহাড়ি বাঙালির সমাবেশে শান্তিচুক্তি সম্পর্কে তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি সমাজসেবা বিভাগে বান্দরবানের জন্য ৪৫ লাখ টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের ঘোষণা করেন। গতকাল বান্দরবান সদর থানায় প্রান্তিক চাষীদের ২ লাখ ৮২ টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করেন।

ভোরের কাগজ

২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সংবাদ সম্মেলনে ডাচমন্ত্রী মেলকার্ট

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত হলে

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে সাহায্য

করতে ডাচ সরকার প্রস্তুত

কাগজ প্রতিবেদক: সপ্তাহব্যাপী বাংলাদেশ সফরের শেষ পর্যায়ে নেদারল্যান্ডসের সমাজকল্যাণ ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী মি. এ পি ডব্লিউ মেলকার্ট বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে নেদারল্যান্ডস সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের সাহায্য গ্রহণের আগে বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য এলাকায় শান্তি নিশ্চিত করতে হবে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঐ এলাকাকে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, সেখানে আর কোনো সশস্ত্র সংঘাত থাকবে না।

ডাচমন্ত্রী বলেন, ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে বাংলাদেশের সঙ্গে ডাচ সহযোগিতার নতুন দিক উন্মোচন করবে। ডাচ সরকার পার্বত্য এলাকার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সেখানকার উন্নয়নের জন্য ঢাকাকে সাহায্য করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। এ জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের আগ্রহও রয়েছে।

তিনি গত ২০ ডিসেম্বর এক সপ্তাহের সরকারি সফরে ঢাকা আসেন। সফরশেষে গতকাল শুক্রবার বিকেলে হোটেল শেরাটনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, সচিব মোহাম্মদ আহসান আলী সরকার এবং বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ডিক বি ডেন হাসসহ মন্ত্রীর সফরসঙ্গীরা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে নারী গণসমাবেশ

অশুভ শক্তির তৎপরতা বন্ধে নারী

সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আয়োজিত নারী গণসমাবেশে বক্তারা বলেছেন, শত্রুতা, হানাহানি, সশস্ত্র সংঘর্ষ অবসানের জন্য দেশ যখন একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের দিকে এগুচ্ছে তখন একটি বিশেষ মহল সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভ্রান্তি ও সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টির যে উস্কানি দিচ্ছে, তা খুবই দুঃখজনক। তারা পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তির তৎপরতা বন্ধে এগিয়ে আসতে দেশের নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল শনিবার বিকেল ৩টায় পল্টন ময়দানে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির সপক্ষে নারী গণসমাবেশ প্রস্তুতি কমিটি আয়োজিত এক নারী গণসমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন। নারী আন্দোলনের নেত্রী অ্যারমা গুণের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল, নারী নেত্রী খুশী কবির, আয়শা খানম, রোকেয়া কবীর প্রমুখ। কবি সুফিয়া কামাল ও ড. নীলিমা ইব্রাহিম অসুস্থ থাকায় সুফিয়া কামালের বাণী ও নীলিমা ইব্রাহিমের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান যথাক্রমে লায়লা আরজু মান্নান বানু ও শাহনাজ সুমী।

কবি সুফিয়া কামাল তার বাণীতে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের এই শান্তিচুক্তি নিয়ে নানাজনের নানারূপ আলোচনা হচ্ছে। বিরোধী দলের নেত্রী জঘন্যভাবে এই চুক্তির বিরোধিতা করছেন। আমার মতে এই শান্তিচুক্তি একটি শুভ উদ্যোগ।

নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মায়েরা, বোনেরা শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা কর। দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে এটাই আমার কামনা।

নারী নেত্রী খুশী কবির বলেন, '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে হত্যার পর থেকেই পার্বত্য অঞ্চলে সমস্যার সূচনা ঘটে। শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় এখন প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এতে বিপন্ন হবে কিনা। এখন আমাদের দায়িত্ব শান্তিচুক্তি বাতিলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

আয়েশা খানম বলেন, শান্তিচুক্তি সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বলিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক চুক্তি এই

শান্তিচুক্তি। এখন বলা হচ্ছে এ চুক্তি শাসনতন্ত্রবিরোধী। সেই '৪৭ থেকে '৯৬ পর্যন্ত যখনই কোনো ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তখনই রব উঠেছে— ইসলাম গেলো, দেশ গেলো।

পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি পূর্বাপর ব্যাখ্যা করে রোকেয়া কবীর বলেন, বিরোধী নেত্রী কি বলে, আরো নারী সেখানে ধর্ষিত হোক? অস্ত্র ব্যবসা চলুক? কাঠের ব্যবসা করে কিছু লোক টাকার পাহাড় গড়ুক? অশান্তি চলতেই থাকুক?

জামাতের সাধারণ সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি বলেছেন, নারী নেতৃত্ব হারাম। এখন কিভাবে খালেদা জিয়ার সঙ্গে বসে আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন?

ভোরের কাগজ

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তির অভিযাত্রার শেষ দিনে

বান্দরবানে বিশাল মিছিল

বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, বান্দরবান থেকে: পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রীতির পরিবেশে গতকাল শনিবার বান্দরবানে এক বিশাল শান্তি মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির অভিযাত্রার শেষ দিন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীরা বান্দরবানে এসে পৌছলে শান্তিকামী হাজার হাজার নারীপুরুষ ভেদাভেদ ভুলে 'পাহাড়ি-বাঙালি ভাই ভাই, এক সাথে থাকতে চাই' স্লোগান তুলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে অংশ নিতে রাস্তায় নেমে আসে।

সাংসদ বীর বাহাদুরের নেতৃত্বে শান্তি মিছিল শেষে ঐতিহাসিক রাজবাড়ি মাঠে এক সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী যাকেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতা হাসান ইমাম, শাহরিয়ার কবির, গোলাম কুদ্দুস, আফজাল হোসেন, হাসান আরীফ, সাংসদ বীর বাহাদুর, স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান খোয়ায়চ প্রু মাস্টার প্রমুখ।

আলোচনা শেষে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের শিল্পী ও স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দীন ইউসুফ গতকাল লামা ও আলীকদম থানা সফর করেন। তিনি শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং আলীকদম থানার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন।

ভোরের কাগজ

৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি : অযৌক্তিক বিরোধিতা

-এস এস চাকমা

দীর্ঘ একুশ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে গত ২ ডিসেম্বর '৯৭ তারিখে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বধিপ্রিয় লারমা এবং সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এখন চুক্তিটি যাতে বাস্তবায়ন করা না যায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হয় সেজন্য কয়েকটি দল উঠে-পড়ে লেগেছে। যার মধ্যে রয়েছে বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টির একটি অংশসহ আরো কয়েকটি ছোটখাটো দল। তারা ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম শহরসহ সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে হরতাল অবরোধের কর্মসূচি নিয়েছে।

বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ হলো, শান্তিচুক্তিটি সংবিধানবিরোধী এবং উপজাতিদের জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি এবং ঐ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন উপজাতি মন্ত্রী নিয়োগ সংবিধান-পরিপন্থী। যদিও তারা এই চুক্তিটিকে সংবিধানবিরোধী বলছে কিন্তু তারা কোর্টের আশ্রয় নিতে অনুৎসাহী এবং এ ব্যাপারে তারা এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তাদের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উপজাতিদের মধ্য হতে উপদেষ্টা নিয়োগ নতুন কিছু না। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইউব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে জেনারেল আজম খানকে এই পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। জেনারেল আজম গভর্নরের দায়িত্ব নিয়েই ১২ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। ঐ ১২ সদস্যের মধ্যে ২ জন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক এবং তারা ছিলেন— কে কে রায় এবং বোমাং চিফ মং শু প্রু চৌধুরী। পরবর্তীকালে বিডি মেম্বারদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের পরে যখন মোনায়েম খান গভর্নর হন তখন অং শু প্রু চৌধুরীকে আবার মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ডাঃ মালেকের মন্ত্রিসভায় অং শু প্রু চৌধুরী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে বিচারপতি সায়েম যখন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন তখন রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। রাজমাতা বিনীতা রায় জেনারেল জিয়ার সময়ও কিছুদিনের জন্য উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের পরে জেনারেল জিয়া যখন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন অং শু প্রু চৌধুরীকে প্রথমমন্ত্রী এবং সুবিমল দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক

সহকারী উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি সান্তারের সময়েও অং ও গু চৌধুরী তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিলেন।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত রিফুজি এসোসিয়েশনের সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে বিনয় কুমার দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক তার মন্ত্রী এবং উপদেষ্টা হন। বিনয় কুমার দেওয়ানের পরামর্শে বিশেষ কার্যাদি বিভাগ গঠন করা হয়। তাকে বিশেষ কার্যাদি বিভাগের দায়িত্ব দেওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন না করে ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের আনার জন্য আগরতলা যেতে রাজি না হলে বিনয় কুমার দেওয়ানকে পদত্যাগ করতে বলা হয় এবং তিনি পদত্যাগ করে রাঙ্গামাটি চলে যান। কাজেই পাকিস্তান আমল হতে ব্যতিক্রম ছাড়া সব সরকারের আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে মন্ত্রী অথবা উপদেষ্টা নিয়োগ করা হতো। বিশেষ করে জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে থেকে একজনকে নিয়োগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে, কোনো দেশে কোনো বিশেষ এলাকার জন্য মন্ত্রী নিয়োগ কোনো নতুন বিষয় নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে সেখানে কাশ্মির এবং উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী রয়েছে এবং এসব মন্ত্রীরা ঐ এলাকারই মানুষ। এমন কি যুক্তরাজ্যেও স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড বিষয়ক মন্ত্রী আছেন। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াতেও আদিবাসী এবং অঞ্চল বিষয়ক মন্ত্রণালয় রয়েছে।

বিএনপি এবং তার বর্তমান মিত্র জামাতসহ আরো কিছু ডানপন্থী ক্ষুদ্র দলগুলো, এমন কি বর্তমানে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত একটি সাপ্তাহিক শান্তিবাহিনীর সঙ্গে কেন গোপনে আলোচনা করা হলো, চুক্তি হওয়ার আগে কেন পার্লামেন্টে আলোচনা হলো না ইত্যাদি নানা বিষয়ে অভিযোগ তুলছে। গত সপ্তাহে সাপ্তাহিকটি আরো অভিযোগ করেছে যে, ব্রিটেনে লেবার পার্টি নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে তারা স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসকে স্বায়ত্তশাসন এবং সেইসঙ্গে নিজেদের পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার অধিকার দেবে। আওয়ামী লীগের তুলনায় ডাবল ভোট পেয়েও এবং পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে জয়ী হওয়ার পরও লেবার পার্টি তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়নি। বরং স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার ব্যাপারে তারা গণভোট বা রেফারেন্ডামের আয়োজন করেছে। কাজেই সাপ্তাহিকটির মতে চুক্তি সম্পাদনের আগে আওয়ামী লীগের উচিত ছিল দেশে রেফারেন্ডামের আয়োজন করা।

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোন গোপন আলোচনার ফলে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি হঠাৎ করে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলো এবং কেনই বা বর্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার হঠাৎ করে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি এবং রাজনৈতিক সংগঠন সিনফিনের নেতা, যুক্ত আয়ারল্যান্ডের প্রবক্তা জেরি এডামস-এর সঙ্গে তার নিজের বাসভবনে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমস্যাটি সমাধানের জন্য বৈঠক করলেন, তা কখনোই নিউজ মিডিয়ার কাছে প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি পার্লামেন্টকেও জানানো হয়নি। বিরোধী দলও এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করেনি। টনি ব্লেয়ার তার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসবাসীরা আসলেই স্বায়ত্তশাসন চায় কিনা তা যাচাই করার জন্য সেখানে গণভোটের ব্যবস্থা করেছেন। একইভাবে বাংলাদেশেও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধান করবে এবং সেই লক্ষ্যে শেখ হাসিনা শান্তিচুক্তি করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন।

এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, আওয়ামী লীগের আগেই বিএনপি শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে মন্ত্রী অলি আহমেদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে মোট ৭ বার বৈঠক করে। এছাড়া তখনকার সাংসদ রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বেও একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। এই সাব কমিটি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ৬ বার বৈঠক করে। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে এই কমিটিগুলোর সব আলোচনাই গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই আলোচনা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ কোনোদিন প্রকাশ করা হয়নি। এমন কি সংসদকেও জানানো হয়নি। আওয়ামী লীগও বিএনপির পথ অনুসরণ করে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে, যেখানে বিএনপির দুজন সাংসদকেও রাখা হয়েছিল। একইভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনাসমূহ নিউজ মিডিয়ার কাছে তেমনভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে বিএনপির সঙ্গে শান্তিবাহিনীর আলোচনার কিছু কিছু অংশ এখন প্রকাশিত হচ্ছে। ১৩ ডিসেম্বর '৯৭ তারিখে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে দিনব্যাপী পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে যে গোল টেবিলে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সাবেক সাংসদ এবং তখনকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত সংসদীয় কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেন তা ১৪ ডিসেম্বর তারিখে 'ভোরের কাগজ'-এ প্রকাশিত হয়। তার বক্তব্য অনুযায়ী সেই সময় শান্তিবাহিনী এবং বিএনপি গঠিত সংসদীয় কমিটির মধ্যে খসড়া শান্তিচুক্তি হয়েছিল। আওয়ামী

লীগ তখনই সংসদ বয়কট না করলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যেতো এবং শান্তিবাহিনী বর্তমান চুক্তির তুলনায় আরো অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পেতো। এতোদিন এই আলোচনা সংক্রান্ত কোনো তথ্যই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, এখন রাশেদ খান মেননের মাধ্যমে আমরা কিছু জানতে পারলাম। সেজন্য মেননকে অনেক ধন্যবাদ।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ভারত সরকার মিজোরাম ও দার্জিলিঙের গুর্খা সমস্যা, অসম গণপরিষদের সঙ্গে অসম সমস্যা, টিএনডির সঙ্গে ত্রিপুরা সমস্যা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্বাধিকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে গোপন আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধান করেছে অথবা সমাধানের চেষ্টা করছে। ভারত সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য কোনো সংসদীয় কমিটিও গঠন করেনি। এখনো নাগা স্বাধিকার আন্দোলনকারী এবং উলফার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোপন আলোচনা চলছে। এইভাবে গোপন আলোচনার মাধ্যমে ফিলিপাইনে মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জের মরো বিদ্রোহীদের সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে। আসলে বর্তমানে স্বাধিকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারের প্রকাশ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না, বা গণভোটের ব্যবস্থাও করা হয় না। সকল ক্ষেত্রেই গোপন আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। শুধু এ দেশে শেখ হাসিনা বিএনপির পথ অনুসরণ করে পার্বত্য সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জনপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় কমিটি গঠন করেছেন।

বিএনপির এই চুক্তি-বিরোধিতা করার পিছনে তাই তেমন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আসলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো একের পর এক পালনে সফল হওয়ায়— যেমন ফারাক্কা বাঁধ সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান এবং দেশে বৈদেশিক পুঁজিবাজারের প্রসার হওয়া, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাফল্য বিএনপির জনপ্রিয়তায় আঘাত হেনেছে। এই কারণে নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি পরবর্তীকালে ক্ষমতায় ফিরে আসার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমানে বিএনপি দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, যেন আওয়ামী লীগকে দেশ শাসনে অযোগ্য প্রমাণিত করে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যায়।

তাই আওয়ামী লীগ যেন কোনোভাবেই তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারে, এই কর্মসূচি নিয়ে বিএনপি মাঠে নেমেছে, যা হয়তো দেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি এনে দিতে পারে। এ কারণে বর্তমানে তেমন কোনো ইস্যু হাতে না পেয়ে বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি নিয়ে জল খোলা করার

জন্য মাঠে নেমেছে, ইতিমধ্যেই যার প্রকাশ ঘটেছে হরতাল, লাগাতার অবরোধের মাধ্যমে। হয়তো পরবর্তীকালে যা গিয়ে পৌছাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। বিএনপি, জামাত এবং তাদের সমগোত্রীয় দলের কর্মকাণ্ডই এই ধারণা ধীরে ধীরে বদ্ধমূল করে দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় বিশৃংখলা আনার জন্য চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরকেও অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দেশের রাজস্ব আদায় যেন কম হয়, বৈদেশিক রপ্তানি যেন বন্ধ হয়ে যায়, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যেন চলে যায়, আমদানিও যেন বন্ধ হয়ে যায়, এই উদ্দেশ্যেও চট্টগ্রামে বিশৃংখল পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আশা করা যায় তাদের প্রতিহত করার জন্য সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিকরা এগিয়ে আসবেন।

এস এস চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

ভোরের কাগজ

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি পরিষদের আলোচনা সভায় বক্তারা

শান্তিচুক্তি আলোচনা হতে হবে সংসদেই

গোলটেবিল কিংবা বিশেষ স্থানে নয়

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে এক আলোচনা সভায় বক্তারা চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদকেই বেছে নেওয়ার কথা বলেছেন। তারা বলেন, গোলটেবিল কিংবা বিশেষ স্থানে আলোচনা হলে সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর আঘাত আসতে পারে।

বাংলাদেশ শান্তি পরিষদ গতকাল মঙ্গলবার নগরীর একটি মিলনায়তনে ‘পার্বত্য চুক্তি : শান্তি ও উন্নয়নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ’ শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আলী আকসাদ।

পানিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে শান্তিতে বাস করার জন্যই এই চুক্তি হয়েছে। অস্থিরতা থাকলে গণতন্ত্র আশঙ্কামুক্ত হয় না। উন্নয়নের জন্য শান্তি অপরিহার্য। তিনি বলেন, সংসদের আগামী অধিবেশনে এই চুক্তি প্রতিস্থাপিত হবে। গোলটেবিল বা বিশেষ স্থানে আলোচনা ক্ষতিকর। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি এতে আঘাত আসতে পারে।

বেসরকারি বিমান চলাচল পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর যে লক্ষ্য সামনে রেখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে

বলেন, সংবিধানের আওতায় সার্বভৌমত্বের ওপর আস্থা রেখে পার্বত্য অঞ্চলে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন সাধন করাই হলো চুক্তির মূল লক্ষ্য।

তিনি বলেন, বিএনপি পার্বত্য অঞ্চলকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দিতে চেয়েছিল। বিএনপির ঐ প্রস্তাবের প্রমাণাদি সরকারের কাছে রয়েছে, সময়মতো তা প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, প্রতিদিন ঐ অঞ্চলে এক কোটি টাকা খরচ হতো, কিন্তু উন্নয়ন হয়নি। এখন থেকে উন্নয়ন হবে।

তিনি পার্বত্য অঞ্চল থেকে নিরাপত্তাবাহিনী প্রত্যাহার সম্পর্কিত অপপ্রচারের জবাবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, একজন সদস্যও যদি প্রত্যাহার করার প্রমাণ কেউ দিতে পারে তাহলে সরকার থেকে পদত্যাগ করবো।

আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে আইন প্রণয়ন করলে সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে— এ ধরনের বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, এতে বরং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তিনি এই চুক্তিকে পৃথিবীর এ জাতীয় অন্যান্য চুক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মন্তব্য করেন।

বিচারপতি কে এম সোবহান বলেন, পার্বত্য চুক্তির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদি বিষয়ে যদি আলোচনা হতে হয় তাহলে সংসদেই হতে হবে। নয়তো গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হলে জনগণের অংশ হিসেবে আমাদেরকেও সেখানে রাখতে হবে।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, আমরা ধরেই নেই পার্বত্য অঞ্চল দেশের অন্যান্য জেলাগুলোর মতোই। কিন্তু বাস্তবতা হলো পার্বত্যবাসী আমাদের নিকট প্রতিবেশী, বহুকাল ধরে তারা বিচ্ছিন্ন। তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলেই তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ঘটবে।

পার্বত্য অঞ্চলে জমি কেনা যাবে না— এ ধরনের প্রচারণার জবাবে তিনি বলেন, ঐ অঞ্চলে জমি কিনতে গেলে আগেও অনুমোদন লাগতো, এখনো লাগবে। আগে অনুমোদন নেওয়া হতো বিভাগীয় কমিশনারের কাছ থেকে এখন লাগবে জনপ্রতিনিধির অনুমোদন। কিন্তু মানুষ মনে করে আমলাদের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া মানেই কেন্দ্রীয় শাসন।

তিনি বলেন, এই চুক্তির এটি একটি ভালো দিক যে আগে শুধু বাঙালিরাই জমি কেনার অনুমোদন নিতেন, এখন সকলেরই ঐ অনুমোদন নিতে হবে।

ব্যারিস্টার আমীর পার্বত্য চুক্তির বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সরকার ও বিরোধীদলের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন।

এতে আরো আলোচনা করেন অধ্যাপক এম এম আকাশ, ন্যাপ নেতা আমিনা আহমেদ ও কমিউনিস্ট কেন্দ্রের অজয় রায় প্রমুখ।

ভোরের কাগজ

২ জানুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণের স্থান-কাল নির্ধারণে এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৈঠক

শান্তিবাহিনী সদস্যদের তালিকা ও

অস্ত্র গোলাবারুদের হিসাব চেয়ে

হংসধ্বজ চাকমার জরুরি চিঠি

খাগড়াছড়ি থেকে আজিমউল হক ও রাঙ্গামাটি থেকে হরি কিশোর চাকমা: পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সদস্যদের তালিকা এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের হিসাব চেয়ে জনসংহতি সমিতিতে তাগাদা দিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা। এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহের নেতাকর্মীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রস্ততি নিতে শুরু করেছে বলে জানা গেছে। চলতি জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের যেকোনো দিন সরকার ও জনসংহতি সমিতির বৈঠকে অস্ত্র সমর্পণের স্থান ও সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র এ তথ্য জানায়।

হংসধ্বজ চাকমার লিখিত তাগাদাপত্র গতকাল দুদকছড়িতে জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানো হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুযায়ী চুক্তির ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনী সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র ও গোলাবারুদের হিসাব এবং অস্ত্র সংবরণের তারিখ নির্ধারণের কথা ছিল। কিন্তু শান্তিচুক্তির পর ৩০ দিন অতিবাহিত হলেও জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক এ জরুরি পত্র লিখেছেন বলে জানা গেছে।

গতকাল হংসধ্বজ চাকমা এ প্রতিবেদককে বলেন, আশা করছি ২/১ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির জবাব পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, চুক্তি অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে তাদের কাছ থেকে তালিকা পাওয়ার কথা। তাই তিনি সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র ও গোলাবারুদের হিসাব এবং অস্ত্র সংবরণের দিনক্ষণ এবং চুক্তি বাস্তবায়নে তদারকি কমিটি গঠনের লক্ষ্যে তাদের মতামত চেয়ে এ পত্র লিখেছেন, যাতে সরকার ও সমিতির মধ্যে বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে হংসধ্বজ চাকমা জানান, জনসংহতি সমিতি ইতিমধ্যে চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ শুরু করেছে, তাদের অস্ত্র জমা নেওয়া শেষ করেছে এবং চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির একজন বিশেষ পত্রবাহক জানান, গত ২ ডিসেম্বর সরকারের সঙ্গে ‘পার্বত্য শান্তিচুক্তি’ স্বাক্ষরের পরপরই জনসংহতি

সমিতি সংশ্লিষ্ট ‘কমান্ড পোস্ট’গুলো থেকে গোলাবারুদ ও সদস্য-সদস্যদের নামের তালিকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাতে শুরু করে। তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনসমূহের নেতাকর্মীরা তিন থেকে চার গ্রুপে বিভক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। সরকার পক্ষ ‘কোম্পানি গ্রুপ’ অর্থাৎ সশস্ত্র ক্যাডারদের প্রথমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী বলে জানা গেছে। তবে জনসংহতি সমিতি ‘কমান্ড পোস্ট’ অনুযায়ী অস্ত্রসমর্পণে আগ্রহী। জনসংহতি সমিতি বর্তমানে তিনটি কমান্ড পোস্টের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। পোস্টগুলো হচ্ছে— এসপিএল কমান্ড পোস্ট, ‘এ’ কমান্ড পোস্ট ও ‘বি’ কমান্ড পোস্ট।

সূত্র জানায়, সরকারের কাছে প্রথম অস্ত্রসমর্পণ করবেন ‘বি’ কমান্ড পোস্টের নেতাকর্মীরা। এ গ্রুপের নেতৃত্বে থাকবেন সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির শান্তি আলোচনার আলোচকদলের অন্যতম সদস্য রক্তোৎপল ত্রিপুরা ও ‘বি’ কমান্ড পোস্টের কমান্ডার মেজর পেলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে ‘বি’ কমান্ড পোস্ট। এর আওতায় রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, রাজস্থলী, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি থানার সম্পূর্ণ অংশ, রাঙ্গামাটি সদর ও কাপ্তাই থানার কিছু অংশ এবং বান্দরবান জেলার সম্পূর্ণ এলাকা। জনসংহতি সমিতি কর্ণফুলী নদীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণ করেছে।

সূত্রমতে, অস্ত্রসমর্পণের প্রস্তুতি হিসেবে জনসংহতি সমিতি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত এলাকা গগুছড়া ও পদাছড়া এলাকায় ট্রানজিট ক্যাম্প তৈরি করেছে। ‘বি’ কমান্ড পোস্টের সকল নেতাকর্মী সেসব ট্রানজিট ক্যাম্পে জড়ো হতে শুরু করেছেন। আগামী ৭ জানুয়ারি সেখানেই শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হবে। উল্লেখ্য, সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি ‘শান্তিবাহিনী’ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এদিকে, আগামী ৮ থেকে ১৪ জানুয়ারির মধ্যে যেকোনো একদিন সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আরো একদফা বৈঠক হবে বলে জানা গেছে। সে বৈঠকেই জনসংহতি সমিতি সদস্যদের নামের তালিকা এবং গোলাবারুদের হিসাব সরকারকে প্রদান করবে। এছাড়াও অস্ত্রসমর্পণের সময়সীমা এবং স্থান নির্ধারণ করা হবে উভয়পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়িতে অস্ত্রসমর্পণ করতে আগ্রহী। সে হিসেবে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামেই অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান হতে পারে বলে সূত্র উল্লেখ করেন।

ভোরের কাগজ

২ জানুয়ারি ১৯৯৮

রা.বি আইবিএস-এর আয়োজনে সেমিনারে বক্তারা

পার্বত্য শান্তিচুক্তি সংবিধানের

ভিতরেই স্বাক্ষরিত হয়েছে

আনু মোস্তফা/ ফারুক হোসেন চৌধুরী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ’ এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে বিশিষ্ট বক্তারা পার্বত্য শান্তিচুক্তি সংবিধানের ভিতরেই স্বাক্ষরিত হয়েছে মন্তব্য করেন। তবে সরকার ও বিরোধীপক্ষের সমঝোতার আলোকে চুক্তি সংশোধনের সুযোগও রয়েছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভাবনে গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ‘পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি সাংবিধানিক বিশ্লেষণ’ শীর্ষক সেমিনারে রাবি উপাচার্য প্রফেসর আঃ খালেক বলেন, ‘পঁচাত্তরে পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান বাঙালি জাতিকে বাংলাদেশীতে রূপান্তরিত করেছিলেন, এখন তারাই আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী থেকে বাঙালি হয়ে গেছে। জিয়া, এরশাদ, খালেদাও পার্বত্য সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। আওয়ামী লীগের সফলতা তাদের চক্ষুশূল হওয়াতেই তাদের এতো লাফালাফি।

সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন প্রোভিসি সাইদুর রহমান খান, প্রফেসর গোলাম মোর্শেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জুলফিকার মতিন, প্রফেসর শামসুর রহমান, আবদুল কাদির ভূঁইয়া প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আবদুল ফজল হক। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইবিএসএর পরিচালক আতফুল হাই শিবলী।

প্রোভিসি সাইদুর রহমান খান বলেন, শান্তিচুক্তি সংবিধানের মধ্য থেকেই হয়েছে। পার্বত্য এলাকা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এই সম্পদ এখন সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে পার্বত্য এলাকাসহ গোটা দেশের উন্নতি সম্ভব হবে। তিনি বলেন, শান্তি ও উন্নয়ন এ দুটি সমার্থক। তবে প্রয়োজনে চুক্তিতে সংশোধনী আনা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা থাকতে হবে।

গোলাম মোর্শেদ বলেন, চট্টগ্রামের অশান্ত অবস্থা কি স্বার্থে এতোদিন জইয়ে রাখা হয়েছিল তা বোধগম্য নয়।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, রাজনৈতিক কারণে শান্তি চুক্তির পক্ষ বিপক্ষ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রাথমিক জুলফিকার মতিন বলেন, সামরিক শক্তি দিয়ে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। সামরিক শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

প্রফেসর শামসুর রহমান বলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে দিয়ে সরকারের সাংবিধানিক ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে।

প্রফেসর আবদুল কাদির ভূঁইয়া বলেন, সম্ভব লারমা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করার কে? তিনি নির্ধারিত কোনো জনপ্রতিনিধি নন তাই এই চুক্তির মাধ্যমে সংবিধান ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মূল প্রবন্ধে বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ আবদুল ফজল হক বলেন, জেনারেল এরশাদ এই আলোচনা শুরু করেছিলেন। এই চুক্তি মূলত জনসংহতি কমিটি ও জাতীয় কমিটির মধ্যেই সমঝোতা। চুক্তির ব্যাপারগুলো সংসদীয় আইন দ্বারা পাস করতে হবে।

ভোরের কাগজ

৪ জানুয়ারি ১৯৯৮

প্রসঙ্গ সদস্য তালিকা, অস্ত্রের হিসাব ও সমর্পণের দিন নির্ধারণ

১৫ জানুয়ারি বৈঠকের প্রস্তাব

দিয়েছে জনসংহতি সমিতি

আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের তালিকা ও অস্ত্র-গোলাবারুদদের বিবরণী সরকারের কাছে দাখিল করা এবং অস্ত্র সমর্পণের দিন-তারিখ ও স্থান নির্ধারণের জন্য আগামী ১৫ জানুয়ারি সরকারকে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দিয়েছে জনসংহতি সমিতি।

গতকাল যোগাযোগ কমিটি আহ্বায়কের কাছে লেখা জনসংহতি সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতা উষাতন তালুকদার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা চিঠিটি সরকারকে পৌঁছে দিয়েছেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ছাড়া সামরিক বা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরৎ নেওয়ার লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণের বিষয়টি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈঠকটি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের সদস্যদের দুদকছড়ি থেকে হেলিকপ্টারে করে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে আনার ব্যবস্থা করা এবং এ সময় জাতীয় কমিটির

একজন সদস্য থাকা কাম্য বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়। পত্রে আগের বৈঠকের মতো এ বৈঠকেও নিরাপত্তার বিষয়ে যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারি প্রস্তাবিত বৈঠকের বিষয়ে সরকার রাজি আছে কিনা তা আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে জনসংহতি সমিতিতে অবহিত করণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পরপর ৭ দফা আলোচনার পর গত ২ ডিসেম্বর ঢাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতি পার্বত্য সমস্যা সমাধানে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। শান্তিচুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তির দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতি তাদের সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র-গোলাবারুদদের হিসাব এবং অস্ত্র সংবরণ করার দিন-তারিখ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। কিন্তু চুক্তির ৩০ দিন অতিবাহিত হলেও সমিতির পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় গত ১ জানুয়ারি যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এক জরুরি পত্রে সমিতিতে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেন। তারই প্রেক্ষিতে সমিতি গতকাল এ প্রস্তাবপত্র পাঠিয়েছে।

ভোরের কাগজ

৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

১২ বা ১৩ জানুয়ারি বৈঠক করার প্রস্তাব দিয়ে

জনসংহতির কাছে সরকারের চিঠি

অস্ত্রসমর্পণ, সাধারণ ক্ষমা ও নিরাপত্তা

বাহিনীর ক্যাম্প গুলানো নিয়ে কথা হবে

সানউল্লাহ: আগামী সপ্তাহে ১২ অথবা ১৩ তারিখ বৈঠকে বসার জন্য জনসংহতি সমিতিতে প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। এই বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তার সশস্ত্র সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনীর সদস্য এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র ও গোলাবারুদদের তালিকা সরকারের কাছে জমা দেবে এবং তাদের অস্ত্র সমর্পণের দিনক্ষণ ঠিক হবে। তবে আসন্ন ঈদের আগে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, জনসংহতি সমিতি ১৫ জানুয়ারি খাগড়াছড়িতে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দিয়ে দুদিন আগে সরকারকে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু একাধিক কারণে ১৪ বা ১৫ তারিখ বৈঠক সম্ভব নয় বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, আগামী ১২ বা ১৩ জানুয়ারি বৈঠকে বসার প্রস্তাব নিয়ে যোগাযোগ কমিটির কাছে চিঠি

দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে সংসদ ভবনে তাঁর কার্যালয়ে এ বিষয়ে ভোরের কাগজ প্রতিনিধির সঙ্গে কথা হয়। জনসংহতি সমিতি ১৫ জানুয়ারি বৈঠকে বসার প্রস্তাব করলেও জানা যায়, সেদিন ঢাকায় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সরকার প্রধানদের উপস্থিতিতে বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন হতে যাচ্ছে। ফলে সেদিন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। আর তার আগের দিন ১৪ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের এ বছরের প্রথম এবং শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। তাই সেদিনও সরকারি জাতীয় কমিটির সদস্যরা ব্যস্ত থাকবেন। এ কারণে সরকার ১২ বা ১৩ তারিখ বৈঠক করার প্রস্তাব দিয়েছে।

গত ২ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরের পর আসন্ন বৈঠকটি উভয়পক্ষের জন্যই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী, তা স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতি তার সশস্ত্র সদস্যদের তালিকা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী সরকারের কাছে পেশ করার কথা রয়েছে। চুক্তির এই ৪৫ দিনের মেয়াদ আগামী ১৬ জানুয়ারি অতিক্রম করবে। এবারের বৈঠকে অবশ্য জনসংহতি সমিতি তাদের লোকবল ও অস্ত্রের তালিকা পেশ করবে বলে সরকার পক্ষ আশা করছে।

পাশাপাশি এ বৈঠকে উভয়পক্ষ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের দিনক্ষণ ও স্থান ঠিক করবে। অস্ত্র সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, তাদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোও বৈঠকে আলোচনায় আসবে। এসব বিষয়ের সঙ্গে যেহেতু সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, সে কারণে এবারের বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব বা উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা অংশ নিতে পারেন বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়।

দণ্ডবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা গতরাতে ভোরের কাগজকে বলেন, অস্ত্র সমর্পণ ও সাধারণ ক্ষমার মতো বিষয়গুলো সরকারি আইন-কানুন অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা থেকে নির্বাচিত এই সাংসদ গত ৩১ ডিসেম্বর মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। শান্তিচুক্তি অনুযায়ী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যে মন্ত্রণালয় গঠন করতে যাচ্ছে তিনি তার দায়িত্ব নেবেন। এ মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়টি গঠিত হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়।

শান্তি বাহিনীর সদস্যরা একবারে সকলে, নাকি কয়েক দফায় অস্ত্র সমর্পণ করবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, তারা কয়েকটি পর্যায়ে অস্ত্র সমর্পণের চিন্তা-ভাবনা করছে। ঈদের পর প্রথম এবং আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানটি খাগড়াছড়িতে

নবনির্মিত স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকতে পারেন। অন্যদিকে সরকারি সূত্রে জানা যায়, তারা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য সবসময়ই তৈরি রয়েছেন। সরকার চাইছে যতো দ্রুত সম্ভব অস্ত্র সমর্পণ করে শান্তি বাহিনী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে ততোই চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের জন্য সুবিধা হবে। ইতিমধ্যে পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সর্বোচ্চ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেওয়া এবং চুক্তি অনুযায়ী উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।

পাশাপাশি আইন প্রণয়ন, বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলার জন্য পৃথক পৃথক জেলা পরিষদ গঠন এবং একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যাপারে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাতীয় সংসদের এবারের অধিবেশনে এসব বিল আসতে পারে বলে জানা যায়। অর্থাৎ চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার পক্ষ তাদের আন্তরিকতার নজির স্থাপন করেছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

তবে জনসংহতি সমিতির সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এবারের বৈঠকে তারা নিরাপত্তাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী সেনানিবাসগুলোর বাইরে সামরিক, আধা সামরিক বাহিনী, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলসহ নিরাপত্তাবাহিনীর ৫৫০টি অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে। শান্তি বাহিনীর বিদ্রোহী তৎপরতা দমনে এসব ক্যাম্প সত্তরের দশক থেকে পর্যায়ক্রমে স্থাপন করা হয়েছিল। শান্তিচুক্তি অনুযায়ী অস্ত্র সমর্পণের পর এসব অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলার কথা রয়েছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে, জনসংহতি সমিতির সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তরক্ষী আধা সামরিক বাহিনী বিডিআর ক্যাম্পসমূহ ও স্থায়ী ৬টি সেনানিবাস বাদে বাকি সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করে সেনানিবাসে ফিরিয়ে আনা হবে।

ভোরের কাগজ

৭ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন

সরকার ও জনসংহতি সমিতির

বৈঠক ১৬ জানুয়ারি খাগড়াছড়িতে

হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে : পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ১৬ জানুয়ারি সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে উভয়পক্ষের সম্মতি পাওয়া গেছে বলে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানিয়েছেন।

গত ২ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী আগামী ১৬ জানুয়ারির মধ্যে জনসংহতি সমিতি তার অঙ্গসংগঠনসমূহের সদস্যদের নামের তালিকা এবং গোলাবারুদের হিসাব সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। গত ১ জানুয়ারি সরকার পক্ষের পরামর্শে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জনসংহতি সমিতির কাছে তাগাদাপত্র পাঠান। জনসংহতি সমিতি আগামী ১৪ অথবা ১৫ জানুয়ারি বৈঠকে বসার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু ঐ তারিখে বৈঠকে বসা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে সরকার পক্ষ ১২ অথবা ১৩ জানুয়ারি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেয়। গতকাল মঙ্গলবার ১৬ জানুয়ারি বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে হংসধ্বজ চাকমার কাছে চিঠি পাঠায় জনসংহতি সমিতি। চিঠি পাওয়ার পরপরই হংসধ্বজ চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে সম্মতি নেন। আজ বুধবার সরকার ও জনসংহতি সমিতিতে ১৬ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হবে বলে হংসধ্বজ চাকমা জানান।

গত ২ ডিসেম্বর '৯৭ স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এ বৈঠকে শান্তিবাহিনীর সদস্য ও অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা সরকারকে প্রদান ছাড়াও তাদের অস্ত্র সমর্পণের সময় ও স্থান নির্ধারণ, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে।

ভোরের কাগজ

৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রশ্নে

গোলটেবিল বৈঠক ডাকবেন না রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ গতকাল বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বিষয়ে তিনি নিজে কোনো গোলটেবিল বৈঠক ডাকবেন না। গত ২১ ডিসেম্বর বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শান্তিচুক্তি নিয়ে একটি গোলটেবিল আয়োজন করার জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন। ইউএনবি, বাসস।

গতকাল বঙ্গবন্ধু থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি গোলটেবিল আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে তার এই অস্বীকার ব্যক্ত করেন। তবে বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি তাঁর এ মতও পুনর্ব্যক্ত করেন যে, এটি একটি সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন জাতীয় ইস্যু যা রাষ্ট্রপতিকে কোনো বিতর্কে না জড়িয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পার্লামেন্টের ভিতরে-বাইরে আলোচিত হতে পারে।

এর আগে গতকাল সকালে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে খালেদা জিয়ার সাক্ষাতের পরদিন বঙ্গবন্ধুর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে চান। এতে জানানো হয়, তিনি পরে তার সিদ্ধান্ত দেবেন।

ভোরের কাগজ

৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির

বৈঠক ১৫ জানুয়ারি পুনর্নির্ধারিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যকার প্রস্তাবিত বৈঠকের তারিখ ১৫ জানুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতি এর আগে বৈঠকটি ১৬ জানুয়ারি তারিখে করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। কিন্তু শান্তিচুক্তিতে উল্লেখিত শর্তের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে বৈঠকের তারিখ একদিন এগিয়ে আনা হয়। ইউএনবি।

খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠেয় এ বৈঠকে শান্তিচুক্তির শর্তানুযায়ী শান্তিবাহিনীর গেরিলাদের অস্ত্র সমর্পণের প্রক্রিয়াটি আলোচিত হবে। শর্তমতো গত ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের তাদের যাবতীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা সরকারের কাছে জমা দেওয়ার কথা ছিল। বৈঠকটি ১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হলে নির্ধারিত ঐ ৪৫ দিনের মেয়াদ পেরিয়ে যায়। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বলেছেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে উভয়পক্ষ এখন ১৫ জানুয়ারি বৈঠকটি আয়োজনে সম্মত হয়েছে। বৈঠকে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের তারিখ, সময় এবং স্থানও নির্ধারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভোরের কাগজ

১২ জানুয়ারি ১৯৯৮

বৃহস্পতিবারের খাগড়াছড়ি বৈঠক একাধিক দিন চলতে পারে

শান্তিবাহিনী পাঁচ ভাগে অস্ত্র সমর্পণ

চায়, সরকার চায় একবারে সকলের

সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা/আজিম উল হক: জনসংহতি সমিতির সঙ্গে খাগড়াছড়িতে সরকারের আগামী বৃহস্পতিবারের আলোচনা একাধিক দিন চলতে পারে। এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তাদের সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর

সদস্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা সরকারের কাছে জমা দেবে। পাশাপাশি শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ, বিদ্রোহীদের প্রতি সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পরিস্থিতি বৈঠকে আলোচনা হবে।

এদিকে, গত ৮ ও ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির নীতিনির্ধারণী বৈঠকে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের একাধিক দিনে অস্ত্র সমর্পণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়। বৈঠকে অস্ত্র সমর্পণ ছাড়াও জনসংহতি সমিতির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, গত ৭ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামের গণ্ডাছড়া এলাকায় শান্তিবাহিনীর ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। এর পরের দুদিন একই স্থানে জনসংহতি সমিতির নীতিনির্ধারণী বৈঠক হয়।

জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে তাদের সকল সদস্য একমত হয়েছেন। নীতিনির্ধারণী বৈঠকে ঠিক হয়েছে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর জনসংহতি সমিতির সদস্যরা নিজের ইচ্ছামতো পেশা বেছে নিতে পারবেন। তবে জনসংহতি সমিতি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নীতিনির্ধারণী বৈঠকে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে একাধিক দিনে অস্ত্র সমর্পণের চিন্তা-ভাবনা হয়েছে বলে সূত্র জানায়। তবে এর ঝুঁটিনাটি আগামী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সরকারের সঙ্গে বৈঠকে ঠিক হবে। প্রথম ধাপের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিও জনসংহতি সমিতি চাইছে। এ ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির মাধ্যমে তারা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্য দলের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ম) লারমা শেষ দলে অস্ত্র সমর্পণ করবেন বলে জানা যায়।

সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সূত্রগুলোর ধারণা, শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২ হাজার হবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সদস্য তিন/সাড়ে তিন হাজারের বেশি হবে না। সরকারের সঙ্গে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জনসংহতি সমিতিও ধারণা দিয়েছিল তাদের সশস্ত্র সদস্য সংখ্যা ২ হাজারের বেশি নয়।

তবে ঢাকার সরকারি সূত্র জানান, সরকার চায় শান্তিবাহিনী একবারে সবাই অস্ত্র সমর্পণ করুক। কারণ অস্ত্র সমর্পণের স্পর্শকাতর বিষয়ের ওপর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের বড়ো অংশই নির্ভর করছে।

কারণে প্রয়োজনে কিছুটা সময় বেশি নিয়ে হলেও একবারে অস্ত্র সমর্পণ ভালো হবে বলে সরকার মনে করছে। তাছাড়া একাধিক দিনে অস্ত্র সমর্পণ

অনুষ্ঠানে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাসহ অন্যান্য বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। সরকার মনে করে অস্ত্র সমর্পণ দীর্ঘায়িত হলে চুক্তি বাস্তবায়ন বিশেষ করে আইন প্রণয়নের কাজ পিছিয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বিশেষ কার্যাদি বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী ও বিডিআর-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যোগ দেবেন। অস্ত্র সমর্পণ, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং এ সম্পর্কিত কাজে তাদের সংশ্লিষ্টতার কারণেই বৈঠকে তাদের উপস্থিতি করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, উপজাতীয়দের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও গঠন করা হবে। তাছাড়া শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের চিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য টার্কফোর্স এবং চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর করতে কমিটি এ মাসেই গঠন করা হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের এসব বিষয়ের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলার জন্য পৃথক ৩টি আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের কাজও সরকার করছে। তবে সংসদের চলতি অধিবেশনে এসব আইন উত্থাপিত হবে কিনা তা নিশ্চিত নয়।

জানা যায়, অস্ত্র সমর্পণের ওপর আইন প্রণয়নের কাজটি মূলত নির্ভর করছে। সে কারণে সংসদ অধিবেশন চলাকালে অস্ত্র সমর্পণ সম্পন্ন না হলে এসব আইন এবার নাও আসতে পারে। তবে সব বিষয়ই এবারের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা যায়।

জনসংহতি সমিতির নীতিনির্ধারণী বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী ‘এ’ কমান্ড পোস্টের ‘বগুড়া জেলার’ সদস্যরা প্রথম অস্ত্র সমর্পণ করবে বলে সূত্র জানিয়েছে। তাদের এই জেলায় অন্তর্ভুক্ত এলাকা হলো : রাজমাটি জেলার কাউলী, লংগদু, বন্দুকভাঙ্গা, নানিয়ারচর এবং খাগড়াছড়ি জেলার পূর্ব মহালছড়ি ও কমলছড়ি। জনসংহতি সমিতি এর আগে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে ‘বি’ কমান্ড পোস্টের সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের মূল এবং প্রধান অনুষ্ঠান করার চিন্তা করলেও এখন বিভিন্ন থানা সদরে অস্ত্র সমর্পণের পরিকল্পনা করছে।

সরকারি সূত্রে অবশ্য জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশী বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর তৎপরতা এবং নিরাপত্তার প্রশ্নটি এবারের আলোচনায় আসবে। এসব সমস্যা সমাধানে জনসংহতি সমিতির ধারণা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে সরকার আগ্রহী।

ভোরের কাগজ

১২ জানুয়ারি ১৯৯৮

সংসদে শান্তিচুক্তি আলোচনা হবে

বিরোধী দলের আইনি পরামর্শ

বিবেচনা করতে রাজি : চিফ হুইপ

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতীয় সংসদের এবারের অধিবেশনে পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। সরকারি সূত্রে জানা যায়, বিরোধী দল সংসদে যোগ না দিলেও চুক্তি সংসদে উত্থাপিত এবং আলোচনা হবে।

তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বিরোধী দলকে সংসদে যোগ দিয়ে চুক্তি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সংসদে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দল যদি চুক্তির ব্যাপারে আইনগত কোনো পরামর্শ দেয় তা সরকার বিবেচনা করতে রাজি আছে।

আগামী বুধবার জাতীয় সংসদের এ বছরের প্রথম এবং শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানা যায়, সংসদে শান্তিচুক্তি পেশ করা হবে এবং বিরোধী দল অধিবেশনে যোগ দিক বা না দিক চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও সংসদে হবে। এ ক্ষেত্রে যেদিন সংসদে শান্তিচুক্তি আলোচনা হবে সেদিন পুরো আলোচনা রেডিও-টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হতে পারে বলেও চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।

গতকাল রোববার রাতে যোগাযোগ করা হলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ভোরের কাগজকে বলেন, শান্তিচুক্তি নিয়ে সরকার সংসদে খোলামেলা আলোচনা করতে চায়। এ আলোচনায় প্রধান বিরোধী দল অংশ নেবে এমন আশাও আমরা করি। তিনি বলেন, চুক্তির আইনগত বা সাংবিধানিক কোনো কোনো বিষয়ে বিরোধী দল যদি কোনো পরামর্শ দেয় তাও বিবেচনা করতে সরকার রাজি রয়েছে।

কিন্তু চুক্তি বাতিল করলে বিরোধী দল সংসদে এ নিয়ে আলোচনা করতে রাজি রয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশিত বিএনপি নেতাদের এ বক্তব্যের ব্যাপারে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে চিফ হুইপ পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, চুক্তিই যদি বাতিল করা হয় তাহলে এ নিয়ে সংসদে আলোচনার কি আছে?

ভোরের কাগজ

১২ জানুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা অমান্য করে সাঙ্গদীর সমাবেশ

চুক্তি ঠেকাতে ১০ লাখ যুবককে প্রশিক্ষণ

দিয়ে পাহাড়ে পাঠানো হবে

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: জেলা সদরে শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে দুটি সংগঠন একই সময়ে একই স্থানে সভা আহ্বান করায় জেলা প্রশাসন গতকাল রোববার খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি করে। তবে ইসলামি ঐক্যজোট ও জামাতে ইসলামী যৌথভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল সমাবেশ করে।

শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে ইসলামি ঐক্যজোট ও জামাতে ইসলামী যৌথভাবে এবং চুক্তির সমর্থনে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ স্কুল মাঠে গতকাল সভা আহ্বান করলে প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি আশঙ্কায় সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জোট নেতৃবৃন্দ ও জামাতের সংসদীয় গ্রুপ নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঙ্গদীর নেতৃত্বে বাস কাফেলা খাগড়াছড়িতে আসতে থাকলে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ বাধা দেয়। নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ি শহরে ঢোকার পর দুপুর ১২টায় স্কুল মাঠ ও শাপলা চত্বরে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। শহরে এ সময় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ চেহী ব্রিজে বাসগুলোকে বাধা দিলে নেতৃবৃন্দ পায়ে হেঁটে তাদের সমর্থকদের নিয়ে শহরের দিকে আসতে থাকেন। অপরদিকে বিভিন্ন এলাকা থেকেও বিপুল সংখ্যক লোক শাপলা চত্বর থেকে কালো পতাকাসহ মিছিল করে কলেজ মাঠে গিয়ে জড়ো হয় এবং পরে সমাবেশ শুরু করে।

সমাবেশে দেলোয়ার হোসেন সাঙ্গদী এমপি বলেন, পাহাড়িরা পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিপুত্র নয়, পার্বত্য এলাকার সম্পদের উপর ভারতের দৃষ্টি পড়েছে, ভারত শান্তিবাহিনীকে অস্ত্র গোলা বারুদ দিয়ে বাঙালি হত্যার ইফ্রন যুগিয়েছে, সরকার শুধু চাকমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এ চুক্তি মানি না। চুক্তি করতে হবে ভারতের সঙ্গে। এ চুক্তির মাধ্যমে বাঙালিদের তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঐক্য পরিষদ নেতারা বলেন, চুক্তি ঠেকাতে ১০ লাখ যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাহাড়ে পাঠানো হবে। তারা বলেন, আরো ৫ লাখ বাঙালিকে পাহাড়ে পুনর্বাসন করতে হবে। সাঙ্গদী শান্তিচুক্তির পক্ষের পত্রিকাসমূহকে পাহাড়ে প্রবেশ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শামসুর রহমান এমপি, কাজী আনোয়ার হোসেন এমপি, আবদুল মোমেন, হাবিবুর রহমান প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বেলায়েত হোসেন।

এদিকে স্থানীয় ঐক্যপরিষদ এক বিবৃতিতে সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে ১৪৪ ধারা ভেঙে ঐক্য পরিষদের ‘স্মরণকালের বৃহত্তম সমাবেশ’ সফল করায় খাগড়াছড়ির জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে। বিবৃতিতে জেলা প্রশাসকের কার্যক্রমের তীব্র নিন্দা জানান।

অপরদিকে জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যুবলীগ নেতা রফিকের দোকান বিনা উল্ক্ষানিতে জামাত-শিবির ও বিএনপির সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর করায় তীব্র নিন্দা জানান। নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার প্রতিবাদে সমাবেশ করেন।

ভোরের কাগজ

১২ জানুয়ারি ১৯৯৮

দিঘীনালায় সমাবেশ

শান্তিচুক্তি নস্যাতির চক্রান্তে যারা লিপ্ত
তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন : কল্লরঞ্জন

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি হওয়ায় পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চুক্তির কারণে দীর্ঘ দেড় যুগের সহিংস ঘটনার অবসান ঘটেছে। একটি মহল এ শান্তিচুক্তি নস্যাৎ করার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। তাদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

গত রোববার জেলার দিঘীনালা থানায় তাকে দেওয়া এক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন। দিঘীনালা থানা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ধুজেন্দ্র লাল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য সমস্যাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করছে। শেখ হাসিনার সরকার পার্বত্য এলাকা থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করায় পাহাড়িদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এ চুক্তি পাহাড়ি-বাঙালিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সনদ। এ চুক্তিতে পার্বত্যবাসীদের অধিকার সংরক্ষণে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে তাকে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

সভায় বক্তব্য রাখেন, চিরজ্যোতি চাকমা, আওয়ামী নেতা প্রবীণ চাকমা, পেশাজীবী ঐক্য পরিষদ নেতা সৌখিন চাকমা, হাজী রফিক, অক্ষয়মণি চাকমা, শাক্যমণি চাকমা, মৃদুল সেন, ইউনুছ মিয়া ও ইলিয়াছ প্রমুখ। সভায় বক্তারা বেশকিছু দাবি উত্থাপন করলে মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে দাবি মেনে নেন এবং অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। পরে মন্ত্রীকে খাগড়াছড়ি সনাতন সমাজকল্যাণ পরিষদ, পূজা উদযাপন ও লক্ষ্মীনারায়ণ পর্ষদ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

ভোরের কাগজ

১৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়িতে গুচ্ছগ্রামবাসীদের সংবাদ সম্মেলন

পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সংসদে

আলোচনা ও ৭ দফা মেনে নেওয়ার আহ্বান

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: খাগড়াছড়ি জেলার ৭৮টি গুচ্ছগ্রামের প্রায় দেড় লক্ষাধিক বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে রক্তবরা স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য সংসদে বসে আলোচনা-আলোচনা করে সমাধান বের করার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তারা তাদের নানাবিধ সমস্যাসহ ‘গুচ্ছগ্রাম নামক বন্দিশিবির’ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সকল মহলের উদ্যোগ কামনা করেছে।

গতকাল খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবে গুচ্ছগ্রামভিত্তিক সংগঠন ‘বাঙালি কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ’ এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মাহবুবুর রহমান। নেতৃবৃন্দ বলেন, অতীতের স্বৈরাচারী সরকার পার্বত্য সমস্যা সমাধানের নামে ১৯৮৮ সালে বাধ্যতামূলকভাবে গুচ্ছগ্রাম নামের বন্দিশিবিরে ২৬ হাজার ২২০ পরিবারকে আটক করে খয়রাতি রেশনের ওপর তাদেরকে নির্ভরশীল করে তোলে। পরবর্তীকালের বিএনপি সরকারও ঐ অবস্থা বহাল রাখে। গুচ্ছগ্রামবাসী রেশনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা বাসস্থানসহ সকল প্রকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৫ হাজার বাঙালি পরিবার কার্ডবিহীন অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছে।

গুচ্ছগ্রামবাসীরা বিরাজিত পরিস্থিতির কারণে তাদের নামে কবুলিয়তভুক্ত জমি বাগানবাগিচা সহায়সম্পত্তি ফেলে গুচ্ছগ্রামে চলে আসার কারণে তাদের সকল সম্পত্তি বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তারা বলেন, অপর দিকে গুচ্ছগ্রামে বাগান-বাগিচার নামে নেওয়া কৃষি ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় তারা সার্টিফিকেট মামলায় জর্জরিত।

সংবাদ সম্মেলনে গুচ্ছগ্রামবাসীদের সাত দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে: গুচ্ছগ্রামবাসীদের বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসিত করা, সকল ঋণ মওকুফ করা, স্বনির্ভরতা অর্জনে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া, ভূমিহীন পরিবারগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি ও অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন করা, ভিডিপিতে কর্মরতদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা, বনবিভাগ ও উন্নয়ন বোর্ড গুচ্ছগ্রামবাসীর বন্দোবস্ত যে সকল ভূমি স্বত্ব হুকুম দখল করেছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া, শান্তিবাহিনী কর্তৃক আহত, নিহত সকল ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, পার্বত্য জেলা পরিষদ আঞ্চলিক

পরিষদের চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জনসংখ্যানুপাতিক হারে আসন বণ্টন করা এবং ১৯০০ সালের ম্যানুয়েল বাতিল করা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাঙালি কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের সহসভাপতি মোস্তফা হায়দার চৌধুরী, সম্পাদক আবদুল আউয়াল, এ কে এম শহীদুল ইসলাম সহসভাপতি প্রমুখ।

ভোরের কাগজ

১৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ
সকলের অধিকার নিশ্চিত করাই
সরকারের মূল লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, ‘দেশের সংবিধানে সকলের জন্য সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।’ বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ-এর ২২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সংঘের সভাপতি শ্রীমথ শুদ্ধানন্দ মহাথেরো এবং মহাসচিব অধ্যাপক প্রণব কুমার বড়ুয়া। বাসস।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সংবিধানে জনগণের ধর্মের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সকলের অধিকার নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, জাতি, বর্ণ, ধর্ম দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান হবে এবং তা ঐ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলটি তাদের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে। স্মারকলিপিতে তারা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময় দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। এই সম্মেলন দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল এবং বৌদ্ধ প্রধান দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধনকে আরো জোরদার করবে। বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিনিধিদলে অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন-জ্যোতিপাল মহাথেরো, ধর্মপাল মহাথেরো, সুগাতানন্দ মহাথেরো, বিমলেন্দু বড়ুয়া, আশুতোষ সিনহা, অধ্যাপক স্মৃতি বড়ুয়া ও মিরামোতসুদ্বি।

ভোরের কাগজ

১৬ জানুয়ারি ১৯৯৮

৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে
শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

সানাউল্লাহ/আজিম-উল হক: খাগড়াছড়ি থেকে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর প্রথম দলটি সরকারের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করবে। জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমা এ দলের নেতৃত্ব দেবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি জানান, ৯, ১৬, ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ৪ দফার শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ সম্পন্ন হবে।

গতকাল দুপুরে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অস্ত্রসমর্পণ বিষয়ে সরকারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির বৈঠকটি শুরু হয়। এর আগে সকালে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনসহ জাতীয় কমিটির সদস্যরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে খাগড়াছড়ি আসেন।

খাগড়াছড়ির ভারতীয় সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়ি থেকে সম্ভ লারমাসহ জনসংহতি সমিতির নেতাদের বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে খাগড়াছড়ি আনা হয়। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত স্থায়ী এই বৈঠকে জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যের তালিকা, তাদের নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা সরকারের কাছে পেশ করা হয়। জাতীয় কমিটি সূত্র এই তালিকা প্রাপ্তির কথা স্বীকার করলেও এর বিস্তারিত কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানান। এ ছাড়া বৈঠকে অস্ত্রসমর্পণের দিনক্ষণ, স্থান, অস্ত্র সমর্পণকারীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং শান্তিচুক্তি অনুযায়ী এসব সদস্যের পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকশেষে এক সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় কমিটি একমত হয়েছে যে, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতির সভাপতির

নেতৃত্বে তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ ৪০০ সদস্য এবং গোলাবারুদসহ ২০০ সদস্য মোট ৬০০ সদস্য খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে দুপুর ১২টায় অস্ত্রসমর্পণ করবেন। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়ি হাই স্কুল মাঠে, ২২ ফেব্রুয়ারি বরদা (দীঘিনালা) হাইস্কুল মাঠে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি দুদুকছড়িতে তাদের বাকি সকল সদস্য অস্ত্রসমর্পণ করবেন। আনুষ্ঠানিক এই বক্তব্যের পর চিফ হুইপ বা অন্য কেউ সাংবাদিকদের আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি। এ সময় সন্ত লারমাসহ জনসংহতি সমিতি ও সরকারি জাতীয় কমিটির অন্য সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গতকালের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য দণ্ডবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা, জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর এবং জনসংহতি সমিতির নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা এখানে আসেন।

এ ছাড়া বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (রাজনৈতিক) জানিবুল হক, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেনসহ সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তবে গতকালের উভয়পক্ষের আলোচনায় সরকারের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ও কল্লরঞ্জন চাকমা এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্ত লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা অংশ নেন।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে জনসংহতি সমিতির দেওয়া তালিকা অনুযায়ী এসব সদস্যের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে। এই সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই চলেবে। শান্তিচুক্তিতে বলা হয়েছে, অস্ত্রসমর্পণের পর সাধারণ ক্ষমার আওতায় যেসব শান্তিবাহিনীর সদস্য আসবেন সরকার তাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহার করে নেবেন। যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন তাদের প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা প্রদান, বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা থেকে ইতিপূর্বে নেওয়া তাদের ঋণ সুদসহ মওকুফ করাসহ তাদের পুনর্বাসনের একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হবে। তবে সাধারণ ক্ষমার নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেউ অস্ত্র জমা দানে ব্যর্থ হলে সরকার তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন।

অস্ত্রসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়ন করা সেনাক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার শুরু হবে কিনা-জানতে চাইলে জাতীয় কমিটির একজন নীতিনির্ধারণী নেতা জানান, চুক্তিতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চুক্তিতে কোনো সময়সীমা না দিয়ে বলা হয়েছে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী ৬টি সেনানিবাস বাদে সামরিক বাহিনী, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং এ লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। অস্ত্র সমর্পণকে ‘স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসা’ বোঝায় কিনা জানতে চাইলে ঐ নেতা আর কোনো মন্তব্য করেননি।

একাধিক দফায় অস্ত্রসমর্পণের পরিকল্পনা জনসংহতি সমিতির থাকলেও সরকার চেয়েছিল একবারে যাতে সকলের অস্ত্রসমর্পণ সম্পন্ন করা যায় তার ব্যবস্থা করা। এ নিয়ে গতকালের বৈঠকে আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় না নিয়ে মাত্র ৩ সপ্তাহে ৪ দফায় সকল অস্ত্রসমর্পণ সম্পন্ন করার প্রস্তাব জনসংহতি সমিতি দিলে সরকার তা গ্রহণ করে বলে জানা যায়।

অস্ত্রসমর্পণ গত ২ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির একটি প্রধান বিষয়। সুষ্ঠুভাবে অস্ত্রসমর্পণের ওপর শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন বড়োভাবে নির্ভর করছে। কারণ প্রকৃত অর্থে অস্ত্রসমর্পণের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু পাহাড়ি উপজাতি জনগণের দাবি আদায়ে গত দুই যুগ ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের শান্তিবাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটবে এবং বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ হবে। সে কারণে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের তীক্ষ্ণ নজর ছিল গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠকের দিকে। অস্ত্রসমর্পণের চূড়ান্ত দিনক্ষণ নির্ধারিত হওয়ায় এ সম্পর্কিত এক ধরনের জল্পনার অবসান ঘটেছে। গতকালের বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তাদের সশস্ত্র সদস্য ও অস্ত্রের যে তালিকা দিয়েছে তা এখন সরকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে বলে জানা যায়।

ভোরের কাগজ

১৭ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর প্রায় দুই হাজার

সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবে

সানাউল্লাহ, খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর প্রায় ২ হাজার সদস্য আগামী মাসে সরকারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবে। গত বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় জনসংহতি সমিতি শান্তিবাহিনীর প্রায় ২ হাজার সশস্ত্র সদস্য ও অস্ত্র-গোলাবারুদের তালিকা সরকারের কাছে পেশ করেছে বলে জানা যায়।

এদিকে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ

আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া, জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্ত লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

জনসংহতি সমিতি তাদের কতোজন সশস্ত্র সদস্যের তালিকা সরকারের কাছে দিয়েছে সে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করতে উভয়পক্ষের কোনো সূত্রই রাজি হননি। তবে তারা আভাস দিয়েছেন, এ সংখ্যা ১ হাজার ৮০০-এর বেশি কিন্তু ২ হাজারের কম হবে। সদস্যদের তালিকার পাশাপাশি জনসংহতি সমিতি তাদের নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা দিয়েছে। এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ তালিকাভুক্ত সশস্ত্র সদস্যরা আগামী মাসের ৯, ১৬, ২২ ও ২৮ তারিখ সরকারের কাছে সমর্পণ করবে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ৭ দফায় ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছিল। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার থানা পর্যায়ে এসব অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও দিয়েছিল। কিন্তু সরকারি জাতীয় কমিটির সদস্যরা প্রথমে একবারে সকলের অস্ত্র সমর্পণ চাইলেও পরে আলোচনা করে ৪ দফায় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ তিন সপ্তাহে পুরো অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কথা বলেন। জনসংহতি সমিতিও এ প্রস্তাবে সম্মত হয়। বৈঠকে সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতিকে জানায়, অস্ত্র সমর্পণ দীর্ঘায়িত হলে শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নের অনেক কিছু পিছিয়ে যাবে।

সরকার ইতিমধ্যে তিন পার্বত্য জেলার জন্য পৃথক পৃথক তিনটি জেলা পরিষদ গঠন ও পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আইন মন্ত্রণালয় ও আইন কমিশন এ বিষয়ে কাজ করছে বলে জানা যায়। সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতিকে জানায়, অস্ত্র সমর্পণ দীর্ঘায়িত হলে এসব আইন অনুমোদনের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে।

সূত্র জানায়, জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্ত) লারমা শেষবারে অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাদের কথা ছিল সন্ত লারমার অস্ত্র সমর্পণের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। কিন্তু সরকার পক্ষ বলেছে, সংগঠনের প্রধানের অস্ত্র সমর্পণ শুরুতে না হলে নানা সমস্যা হবে।

এমনকি অনেকে অস্ত্র সমর্পণের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পারে। সে ক্ষেত্রে সন্ত লারমা শুরুতে অস্ত্র সমর্পণ করলে দেশে-বিদেশে এর বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপিত হবে। জনসংহতি সমিতিও সরকারের প্রস্তাবে সম্মত হয়। তাছাড়া প্রথম দফায় শান্তিবাহিনীর কতোজন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবে সেটাও বৈঠকের আলোচনায় ঠিক হয়। জানা যায়, শান্তিবাহিনীর ২০০ সদস্য প্রথমে অস্ত্র সমর্পণ করার প্রস্তাব দিয়েছিল জনসংহতি সমিতি। পরে

সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এ সংখ্যা ৬০০ জনে উন্নীত হয়। বৈঠক শেষের ঘোষণা অনুযায়ী ৯ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর ৪০০ সদস্য অস্ত্রসহ এবং ২০০ সদস্য গোলাবারুদসহ অস্ত্র সমর্পণ করবে।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর সরকার চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করবে। জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্ত লারমা হবেন আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান। শান্তিচুক্তির ‘গ’ খণ্ডের ১২ ধারায় বলা হয়েছে : পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার ওপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারবেন। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়।

এদিকে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর কমিটির আহ্বায়ক নিয়োগ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। চুক্তিতে বলা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মনিটর কমিটির আহ্বায়ককে মনোনয়ন দেবেন। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানকেই এ পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। তিন সদস্যবিশিষ্ট এই মনিটর কমিটির বাকি দুই সদস্য হবেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্ত লারমা এবং অভ্যন্তরীণ শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক সরকারি টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান। অভ্যন্তরীণ শরণার্থী, পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সটি এখনো গঠন করা হয়নি। চলতি সপ্তাহে এটা গঠিত হলে চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর কমিটিও আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবে।

ভোরের কাগজ

১৭ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও স্পেশাল এফেয়ার্স মন্ত্রণালয় গঠন

মঈনুল আলম: পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে। ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ও স্পেশাল এফেয়ার্স মন্ত্রণালয়’ নামক এই নতুন মন্ত্রণালয়টি বৃহস্পতিবার অনুমোদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগকে উন্নীত করে স্বতন্ত্র এই মন্ত্রণালয়টি গঠন করা হলো।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নতুন এই মন্ত্রণালয়টি গঠনে স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের বিদ্যমান জনবল ও কাঠামোকে বাড়িয়ে একটি নতুন মন্ত্রণালয়ে রূপ দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী ছাড়া ১ জন সচিব, ২ জন যুগ্মসচিব, ৪ জন উপসচিব, ৮ জন সহকারী সচিব, ১ জন সহকারী প্রধান, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা,

১ জন গবেষণা কর্মকর্তা ও ৭ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকবেন।

স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের বর্তমান জনবল ৪৫। অতিরিক্ত ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নতুন নিয়োগ দেওয়া হবে।

নবগঠিত মন্ত্রণালয়টি তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতীয়দের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য কাজ করবে। এই মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে গত ২ ডিসেম্বর '৯৭ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির ঘ(১৯) ধারা বাস্তবায়িত হলো।

কেবিনেট সচিবের নেতৃত্বে সচিব কমিটি দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরকারের কাছে এই মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ পেশ করে। সচিব কমিটির মতে, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ তিনটি পার্বত্য জেলা ও দেশের অন্যান্য এলাকার ৩ উপজাতীয়দের জন্যই কাজ করেছে। তাই নবগঠিত মন্ত্রণালয়টির কার্যক্রম ও কর্মপরিধি সারা দেশের উপজাতীয়দের জন্যই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গত তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি ছাড়া দেশের আরো দশটি জেলার ৪২টি থানায় বিচ্ছিন্নভাবে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও নেত্রকোণায় গারো ও হাজং, সিলেটে মনিপুরী, রাজশাহী ও দিনাজপুরে সাঁওতাল, পটুয়াখালী ও বরগুণায় মগ, কক্সবাজারে রাখাইন প্রভৃতি।

ভোরের কাগজ

১৭ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনী সদস্যদের ঘরে ফেরার প্রস্তুতি

দুদুকছড়িতে সন্ত লারমার ব্যস্ত দিন

আজিম উল হক, দুদুকছড়ি থেকে ফিরে: পার্বত্য অঞ্চলে আন্দোলনরত শান্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বৃহস্পতিবার সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বৈঠকে শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের দিন তারিখ নির্ধারিত হওয়ায় তাদের মধ্যে ঘরে ফেরার তাগিদ আরো জোরালো হয়েছে। শান্তিবাহিনী সদস্যদের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, সন্দেহ ছিল সেটাও কেটে গেছে।

গতকাল শুক্রবার সীমান্তবর্তী দুদুকছড়িতে শান্তিবাহিনী সদস্যদের মধ্যে ঘরে ফেরার তোড়জোড় দেখা যায়। শান্তিবাহিনী সদস্যরা সীমান্তের ওপার থেকে তাদের পারিবারিক সহায়সম্পত্তি গ্রামের বাড়িতে ও আত্মীয়স্বজনের

বাড়িতে পাঠাতে শুরু করেছে। গতকাল প্রতিবেদক দুদুকছড়িতে শান্তিবাহিনী সদস্যদের আত্মীয়স্বজনকে বাস্র পেটরা বেডবেডিং কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে আসতে দেখেন। তারা তাদের তৈজসপত্রও গাড়িতে করে গ্রামে পাঠাচ্ছে, যাতে করে ফিরে আসার দিন শুধুমাত্র অস্ত্র নিয়ে তারা আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণ করতে পারে।

গতকাল দুদুকছড়িতে পূর্বের ন্যায় মানুষের মেলা না বসলেও প্রচুর পাহাড়ি-বাঙালি দর্শনার্থী দেখা গেছে। শান্তিবাহিনীতে থাকা ভাই-বন্ধু-আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায়, সারাদিনই শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সিভিল পোশাকে থলে কাঁধে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে।

শান্তিবাহিনীর ২য় ও ৩য় সারির কমান্ডো অফিসারদের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দুদুকছড়ি বিলে শীতের মিষ্টি কড়া রোদে আড্ডা দিতে দেখা যায়। আড্ডায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ফিরে আসলে থাকবে কোথায়, করবে কী এসব স্থান পাচ্ছে।

স্থানীয়ভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত শান্তিবাহিনী সদস্যরা দর্শনার্থী পাহাড়ি-বাঙালি মহিলা পুরুষদের তাদের ভাষায় লাইনে লাইনে গ্রুপ গ্রুপ করে শান্তিবাহিনী সদস্যরা যেখানে আছে সেখানে পাঠাচ্ছে। সকাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মেম্বরদের সন্ত লারমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে দিনভর দুদুকছড়ি গ্রামের চায়ের দোকানে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। এ চিত্র দেখা যাচ্ছে গত বেশ কয়েকদিন ধরে।

ধারণা করা হচ্ছে, চুক্তি অনুযায়ী নবগঠিত আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদে একটু ঠাইয়ের আশায় সন্ত লারমার আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় নেতাকর্মীদের এ প্রতীক্ষা। নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যরা লাইনে লাইনে হাইকমান্ডের কাছে খবর পাঠায়, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর কারো গ্রিন সিগন্যাল আসলে সে হাইকমান্ডের কাছে চলে যায়। কেউ থেমে হেসে ফিরে আসে কেউবা গোমরা মুখে, কেউ আবার গ্রিন সিগন্যাল না পাওয়ায় অপেক্ষার প্রহর গুনে। গতকাল সাংবাদিকদের একটি দল দুদুকছড়ি ছেড়ে এগিয়ে গেলে জঙ্গল থেকে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা বের হয়ে এসে পথরোধ করে পরিচয় জানতে চায়। পরে সাংবাদিকদের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে গিয়ে সন্ত লারমার কাছে দেওয়া হলে সন্ত লারমা ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে সাক্ষাতে অপারগতা প্রকাশ করে খবর পাঠান। পরে সাংবাদিকরা বিফল মনোরাহ হয়ে ফিরে আসে।

এদিকে গতকাল সকাল থেকে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাসহ কমিটির সকল সদস্য শান্তিবাহিনীর আন্তানায় গিয়ে উর্ধ্বতন

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করে সক্ষমায় ফিরে আসেন। শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ এখন ঘরে ফেরার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, সস্ত্র লারমাও দুদুকাছড়িতে অবস্থান করছেন।

ভোরের কাগজ

২১ জানুয়ারি ১৯৯৮

জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরে প্রধানমন্ত্রী
শান্তিচুক্তিতে পার্বত্য বাঙালিদের সম্পত্তি রক্ষা,
অর্জন ও নাগরিক অধিকার খর্ব হয়নি

কাগজ প্রতিবেদক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির মাধ্যমে কোনোভাবেই পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত বাঙালিদের সম্পত্তি রক্ষা, অর্জন ও নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়নি। গতকাল জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরকালে পঞ্চগনন বিশ্বাসের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার জেলা প্রশাসকদের ক্ষমতা বিশেষ করে জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে ক্ষমতা আগের মতোই রয়ে গেছে। শুধু উপজাতীয় ব্যক্তি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে পূর্বে জেলা প্রশাসকদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা পরিবর্তন করে বর্তমান চুক্তিতে সে দায়িত্ব সার্কেল চিফের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। শেখ হাসিনা জানান, বর্তমান চুক্তির আলোকে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯-এর জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত ৬৪ নম্বর ধারাটি কিছুটা পরিবর্তন করা হবে।

শেখ হাসিনা জানান- ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যগণ ও জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান এ চুক্তির প্রশংসা করেছেন, এ ছাড়া বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিভিন্ন দাতা ও সাহায্য সংস্থা এ চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, বিএনপি সরকার ও জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতির্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সস্ত্র লারমা)-র সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে সময় অলি আহমদের নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে মোট ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভোরের কাগজ

২২ জানুয়ারি ১৯৯৮

দীপংকর টাঙ্কফোর্সের চেয়ারম্যান

অস্ত্র সমর্পণ বিষয়ে আজ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের সভা

সানাউল্লাহ: শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাসহ এ সম্পর্কিত সরকারি কাজকর্ম সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করতে আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হবে।

বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিববৃন্দ, পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া সরকার পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাঙ্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে। সাংসদ দীপংকর তালুকদারকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে টাঙ্কফোর্সের।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, আজ বিকেল ৪টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকটি হবে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ দফায় শান্তিবাহিনীর যে প্রায় ২ হাজার সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন তার সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় করতে এ সভা আহ্বান করা হয়েছে। ৯, ১৬, ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি এই ৪ দিনে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করবেন। এদিকে গত ১৫ জানুয়ারি খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে তাদের সশস্ত্র সদস্য ও নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের যে যে তালিকা দিয়েছে তা সরকার এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে বলে জানা যায়।

অন্যদিকে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক টাঙ্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে। গত বুধবার এক সরকারি আদেশে টাঙ্কফোর্সের নতুন চেয়ারম্যান পদে সাংসদ দীপংকর তালুকদারকে নিয়োগ দিয়েছে। একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ শরণার্থী পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাঙ্কফোর্সেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দীপংকর তালুকদারকে। দীপংকর একই সঙ্গে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর কমিটিরও সদস্য হবেন।

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ মনিটর কমিটির আহ্বায়ক এবং এর অপর সদস্য হলেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতির্দ্র বোধিপ্রিয় (সস্ত্র) লারমা। উল্লেখ্য, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এর আগে টাঙ্কফোর্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাকে মন্ত্রী নিয়োগ করায় সরকার চেয়ারম্যান পরিবর্তন করে দীপংকরকে নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন।

ভোরের কাগজ
২৩ জানুয়ারি ১৯৯৮
সম্র লারমার নেতৃত্বে প্রথম দফা
অস্ত্রসমর্পণ শেখ হাসিনার কাছে

বিশেষ প্রতিনিধি: জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্র) লারমাসহ শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। ১০ ফেব্রুয়ারিসহ ৪ দফায় অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমাকে প্রধান করে গতকাল বৃহস্পতিবার একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সময় একদিন পিছিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি ঠিক করা হয়েছে। সেদিন সম্র লারমাসহ শান্তিবাহিনীর ৬০০ সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা বিধান, অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়।

সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিশেষ কার্যাদি বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশের আইজি, সেনাবাহিনী ও বিডিআর প্রধান, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারসহ পার্বত্য জেলাগুলোর বেসামরিক ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ, একাধিক ব্রিগেড কমান্ডার, এনএসআই ও ডিএফআই কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা বিধানে কল্পরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে যে কমিটি করা হয়েছে তাতে সাংসদ দীপংকর তালুকদার, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব, সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম ডিভিশনের জিওসি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার প্রমুখ রয়েছেন।

সভায় অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে আসা এবং তাদের পুনর্বাসন বিষয়েও আলোচনা হয়।

রাঙ্গামাটি থেকে হরি কিশোর চাকমা জানান, শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের প্রথম দফার তারিখ একদিন পিছানোর সরকারি প্রস্তাবে জনসংহতি সমিতি সম্মতি জানিয়েছে। এদিকে চার দফায় অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানের জন্য জনসংহতি সমিতি তাদের নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়াও শেষ করেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র ও গোলাবারুদের হিসাব সরকার পক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয় এবং অস্ত্র সমর্পণের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হয়। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর ৬০০ জনের প্রথম গ্রুপটি জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্র) লারমার নেতৃত্বে অস্ত্র সমর্পণের সময় নির্ধারণ করা হয়। ঐদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কথা উল্লেখ করে অস্ত্র সমর্পণের সময় একদিন পিছিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি করার জন্য যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংহতি সমিতি তাতে সম্মতি দেয়।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার জনসংহতি সমিতির সম্মতির কথা পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে জানিয়েছেন।

এদিকে চার দফা অস্ত্র সমর্পণে শান্তিবাহিনী সদস্যদের নেতৃত্বদানের জন্য নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া জনসংহতি সমিতি শেষ করে এনেছে বলে জানা যায়। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র মতে, ১০ ফেব্রুয়ারি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্র) লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর ৬০০ সদস্য খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করলেও অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর সম্র লারমা পুনরায় নিজ আস্তানায় ফিরে যাবেন। পরবর্তীকালে ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ দফা অস্ত্র সমর্পণের দিন তিনি পাকাপোক্তভাবে ফিরে আসবেন। এ সময়ে অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সার্বিক নেতৃত্বে থাকবেন রূপায়ন দেওয়ান। এ ছাড়াও ১৬ ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়িতে সমর্পণকারীদের নেতৃত্বে থাকবেন রক্তোৎপল ত্রিপুরা। ২২ ফেব্রুয়ারি দীঘিনালায় অস্ত্র সমর্পণকারীদের নেতৃত্বে থাকবেন সুধাসিন্দু খীসা ও গৌতম চাকমা এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি দুদুখছড়িতে সর্বশেষ অস্ত্র সমর্পণে নেতৃত্ব দেবেন শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার।

ভোরের কাগজ
২৩ জানুয়ারি ১৯৯৮
পার্বত্য শান্তিচুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে
দায়েরকৃত একটি রিট প্রত্যাখ্যান করেছে হাইকোর্ট

সুপ্রিম কোর্ট প্রতিবেদক: পার্বত্য শান্তিচুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত একটি রিট আবেদন গতকাল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও জাতীয় মুজাহিদ সংঘের নেতা সামসুদ্দিন আহমেদ বাদী হয়ে রিট আবেদনটি দায়ের করেন এবং নিজেই আদালতে বক্তব্য রাখেন। আবেদনে তিনি নিজেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রথম ও প্রকাশ্য আন্দোলনকারী হিসেবে দাবি করেন এবং সম্প্রতি সম্পাদিত শান্তিচুক্তিতে সংক্ষুব্ধ হয়ে রিট আবেদনটি দায়ের করেছেন বলে উল্লেখ করেন। আবেদনে সিরাজ সিকদারকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, মেজর এমএ জলিলকে জগৎশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা, ১৫ আগস্টের ঘটনাকে ‘মহান বিপ্লব’, স্বাধীনতায়ুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে ‘দেশদ্রোহী’, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে ‘দুইটি পাকিস্তান’ হিসেবে অভিহিত করে ভারত, হিন্দু, খ্রিষ্টান, উপজাতীয় গোষ্ঠী ও রাজনীতিকদের সম্পর্কে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয়।

রিট আবেদনটিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তির ফলে অবিভক্ত বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা ও বঙ্গভূমি আন্দোলনকে জোরদার করার অভিযোগ তুলে জ্যোতির্নন্দ বোধিপ্রিয় (সম্ভ লারমা)কে হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে চুক্তি সম্পাদনে তার এবং চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর কর্তৃত্বের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়।

বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন ও বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাছির-এর সম্মুখে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ রিট আবেদনের বিষয়বস্তু এবং আবেদনে উল্লিখিত ভাষাকে অপ্রাসঙ্গিক, অন্যদেশ, গোষ্ঠী ধর্ম ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিদ্বেষপূর্ণ, আক্রমণাত্মক এবং হাইকোর্টে শুনানির অনুপযোগী বিবেচনা করে বিধি মোতাবেক আবেদনপত্র নিয়ে আসার জন্য আবেদনকারীকে পরামর্শ দেন। কিন্তু আবেদনকারী আদালতের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে আদালতের আদেশ প্রার্থনা করেন। এ সময়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা আবেদনকারীকে আদালতের পরামর্শ মেনে নেয়ার অনুরোধ করলে আবেদনকারী তার প্রতিও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আদালত রিট আবেদনটিকে শুনানির অযোগ্য বিবেচনা করে তা প্রত্যাখ্যান করার আদেশ দেন। আদালতে এটর্নি জেনারেল কে এস নবী, ড. কামাল হোসেনসহ বিপুলসংখ্যক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ
২৭ জানুয়ারি ১৯৯৮
শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ: প্রস্তুতি
চলছে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের

সানাউল্লাহ: জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করবেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রীবর্গ, সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংসদ, ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনীতিকগণ, দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি রেডিও ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের চিন্তাভাবনাও করছে সরকার।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির বিষয়ে আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রামে দুপুর ১২টায় এক বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্লরঙ্গন চাকমা এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপংকর তালুকদার, সাংসদ বীর বাহাদুর, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের মহাপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের জেলা প্রশাসকবৃন্দ, সেনাবাহিনীর রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের কমান্ডারগণ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

আজকের বৈঠকে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান বিশেষ করে কিভাবে অস্ত্র সমর্পণ হবে, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের কোথা থেকে অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসা হবে, তাদের নিরাপত্তা প্রদান, প্রধানমন্ত্রীর সহ অন্যান্য অতিথিদের নিরাপত্তা প্রদান, অনুষ্ঠানে কি কি থাকবে ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও কৌশল ঠিক হবে। জানা যায়, এ উপলক্ষে খাগড়াছড়ি জেলা শহরকে উৎসবমুখর করে তোলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হচ্ছে। অস্ত্র সমর্পণের গোটা অনুষ্ঠানের আয়োজক হচ্ছে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদের সব ধরনের সহায়তা দেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যদের, সরকার ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ, সাংসদগণ, কূটনীতিক, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও করছে সরকার।

তাছাড়া অনুষ্ঠানটি রেডিও ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাও হচ্ছে। তবে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হয়নি বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়।

এদিকে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমার পক্ষে শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার সরকারের কাছে লেখা এক চিঠিতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য তাগিদ দিয়েছেন। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে তাদের সদস্যদের কিভাবে আনা হবে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাদের সমাবেশস্থলের আশপাশের নিরাপত্তা বাহিনীর অস্থায়ী কিছু ক্যাম্প প্রত্যাহার ও নিষ্ক্রিয় করার ব্যাপারে তাদের মতামত এই চিঠিতে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত দুই যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় জনসংহতি সমিতি ও তাদের সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী দেশের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তৎপরতা চালিয়ে আসছিল। বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় সংখ্যালঘু পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গত ২ ডিসেম্বর সরকার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুযায়ী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আগামী ১০, ১৬, ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ৪ দফায় সরকারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। ১০ ফেব্রুয়ারি সম্ভ লারমার নেতৃত্বে তাদের ৬০০ সদস্য নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণ করবেন।

ভোরের কাগজ

২৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

আগের দিন গোলাবারুদ নিয়ে নেওয়া হবে

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

অনুষ্ঠান হবে দেড় ঘণ্টা স্থায়ী

হরিকিশোর চাকমা: শান্তিবাহিনীর প্রথম দফার অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান দেড়ঘণ্টা স্থায়ী হবে। এরপর তাদের স্থায়ী নিরাপত্তা ক্যাম্প রাখার ব্যবস্থা করা হবে। অস্ত্র সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ শাখার আওতায় নিয়ে আসা হবে। এ সময় খাগড়াছড়ি জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বৈঠকে এ সমস্ত সিদ্ধান্তসহ এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বৈঠক শুরু হয় দুপুর ১২টায়। সাড়ে ৩ ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। অন্যায়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি শরণার্থীবিষয়ক টাফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দ্বীপংকর তালুকদার, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

চেয়ারম্যান কিং কিউ রোয়াজা, সমীরণ দেওয়ান, ফোয়াইচ প্রু মাস্টার, সাংসদ বীর বাহাদুর, স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক, ব্রিগেড কমান্ডার, পুলিশ সুপারবন্দ।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে ৬০০ সদস্যের শান্তিবাহিনীর প্রথমদফা অস্ত্র সমর্পণকারী দলটি একদিন পূর্বে খাগড়াছড়ি সদরে এসে অবস্থান করবেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে গোলাবারুদ খুলে নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে নিয়ে গিয়ে খালি অস্ত্রগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান শুরু হবে। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে প্রথম অস্ত্রটি তুলে দেবেন। এরপর ২০ মিনিটের মধ্যে সব অস্ত্র জমা দেওয়া হবে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে মাত্র চারজন বক্তৃতা করবেন। এরা হলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও জনসংহতি সমিতির প্রধান সম্ভ লারমা। এর পরপরই শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবকিছু মিলিয়ে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান চলবে দেড়ঘণ্টা। অনুষ্ঠান শেষে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনরায় স্থায়ী নিরাপত্তা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে।

বৈঠক সূত্রে আরো জানা গেছে, তিন পার্বত্য জেলার জেলা সদরে তিনটি স্থায়ী নিরাপত্তা ক্যাম্প করা হবে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এসব নিরাপত্তা ক্যাম্পে ৩ দিন থেকে একমাস থাকার সময় পাবেন। তবে এ সময়ের মধ্যে যদি অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য নিজগ্রামে যেতে চান যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সরকার তাদের নিরাপত্তা দিতে বাধ্য থাকবে না। অস্ত্র সমর্পণের পরপরই শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকার চেকসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। পরবর্তী ৩ দফায় অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদেরও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

শান্তিবাহিনীর প্রথম দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানটি জাঁকজমকপূর্ণ করার জন্য সেনাবাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকাসহ তিন পার্বত্য জেলার সাংস্কৃতিক কর্মীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। ঢাকা থেকে আমন্ত্রিত দেড় শতাধিক রাষ্ট্রীয় অতিথি অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলেও বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের পূর্বে নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করবেন।

ভোরের কাগজ
২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
জনসংহতি সমিতির দুই নেতা খাগড়াছড়ি পৌছেছেন
শান্তিবাহিনীর ১,৯৩৩ সদস্য
৫ দফায় অস্ত্র সমর্পণ করবে

বিশেষ প্রতিনিধি: জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার জন্য তাদের দুই নেতা গতকাল রোববার খাগড়াছড়ি পৌছেছেন। ১০ ফেব্রুয়ারি প্রথম দফায় ৬০০ জনের অস্ত্রসমর্পণের পরদিন ১১ ফেব্রুয়ারি আরো ১৪৩ জন অস্ত্রসমর্পণ করবে। সবমিলিয়ে মোট ১,৯৩৩ জন অস্ত্রসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। অন্যদিকে অস্ত্রসমর্পণের মূল অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের চেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রতিনিধি আজিম-উল হক জানিয়েছে, জনসংহতি সমিতির নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রঞ্জনপল ত্রিপুরা গতকাল বিকেলে খাগড়াছড়ি পৌছেছেন। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য আগামী ১১ বা ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসেই থাকবেন। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা খাগড়াছড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি দেখার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, সরকারি জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার খাগড়াছড়ি যাচ্ছেন। সেদিন সেখানে প্রস্তুতির বিষয়ে বৈঠক হবে। স্বরাষ্ট্র সচিব ও বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিবও বৈঠকে যোগ দেবেন।

ইতিপূর্বে নির্ধারিত তারিখের বাইরে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর আরো ১৪৩ জন সদস্য খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্রসমর্পণ করবে। ফলে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মোট ৫ দফায় শান্তিবাহিনী মোট ১,৯৩৩ জন সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সদস্য অস্ত্রসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। অস্ত্রসমর্পণকারীদের ৮৬০ জন সশস্ত্র সদস্য বলে জানা গেছে। এর মধ্যে প্রথম দুদিনেই ৭৪৩ জন অস্ত্রসমর্পণ করবেন। বাকিরা ১৬, ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রসমর্পণ করবেন।

শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার গত ২৮ জানুয়ারি এক চিঠিতে জানিয়েছেন, ১০ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণের জন্য দুদকছড়ি থেকে ২৭৬ জন, ঘিলাছড়ি থেকে ১৯৩ জন ও মাইছছড়ি থেকে ১৩১ জন

সদস্যকে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে নিয়ে আসতে হবে। তাদের পরিবহন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে সরকার। ৯ ফেব্রুয়ারি এসব পয়েন্ট থেকে তাদের খাগড়াছড়ি নিয়ে আসা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। আর ১১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানের জন্য ঘিলাছড়ি থেকে ৬৯ জন ও মাইছছড়ি থেকে ৭৪ জনকে খাগড়াছড়ি আনতে হবে।

জানা গেছে, প্রথম দিন জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমা ছাড়াও তাদের প্রথম সারির নেতা রূপায়ণ দেওয়ান অস্ত্র সমর্পণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংসদগণ, উচ্চপদস্থ সরকারি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কূটনীতিকগণ, বিশিষ্ট নাগরিক ও সাংবাদিকদের এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারের জন্য বিদেশী টেলিভিশন কোম্পানির সঙ্গে সরকারের কথাবার্তা চলছে বলে জানা গেছে। খাগড়াছড়ির মতো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বাংলাদেশ টেলিভিশনের নেই বলেই বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। তবে সরকারি সূত্রে জানা যায়, বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্মত না হলে বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানটি রিলে করার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। খাগড়াছড়ি থেকে আংশিক অনুষ্ঠান ধারণ করে মূল অনুষ্ঠানের স্বল্প বিলম্বে চট্টগ্রাম থেকে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হবে। তবে বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠানটি সরাসরি খাগড়াছড়ি থেকে সম্প্রচার করার ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভোরের কাগজ
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তুতি
খাগড়াছড়িতে যেন উৎসব

আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: আর মাত্র ছয়দিন পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আনুষ্ঠানিক অস্ত্রসমর্পণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। একই সঙ্গে অবসান ঘটবে জুম্ম জাতির দীর্ঘ দুই যুগের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম, আর একে ঘিরে অব্যাহত সহিংসতা, হানাহানি ও রক্তপাতের। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার অস্ত্রসমর্পণের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ঘিরে পুরো খাগড়াছড়ি এখন উৎসবের রূপ নিয়েছে। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্যালোচনা ও পরিদর্শন করতে ডজনখানেক মন্ত্রী আজ বুধবার খাগড়াছড়ি আসছেন।

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান সৃষ্টভাবে সম্পন্ন করতে সেনাবাহিনী, বিডিআর, আর্মড পুলিশ ও পুলিশ খাগড়াছড়ি জেলার সর্বত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। চুক্তিবিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে গত এক সপ্তাহে ১৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের অসামান্য কাজ সম্পন্ন করা ও শহর সাজসজ্জার কাজ চলছে রাতদিন। স্টেডিয়াম সাজানোর কাজ করছে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা। গ্যালারি ডিসপ্লে, সেনাবাহিনী ব্যান্ড ডিসপ্লে, তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় শিল্পীদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যগীতের মহড়া চলছে। প্রতিদিন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা প্রস্তুতি কমিটির সদস্য নিয়ে সভা করছেন। জেলার স্ব-স্ব সরকারি বিভাগ তাদের অফিস, বাড়িঘর, শহর সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা শহর উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

১০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় শান্তিবাহিনী প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্ত) লারমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্রসমর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন এবং পরপরই সশস্ত্র সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করবেন অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সচিবগণ, তিন বাহিনী প্রধান, কূটনৈতিক, বুদ্ধিজীবী, দেশী-বিদেশী সাংবাদিকসহ ৫ শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

জেলা প্রশাসন শান্তিবাহিনী সদস্যদের ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমবেত হওয়ার সুবিধার্থে মাইচছড়ি হাইস্কুল, দুদুকছড়ি ও ঘিলাছড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। ৯ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর ৬০০ সদস্যকে খাগড়াছড়ি শহর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে পেরাছড়া হাইস্কুল ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে। ট্রানজিট ক্যাম্পের শান্তিবাহিনী সদস্যদের পরিচয়পত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ট্রানজিট ক্যাম্পে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন শান্তিবাহিনী সদস্যদের সমাবেশ ক্যাম্প থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ট্রানজিট ক্যাম্পে আনার জন্য বাস, ট্রাক ও জিপ রিকুইজিশন করেছে। ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে শান্তিবাহিনী সদস্যদের স্টেডিয়ামে নিয়ে আসা হবে। এদিকে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা।

প্রস্তুতি পরিদর্শনে আজ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডা. এস এ মালেক, শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ বীর বাহাদুর, তিন

স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, সচিববৃন্দ এবং সামরিক-বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ খাগড়াছড়ি আসছেন।

ভোরের কাগজ

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বৈঠক

সন্ত লারমা অস্ত্র জমা দেবেন আর

প্রধানমন্ত্রী দেবেন সাদা গোলাপ

আজিম উল হক/হরি কিশোর চাকমা, খাগড়াছড়ি থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্ত) লারমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র প্রদান এবং প্রধানমন্ত্রী সন্ত লারমাকে একগুচ্ছ সাদা গোলাপ প্রদানের মাধ্যমে সূচিত হবে পার্বত্য অঞ্চলের সশস্ত্র আন্দোলনের অবসান। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় খাগড়াছড়ির নবনির্মিত স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনী প্রধান সন্ত লারমাসহ শান্তিবাহিনীর ৭৩৪ জন সশস্ত্র সদস্য সরকার প্রধান শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে দীর্ঘ দুই দশক পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অস্ত্র জমাদানের প্রস্তুতিমূলক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহসহ সরকারের বেশ কজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান, সংশ্লিষ্ট সচিব ও সামরিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানকে ঘিরে ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহর এবং তিন পার্বত্য জেলার প্রশাসনিক ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। সভায় জানানো হয়, ১০ ফেব্রুয়ারি অস্ত্র জমাদানের জন্য শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তিনটি ক্যাম্পে সমবেত হবে। ক্যাম্প থেকে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলার পেরাছড়া হাইস্কুলে ট্রানজিট ক্যাম্পে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শান্তিবাহিনী সদস্যদের নিয়ে আসা হবে। ট্রানজিট ক্যাম্পে জাতীয় কমিটির ১৪ জন সদস্য ও যোগাযোগ কমিটির একজন সদস্যের উপস্থিতিতে সেনা কর্মকর্তারা শান্তিবাহিনীর সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ বুঝে নেবে।

পরে সেনাবাহিনী শান্তিবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদসমূহ ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে সাজিয়ে রাখবে। একইদিন সকালে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে শান্তিবাহিনী সদস্যদের সেনাবাহিনী ও বিডিআর কড়া নিরাপত্তা দিয়ে স্টেডিয়ামে নিয়ে আসবে, প্রধানমন্ত্রী বেলা সাড়ে ১১টায় স্টেডিয়ামে

এসে জাতীয় কমিটির সকল সদস্য ও সেনাপ্রধানসহ মঞ্চে আসন গ্রহণ করবেন। মঞ্চে সন্ত্রাস লারমার জন্য চেয়ার রাখা হবে। এ সময় সামরিক ব্যান্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে। পরে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় শিল্পীবৃন্দ সমন্বিত নৃত্যগীত পরিবেশন করবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন। সন্ত্রাস লারমা প্রধানমন্ত্রীর কাছে অস্ত্র জমাদানের পর প্রধানমন্ত্রী সে অস্ত্র খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করবেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী একগুচ্ছ সাদা গোলাপ দিয়ে সন্ত্রাস লারমাকে বরণ করে নেবেন। পরে সন্ত্রাস লারমা তার শান্তিবাহিনী সদস্যদেরকে বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে সরকারের কাছে অস্ত্র জমাদানের জন্য নির্দেশ দেবেন। এরপর থেকেই শান্তিবাহিনীর সদস্যরা একে একে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবে।

পরে শান্তিবাহিনী সদস্যরা ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করবে নিজ বাড়িঘরে না যাওয়া পর্যন্ত। চুক্তি অনুযায়ী শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। এ জন্য ট্রানজিট ক্যাম্প ও স্টেডিয়ামে সোনালী ব্যাংকের বিশেষ শাখা খোলা হয়েছে। বৈঠকে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়দ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, টার্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে অস্ত্র জমাদানের সময় স্টেডিয়ামের চারদিক থেকে শত শত কপোত ও সহস্রাধিক রঙ্গীন বেলুন ওড়ানো হবে। সারা শহর লালনীল পতাকা ও গেট দিয়ে সাজানো। খাগড়াছড়িসহ তিন পার্বত্য জেলা থেকে পার্বত্যবাসীকে এ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য খাগড়াছড়িতে নিয়ে আসা হবে।

ভোরের কাগজ

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১১ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর

অস্ত্র সমর্পণ হবে না

বিশেষ প্রতিনিধি: ১০ ফেব্রুয়ারির প্রথম দফা আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণের পর ১১ তারিখ নতুন কোনো অস্ত্র সমর্পণ হচ্ছে না। এর আগে জনসংহতি সমিতি জানিয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি তাদের ১৪৩ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবেন খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। অস্ত্র সমর্পণের মূল যে দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়েছিল তাতে অবশ্য ১১ তারিখের কর্মসূচি ছিল না।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, ১১ ফেব্রুয়ারি কোনো অস্ত্র সমর্পণ হবে না। ১০ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিবিন্দু বোধিপ্রিয় (সন্ত্রাস) লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবেন।

উল্লেখ্য, এ মাসের ১০, ১৬, ২২ ও ২৮ তারিখ শান্তিবাহিনীর ১ হাজার ৯৩৩ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবেন। এদের মধ্যে ৮৬০ জন সশস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য রয়েছে।

ভোরের কাগজ

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

জনসংহতি সমিতির সকল

সদস্যের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

কাগজ প্রতিবেদক: সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। সমিতির সদস্যদের দখলে, নিয়ন্ত্রণে বা তত্ত্বাবধানে থাকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার তারিখ থেকে সাধারণ ক্ষমা কার্যকর হবে। সরকার গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে এ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সার্কুলারে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ ক্ষমা কার্যকর হওয়ার পর সমিতির যে সকল সদস্যের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা হুঁলিয়া জারি করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হবে। যে সকল সদস্যের অনুপস্থিতিতে বিচারে সাজা দেওয়া হয়েছিল, তা মওকুফের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে সকল সদস্য জেলে আটক রয়েছেন, তাদের মুক্তির আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন, কেবলমাত্র এ কারণে কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা হবে না, কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না বা শাস্তি দেওয়া হবে না। এছাড়া জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন সকল স্থায়ী বাসিন্দার ক্ষেত্রেও সাধারণ ক্ষমা কার্যকর হবে।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে জনসংহতি সমিতি নেতা জ্যোতিবিন্দু বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত্রাস) লারমার নেতৃত্বে সমিতির সদস্যরা প্রথম দফায় অস্ত্র সমর্পণ করবেন। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়ি হাইস্কুল ময়দানে, ২২ ফেব্রুয়ারি বরদাম হাইস্কুল ময়দানে ও ২৮ ফেব্রুয়ারি দুদুকাছড়িতে মোট ৪ দফায় সমিতির সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করবেন।

ভোরের কাগজ

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

৩ ক্যাম্পে অবস্থান নিয়েছে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা

অস্ত্র সমর্পণের আয়োজন শেষ পর্যায়ে,

খাগড়াছড়িতে নিশ্চিন্দ নিরাপত্তা

হরি কিশোর চাকমা/আজিম-উল-হক, খাগড়াছড়ি থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ৩টি সমাবেশ ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিয়েছে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করতে খাগড়াছড়িতে নিশ্চিন্দ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগামী মঙ্গলবার জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর ৭৪৩ জন প্রথম দফায় অস্ত্র সমর্পণ করবে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। এ লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার দুদুকছড়িতে ২৭৬ জন, মাইচছড়িতে ২০৫ জন এবং রাঙ্গামাটি জেলার ঘিলাছড়িতে ২৬২ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য অবস্থান নিয়েছে। এসব সমাবেশ ক্যাম্প থেকে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৪ কি.মি. দূরে পেরাছড়া স্কুল মাঠে নির্মিত ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে আগামীকাল সোমবার। এ সময়ের মধ্যে সমাবেশ ক্যাম্পগুলো তদারকি এবং সেসব স্থান থেকে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ কমিটির সদস্যরা যৌথভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। এদের মধ্যে ঘিলাছড়িতে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, মথুরালাল চাকমা ও শক্তিপদ ত্রিপুরা, বাইচছড়িতে সাংসদ বীর বাহাদুর, কৈ শৈ অং মারমা ও রূপায়ন চাকমা এবং দুদুকছড়িতে দণ্ডুরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, বিশ্বজিৎ চাকমা ও আশীষ চাকমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ১০ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর প্রথম দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে বর্ণাঢ্য করার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাত দিন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে তোরণ নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি শহরের রাস্তা, দালান পরিষ্কার এবং বাকবাকি করার কাজ চলছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণের স্থান খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম, ট্রানজিট সাজানোর কাজ করে যাচ্ছেন। সব কিছু মিলিয়ে খাগড়াছড়িতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। তবে হঠাৎ করে অস্ত্র সমর্পণের দিনে বিএনপিসহ ৭ দল হরতাল আহ্বান করায় জনমনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

বিএনপির ডাকা হরতালে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে আসা কূটনৈতিক, উচ্চ পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় অতিথি, সাংবাদিক ও সাধারণ দর্শকদের যেন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য চট্টগ্রাম, ফেনী এবং রাঙ্গামাটি সড়কসহ খাগড়াছড়ি জেলার অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের পূর্বে এবং পরে যেন কোনো অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত না হয় তার জন্য খাগড়াছড়িতে ইতিমধ্যে নিশ্চিন্দ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৩টি সমাবেশ ক্যাম্প, ট্রানজিট ক্যাম্প ও খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১০ ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণের জন্য তালিকাভুক্ত ৭৪৩ জনের অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শান্তিবাহিনী সদস্য এদিন অস্ত্র সমর্পণ করতে পারে বলে যোগাযোগ কমিটির সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতি

নেলসন ম্যাডেলার অভিনন্দন

কূটনৈতিক প্রতিবেদক: বিশ্বের বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যাডেলা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির খবরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং বিমোহিত। তিনি বলেন, একই সঙ্গে শিশুদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপও প্রশংসাযোগ্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে লেখা চিঠিতে তিনি আরো উল্লেখ করেন, আমরা এখনো বিশ্বাস করি, আলাপ আলোচনা এবং সমঝোতা সংঘাত এড়ানোর সর্বোত্তম পন্থা।

ভোরের কাগজ

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর ৭৬২ সদস্যকে আনা হচ্ছে ট্রানজিট ক্যাম্পে

আজ গোলাবারুদ জমা নেওয়া

হবে, কাল অস্ত্র সমর্পণ

হরি কিশোর চাকমা/আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: আজ সকাল থেকে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর অস্ত্র জমাদানের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হচ্ছে। আজই

সেনাবাহিনীর মাধ্যমে গোলাবারুদ পরীক্ষা করে নিয়ে নেওয়া হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কাছে অস্ত্র জমা দেবেন শান্তিবাহিনীর সদস্যরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা তার সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়ার সূচনা করবেন।

আগামীকাল দুপুর ১২টায় খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে খাগড়াছড়ি আসবেন। খাগড়াছড়িতে ইতিমধ্যেই অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, কূটনৈতিকবৃন্দ, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকসহ প্রায় দুই শতাধিক অতিথি অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। প্রথম দফায় ৪৬৩টি অস্ত্র জমা দেওয়া হবে। শান্তিবাহিনীর ৭৬২ জনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমা ছাড়াও পাঁচ জন নেতা ও তিন জন লেফটেন্যান্ট অস্ত্র জমা দেবেন।

আজ রাঙ্গামাটি জেলার ঘিলাছড়ির সমাবেশ ক্যাম্প থেকে ২৭৯ জন, খাগড়াছড়ি জেলার মাইচছড়ি সমাবেশ ক্যাম্প থেকে ২০৭ জন এবং দুদুকছড়ি সমাবেশ ক্যাম্প থেকে ২৭৬ জন শান্তিবাহিনীর সদস্যকে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে। এর আগে সকাল ৯টা থেকে সমাবেশ ক্যাম্পগুলোতে মজুদ অস্ত্র ও গোলাবারুদ পরীক্ষা করে গোলাবারুদগুলো সরকারি হেফাজতে নিয়ে গিয়ে খালি অস্ত্রগুলো শান্তিবাহিনীকে দিয়ে দেওয়া হবে। মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার তত্ত্বাবধানে বিডিআর সদস্যরা দুদুকছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে, টাঙ্গফোর্স চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদারের তত্ত্বাবধানের সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘিলাছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে এবং সাংসদ বীর বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাইচছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে মজুদ অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলো পরীক্ষা করবেন। তিনটি সমাবেশ ক্যাম্পে ৪৬৩টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র থাকলেও আগামীকাল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ৪০০টি অস্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া হবে। বাকি ৬৩টি অস্ত্র আজ পরীক্ষা করার পর জমা নেওয়া হবে।

শান্তিবাহিনীর প্রথম দফা অস্ত্র জমাদানকারীদের মধ্যে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমা ছাড়াও ৮ জন কর্মকর্তা থাকবেন বলে জানা গেছে। এরা হলেন মেজর কনক, মেজর দেবশীষ, মেজর দেবংশি, মেজর নৈতিক, মেজর খীসা, লে. রেনন, লে. নরোদয় ও লে. অডিং। এদিকে সম্ভ লারমা আগামীকাল অস্ত্র জমাদানের আনুষ্ঠানিকতা

সম্পন্ন করার পর আবারো দুদুকছড়িতে ফিরে যাবেন বলে জানা গেছে। তবে তিনি যদি খাগড়াছড়িতে থাকতে চান তাহলে তার জন্য ইতিমধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

অস্ত্র জমাদান প্রক্রিয়া সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসক, রিজিয়ন কমান্ডার, পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে চারটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো হচ্ছে নিরাপত্তা উপ-কমিটি, প্রশাসনিক উপ-কমিটি, অভ্যর্থনা উপ-কমিটি ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন গতকাল সন্ধ্যায় তার কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিং বলেছেন, দুই শতাধিক রাষ্ট্রীয় অতিথি অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান দেখতে আসবেন। অনুষ্ঠান দেখতে আসা ভিআইপি সহ সাধারণ দর্শকদের নিরাপত্তার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভিআইপি দর্শকদের চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় খাগড়াছড়ি নিয়ে আসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী, বিডিআর সদস্য ছাড়াও ১৮ কোম্পানি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক আরো জানান, অস্ত্র জমাদানকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর আজই ৫০ হাজার টাকার চেক প্রতিজনকে প্রদান করা হবে। তাদের সুবিধার্থে সেখানে সোনালী ব্যাংকে একটি অস্থায়ী শাখা খোলা হবে। শান্তিবাহিনীর কোনো সদস্য তার ইচ্ছা অনুযায়ী চেক ভাঙতে অথবা একাউন্ট খুলে জমা দিতে পারবেন।

এদিকে অস্ত্র জমাদান প্রক্রিয়া সরজমিনে দেখতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়দ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আজ খাগড়াছড়িতে আসছেন বলে জানা গেছে। এদিকে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করা হচ্ছে।

ভোরের কাগজ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই যুগের শস্ত্র তৎপরতার অবসান

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ আজ শুরু

সানাউল্লাহ/আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র তুলে দিয়ে দীর্ঘ দুই যুগের বিদ্রোহী তৎপরতার সমাপ্তি টানবেন শান্তিবাহিনীর সদস্যরা। জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জ্যোতিরিন্দ্র

বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমাসহ মোট ৭৪০ জন আজ খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দেবেন। আজ এবং আগামী ১৬, ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি চার দফায় শান্তিবাহিনীর ১ হাজার ৯৩৩ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন।

আজ সকাল সাড়ে ১১টায় প্রধানমন্ত্রী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর পবিত্র কোরআন তিলওয়াত, ত্রিপিটক, গীতা ও বাইবেল পাঠ হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী প্রায় অর্ধঘণ্টার ভাষণ দেবেন। ভাষণের পর সম্ভ লারমা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার অস্ত্রটি জমা দেবেন। এর পরপরই মাঠে উপস্থিত শান্তিবাহিনীর বাকি ৭৩৯ জন সদস্য তাদের অস্ত্র জমা দেবেন। প্রধানমন্ত্রী এ সময় শ্বেতকপোত উড়িয়ে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও শান্তির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের যাত্রাকে অবমুক্ত করবেন। অস্ত্র সমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ঢাকা থেকে আগত এবং তিন পার্বত্য জেলার শিল্পীরা গান ও নাচের মাধ্যমে পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রীতি চিত্র তুলে ধরবেন। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। টেলিভিশনে সম্প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ি আসতে শুরু করেছেন। মন্ত্রিসভার বাকি সদস্যরা, সাংসদ, কূটনীতিক, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ আজ সকালে এসে পৌঁছবেন। অনুষ্ঠান কাভার করার জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও বার্তা সংস্থা এবং বিদেশী সংবাদ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের অনেকেই এখানে চলে এসেছেন। আজ আরো অনেকে এসে পৌঁছবেন।

এদিকে, গতকাল সকালে অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়ি, দুদুকছড়ি, মাইসছড়ি ও রাজমাটির ঘিলাছড়ি ক্যাম্পে এসে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ৭৩৯ জন সদস্য রেজিস্ট্রেশন করান। তাদের মোট ৪৭৫ অস্ত্রের তালিকা করা হয়। তিনটি ক্যাম্প থেকে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তাদের স্টেডিয়াম থেকে চার কিলোমিটার দূরে বিকেলে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। আজ সকালে অস্ত্র সমর্পণের আগে তাদের ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে স্টেডিয়ামে নিয়ে আসা হবে।

গতকাল অবশ্য জনসংহতি সমিতির প্রধান সম্ভ লারমা আসেননি। দুদুকছড়িতে সমাবেশ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সদস্যদের তিনি বিদায় জানান। আজ দুদুকছড়ি থেকে তাকে সরাসরি স্টেডিয়ামে নিয়ে আসা হবে।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি

বাতিলের দাবিতে বিরোধী দল বিএনপিসহ ৭ দল আহূত চট্টগ্রাম বিভাগে আজকের সকাল-সন্ধ্যা হরতালের প্রেক্ষাপটে এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়েছে আরো কঠোর। শহরে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আর্মড পুলিশ রয়েছে। অন্যদিকে তোরণ আর উৎসবের পতাকায় ছেয়ে গেছে গোটা শহর। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে টানানো হয়েছে ব্যানার।

গতকাল দুপুরে মাইসছড়ি সমাবেশ ক্যাম্প, খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম ও পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে গিয়ে প্রস্তুতির অবস্থা দেখা যায়। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে চারপাশের গ্যালারির ওপর টানানো হচ্ছে প্যাডেল, মাঠে নাচের শিল্পীরা মহড়া করছেন, শব্দযন্ত্রের পরীক্ষা চলছে পাশাপাশি। সরাসরি সম্প্রচারের জন্য টেলিভিশন যন্ত্রপাতি বসানো হচ্ছে। সেনাবাহিনীর বাদক দল তাদের যন্ত্রে সুর তুলে শেষ মহড়া দিচ্ছেন। সবাই কর্মব্যস্ত। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখছেন, প্রয়োজনীয় রদবদল করছেন।

উল্লেখ্য, পাহাড়ি সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ে ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ দুই যুগ ধরে সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে আত্মগোপনে থেকে তারা যুদ্ধ করে গেছে। আশির দশকের মধ্যভাগে এরশাদ সরকার, সাবেক বিএনপি সরকার এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ এক যুগের আলাপ-আলোচনার পর সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির বৈঠকে ২ ডিসেম্বর ঢাকায় বিদ্রোহী তৎপরতার অবসান ঘটিয়ে জনসংহতি সমিতি সরকারের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় একটি প্রধান পদক্ষেপ। আজ সেটি শুরু হচ্ছে।

ভোরের কাগজ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

চট্টগ্রাম বিভাগে আজ সকাল-সন্ধ্যা

হরতাল ডেকেছে বিএনপি

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের দাবিতে আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বিভাগে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল এবং দেশের বাকি ৫টি বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও থানা সদরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের ডাক দিয়েছে বিএনপিসহ ৭ দল।

আমাদের চট্টগ্রাম অফিস জানায়, চট্টগ্রাম বিভাগে আহূত আজকের সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সমর্থনে সমাবেশ ও মিছিল করেছে বিএনপি, হরতালের আগের দিন গতকাল সোমবার ভোরে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের কয়েকজন নেতা ও বেশ কিছু এলাকার সক্রিয় কর্মীদের প্রেক্ষাগষ্ঠের উদ্দেশ্যে বাসায় হানা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন পুলিশ। এদিকে স্মারকলিপি দেওয়ার প্রাক্কালে পুলিশ কমিশনার কুতুবুর রহমান স্থানীয় ছাত্রদল নেতাদের হরতালের সময় ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বন্দরনগরী নাসিমন ভবনস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভারতের স্বার্থে সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গেও চুক্তি করেছে।

নগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওয়াহিদুল আলম এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ শেষে একটি মশাল মিছিল নগরীর কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। এছাড়া নগরীর বিভিন্ন এলাকায় হরতালের সমর্থনে মিছিলের খবর পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

কমান্ডার উষাতন গতকাল এসেছেন

খাগড়াছড়ি থেকে ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: শান্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানে তাদের ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার গতকাল সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি এসেছেন। তিনি দুদকছড়ি থেকে তাদের অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্যদের সঙ্গে ট্রানজিট ক্যাম্প হয়ে খাগড়াছড়ি আসেন। তিনি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামও পরিদর্শন করেন। উষাতন ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ দফায় অস্ত্র সমর্পণ করবেন।

ভোরের কাগজ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

ফুল দিয়ে স্বাগত জানালো বাঙালি-পাহাড়ি তরুণীরা

প্রথম অস্ত্রটি জমা দিয়ে অস্ত্র সমর্পণের সূচনা

করলেন শান্তিবাহিনীর মেজর কনক

হরি কিশোর চাকমা, খাগড়াছড়ি থেকে: বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে বাঙালি ও পাহাড়ি তরুণীরা। গতকাল সোমবার সকালে খাগড়াছড়ির মাইসছড়ি উচ্চ

বিদ্যালয় সমাবেশ ক্যাম্পে এ দৃশ্য দেখা যায়। শান্তিবাহিনীর মেজর কনক এখানে সাংসদ বীর বাহাদুরের হাতে প্রথম অস্ত্রটি তুলে দিয়ে অস্ত্রসমর্পণ প্রক্রিয়ার সূচনা করেন।

গত তিনদিন ধরে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন পাহাড়ি পথ বেয়ে মাইসছড়ির গামারীচালা গ্রামে এসে জড়ো হয়। সেখান থেকে গতকাল সকাল ৯টায় জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরিহিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা কাঁধে ও হাতে অস্ত্র নিয়ে লাইন ধরে সমাবেশ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পায়ে হেঁটে তারা যখন ক্যাম্পের দিকে এগুচ্ছিলেন তখন পথের দুধারে পাহাড়ি-বাঙালি নারী-পুরুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাগত জানায়।

ক্যাম্পের প্রবেশমুখে পাহাড়ি ও বাঙালি তরুণীরা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে বরণ করে নেয়। সাংসদ বীর বাহাদুর, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, সদস্য কৈ শৈ অং মারমাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের স্বাগত জানিয়ে সমাবেশ ক্যাম্প নিয়ে যান। এ সময় সরকারের সঙ্গে সমন্বয়কারী জনসংহতি সমিতি নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পে এসে চা-নাস্তা খেয়ে সকাল সোয়া ১০টায় শান্তিবাহিনীর মেজর কনক সাংসদ বীর বাহাদুরের হাতে প্রথম অস্ত্রটি তুলে দেন। এরপর শুরু হয় সেনাবাহিনী কর্তৃক শান্তিবাহিনীর অস্ত্র পরীক্ষা ও গোলাবারুদ পৃথক করার কাজ এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন। পরে তাদের সমাবেশ ক্যাম্প থেকে খাগড়াছড়ি শহরের চার কিমি. দূরে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। একই প্রক্রিয়ায় দুদকছড়ি এবং রাঙ্গামাটির ঘিলাছড়ি সমাবেশ ক্যাম্প থেকেও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়।

গতকাল রাঙ্গামাটি ঘিলাছড়ি ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানে ছিলেন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে সমন্বয়কারী ছিলেন সুধাসিন্ধু খীসা। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরালাল চাকমা ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য শক্তিপদ ত্রিপুরা। দুদকছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে সমন্বয়কারী ছিলেন শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার (মলয়)। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিশ্বজিৎ চাকমা ও আশীষ চাকমা।

ভোরের কাগজ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তিবাহিনী যেসব অস্ত্র জমা দিচ্ছে আজ

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: শান্তিবাহিনীর ৭৪০ জন সদস্য আজ মঙ্গলবার ৪৭৫টি অস্ত্র ও বিপুল গোলাবারুদ জমা দিচ্ছেন। এসব অস্ত্রের মধ্যে মর্টার, এসএলআর, এসএমজি, এলএমজি, গ্রেনেডসহ প্রচুর বিস্ফোরক রয়েছে। একাধিক সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

খাগড়াছড়ির দুদুকাছড়িতে শান্তিবাহিনীর ২৭৬ জন সদস্য গতকাল রেজিস্ট্রেশন করান। এরা সেখানে জমা দিয়েছেন মোট ২৬৫ টি অস্ত্র। এদের অস্ত্রের মধ্যে ৬৫টি চাইনিজ এসএলআর, ৭৩টি জি থ্রাইফেল, ৫৭টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, ২৭টি এসএমজি, ১০টি এসএমসি, ৭টি মর্টার, ১৫টি চাইনিজ এলএমজি ও ৪টি থ্রি নট থ্রি এলএমজি রয়েছে।

একই জেলার মাইসছড়ি ক্যাম্পে রেজিস্ট্রেশনকৃত ২০৭ জন সদস্য জমা দিয়েছেন ৭৮টি আগ্নেয়াস্ত্র। অন্যদিকে রাঙ্গামাটির ঘিলাছড়ি ক্যাম্পে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন ২৫৬ জন সদস্য। তারা জমা দেন ১৩২টি অস্ত্র। এসব অস্ত্রের মধ্যে পিস্তল, ব্রিটিশ এলএমজি, গ্রেনেড, স্টেনগান রয়েছে। তবে তাদের জমা দেওয়া গোলাবারুদের হিসাব পাওয়া যায়নি।

আজ জমা দেওয়া অস্ত্রের পরিমাণ বাড়তে পারে। জনসংহতি সমিতি সভাপতি সন্ত লারমা গতকাল ক্যাম্পে আসেননি। ফলে তার অস্ত্রটির তালিকা হয়নি। তিনি অবশ্য নিজের অস্ত্রটিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জমা দেবেন। যা প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে নেবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী সন্ত লারমার হাতে তুলে দেবেন সাদা গোলাপ।

ভোরের কাগজ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
অস্ত্র সমর্পণ কর্মসূচির সাফল্য কামনা

কাগজ প্রতিবেদক: বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ কর্মসূচি ও শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের সাফল্য কামনা করেছে। পৃথক পৃথক বিবৃতি ও সমাবেশে এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শান্তিচুক্তির অবশিষ্ট সফল ধারা বাস্তবায়নের স্বপক্ষে সক্রিয় সংহতি গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এক বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করে বলেন, অস্ত্র সমর্পণ কর্মসূচির ফলে দেশের পার্বত্য এলাকায় সশস্ত্র সংঘাতের পরিস্থিতির অবসান ঘটবে।

ওয়ার্কার্স পার্টি এক বিবৃতিতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার গুণ সূচনা বলে অভিহিত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয় সকলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য এই শান্তিচুক্তিতে যে সকল অগ্রগতি রয়েছে তা দূর করা প্রয়োজন।

ভোরের কাগজ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তিচুক্তি বিরোধীদের তৎপরতা
এখনো চোখে পড়ছে খাগড়াছড়িতে

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: শান্তিচুক্তিবিরোধী ক্ষুদ্র অংশটির তৎপরতা প্রকাশ্যে দেখা না গেলেও তাদের উপস্থিতির প্রমাণ চোখে পড়ছে অনেকেরই। জনসংহতি সমিতি ও সন্ত লারমার বিরুদ্ধে পোস্টার আর দেয়াল লিখনে তাদের উপস্থিতি দেখা যায়। আজ অস্ত্র সমর্পণের দিনকে তারা ‘মৃত জনসংহতি সমিতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন’ বলে ঘোষণা করেছে।

শান্তিচুক্তিকে আপোস চুক্তি বলে পাহাড়ি গণপরিষদ, ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একাংশ বিরোধিতা করে আসছে। তারা গত রোববার রাতে স্টেডিয়ামের কাছে একটি তোরণও নষ্ট করেছে। শান্তিবাহিনী সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে এ তোরণটি করা হয়েছিল।

ভোরের কাগজ
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
সকল পাহাড়ি-বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান
পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সমৃদ্ধ এক
রূপসী অঞ্চলরূপে গড়তে চাই : হাসিনা

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘আমরা আর সংঘাত, রক্তপাত, মৃত্যু চাই না। আমরা শান্তি চাই। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সমৃদ্ধ এক রূপসী এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।’ তিনি দল মত নির্বিশেষে দেশের ও জনগণের উন্নয়নে পাহাড়ি ও বাঙালি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

গতকাল মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে এ কথা বলেন। প্রায় ৪৩ মিনিট স্থায়ী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর গৃহীত উদ্যোগ, শান্তিচুক্তি এবং তাতে পাহাড়ি ও বাঙালিদের স্বার্থরক্ষার বিষয়সমূহ, শরণার্থীদের দেশে

ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ, পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি তুলে ধরেন। স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা পাহাড়ি-বাঙালি জনগণ করতালি দিয়ে বারবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন জানায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আজ ১০ ফেব্রুয়ারি দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। অস্ত্র জমা দেওয়ার ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’ তিনি বলেন, কতো বাঙালি-পাহাড়ি মায়ের কোল খালি হয়েছে এখানে দীর্ঘদিন বিরাজমান সংঘাতে। কতো বোন ভাই হারিয়েছে। স্বামী হারিয়েছে স্ত্রীকে। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে। কতো যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আজকের এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, যন্ত্রণা আর নয়। আর কোনো সংঘাত, সহিংসতা, রক্তপাত চাই না। আমরা শান্তি চাই। অস্ত্র সমর্পণকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘তারা এই মাটির সন্তান। পাহাড়ে, জঙ্গলে তাদেরও আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। এই অবস্থার তাই পরিবর্তন আমরা চেয়েছি। যারা আজ অস্ত্র জমা দিচ্ছেন, তাদের বরণ করে নিচ্ছি অন্তরের গভীরতম ভালোবাসায়।’ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামকে পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া কমপ্লেক্সে রূপান্তরের ঘোষণা দেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, অস্ত্র জমাদান দেশের ইতিহাসে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নবদিগন্তের সূচনা করবে। যা দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। উপজাতি ও অ-উপজাতি, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এদেশের সর্বস্তরের জনগণ এর সুফল ভোগ করবে। জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতের সরকারগুলো কখনো সমস্যাটিকে অর্থনৈতিক, কখনো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমস্যাটি ছিল মূলত রাজনৈতিক। তিনি বলেন, ‘আমি ১৯৮২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান জানাই।’ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ১১০ দিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ কমিটিতে বিএনপির ২ জন সংসদ সদস্য ছিলেন। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপি সাংসদদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও তারা অংশ নেননি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রথম থেকেই আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি অসহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করে আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তারা সমগ্র বিষয়টিকে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে

পর্যবেক্ষণ করেন।’ অন্যদিকে বিএনপি শাসনামলে গঠিত কমিটিতে আওয়ামী লীগ সাংসদদের অংশগ্রহণ এমনকি সংসদ থেকে তাদের পদত্যাগের পরও বৈঠকে যোগদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সমস্যার দ্রুত সমাধানে আমরা বিএনপি সরকারকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলাম।’ শান্তিচুক্তি বিরোধীদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপিসহ কয়েকটি সমমনা দল অযৌক্তিকভাবে ভুল তথ্যনির্ভর এবং একপেশে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন।’ তাদের তিনি অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে আসার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা স্পষ্ট করে বলেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য সমুন্নত রেখেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিষয়ে কারো মনে কোনোরূপ ভুল বুঝাবুঝি, অস্পষ্টতা, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচীন হবে না। দেশের সকল নাগরিকের বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি- বাঙালি সকলের অধিকার অতীতে যা ছিল তাই নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা তিনটিতে ডিসি-এসপি থাকবেন, থাকবেন পূর্বের ন্যায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। বাঙালিরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। গুচ্ছগ্রামবাসীরাও স্বভূমিতে থাকবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতির সদস্যদের পাশাপাশি তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করবো। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালি সবাই থাকবেন, কোনো বাঙালিকে বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হবে না।

ত্রিপুরা থেকে ফিরে আসা পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে তিনি বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত থেকে সকল শরণার্থীর দেশে প্রত্যাবর্তন শেষ হবে। তাদের সকলকে সরকার প্রতিশ্রুত ২০ দফা সুবিধা দিয়ে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। ফলে তাদের দুঃসহ শরণার্থী জীবনের অবসান ঘটবে। উপজাতীয় শরণার্থী শব্দটি আমাদের জীবন থেকে চিরদিনের মতো মুছে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাহাড়ে উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বলেন, আশা করি তা বজায় থাকবে এবং স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানীতে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। তিনি বলেন, আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে কোনো অপচেষ্টা কঠোর হাতে দমন করতে বদ্ধপরিকর। আইনশৃঙ্খলাসহ স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা হবে। সরকার সকল নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর কাজ শুরু হয়েছে। চুক্তির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সঠিক নেতৃত্ব। চুক্তি বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে অতীতের দুঃখজনক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, সে সব তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমরা ভুলে যেতে চাই। এসব অভিজ্ঞতাকে অতীতের বিষয় হিসেবে গণ্য করে ভবিষ্যত সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধ এক নতুন জীবনের প্রত্যাশায় সকলকে একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মসূচির বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আশু কার্যক্রম বাবদ ১৫৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি চাহিদা বাবদ ২৮৮ কোটি, মধ্যমেয়াদি বাবদ ৪৬৬ কোটি এবং দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা বাবদ ১২৩৭ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট ২১৪১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তিনি পার্বত্য অঞ্চলে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় করারও ঘোষণা দেন।

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

সস্ত্র লারমা জমা দিলেন এসএমজি, শেখ হাসিনা হাতে তুলে দিলেন সাদা গোলাপের তোড়া

সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা/আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: আড়ম্বরপূর্ণ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এযাবৎ সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রথম দফার অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সুসজ্জিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ২০ হাজারের বেশি পাহাড়ি-বাঙালি জনগণ, মন্ত্রিসভার সদস্য, কূটনীতিক, সামরিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, দেশের বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংবাদ মাধ্যমের শত শত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সস্ত্র) লারমা প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি সাব-মেশিনগান (এসএমজি) তুলে দিয়ে প্রায় ২ হাজার সদস্যের শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এ সময় সস্ত্র লারমার হাতে সাদা গোলাপের একটি তোড়া তুলে দিলে উৎসব আমেজে মুখর উপস্থিত দর্শকরা উল্লাস প্রকাশ করে করতালি দিয়ে এই মহতী ঘটনাটিকে অভিনন্দন জানায়।

আগামী ১৬, ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর আরো তিনটি দল অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। অবসান ঘটবে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা পাহাড়ি-অরণ্যের পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগ স্থায়ী সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহের।

শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ দেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণের পর কোনো একক সশস্ত্র রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধারের এটাই সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। পাহাড়ি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে দুই যুগ আগে জনসংহতি সমিতি সামরিক শাখা গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সশস্ত্র বিদ্রোহের সূচনা করেছিল। সরকার নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তিবাহিনীর যুদ্ধ এবং পাহাড়ি বাঙালি দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের ২০ হাজার মানুষের জীবনহানি ঘটেছে। আর এক যুগের সংলাপ, আলোচনার পর সরকার গত ২ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। সে চুক্তি অনুযায়ী শান্তিবাহিনীর ১ হাজার ৯৩৩ জন সদস্য চার দফায় এ মাসে অস্ত্র সমর্পণ করে বিদ্রোহী তৎপরতার অবসান ঘটাবেন। গতকাল ছিল এর প্রথম আনুষ্ঠানিকতা।

গতকাল দুপুর ১১টা ৫৪ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানস্থল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছেন। তিনি আসন গ্রহণ করার পরপরই শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীত। সেনাবাহিনীর বাজন দল তাদের ব্যান্ডে জাতীয় সঙ্গীতের সুর তুললে স্টেডিয়ামে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানায়। এরপর যথাক্রমে কোরআন তেলওয়াত, ত্রিপিটক, গীতা ও বাইবেল পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানের একমাত্র বক্তা প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে পার্বত্য সমস্যা এবং এর সমাধানে তাঁর সরকারের গৃহীত উদ্যোগ, চুক্তিস্বাক্ষর, এর বাস্তবায়ন, শরণার্থী প্রত্যাশাসন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা, সংঘাত, সহিংসতা, রক্তপাতের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি অস্ত্র সমর্পণকারীদের অন্তরের গভীরতম ভালোবাসায় বরণ করে নিয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, শান্তিচুক্তি সংবিধানসম্মত এবং সার্বভৌমত্বের অধীনে হয়েছে। এ নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। পাহাড়ে বাঙালি পাহাড়ি সবাই থাকবে, বাঙালিদের বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হবে না। গুচ্ছগ্রামবাসী বাঙালিদেরও পুনর্বাসন করা হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন।

শান্তি নষ্টকারী যেকোনো তৎপরতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, এরকম অপচেষ্টা কঠোর হাতে দমন করা হবে।

ভাষণের পর সন্ত্রাস লারমা এগিয়ে গিয়ে একটি এসএমজি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এ সময় মাঠে উপস্থিত জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরিহিত ৭৩৯ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী অস্ত্রটি গ্রহণ করলে দর্শকরা করতালি দিয়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অভিনন্দন জানায়। অস্ত্র সমর্পণকারী সন্ত্রাস লারমার হাতে প্রধানমন্ত্রী সাদা গোলাপের একটি তোড়া তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সঙ্গে সঙ্গেই মাঠে অবস্থানরত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ শুরু হয়। শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে তারা অস্ত্র সমর্পণ করে। উষাতন অবশ্য গতকাল অস্ত্র সমর্পণ করেননি। তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ দলে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। তারা লাইন ধরে ডানে ও বাঁয়ে দুপাশে জমা দেওয়ার স্থানে গিয়ে হাতের অস্ত্রগুলো জমা করতে থাকেন। দর্শকরা প্রায় ১৫ মিনিট স্থায়ী এই অস্ত্র জমার প্রক্রিয়ায় করতালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে।

সংঘাত, হানাহানির অবসান আর শান্তির সম্ভাবনায় যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় প্রধানমন্ত্রী হাতে শ্বেতকপোত ও বেলুন উড়িয়ে আরো উৎসবের আমেজ দেন। গ্যালারি এবং মাঠ থেকে আরো অসংখ্য কপোত আর বেলুন বাধামুক্ত হয়ে আকাশে উড়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় সন্ত্রাস লারমাকে অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে নিয়ে যান। মঞ্চে আগে থেকেই উপবিষ্ট ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা শরদেন্দু শেখর চাকমা, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান বীর বিক্রম, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবু কায়সার ফজলুল কবির।

অস্ত্র সমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা এবং পার্বত্য তিন জেলার শিল্পীরা নাচে গানে বাংলাদেশের অখণ্ডতা, পাহাড়ি-বাঙালির সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরেন। শিল্পকলা একাডেমীর আয়োজনে এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন শিল্পী শামীম আরা নীপা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন আজাদ রহমান।

এদিকে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে খাগড়াছড়ি শহরে এক উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নানা রঙের ব্যানার ফেস্টুনে এবং প্রায় সকল

ভবন ও দোকানপাটে সাদা পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল। শান্তিবাহিনীর সদস্য আর প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে নির্মিত হয়েছিল প্রায় ৩০টির মতো তোরণ। ভোর থেকেই জনতার ঢল নামে শহরে। শহরের বাইরে থেকে অন্য দুই পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান থেকেও প্রচুর লোক সমাগম হয়। শহরের সকল রাস্তা দিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, এমনকি বয়স্ক নারী-পুরুষ স্টেডিয়ামে যেতে থাকে। সকাল সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ৯টার মধ্যেই ২০ হাজারের বেশি জনতা স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়ে। বাইরে অপেক্ষমাণ তখনো আরো হাজার হাজার মানুষ। অবশেষে সাড়ে ৯টায় শহরের চেন্সি স্কোয়ারের মোড়ে নিরাপত্তা রক্ষীরা স্টেডিয়ামমুখী সড়ক বন্ধ করে দিয়ে লোকজনকে ফিরিয়ে দিতে থাকে।

শহরের মতো স্টেডিয়ামটিও সাজানো হয়েছিল বর্ণাঢ্যভাবে। প্রচুর ফেস্টুন, ব্যানার গ্যালারির ওপর প্যাভেল, অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে, প্রেস মিডিয়া, ফটো সাংবাদিকদের জন্য পৃথক পৃথক স্থানের জায়গা করা হয়েছিল। মাঠের মাঝে লাইন ধরে বসানো হয়েছিল ৭৪০টি চেয়ার। এসব চেয়ারে অস্ত্র সমর্পণকারীরা পরে বসেন। আর তাদের দুপাশে অস্ত্র জমা রাখার স্থান তৈরি হয়েছিল।

ঠিক সকাল ১১টায় অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনী সদস্যদের দলটি স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে শুরু করে। একজন একজন করে লাইন ধরে জলপাই রঙের ইউনিফর্ম এবং একই রঙের কাপড়ের ক্যাপ পরিহিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যখন স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে উপস্থিত জনতা উল্লাস প্রকাশ করে তাদের শুভেচ্ছা জানায়। প্রথম দলটি ছিল খালি হাতে। ১১টা ১০ মিনিটে অস্ত্র হাতে সদস্যরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। এ দলের নেতৃত্ব দেন মেজর আলাপূর্ণ চাকমা। তাদের কারো হাতে এসএলআর, এসএমজি, কারো কাছে ছিল মর্টার। পুরো অনুষ্ঠান শেষ করে প্রধানমন্ত্রী স্টেডিয়াম ত্যাগ করার পর দুপুর পৌনে ২টায় তারা স্টেডিয়াম ছেড়ে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে যান। সোয়া তিন ঘণ্টা প্রখর রোদে তারা স্টেডিয়ামেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য গতকাল সকালে সাংসদ বীর বাহাদুর সড়ক পথে দুদকছড়ি সীমান্ত থেকে সন্ত্রাস লারমাকে খাগড়াছড়িতে নিয়ে আসেন। অনুষ্ঠান শেষে বীর বাহাদুর তাকে আবার দুদকছড়ায় দিয়ে আসেন। সন্ত্রাস লারমা তার দলের সঙ্গে থেকে অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করবেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ দলের অস্ত্র সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাগড়াছড়ি আসেন ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে। অনুষ্ঠান শেষে একইভাবে তিনি ঢাকা ফিরে যান।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে শহরে ও স্টেডিয়ামে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীর তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। শান্তিচুক্তিবিরোধী পাহাড়ি তরুণ-তরুণীদের স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা ছাড়া আর কোনো অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। বিএনপি ও সমমনা দলগুলো আহুত হরতালেরও কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়া ছিল না খাগড়াছড়িতে।

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সন্ত্র লারমা শান্তিবাহিনীর

সদস্য বা অস্ত্রধারী ছিলেন না

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ জন সদস্য গতকাল মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ৪৬৩টি আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিয়েছে। সরকার ও নিরাপত্তাবাহিনীর একাধিক সূত্রে গতকাল এ সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। সন্ত্র লারমার অস্ত্র সমর্পণ নিয়ে যে বিভ্রান্তি হয়েছিল তা দূর হয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি হিসেবে সন্ত্র লারমা শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। কিন্তু তিনি শান্তিবাহিনীর সদস্য নন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টি ছিল প্রতীকী। ফলে তাকে শান্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়নি। তাই অস্ত্র সমর্পণকারীদের তালিকায় তার নামও নেই। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সন্ত্র লারমা যে এসএমজিটি সমর্পণ করেন সেটি গত সোমবার শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সমাবেশ ক্যাম্পে যে অস্ত্র জমা দেন তা থেকে তুলে আনা। সন্ত্র লারমা এ অস্ত্রটি ব্যবহার করেননি।

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

গ্যালারিতে চুক্তিবিরোধী পাহাড়িদের

ব্যানার প্রদর্শন, বিক্ষোভ

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: শান্তিচুক্তি বিরোধী পাহাড়িরা গতকাল মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। মূল অনুষ্ঠান হওয়ার আগে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্ত্র) লারমা সোয়া ১১টায় স্টেডিয়ামে উপস্থিত হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে গ্যালারিতে মঞ্চের মুখোমুখি অংশে বসা বিরোধীরা ব্যানার উঁচিয়ে, কালো কাপড় দুলিয়ে

বিক্ষোভ দেখায়। এসময় পুলিশ সদস্যরা ব্যানার কেড়ে নিতে গেলে তারা পুলিশকেও মারধর করে। পরে সেনা সদস্যরা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

১১টা ২৫ মিনিটে আকস্মিকভাবেই গ্যালারিতে অল্প কজন পাহাড়ি তরুণ-তরুণী একটি ব্যানার তুলে ধরে। পাহাড়ি গণ পরিষদ, ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন সমর্থকদের ব্যানারে লেখা ছিল ‘আপোস চুক্তি মানি না- পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই’, ‘নো ফুল অটোনমি- নো রেস্ট’। তারা একই ধরনের কয়েকটি পোস্টারও প্রদর্শন করে। এসময় বিক্ষোভকারী মেয়েরা তাদের কালো ওড়না উড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের কিছু সদস্য কর্মকর্তা তাদের এ কাজে নিবৃত্ত করতে গেলে তারা পুলিশকে কিল, ঘুষি, লাথিও মারে। বিক্ষোভকারীরা সন্ত্র লারমা ও জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয় এবং চিৎকার করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত একটু দূরে অবস্থানরত সেনা সদস্যরা এগিয়ে আসে। তারা বিক্ষোভকারীদের কাছ থেকে ব্যানার, পোস্টার কেড়ে নেয়। সেনা সদস্যরা তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে এবং সেখানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে, অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে। বিক্ষোভের ধরন দেখেই বোঝা যায় তারা সন্ত্র লারমা ও জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধেই তাদের ক্ষোভ জানাচ্ছিল।

একই সময় তাদের কিছুটা দূরে গ্যালারিতে বসা বেশ কিছু পাহাড়ি ও বাঙালি দর্শক সাদা পতাকা দুলিয়ে শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানায়। তাদের পোস্টারে লেখা ছিল ‘আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চাই’।

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত, জনসংহতি সমিতি

রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করবে : সন্ত্র লারমা

রাষ্ট্রাঙ্গাটি প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে: অস্ত্রসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিবাহিনী স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করবে। জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্ত্র) লারমা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান।

গতকাল মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর প্রথম দফা অস্ত্র সমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন সন্ত্র লারমা। এ সময় তিনি হাসিখুশি ও উৎফুল্ল ছিলেন। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হলে এ মুহূর্তে বলা যাবে না বলে জানান।

অস্ত্রসমর্পণের পর শান্তি আসবে কিনা— প্রশ্ন করা হলে সন্ত লারমা বলেন, শান্তি হচ্ছে আপেক্ষিক ব্যাপার। তাহলে অস্ত্রসমর্পণ কেন করলেন— প্রশ্ন করা হলে তিনি এর উত্তর সরকারের কাছ থেকে জেনে নিতে বলেন। অস্ত্রসমর্পণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সন্ত লারমা বলেন, খুবই ভালো লাগছে।

নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সন্ত লারমা নিজেকে নিরাপদ মনে করেন বলে জানান এবং সরকারই নিরাপত্তা দেবে বলে উল্লেখ করেন। তবে বিএনপি এবং জামাতের শাস্তিচুক্তির বিরোধিতা সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি। সন্ত লারমা নিজেদের ‘বিদ্রোহী’ হিসেবে আখ্যা দিতে রাজি নন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘কে বলেছে বিদ্রোহ করেছে। আমরা হচ্ছে অধিকারকামী, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামী আমরা।’ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কতোটুকু পাওয়া গেছে তা চুক্তি বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে বলে সন্ত লারমা উল্লেখ করেন।

বাঙালিদের ভয়, আপনারা সব জমিজমা কেড়ে নেবেন— এ প্রশ্নের উত্তরে সন্ত লারমা বলেন, যারা বেআইনিভাবে দখল করে আছে জমিজমা তাদের তো ছেড়ে দিতে হবে। এখন যদি আপনার জমি কেউ দখল করে আপনি ছেড়ে দেবেন? আপনি কি যাবেন না সেখানে? ভারতে আশ্রিত পাহাড়ি শরণার্থীরা এ মাসের মধ্যে ফিরে আসবেন বলে সন্ত লারমা জানান।

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন কিনা— প্রশ্ন করা হলে সন্ত লারমা বলেন, এটা আমার ব্যাপার না, সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। অস্ত্রসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এখন যার যার বাড়িতে চলে যাবে। সরকার চুক্তি অনুযায়ী তাদের টাকা পয়সা দিয়ে দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সরকার কতোটুকু আন্তরিক— এ প্রশ্নের জবাবে সন্ত লারমা বলেন, ‘সরকার আন্তরিক বলেই তো একটা চুক্তিতে এলো।’ সামনে বড়ো বাধা কি— এ সম্পর্কে সন্ত লারমা স্পষ্ট কিছু না বললেও ‘সাংবাদিকরা সবকিছু জানেন’ বলে উল্লেখ করেন।

পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শাস্তিচুক্তির বিরোধিতা সম্পর্কে সন্ত লারমা বলেন, ‘পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটা ক্ষুদ্র অংশ এই অর্থে বিরোধিতা করছে যে, তারা মনে করে এখানে শান্তি আসবে না, পার্বত্য সমস্যার সমাধান হবে না। তারা পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের কথা বলছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, চুক্তির মধ্যে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা যদি কার্যকর হতে পারে যৌক্তিকভাবে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানের পথ অবশ্যই মুক্ত হবে এবং তার ভিত্তিটা রচিত হবে।’ বিরোধিতাকারীদের প্রতি কোনো আহ্বান আছে কিনা— প্রশ্ন করা হলে সন্ত লারমা এ মুহূর্তে তার কোনো কিছু বলার নেই বলে জানান।

মানবাধিকার লঙ্ঘন, লোগাং, নানিয়ারচর গণহত্যা, কল্লনা চাকমা অপহরণের বিচার দাবি করবেন কিনা— প্রশ্ন করা হলে সন্ত লারমা এগুলো অনেক বড়ো, জটিল এবং বিতর্কিত প্রশ্ন বলে উল্লেখ করে বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো কিছু বলা উচিত নয়।

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সন্ত লারমা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে : তিন পাহাড়ি সংগঠন

তিনটি পাহাড়ি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে জনসংহতি সমিতির অস্ত্র জমাদানের সমালোচনা করে তাকে ‘আত্মসমর্পণ’ ও ‘জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা’ বলে উল্লেখ করেছে। পাহাড়ি গণপরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত খীসা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি দীপ্তি শঙ্কর চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমা এক বিবৃতিতে বলেন, সন্ত লারমা চক্র জনতার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের পথ ধরেছে। আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে তারা জাতীয় বেঈমান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ বলেন, অস্ত্র সমর্পণ করলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। তারা বলেন, যতোদিন পাহাড়ি জনগণ তাদের জায়গা জমি ফেরত না পাচ্ছে, বিভিন্ন সময়ের হত্যাকাণ্ডের বিচার না হচ্ছে ততোদিন এ অঞ্চলে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিজ্ঞপ্তি।

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণে অভিনন্দন

কাগজ প্রতিবেদক: শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণকে অভিনন্দন জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি প্রদান করেছে। বিবৃতিতে তারা বলেন, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিনের শস্ত্র তৎপরতার অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসবে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্ত্র সমর্পণকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বর্ণাঢ্য মিছিল ও সমাবেশ করে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ইসহাক আলী খান পান্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মনিরুজ্জামান মনির, আখতার হোসেন, সুজিত রায় নন্দি, গোলাম সারোয়ার টুকু, আবদুল ওয়াদুদ খোকন প্রমুখ। সমাবেশে ইসহাক

আলী খান পান্না প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ধারাবাহিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত সাফল্যের অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে শান্তিচুক্তি ও অস্ত্র সমর্পণ একটি বিরল কৃতিত্ব। সমাবেশে ইসহাক আলী খান পান্না শান্তিচুক্তির বিরোধিতার নামে যেকোনো ধরনের হঠকারিতা প্রতিহত করার আহ্বান জানান।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি আ স ম আবদুর রব এবং সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের সভাপতি এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মঞ্চ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন পরিষদ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

ভোরের কাগজ
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
সম্পাদকীয়
শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

এক উৎসবমুখর পরিবেশে গতকাল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে সূচিত হলো শান্তির নতুন অধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের প্রতি অবিচল আনুগত্য রেখে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিতে পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে সকলের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে, এখানে সবাই মিলেমিশে থাকবে।

পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘ দুই দশকের সংঘাত ও হানাহানির অবসান ঘটলো। এটা সত্যিই দুঃখজনক যে, দেশের এক-দশমাংশ ভূখণ্ডে এতোদিন ধরে চলেছে নির্মম রক্তাক্ত সংঘর্ষ। সমস্যাটি ছিল মূলত রাজনৈতিক। কিন্তু অতীতে অস্ত্রের মাধ্যমে এর সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। একদিকে পাহাড়িরা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছিল। অন্যদিকে বিদ্রোহ দমন তৎপরতায় নিয়োগ করা হয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনীকে। এই দীর্ঘ সময় নিরাপত্তাবাহিনী, শান্তিবাহিনী, পাহাড়ি ও বাঙালি সম্প্রদায়ের ২০ হাজারেরও বেশি সদস্য প্রাণ দিয়েছেন। এই বিপুল প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞের শেষ প্রান্তে এসে আমরা উপলব্ধি করছি যে, এই সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান নেই। গুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনা। বিগত দুটি সরকারের শান্তি প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি আলোচনায় গতি সঞ্চার করে। গত ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী শান্তিবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করলো। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী

শরণার্থীরা ফিরে আসছে। অচিরেই তাদের সবাই ফিরে আসবে। আজ সত্যিই সমগ্র জাতির আনন্দের দিন।

এটা দুঃখজনক যে, প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ কয়েকটি দল শান্তিচুক্তি ও অস্ত্র সমর্পণ প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ একটি উন্নয়ন প্রত্যাশী জাতির জন্য নিজ দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। শান্তি সমগ্র জাতির অভিন্ন স্বার্থ। সম্পাদিত শান্তিচুক্তির কোনো ধারায় আপত্তি থাকলে বিএনপির উচিত সংসদে গিয়ে তা তুলে ধরা। দেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু থাকলে নিশ্চয়ই তা সংশোধন করা প্রয়োজন। সংসদীয় পদ্ধতিতেই এর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেই নিয়মসিদ্ধ পথে না গিয়ে শান্তির কথা বলে অশান্তি সৃষ্টি কারো কাম্য হতে পারে না।

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন ও পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। শান্তিচুক্তির ধারা অনুযায়ী সংসদে আইন প্রণয়ন এবং আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে— এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা মনস্তাত্ত্বিক জগতে। দীর্ঘদিনের বৈরিতার মধ্য দিয়ে পাহাড়ি ও বাঙালির মনোজগতে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে সেটা যতো দ্রুত কমিয়ে আনা যায় ততোই মঙ্গল। পাহাড়ি অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম শর্ত।

এটা ঠিক যে, পাহাড়িদের একটি ক্ষুদ্র অংশ শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছে। বাঙালিদের একটি অংশের মধ্যেও এরকম মনোভাব রয়েছে। এই বিরোধিতার অবসানের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, শান্তিচুক্তির সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রমাণ করা যে, এই চুক্তি আসলেই সকলের শান্তির জন্য নিবেদিত। ইতিমধ্যে উস্কানি বা হানাহানি সৃষ্টির যেকোনো অপচেষ্টার মুখে ধীর স্থির ও শান্তিপূর্ণ থাকার জন্য পার্বত্য অঞ্চলের সকলের প্রতি আমরা আবেদন জানাই। শান্তি আমাদের সকলের একান্ত কাম্য।

ভোরের কাগজ
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে
অস্ট্রেলিয়া সহায়তা দেবে

কূটনৈতিক প্রতিবেদক: পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে অস্ট্রেলীয় সরকার সহায়তা দেবে। বাংলাদেশ সফররত অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার

গতকাল মঙ্গলবার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে একথা জানান। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ।

বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাউনার বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আমরা স্বাগত জানাই। এই এলাকার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব দিলে অস্ট্রেলিয়া তা বিবেচনা করবে। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় অনুষ্ঠিত ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে উভয় দেশ দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে।

বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৭-৯৮ সালে বাংলাদেশের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৩ দশমিক ৩ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার। এর মধ্যে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৮ দশমিক ৩ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার।

তিনি আরো বলেন, এবছর অস্ট্রেলিয়া ২৪টি অতিরিক্ত বৃত্তি বাংলাদেশ সরকারকে দিয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট একাডেমিতে বাংলাদেশের দুজন তরুণ ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, একটি স্বতন্ত্র মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে সহায়তা দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বৈঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির চিত্র তুলে ধরে অস্ট্রেলীয় সরকারের সহায়তা কামনা করেন।

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর সদস্যরা গ্রামের বাড়িতে ফিরছে

প্রথম দফায় অস্ত্র সমর্পণকারীরা পুনর্বাসনের

জন্য মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা পেয়ে গেছেন

আজিম-উল-হক, খাগড়াছড়ি থেকে: দুই যুগের সংঘাত-সংঘর্ষের অবসানে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম ধাপেই অস্ত্র সমর্পণের পর শান্তিবাহিনীর সদস্যরা নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে যাচ্ছে। গতকাল খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে পেরাছড়া হাইস্কুল ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪২৪ জন নিজ বাড়িতে ফিরে গেছে।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন জানান, মঙ্গলবার, অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ সদস্যের মধ্যে সরকার প্রতিশ্রুত মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৩ কোটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ট্রানজিট ক্যাম্পে সোনালী ব্যাংকের

বিশেষ শাখা থেকে সরকারি কর্মকর্তা ও জনসংহতি সমিতি নেতাদের উপস্থিতিতে এ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রশাসন গতকাল খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন থানায় ও গ্রামে পুলিশ প্রহরায় বাস, ট্রাক ও জিপে করে তাদের পৌঁছে দেওয়া হয়। গতকাল মহালছড়িতে ১২৫, খাগড়াছড়ি সদরে ৫৮, দীঘিনালা থানায় ১০৭, মাটিরাজা থানায় ১৮ ও বাঘাইঘাটে ৩৫ জন অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্য নিজ বাড়িতে ফিরে গেছেন। অবশিষ্ট ৩১৫ জনকে আজ রাক্ষাসমাটিসহ বিভিন্ন থানায় নিজ গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গত মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে জনসংহতি সমিতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমার নেতৃত্বে ৭৩৯ জন শান্তিবাহিনী সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। আগামী ১৬, ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি আরো ৩ দফায় শান্তিবাহিনীর বাকি সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কথা রয়েছে।

এদিকে গত মঙ্গলবার শান্তিবাহিনী সদস্যদের আড়ম্বরপূর্ণ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান শেষে খাগড়াছড়ি শহরে আগের নিরিবিলি পরিবেশ ফিরে এসেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে ২০ দিন আগে প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাক্ষাসমাটি ও বান্দরবান থেকে হাজার হাজার মানুষ, শ-শ গাড়ি খাগড়াছড়ি শহরে সমবেত হলে ছোট্ট পাহাড়ি জেলা শহরটি ভীষণ ব্যস্ত নগরীতে পরিণত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতায় সেজে উঠেছিল শহরটি। অনুষ্ঠান শেষে মঙ্গলবারই বেশির ভাগ অতিথি খাগড়াছড়ি ত্যাগ করেন। বাকিরা ফিরে গেছেন গতকাল। শহর খাগড়াছড়ি তাই আবার ফিরে এসেছে পুরোনো রূপে।

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণের খবর ব্যাপকভাবে

প্রচারিত হয়েছে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে

দাউদ হায়দার, বার্লিন থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এবং শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের ঘটনা পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্�ণের খবর ইউরোপের মিডিয়ায় তুমুলভাবে প্রচারিত হয়েছে। কেবল বিবিসি, সিএনএন টিভি, রেডিও-ই নয়, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, সুইজারল্যান্ড, জার্মানির রেডিও-টিভি-সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবেই তুলে ধরা হয়েছে।

জার্মান টিভি সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের খবরাখবর প্রচারে তেমন মনোযোগী নয়, বাংলাদেশে সাংঘাতিক বন্যা হলে, কয়েক হাজার মানুষ মারা

গেলে তবেই ছিটেফোঁটা সংবাদ প্রচার করে। কিন্তু শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের খবর ও ছবি গুরুত্ব দিয়েই প্রচার করেছে। শেখ হাসিনার বাংলা ভাষণের কিছু অংশও শুনিয়েছে। জার্মান টিভিতে শেখ হাসিনার প্রশাসনিক দক্ষতারও প্রশংসা করা হয়েছে। ফ্রেন্স টিভি ‘আরটে’ শুধু খবর বা অস্ত্র সমর্পণের ছবি দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, শান্তিচুক্তি নিয়ে বিশেষ কमेंটারিও করেছে।

জার্মানির ডাকসাইটে পত্রিকা ‘ফ্রাঙ্কফুর্টার ‘রুন্ডশাও’ সংবাদভাষ্যে লিখেছে, বাংলাদেশের মানুষ শান্তিবাহিনীর সঙ্গে শেখ হাসিনা সরকারের শান্তিচুক্তিকে মনেপ্রাণেই স্বাগত জানিয়েছে, তাই পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হয় অস্ত্র সমর্পণ দেখতে। যদিও, বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দলের কেউ যাননি, প্রথম থেকেই শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছে, কিন্তু এই বিরোধিতা আদৌ ধোপে টেকেনি, তার প্রমাণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুষ্ঠু রাজনীতির ধারাকেই ফিরিয়ে আনছেন বাংলাদেশে।’

ভোরের কাগজ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

‘শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের দিন

হরতাল ডেকে খালেদা জিয়া জাতিকে

অপমান করে বিদেশ চলে গেছেন’

কাগজ প্রতিবেদক: সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা গতকাল বুধবারও অব্যাহত ছিল। গতকাল আলোচনা করেন চারজন সাংসদ।

সরকারি দলের সাংসদ ড. মোহম্মদ সেলিম আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, জাতীয় সংসদ ও গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে বিরোধীদলীয় নেত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন নাই। তিনি এ দিন হরতাল ডেকে জাতিকে অপমান করে বিদেশ চলে গেছেন।

এছাড়া শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিনাতুল্লাহা তালুকদার, আওয়ামী লীগের কামাল আহমেদ মজুমদার ও জাতীয় পার্টির গোলাম ফারুক অভিও বক্তব্য রাখেন।

ড. মোহম্মদ সেলিম ভাষণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বেগম জিয়া কথায় কথায় সার্বভৌমত্বের কথা বলেন। দেশের সার্বভৌমত্ব কোনোদিন হুমকির সম্মুখীন হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা

রক্ত দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে সংসদে ফিরে আসার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টির সাংসদ গোলাম ফারুক অভি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আসামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে সংগ্রামকারী অনুপ চেটিয়াকে গ্রেপ্তার করেছেন। যে ভারত সরকার তাকে ফাঁসি দিতে চায় অনুপ চেটিয়াকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সরকার উদ্বীষ।

গতকাল সংসদের অধিবেশনে ডেপুটি স্পিকার আব্দুল হামিদ সভাপতিত্ব করেন। প্রশ্নোত্তর জনগুরুত্ব সম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের নিষ্পত্তি শেষে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কমিটির সভাপতি এডভোকেট রহমত আলী কমিটির ২০তম রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হওয়ায় দি কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর (সংশোধনী) বিল ১৯৯৭ উক্ত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়।

সংসদের অধিবেশন আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় আবার শুরু হবে।

ভোরের কাগজ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাউনার

পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে

সহায়তা দেবে অস্ট্রেলিয়া

কূটনৈতিক প্রতিবেদক: দুদিনের বাংলাদেশ সফর শেষে দেশে ফেরার আগে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাউনার বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অস্ট্রেলিয়া অংশ নেবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি খাতে সহায়তা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা তাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছি। কারণ কৃষি খাতের ব্যাপারে আমাদের বিশেষজ্ঞ রয়েছে।

গতকাল বুধবার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী এবং ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা অভূতপূর্ব। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ জাতীয় সমস্যা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, সামরিক পন্থায় এই সমস্যা সমাধানযোগ্য নয়।

রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান করতে হবে। তিনি বলেন, ফিলিপাইনে মুসলিম অধ্যুষিত মিন্দানাও সমস্যা এবং নিউজিল্যান্ডেও একই ধরনের সমস্যার সমাধান হয়েছে। তবে দুটি ক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধানের জন্য তৃতীয় একজন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ নিজেরাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করেছে। এই দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্জনকে অভূতপূর্ব বলা যায়।

ভোরের কাগজ

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

প্রথম দফায় অস্ত্র সমর্পণকারী

শান্তিবাহিনীর সবাই বাড়ি ফিরেছে

আজিম-উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর আরো ২৫৭ জন সদস্যকে গতকাল বৃহস্পতিবার নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রথম দফায় অস্ত্র সমর্পণকারী ৭৩৯ জনের সবাই ঘরে ফিরে গেছে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, সরকারি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় স্থানীয় পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে ১০০ জন রাঙ্গামাটি, ৩৬ জন নানিয়ারচর, ৪০ জন কাউখালী, ৩২ জন কাপলিং, ১৮ জন মাটিরাঙ্গা ও ৩১ জন গুইমারা ও লক্ষ্মীছড়িতে পাঠানো হয়েছে। বাস, ট্রাক ও জিপে করে তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

ট্রানজিট ক্যাম্পের সবাইকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ফলে পেরাছড়া ক্যাম্পটি বন্ধ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, তারা গত ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল।

এদিকে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়িতে দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। দ্বিতীয় দফায় শান্তিবাহিনীর আরো ৫ শতাধিক সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবে।

বান্দরবান প্রতিনিধি জানান, প্রথম দফায় অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর তিনজন সদস্য গতকাল বান্দরবানে পৌঁছে। তাদের একজনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি দুজনকে আজ শুক্রবার থানচিতে তাদের বাড়িতে পাঠানো হবে।

ভোরের কাগজ

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

প্রস্তুতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

শান্তিবাহিনীর ৫৫০ সদস্য সোমবার

বাঘাইছড়িতে অস্ত্র জমা দেবে

হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে: সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণের মধ্যদিয়ে আরো ৫৫০ সদস্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানায় অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম এ অনুষ্ঠানে প্রথম অস্ত্রটি গ্রহণ করবেন।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে প্রধানমন্ত্রীর হাতে জনসংহতি নেতা সন্ত লারমার অস্ত্র জমা দেওয়ার মাধ্যমে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধারা শুরু হয়। ৫ দফায় অস্ত্র সমর্পণের দ্বিতীয়টি আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকাল ১১টায় বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শুরু হবে। তার আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের কচুছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর ৫৫০ জন সদস্য এসে টাঙ্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপংকর তালুকদারের তত্ত্বাবধানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা শান্তিবাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ পরীক্ষা ও পৃথক করার কাজ করবেন। এ সময় জনসংহতি সমিতির নেতা সুধাসিন্ধু খীসা উপস্থিত থাকবেন। সমাবেশ ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে, বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ও বাঘাইছড়ি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে। অস্ত্র সমর্পণে নেতৃত্ব দেবেন শান্তিবাহিনীর দক্ষিণ অঞ্চলের কমান্ডার মেজর পেলে।

১৬ ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠানকে ঘিরে বাঘাইছড়ি থানায় উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। সমাবেশ ক্যাম্প, ট্রানজিট ক্যাম্প, স্টেজ নির্মাণে প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চলছে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ। সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশের সমন্বয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি দেখতে টাঙ্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপংকর তালুকদার, স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা, রাঙ্গামাটি রিজিয়ন কমান্ডার আ ত ম জহিরুল আলম, জেলা প্রশাসক শাহ আলম, পুলিশ সুপার এম এ জামান বাঘাইছড়ি ঘুরে এসেছেন।

প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর ৫৫০ জন সদস্যের প্রত্যেককে চুক্তি অনুযায়ী ৫০ হাজার করে টাকা প্রদানের

জন্য ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থানকালীন সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য টেলিভিশন, বিসিপি, জেনারেটর ও বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে রাষ্ট্রাঙ্গাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ।

এদিকে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান টেলিভিশন এবং বেতারে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা না থাকলেও পরে ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাষণ দেবেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপংকর তালুকদার ও সাংসদ বীরবাহাদুর।

ভোরের কাগজ

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বাঘাইছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ কাল কর্মসূচিতে কিছু রদবদল

হরি কিশোর চাকমা, রাষ্ট্রাঙ্গাটি থেকে: আগামীকাল সোমবার রাষ্ট্রাঙ্গাটি জেলার বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান। এ লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তবে অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে।

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ পরীক্ষা ও পৃথক করার আনুষ্ঠানিকতা আজ হচ্ছে না। সরকার পক্ষ, জনসংহতি সমিতি ও যোগাযোগ কমিটির প্রতিনিধিদের মধ্যে গতকাল এক আনুষ্ঠানিক বৈঠকে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক বৈঠকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপংকর তালুকদার, রাষ্ট্রাঙ্গাটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সহিদুল্লাহ মজুমদার, জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা এবং যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরা লাল চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

অস্ত্র সমর্পণের পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী, আগামীকাল সোমবার সকাল ৮টায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বাঘাইছড়ি গ্রাম থেকে বাঘাইছড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবেন। সাংসদ দীপংকর তালুকদার অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলো জমা দেওয়ার পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেগুলো পরীক্ষা করবে এবং খালি অস্ত্রগুলো অনুষ্ঠান স্থলে নিয়ে যাবে। সকাল সাড়ে ১০টায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা খালি হাতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে যাবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের ভাষণ শেষ হওয়ার পর শান্তিবাহিনীর

দক্ষিণ অঞ্চলের কমান্ডার মেজর পোলে জমা দেওয়া অস্ত্র থেকে একটি অস্ত্র তার হাতে তুলে দেবেন। অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠান শেষে একই স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে। এদিকে আগামীকাল শান্তিবাহিনীর ৫৫০ জন সদস্যের অস্ত্র সমর্পণের কথা থাকলেও ৫ জন পরে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। সে অনুযায়ী আগামীকাল ৫৪৫ জন অস্ত্র সমর্পণ করবেন। অপরদিকে অস্ত্রসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রসমর্পণের পরদিন অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি স্ব স্ব গ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। সে অনুযায়ী প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বলে প্রশাসনের একটি সূত্র উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, গত ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ জন সদস্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন।

ভোরের কাগজ

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর সদস্যরা বাড়ি ফিরে খুশি, গ্রামবাসীরাও খুশি

আজিম-উল-হক খাগড়াছড়ি থেকে: দীর্ঘ সশস্ত্র তৎপরতার ইতি টেনে পাহাড়ি পল্লী যে সব যোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন তাদেরকে সানন্দে বরণ করে নিচ্ছে গ্রামবাসী। দলে দলে গ্রামবাসী স্বজনরা তাদের বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছে, অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্যরাও এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে দাওয়াত খাচ্ছে। গ্রামবাসী সকল সংগ্রামী ফিরে আসার পর সংবর্ধনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১০ ফেব্রুয়ারি প্রথম দলে জনসংহতি সমিতির ৭৩৯ জন ফিরে আসেন। প্রথম পর্যায়ে সমিতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্ত লারমা ও উষাতন তালুকদার ছাড়া অন্য সকলেই নিজেদের স্ব স্ব গ্রামে পৈত্রিক বসত ভিটায় প্রিয়জনের কাছে ছুটে গেছেন।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্য সুধাকর ত্রিপুরা (পার্টি নাম মুন) ও কল্লোল ত্রিপুরা খাগড়াছড়ির খাগড়াপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে এ প্রতিবেদককে বলেছেন, দীর্ঘ অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পর শান্তিচুক্তির মাধ্যমে অধিকার নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি জন্ম জনগণের চিন্তা-ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে। তারা বলেছেন, সম্পাদিত শান্তিচুক্তিতে পাহাড়ি বাঙালির অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। শান্তিচুক্তির বিরোধিতাকারী পাহাড়ি বাঙালিদের সম্পর্কে তারা বলে প্রতিটি সমাজে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা ভালো

কিছুকে গ্রহণ করতে চায় না। তারা হীনস্বার্থচরিতার্থ করার জন্য এ বিরোধিতা করছেন বলে মন্তব্য করেন। সুধাকর ত্রিপুরা বলেন, সময় প্রেক্ষিত ও বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে আমাদের নেতারা বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের পক্ষে যা কিছু দেখা সম্ভব সে সব বিবেচনা করেই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

‘জন্ম জাতি’র অধিকার আদায়ের সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের পাহাড়ি যুবক তিন সন্তানের জনক স্ত্রী বিজয়া ত্রিপুরাকে সঙ্গে নিয়ে সুধাকর ত্রিপুরা ‘৯৫ সনের জুন মাসে শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে রাঙ্গামাটি লংগদু ও পোঠ এলাকায় পার্টির কাজে নিয়োজিত ছিল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা গভীর জঙ্গলে বাস করতো অতি কষ্টে। স্বপ্ন দেখতো অধিকার নিয়ে নতুন জীবনের। আজ সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রথম দফায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। গত শুক্রবার খাগড়াপুরের বাড়িতে তার স্ত্রী বিজয়া বলেন, সংগ্রামী জীবন কষ্টকর হলেও তৃপ্তির। সুধাকর বলেন, সংগ্রামী জীবনে স্ত্রীদের অনুপ্রেরণা মনকে চাপা করে তোলে। তিনি বলেন, ঘরে ফিরে এসেছি। এখন চাই চুক্তির সফল বাস্তবায়ন। তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই।

সুধাকরের অপর সতীর্থ কল্লোল ত্রিপুরী একই গ্রামের। এক সন্তানের জনক কল্লোল স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে একই সালে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেন। পাহাড়ের পল্লীতে অরণ্যে পার্টির কাজ করেন। তিনি বলেন, ছোট একটি মহল এ চুক্তির বিরোধিতা করছে। সময়ই বলে দেবে তারা ভুল পথে আছে।

গতকাল বাজার করতে আসা সমং মার্মা ও পেরাছড়ার প্রমিলা চাকমা বলেন, অস্ত্র জমা দিয়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা গ্রামে ফিরে আসায় গ্রামবাসী খুবই আনন্দিত। যুদ্ধ আর হবে না, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ প্রত্যাশায় আছি।

ভোরের কাগজ

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজ বাঘাইছড়িতে শান্তিবাহিনীর

দ্বিতীয় দফা অস্ত্রসমর্পণ

হরি কিশোর চাকমা, বাঘাইছড়ি থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামের নামে দীর্ঘদিন সশস্ত্র তৎপরতায় লিপ্ত শান্তিবাহিনীর আরো ৫৪৫ যোদ্ধা আজ অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আজ বাঘাইছড়িতে দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ।

প্রথম দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান হয় গত ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। দুদফায় ১ হাজার ২৮৪ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণের আওতায় আসবেন। শান্তিবাহিনীর বাকি ৬৪৯ জন আগামী ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলার বড়াদাস উচ্চ বিদ্যালয় ও দুদকছড়ি এলাকায় অস্ত্র সমর্পণের মধ্যদিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন।

আজ সকাল ৮টায় শুরু হবে অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠান। এ লক্ষ্যে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের চারদিকে তৈরি করা হয়েছে প্যান্ডেল। স্কুল মাঠসহ রাস্তার দুপাশে রং বেরঙের পতাকা ব্যানার ফেস্টুন টাঙানো হয়েছে। থানা সদর থেকে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ এবং শান্তিবাহিনীর অবস্থানস্থল বাঘাইছড়ি গ্রাম পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটারের অপ্রশস্ত রাস্তাটিকে কোথাও মাটি ভরাট করে আবার কোথাও মাটি কেটে গাড়ি চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।

শান্তিবাহিনীর নার্স সেন্টার হিসেবে পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলের ‘বি’ কমান্ড পোস্টের চার কোম্পানির ৫৪৫ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাদ যেতে পারে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পক্ষপাতী নয় বলে জানা গেছে। তবে রাঙ্গামাটি থেকে ৮০ জন শিল্পী ইতিমধ্যে বাঘাইছড়ি এসে পৌঁছেছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অস্ত্র সমর্পণের খুঁটিনাটি ক্রটি সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির সঙ্গে সরকার পক্ষের আলোচনা চলছিল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত।

এদিকে আজকের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর দক্ষিণ অঞ্চলের কমান্ডার মেজর পেলে, মেজর বাতায়নসহ শান্তিবাহিনীর বেশ কিছু দুর্ধর্ষ কমান্ডার অস্ত্র সমর্পণ করবেন বলে জানা গেছে। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অত্যাধুনিক অস্ত্রও জমা পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভোরের কাগজ

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দ্বিতীয় দফায় বাঘাইছড়িতে শান্তিবাহিনীর

৫৪২ সদস্য ২৪২ টি অস্ত্র জমা দিয়েছে

হরি কিশোর চাকমা/আজিম উল হক, বাঘাইছড়ি থেকে: সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলের কমান্ডার মেজর পেলে ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের মধ্যে পিস্তল ও সাদা গোলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শান্তিবাহিনীর দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল সোমবার

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে শান্তিবাহিনীর ৫৪২ জন সদস্য ২৪২টি অস্ত্র ও প্রায় ৪০ হাজার গোলাবারুদ জমা দিয়েছে।

সকাল থেকে বাঘাইছড়ি থানার প্রত্যন্ত এলাকাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা হাজার হাজার মানুষ বাঘাইছড়ি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সমবেত হয়। ৯টার মধ্যে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানস্থল ও আশপাশ এলাকা জনারণ্য হয়ে ওঠে। অপর দিকে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তাদের অবস্থানস্থল বাঘাইছড়ি গ্রাম থেকে জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় হাতে কাঁধে অস্ত্র গোলাবারুদ এবং কাপড় চোপড়ের ব্যাগ নিয়ে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে আসতে থাকে। সেখানে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অভ্যর্থনা জানান এবং অস্ত্র জমা নেন পাহাড়ি শরণার্থী টার্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, সাংসদ বীরবাহাদুর ও চাকমা রাজা দেবশীষ রায়। শান্তিবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য অস্ত্র জমা দিয়ে এবং রেজিস্ট্রেশন করিয়ে সরাসরি অনুষ্ঠান স্থলে চলে আসেন। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র জমা দেওয়া শেষ হওয়ার পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলো পরীক্ষা ও পৃথক করার পর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান স্থলে নিয়ে আসে।

এদিকে উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে আসা লোকজন ভেতরে ঢুকতে না পেরে বাইরে অপেক্ষা করে। এক সময় দর্শকরা ক্ষুব্ধ হয়ে জোর করে মাঠে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়ে দর্শকরা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও লাঠিচার্জ করে দর্শকদের পিছু হটিয়ে দেয়। ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ ২ জন পুলিশসহ ৭ জন আহত হয়।

সকাল সোয়া ১১টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠান স্থলে আসার পরপরই অস্ত্র সমর্পণের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শেষ হওয়ার পর পরই শান্তিবাহিনীর পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলের কমান্ডার মেজর পেলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের কাছে একটি পিস্তল জমা দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর পেলের কাছে একটি সাদা গোলাপের তোড়া উপহার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা হাততালি দিয়ে স্বাগত জানায়। মাঠের চারদিক থেকে রঙিন বেলুন এবং সাদা কবুতর অবমুক্ত করা হয়। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টার্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, সাংসদ বীর বাহাদুর, রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান থোয়াইচ মাস্টার, চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবশীষ রায়, স্বরাষ্ট্র সচিব, সেনাবাহিনী প্রধান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, জিওসি চট্টগ্রাম, বিডিআর

মহাপরিচালক, জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, রাঙ্গামাটি পৌরসভা চেয়ারম্যান মহিষরান দেওয়ানসহ জেলার উর্ধ্বতন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এদিকে গত রোববার রাতে সরকার পক্ষের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির আলোচনা সাপেক্ষে অনুষ্ঠানসূচি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গতকাল তা হয়নি। ফলে অস্ত্র সমর্পণের মূল অনুষ্ঠান হয়েছে মাত্র ২০ মিনিট স্থায়ী।

গতকাল অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের বাঘাইছড়ি উচ্চবিদ্যালয় ও বাঘাইছড়ি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে চুক্তি অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া শুরু হয়েছে। অনেকে টাকা নিয়ে গতকালই আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে গেছেন। আজকের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সকল সদস্য ট্রানজিট ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবেন বলে প্রশাসন আশা করছে।

ভোরের কাগজ

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর

পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে কোন বিদেশী শক্তির
কাছে নতজানু হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না

কাগজ প্রতিবেদক: পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সংবিধানের আওতায় থেকেই পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অটুট রয়েছে। কারও সাধ্য নেই সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার। আর চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কোনো বিদেশী শক্তির কাছে নতজানু হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সাংসদদের একাধিক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

সাংসদ আবদুল লতিফ মির্জার এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শান্তিচুক্তির ফলে বাঙালির অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে বিরোধী দল অসত্য তথ্য পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে।

সাংসদ জয়নাল আবেদীন হাজারীর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেছিলেন শান্তিচুক্তি হলে ফেনী পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে। আমার প্রশ্ন, তিনি কি এখন ভারতীয় হয়ে গেছেন? দেশবাসী দেখছে কে অসত্য ভাষণ দিয়েছিল।

জাতীয় পার্টির সাংসদ ডা. রুস্তম আলী ফরাজীর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা ছিল, নিজেরাই আলাপ-আলোচনা করে সমাধান করেছে, কোনো রকম বৈদেশিক সাহায্য বা মধ্যস্থতা ছাড়াই। দুই পক্ষের আলাপ-আলোচনার পর্যায়ে বিষয়টি সংসদে আনলে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। চুক্তি নিয়ে যখন সংসদে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আইন পাস হবে তখন লক্ষ্য রাখবেন চুক্তিতে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা।

ব্যয় ১০৬ কোটি, প্রাণহানি ৯৩৭ জনের

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনটি পার্বত্য জেলায় প্রতিরক্ষা খাতে ১০৫ কোটি ৯৪ লাখ ৪৯ হাজার ৫১১ টাকা ব্যয় হয়েছে। রাজমাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এলাকায় ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সহিংস ঘটনায় ৯৩৭ জন প্রাণ হারিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে একথা বলেছেন মহিলা সাংসদ মেহের আফরোজের এক প্রশ্নের জবাবে। সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনসংহতি সমিতির যেসব সদস্য অস্ত্র জমা দিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে নগদ ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়ে নিজ এলাকায় বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাংসদ হাজী সেলিমের অপর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিহত ৯৩৭ জন যেসব সংস্থায় কর্মরত ছিলেন, সেসব সংস্থা থেকে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়েছে। এরপর নিহত কারো পরিবার দুরাবস্থায় থাকলে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভোরের কাগজ

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন

স্বাগত জানিয়েছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। গতরাতে ওয়াশিংটন থেকে পাওয়া এক বার্তায় একথা জানা গেছে। বাসস।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো এক অভিনন্দন বার্তায় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বলেন, ‘আমি বিশেষ আত্মহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে,

আপনার সরকার পার্বত্যবাসীর সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে উপনীত হয়েছে। এভাবে দীর্ঘদিনের সংঘর্ষের অবসান ঘটানোর জন্য আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।’

বাংলাদেশ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণের কথা স্মরণ করে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বলেন, বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন। যথাসময়ে রাষ্ট্রদূত হোলজম্যান বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করবেন।

ভোরের কাগজ

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

কাল দীঘিনালায় শান্তিবাহিনীর

তৃতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ

আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: আগামীকাল ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় শান্তিবাহিনীর ৪৫০ জন সশস্ত্র সদস্য তৃতীয় দফায় দীঘিনালার বড়াদম দীঘির পাড়ে অস্ত্রসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। মেজর তাপসের নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করবে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তৃতীয় পর্যায়ে অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন ও প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রসমর্পণ এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী, আর্মড পুলিশ ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে বেশি মানুষের স্থান সঙ্কুলানের জন্য পূর্বনির্ধারিত বড়াদম স্কুল মাঠ পরিবর্তন করে স্কুল থেকে ৫০০ গজ দূরে দীঘির পাড়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে দীঘির পাড়ে ধানী জমি ড্রেজার দিয়ে সমান করা হচ্ছে। সেনা ও থানা প্রশাসন যৌথভাবে অনুষ্ঠানের জন্য গেট, স্টেজ, শান্তিবাহিনীর সদস্য, সাংবাদিক অতিথি ও জনতার জন্য পৃথক পৃথক তাঁবু খাটানো হচ্ছে। শান্তিবাহিনী সদস্যরা আজ সকাল ১০টায় বড়াদম হাইস্কুল ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান নেবে। ট্রানজিট ক্যাম্পে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার উপস্থিতিতে সামরিক কর্তৃপক্ষ অস্ত্র গোলা-বারুদ বুঝে নেবে।

এদিকে ভোরের কাগজের দীঘিনালা প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম জানান, অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কার্যক্রম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সশস্ত্র শান্তিবাহিনী সদস্যরা গত বুধবার থেকে

অনুষ্ঠানস্থলের আধ কিলোমিটার দূরে মাজনী নদীর পশ্চিম পারে তেবাংছড়া গ্রাইমারি স্কুলে অবস্থান নিয়েছে। সেখানে তারা নিজেরাই খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করেছে। বেশ কয়েকটি তাঁবুও খাটানো হয়েছে। আজ সকালে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তেবাংছড়া স্কুল থেকে বড়াদম হাইস্কুল ট্রানজিট ক্যাম্পে চলে আসবে। এদিকে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে তেবাংছড়া স্কুলে প্রায় ৫০০ শান্তিবাহিনী সদস্য জড়ো হয়েছে।

গতকাল অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা, রিজিয়ন কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী, জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন, টিএনও এসবিএম শফিক-উদ-দৌলা ও সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা বড়াদম সফর করেন।

ভোরের কাগজ
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তি বাহিনীর তৃতীয় দফা
অস্ত্র সমর্পণ সম্পন্ন
চুক্তিবিরোধী কিছুসংখ্যক পাহাড়ি বিক্ষোভ
ইটপাটকেল নিষ্ক্ষেপ, আহত ২০

আজিম উল হক/হরি কিশোর চাকমা/জাহাঙ্গীর আলম রাজু, দীঘিনালা থেকে ফিরে: হাজার হাজার পাহাড়ি-বাঙালি জনতার উপস্থিতিতে গতকাল এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর ৪৪৩ জন সদস্য ১৯০টি অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এদিকে গতকাল অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে শান্তিচুক্তিবিরোধী কিছুসংখ্যক পাহাড়ি নাগরিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে নিরাপত্তাবাহিনী সদস্যদের বাধাদান এবং উভয়পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিষ্ক্ষেপে সেনাবাহিনীর একজন মেজরসহ পুলিশ, বিডিআর ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশ কজন আহত হয়। আহতদের কারো অবস্থাই গুরুতর নয় বলে জানানো হয়েছে।

খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে দীঘিনালা থানার বড়াদম দীঘির পাড়ে গতকাল জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর উপস্থিতিতে তৃতীয় দফার এ অস্ত্র সমর্পণ পর্ব সম্পন্ন হয়। শান্তিবাহিনী লিডার চতুরঙ্গপময় চাকমা ক্লেবার আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর কাছে একটি একে-৪৭ রাইফেল জমা দিয়ে এ অস্ত্র সমর্পণ পর্বের সূচনা করেন। এ সময় চিফ হুইপ ক্লেবারকে একগুচ্ছ সাদা গোলাপ উপহার দিয়ে তাকে বরণ করে নেন। এর পরপরই শান্তিবাহিনীর ১১০ জন সশস্ত্র সদস্য একে একে চিফ হুইপের কাছে অস্ত্র জমা দেন। মন্ত্রী

কল্লরঞ্জন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, টাঙ্গ ফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এ সময় শান্তির সাদা কবুতর উড়িয়ে দেন।

গতকাল সকালে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তেবাংছড়া স্কুল থেকে পায়ে হেঁটে বেডবেডিং নিয়ে বড়াদম হাইস্কুলে ট্রানজিট ক্যাম্পে সমবেত হয়। সেখানে মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা, সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান খোয়াই চ গুং মাস্টার, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, স্পেশাল এফেয়ার্স সচিব গোলাম রহমান, মেজর জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল বজলুল কবীর, শান্তিবাহিনী নেতা সুধাসিন্দু খীসা ও রক্তউৎপল ত্রিপুরা প্রমুখের উপস্থিতিতে শান্তিবাহিনী সদস্যরা গোলাবারুদ জমা দেন। সেনাবাহিনীর অফিসাররা এসব গোলাবারুদ বুঝে নেন।

অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ট্রানজিট ক্যাম্পের বাইরে চুক্তিবিরোধী কতিপয় নাগরিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের বাধা দেয়। এ সময় চুক্তিবিরোধীরা ইটপাটকেল নিষ্ক্ষেপ করলে উভয় পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এ সময় সেনাবাহিনীর মেজর নজরুল ইসলামসহ পুলিশ, বিডিআর ও চুক্তিবিরোধী বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রায় ২০ জন আহত হয়। আহতদের সবাইকে ট্রানজিট ক্যাম্পের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ট্রানজিট ক্যাম্পের অদূরে বড়াদম দীঘির পাড়ে মূল অনুষ্ঠানস্থলে শান্তিবাহিনী সদস্যদের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়ে আসা হয়।

ভোরের কাগজ
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শেষ দফা অস্ত্র সমর্পণের তারিখ
পেছানোর জন্য জনসংহতির অনুরোধ

হরি কিশোর চাকমা : সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান ২৮ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। জনসংহতি সমিতি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের একটি সূত্রে জানা গেছে, শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ চতুর্থ দফা অস্ত্র সমর্পণের তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৫ মার্চ অনুষ্ঠানের জন্য জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। সূত্র জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা

শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার স্বাক্ষরিত সরকারের কাছে পাঠানো চিঠিতে তারিখ পিছানোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতাদের অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তুতি শেষ হয়নি বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে শান্তিবাহিনীর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য জানিয়েছেন, তাদের বেশ কিছু নেতাকর্মী এখনো ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সে কারণে সর্বশেষ অস্ত্র সমর্পণের তারিখ পিছাতে পারে।

ভোরের কাগজ
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
হাসিনাকে অলব্রাইটের চিঠি
যুক্তরাষ্ট্র পার্বত্য শান্তি
চুক্তিকে স্বাগত জানায়

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রশংসা অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রশংসা করেছেন। বাসস, ইউএনবি। অলব্রাইট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা এক চিঠিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আপনার সরকারের প্রচেষ্টা যেভাবে প্রশংসিত হয়েছে তা দেখে আমি আনন্দিত।’ অলব্রাইট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য উপজাতীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ ব্যাপারে আশাবাদী যে, সকল পক্ষের সদিচ্ছার মাধ্যমে শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা যাবে, যাতে পার্বত্য এলাকার জনগণ শান্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারে।

ভোরের কাগজ
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
তারিখ একদিন পেছালো
পাহাড়ের শরণার্থীদের সর্বশেষ
দল ফিরে আসবে গুজরার

আজিম-উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ৬টি আশ্রয় শিবিরে অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীদের সর্বশেষ দলটি আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরার তবলছড়ি শিলাছড়ি সীমান্ত পথে ফিরে আসবে। আর তাদের স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসার মধ্যে দিয়েই শরণার্থীদের শিবির

জীবনের ইতি ঘটবে। ইতি মধ্যে ৫টি শিবিরের সকল শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। গতকাল তাকুমবাড়ি শিবির থেকে ১৮৬ পরিবারের ১১২১ জন শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। এ নিয়ে ১৯৯৪ সাল থেকে এ যাবৎ ১২ হাজার ২৯০ পরিবারের ৬২ হাজার ৮২২ জন শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে সমিতির সকল নেতাকর্মীসহ সর্বশেষ ৩২ পরিবার শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে। এর আগে অপরাপর শরণার্থীরা আজ ও কালকের মধ্যেই দেশে ফিরবে। জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন গতকাল এ তথ্য জানান। উল্লেখ্য, শরণার্থীদের সর্বশেষ দলটি ২৬ ফেব্রুয়ারি ফিরবে বলে কথা ছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততার কারণে তা একদিন পিছিয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল তবলছড়ি সীমান্তে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক, ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনায় নতুন করে তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি শরণার্থীদের সর্বশেষ দলকে স্বাগত জানাতে জেলা প্রশাসন প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেদিন সর্বশেষ দলকে স্বাগত জানাবেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, টাঙ্গফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, জেলা বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও জেলা প্রশাসক এ কে এম কামরুল হোসেন। ভারতীয় পক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরার চিফ সেক্রেটারিসহ উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গেছে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন সর্বশেষ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ভোরের কাগজ
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
পাহাড়ি শরণার্থীদের সর্বশেষ দলটি
আজ ফিরে আসছে

আজিম উল হক: এক যুগের শরণার্থী জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ শেষে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের তাকুমবাড়ি শিবির থেকে পাহাড়ি শরণার্থীদের সর্বশেষ দলটি তবলছড়ি সীমান্ত পথে আজ দেশে ফিরছে। সকাল ১০টায় উপজাতীয় শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে সর্বশেষ ৩৩ পরিবারের ১৯৮ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে শরণার্থী সমস্যার আজ আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটতে যাচ্ছে।

এর আগে গতকাল তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে ৭৯ পরিবারের ৪৫৭ জন শরণার্থী দেশে ফিরেছে। এ নিয়ে ৬ দফায় ত্রিপুরার ৬টি শিবির থেকে সর্বমোট ১২ হাজার ৩২২ পরিবারের ৬৩ হাজার ৬৪ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে।

আজ শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার শেষ মুহূর্তে সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, টাঙ্গফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান উপস্থিত থেকে সর্বশেষ ফিরে আসা শরণার্থী দলকে স্বাগত জানাবেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্য সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।

ভোরের কাগজ

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দুই দশক ধরে বিরাজমান সমস্যার আনুষ্ঠানিক অবসান

পাহাড়ি শরণার্থীদের সর্বশেষ

দলটি দেশে ফিরে এলো

আজিম-উল হক, তবলছড়ি থেকে ফিরে: ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোনো বাংলাদেশী পাহাড়ি শরণার্থী রইলো না। গতকাল সর্বশেষ শরণার্থী দলটির দেশে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ দুই দশক ধরে বিরাজমান শরণার্থী সমস্যার অবসান ঘটেছে। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি সাবেক সাংসদ উপেন্দ্র লাল চাকমার পরিবারসহ সর্বশেষ ৩৩ পরিবারের ১৯৯ জন পাহাড়ি শরণার্থী গতকাল তবলছড়ি সীমান্ত পথে দেশে ফিরে এসেছে।

এ নিয়ে ১৯৯৪ সাল থেকে গতকাল পর্যন্ত ৬ দফায় ভারতের ৬টি শরণার্থী শিবির থেকে সর্বমোট ১২ হাজার ৩৮৭ পরিবারের ৬৩ হাজার ৪০৭ জন পাহাড়ি শরণার্থী দেশে ফিরে এলেন।

গতকাল তবলছড়ি-শিলাছড়ি সীমান্তের দুপাড়ে হাজার হাজার ভারতীয় এবং বাংলাদেশী পাহাড়ি বাঙালি জনগণের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে সর্বশেষ শরণার্থী দলটির প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয়। সকাল ১১টায় উপেন্দ্র লাল চাকমা তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দুই নাতিকে নিয়ে সবার আগে স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন। এ সময় ভারতীয় ভূখণ্ডে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী কেশব মজুমদার ও মুখ্য সচিব সুধির শর্মা তাকে বিদায় জানান।

অপরদিকে সীমান্তের এখানে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, শরণার্থী প্রত্যাবাসন টাঙ্গফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, সাংসদ বীর বাহাদুর ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মুহূর্তে মুহূর্তে করতালির মধ্যে ফুলের তোড়া দিয়ে তাদেরকে বরণ করে নেন।

শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা স্বদেশের মাটিতে ফিরে এ প্রতিবেদককে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, দীর্ঘ এক যুগ পর সকল শরণার্থীদের নিয়ে দেশে ফিরতে পেরে সুখ অনুভব করছি। দেশে ফিরে আত্মীয়স্বজন, পরিচিতজনকে কাছে পেয়ে আনন্দ লাগছে।

তিনি বলেন, পাহাড়ের অতীতের ভয়াল ইতিহাস পেছনে ফেলে এখন সৃষ্টিশীল গঠনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পাহাড়ি-বাঙালি সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

শরণার্থীদের সর্বশেষ দলকে স্বাগত জানাতে গতকাল তবলছড়ি স্কুল মাঠে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী কেশব মজুমদার, টাঙ্গফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, খাগড়াছড়ি পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, সাংসদ বীর বাহাদুর, ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্য সচিব সুধির শর্মা, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের মহাপরিচালক মুবায়দুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন এবং শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা সভায় বক্তব্য রাখেন।

মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, ভারতে আশ্রিত সকল শরণার্থী ফিরে আসায় এ দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। ভারত সরকার এতো দিন ধরে আমাদের জনগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি ভারত সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানান।

ত্রিপুরার মন্ত্রী কেশব মজুমদার বলেন, যারা আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদেরকে বোঝা মনে করিনি। আমরা তাদের জন্য ভালো কিছু করতে না পারলেও জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছি। আজকের দিনের জন্য, শরণার্থীদের সমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। আজ তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে দেখে আনন্দ অনুভব করছি।

এদিকে গতকাল প্রত্যাবর্তনকারী ৩৩ পরিবারের সকল সদস্য ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে গেছেন। গতকাল যারা ফিরেছেন তাদের অধিকাংশই শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতাকর্মী। গতকালই শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা তার পরিবারসহ খাগড়াছড়ি সদরে মহাজনপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে পৌছেন।

ভোরের কাগজ
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
পার্বত্য শান্তিচুক্তির ফলে উৎসাহ সৃষ্টি
মিজোরাম ও আরাকানে আশ্রয়
নেওয়া পাহাড়িরাও ফিরে আসছে

বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, বান্দরবান থেকে: জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের শান্তিচুক্তি এবং শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে পার্বত্য এলাকায় শান্তি ফিরে এসেছে, পাহাড়ি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের সোনালি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ রকম সংবাদ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, অশান্ত পার্বত্য পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিভিন্ন সময়ে বান্দরবান ছেড়ে মিজোরাম ও আরাকানে আশ্রয় গ্রহণকারী পাহাড়িরা এখন দলে দলে ফিরে আসতে শুরু করেছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন সীমান্তপথে ফিরে আসা ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের পাঁচ শতাধিক পরিবার রুমা, রোয়াংছড়ি ও থানচি থানার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত সোমবার বান্দরবান সদরে ১০টি ত্রিপুরা পরিবারকে ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ কার্যালয়ে রাত্রিযাপন করতে দেখা গেছে।

জানা যায়, আশির দশকে পার্বত্য পরিস্থিতি যখন ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত ছিল তখন বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে ভারতের মিজোরাম ও বার্মার আরাকান রাজ্যে প্রায় কয়েক হাজার পাহাড়ি আশ্রয় গ্রহণ করে। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারীরা শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও বান্দরবান থেকে সীমান্ত অতিক্রমকারীরা সেই স্বীকৃতি পায়নি। তারা সেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষের অগোচরে স্থানীয় লোকজন ও সেখানকার তথাকথিত প্রভাবশালীদের করুণার পাত্র হয়ে অসম্মানজনক অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় অশান্ত পার্বত্য পরিস্থিতির অবসান ও শান্তি ফিরে আসার সংবাদের ভিত্তিতে তারা দেশে ফিরে এসেছেন বলে আগতরা জানিয়েছেন।

তিন্দু ইউনিয়নের কণ্ঠহাপাড়ার হাসিরাং ত্রিপুরা (৫৫) ১৯৮২ সালে পরিস্থিতির কারণে মিজোরামে পাড়ি জমিয়েছিলেন। এই প্রতিবেদককে তিনি বিদেশের মাটিতে নিদারুণ কষ্টে তার দিনযাপনের কথা বলেন। এছাড়া বাদুরাং ত্রিপুরা, গঙ্গামনি, বলিহাও, হাকিরাম ত্রিপুরার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা গবসারা গ্রাম থেকে রুমা থানার বটতলি সীমান্ত দিয়ে ফিরে এসেছেন। তৈজং গ্লাং থেকে ২৫ পরিবার, দুয়াংপাড়ার ২০ পরিবার,

বৈলছড়ির ২৯ পরিবার, ফারুয়ার ১৩০ পরিবার সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছে বলেও তারা জানান। তাদের মতে, মিজোরামে অনেক পরিবারের ধান, চাল ও আশ্রয় থাকা সত্ত্বেও স্বদেশের মাটির টানে তারা ফিরে আসছে।

প্রত্যাবর্তনকারীরা বেশির ভাগই ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের। বান্দরবানের ত্রিপুরা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পরিচালক এ ব্যাপারে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছেন। তিনি জানান, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকারী স্বীকৃতিহীন এসব শরণার্থীর ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন, শরণার্থীবিষয়ক টাস্কফোর্স ও জনসংহতি সমিতিকে অবহিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দিয়েছেন। তার মতে, এ পর্যন্ত ৪৩২ ত্রিপুরা পরিবার ও শতাধিক তঞ্চঙ্গ্যা পরিবার বাঘমারা, কচ্ছপতলি, রনিপাড়া বটতলি, বাংসা, পুকুরপাড়া আশ্রয় নিয়েছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বলেছেন, সীমান্তের ওপার থেকে যারা প্রত্যাবর্তন করেছেন তারা সবাই এ দেশেরই নাগরিক, বাংলাদেশেরই বাসিন্দা। পরিস্থিতির কারণেই এক সময় তারা মাতৃভূমি ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কোনো কোনো মহল স্বদেশের মাটির টানে ফিরে আসা বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিকের অনুপ্রবেশ আখ্যায়িত করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করছে।

প্রত্যাবর্তনকারী স্বীকৃতিহীন শরণার্থীদের আশ্রয় ও তালিকাভুক্তির ব্যাপারে প্রশাসন তৎপর নয় বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা আগমনকারীর সংখ্যা এতো ব্যাপক নয় এবং যারা আসছে তারা এক সময় বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বলেন, আগমনকারীরা বিদেশী নাগরিক প্রমাণিত হলে অবশ্যই তাদের গ্রেপ্তার কিংবা পুশব্যাক করা হবে।

গত মঙ্গলবার বান্দরবান সদরে আসা ১০ পরিবারের ৪৭ জনকে মাথাপিছু ৩০ টাকা করে ১ হাজার ৪১০ টাকা জেলা প্রশাসন থেকে বিতরণ করা হয়।

এদিকে বড়ো মদক ও সাঙ্গু রিজার্ভ সীমান্ত দিয়ে আরাকান থেকে আসা কিছু পরিবার বাংলাদেশী হলেও একই সঙ্গে আসা বেশ কিছু লোক বর্মি নাগরিক বলে সেখানকার স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। এসব বর্মি নাগরিক নিজ দেশে খাদ্য সঙ্কটের কারণে এবং পার্বত্য এলাকায় সরকারি উন্নয়নের খবর পেয়ে ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ করছে। এ পর্যন্ত ২ শতাধিক পরিবার অনুপ্রবেশ করেছে বলে রেমাক্রী ও তিন্দু ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ
৪ মার্চ ১৯৯৮
কাল দুদকছড়িতে শান্তিবাহিনীর
শেষ দফা অস্ত্র সমর্পণ

আজিমউল হক, দুদকছড়ি থেকে ফিরে: পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই যুগের জুম্ম জাতির সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান হতে চলেছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী দুদকছড়ি পাহাড়ি পল্লীতে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী সশস্ত্র সদস্যদের সর্বশেষ দলটির অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে শান্তিবাহিনীর বিলুপ্তি ঘটবে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান হবে। কাল জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দসহ সর্বশেষ ২০৮ জন শান্তিবাহিনী সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করবেন।

দুদকছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সেনাবাহিনী, বিডিআর ও জেলা প্রশাসন দুদকছড়ি, বিডিআর হেলিপ্যাডের পার্শ্ববর্তী জংলাজীর্ণ মাঠ পরিষ্কার করে অস্ত্র জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করছে। কর্তৃপক্ষ মাঠে শান্তিবাহিনী, অতিথি সাংবাদিক ও জনগণের জন্য বেশ কয়েকটি তাঁবু খাটিয়েছে এবং মঞ্চ তৈরি করেছে।

শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ দলের অস্ত্র জমা নেবেন বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। এ সময় চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা উপস্থিত থাকবেন। শান্তিবাহিনী ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার বিমান মন্ত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমা দিয়ে সর্বশেষ দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জনসংহতি সমিতি সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্ত লারমাসহ সমিতির সকল উর্ধ্বতন নেতা ও সশস্ত্র সদস্যরা দুদকছড়ি পাহাড়ি পল্লীতে সমবেত হয়েছেন।

যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা যায় সর্বশেষ দলে অস্ত্রের সংখ্যা ততো বেশি নয়। এ দলে অধিকাংশ সদস্য বয়সে প্রবীণ এবং বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত যুদ্ধে যুদ্ধাহত ও অসুস্থ। তাছাড়া দলে জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতাদের দেহ রক্ষীরা রয়েছে বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় শান্তিবাহিনী নেতা ও সদস্যরা গ্রাম থেকে নেমে এসে বিডিআর নির্মিত ট্রানজিট ক্যাম্পে মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমার কাছে অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিয়ে মূল অনুষ্ঠানস্থলে চলে আসবেন। জমা দেওয়া গুলিবিহীন অস্ত্রগুলোই পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিকভাবে মোশাররফ হোসেনের কাছে সমর্পণ করা হবে।

এদিকে গতকাল প্রস্তুতি কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী, বিডিআর সেক্টর কমান্ডার, জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন, পুলিশ সুপার আলহাজ লুৎফর রহমান ও যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা দুদকছড়ি সফর করেন।

উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর ঢাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির পর ১০, ১৬ ও ২২ ফেব্রুয়ারি তিন দফায় ১,৭২৫ জন শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্য অস্ত্র জমা দিয়েছেন।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্ত লারমা শেষ দলের সঙ্গে কাল স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যানের নবনির্মিত বাসভবনে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। উর্ধ্বতন অন্য নেতারা থাকবেন সড়ক বিভাগের রেস্ট হাউজে।

ভোরের কাগজ
৫ মার্চ ১৯৯৮
শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ দলের অস্ত্র সমর্পণ দুদকছড়িতে
আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে শান্তিবাহিনী

আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী দুদকছড়িতে আজ জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ দল অস্ত্র সমর্পণ করবে। দুদকছড়িতে আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণের মধ্যে দিয়ে জুম্ম জাতির দীর্ঘ দুই দশকের সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান ঘটবে— বিলুপ্তি ঘটবে শান্তিবাহিনীর। আজ সর্বশেষ দলে অস্ত্র সমর্পণের জন্য ২০৮ জন আসার কথা থাকলেও আরো ১৪ জন সদস্য অতিরিক্ত আসছেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে প্রীতি লজ্জ চাকমা নামে একজন মহিলা শান্তিবাহিনী কর্মী রয়েছেন।

দুদকছড়িতে শান্তিবাহিনী সর্বশেষ দলের অস্ত্র জমা নিতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। শান্তিবাহিনী সদস্যদের জন্য ট্রানজিট ক্যাম্প খোলা হয়েছে। সরকার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানের জন্য সোনালী ব্যাংকের শাখা খোলা হয়েছে। শান্তিবাহিনীর সকল নেতাকর্মী এখন দুদকছড়ি পাহাড়ি পল্লীতে অবস্থান করছে।

আজ সকাল ৮টায় শান্তিবাহিনীর সকল সদস্য ট্রানজিট ক্যাম্পে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবেন। মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা অস্ত্র জমা নিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে বুঝিয়ে দেবেন, পরে শান্তিবাহিনী সদস্যরা জামা দেওয়া অস্ত্রগুলো তুলে এনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের কাছে সমর্পণ করবেন। এ সময় চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, মন্ত্রী

কল্পরঞ্জন চাকমা, শরণার্থীবিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার ও সাংসদ বীর বাহাদুরসহ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

এদিকে শান্তিবাহিনী সদস্যদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য আগেভাগেই নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে এসেছে। তবে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমার স্ত্রী ও পরিজন আজ তার সঙ্গে আসবেন বলে জানা গেছে।

যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা যায়, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়েই বাড়ি ফিরে যাবে। কেউই ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকবে না। তাই প্রশাসন জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমাসহ সকল উর্ধ্বতন নেতাকে খাগড়াছড়ি শহরে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে।

গতকাল মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, শরণার্থীবিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার সাংসদ বীর বাহাদুরসহ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তারা প্রস্তুতি কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন।

শান্তিচুক্তির পক্ষে মিছিল

গতকাল খাগড়াছড়ি শহরের স্বনির্ভর এলাকায় শান্তিচুক্তি ও শান্তিবাহিনী সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ আনন্দ মিছিল বের করে। এদিকে পানছড়িতে শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে সংগঠনসমূহে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আজকের অনুষ্ঠানে যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে চুক্তির পক্ষের ছাত্র-জনতা সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। পানছড়ি ও দুদুকছড়ি প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে।

ভোরের কাগজ

৫ মার্চ ১৯৯৮

শান্তিবাহিনী সদস্যদের জন্য

রেশনের ব্যবস্থা করছে সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি: অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর ১৯৩৩ জন সদস্য আগামী এক বছর রেশন পাবেন। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার এই রেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) রেশনের এই মালামাল সাহায্য হিসেবে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শান্তিচুক্তিতে রেশন দেওয়ার কোনো বিষয় না থাকলেও সরকার এই ব্যবস্থা করছেন বলে জানা যায়।

ইতিমধ্যে শান্তিবাহিনীর ১৭২৫ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার শেষ দফায় বাকি ২০৮ জন অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন।

জানা যায়, শান্তিবাহিনী সদস্যদের রেশনের জন্য এক বছরে ২ হাজার টনের বেশি চাল, ৯৬ টন ডাল, ৪৮ টন সোয়াবিন তেল ও ৪৮ টন লবণ বরাদ্দ করা হবে।

ভোরের কাগজ

৬ মার্চ ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর শেষ দফা অস্ত্র সমর্পণ

সীমান্তবর্তী দুদুকছড়িতে সম্পন্ন

হরি কিশোর চাকমা/আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে: সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ দলটির অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই যুগের সংঘাতময় রক্তাক্ত একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটলো। গতকাল বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ি এলাকায় শান্তিবাহিনীর কমান্ডার জগদীশ চন্দ্র চাকমা (দেবাংশু) ও বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের মধ্যে চাইনিজ এসএমজি ও সাদা গোলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শান্তিবাহিনীর সকল সদস্যের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্পন্ন হলো।

শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান দেখার জন্য গতকাল সকাল থেকে লোকজন শ্রোতের মতো দুদুকছড়িতে আসতে থাকে। সকাল ১০টার মধ্যে এলাকা লোকে লোকারণ্য। পৌনে ১১টার দিকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা গভীর অরণ্য থেকে দুদুকছড়ি খালের কাঠের সাঁকো পার হয়ে অনুষ্ঠানস্থল আসা শুরু করেন। শান্তিবাহিনীর সকল সদস্যের অনুষ্ঠানস্থলে আসা শেষ হওয়ার পর জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্ভ) লারমা ইতিপূর্বে অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্য, পুলিশ ও বিডিআর সদস্যদের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টিতভাবে থেকে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন। এ সময় সম্ভ লারমার সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এ কে এম জাফরুল হোসেন ও পুলিশ সুপার আলহাজ লুৎফর রহমান।

শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিজেরা সরাসরি অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসেন। পরে সাংসদ বীরবাহাদুর তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলো জমা নেন। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ৫৬টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র এবং ৫১ হাজার ৯৬৬টি গোলা বারুদ জমা দেন। এর পর দুপুর সোয়া ১২টায় অস্ত্র সমর্পণের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। শান্তিবাহিনীর কমান্ডার জগদীশ চন্দ্র চাকমা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের হাতে চাইনিজ এসএমজি তুলে দেওয়ার পর পরই চট্টগ্রামের সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী সম্ভ লারমাকে

শান্তিবাহিনীর জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে মঞ্চে নিয়ে আসেন। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন বাংলায় এবং দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা চাকমা ভাষায় ভাষণ দেন। মন্ত্রীদ্বয় সংবিধানের আওতায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য পার্বত্য শান্তিচুক্তি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শান্তিপ্রিয় জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। তারা শান্তিচুক্তিবিরোধীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সেনাবাহিনী প্রধান, বিডিআর মহাপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, পাহাড়ি শরণার্থীবিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান চিং কিউ রোয়াং জা, খোয়াই চ প্রু মাস্টার এবং সোশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব।

গতকাল শান্তিবাহিনীর ২২২ জন সদস্যের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে গত ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুসারে অস্ত্র সমর্পণ সম্পূর্ণ শেষ হলো। শান্তিবাহিনীও বাস্তবে বিলুপ্ত হলো। এর আগে ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে, ১৬ ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়ি মাঠে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি দীঘিনালার দীঘিরপাড় এলাকায় তিন দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৭২৫ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন।

গতকাল অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য স্ব স্ব গ্রামে ফিরে গেছেন। তবে জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতারা খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে এসে অবস্থান নিয়েছেন। সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানগুলোতে শান্তিচুক্তিবিরোধী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্যদের তৎপরতা দেখা গেলেও গতকাল সে ধরনের কোনো তৎপরতা চোখে পড়েনি।

ভোরের কাগজ

৬ মার্চ ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তিচুক্তি সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য

—সম্র লারমা

রাজ্যমাটি, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সম্র) লারমা বলেছেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি

সকল জনগণের স্বার্থের জন্য, সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য। এখানে কমবেশি সকলের ভূমিকা রয়েছে। সেখানেই আমাদের আশা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুদকছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান চলাকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সম্র লারমা একথা বলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ আপামর জনগণের কাছে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা কামনা করে সম্র লারমা বলেন, একটা আশা নিয়ে আমরা চুক্তিতে উপনীত হয়েছি। সুতরাং বাস্তবায়নতো হবে এটা বিশ্বাস করি। এ ক্ষেত্রে সরকারের একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির একটা ভূমিকা রয়ে গেছে। আমরা সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি। চুক্তি অনুসারে আমরা অস্ত্র জমা দিচ্ছি। গ্রুপে গ্রুপে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছি।

সম্র লারমা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে সে সরকারের সঙ্গে আমরা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। পাহাড়ি এলাকা কিংবা সমগ্র বাংলাদেশের উন্নয়নের আশা নিয়ে তো এ চুক্তি হয়েছে। যেদিন চুক্তি হয়েছে সেদিন থেকে তো শান্তির একটা বাতাবরণ শুরু হয়েছে।

সম্র লারমা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম যদিও সকল ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ কিন্তু এখানে অফুরন্ত সম্পদ রয়ে গেছে। এ সম্পদ যদি আমরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুফল যদি বয়ে আনতে পারি তাহলে এটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বর্তমান মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন একান্ত জরুরি।

জনসংহতি সমিতি আঞ্চলিক দল হিসেবে তার ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করে সম্র লারমা বলেন, যেসব সদস্য অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন তারা সবাই জনসংহতি সমিতির সদস্য থাকবেন। পাহাড়ি জনগণের তথা সমগ্র বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে কাজ করবেন। তিনি বলেন, এ মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে বেশি জরুরি।

এদিকে দুই দশক পরে আত্মগোপনকারী বিদ্রোহী পাহাড়ি নেতা সম্র লারমা গতকাল সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মোটর শোভাযাত্রায় খাগড়াছড়ি শহরে এসেছেন। খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের নবনির্মিত বাসভবনে তিনি উঠেছেন। এটিই তার অফিস ও বাসভবন হিসেবে আপাতত ব্যবহৃত হবে। স্থানীয় সরকার পরিষদ বাসভবন ও অফিসটি তার জন্য সাজিয়ে দিয়েছে।



দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি চুক্তি
উৎসবের ঢেউ আছড়ে পড়েছে ত্রিপুরাতেও

অমিত বসু, কলকাতা থেকে ॥ শীতের উৎসব এখনও একটু দূরে। শব-ই-বরাত ১৬ ডিসেম্বর, বড়দিন ২৫ ডিসেম্বর। কিন্তু ত্রিপুরায় উৎসব এসেছে অনেক আগেই। চট্টগ্রামে যে উৎসবের ঢেউ উঠেছে তা আছড়ে পড়েছে ত্রিপুরায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৎপরতায় এত তাড়াতাড়ি পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে ভাবা যায়নি।

এই চুক্তি মানে তো চাকমাদের ঐতিহাসিক মুক্তি। মুক্তির উল্লাসে ফেটে পড়েছে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা। ঘর ছেড়ে মানুষ রাস্তায়। মিলনের আনন্দের দীর্ঘদিনের মলিনতা ধুয়ে-মুছে সাফ। চুক্তি স্বাক্ষরের খবর দক্ষিণ ত্রিপুরায় চাকমা শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে যায় বাতাসেরও আগে। রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে ঘরে ঘরে ঝরে পড়ে আলোর রোশনাই। আকাশে আলোর আল্পনা কাটতে থাকে আতশবাজি। ফুলঝুরি, রং মশালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শিবিরগুলো। নির্বাসনের অন্ধকার দূর হওয়ার উদ্দীপনায় তারা আত্মহারা। ঘরে ঘরে মিষ্টি বিতরণও শুরু হয়। দিন কয়েক আগে শরণার্থী সংগঠনের সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমা বলেছিলেন, শান্তি চুক্তিতে বাধা দিচ্ছে বিএনপিসহ বাংলাদেশের কয়েকটি মৌলবাদী রাজনৈতিক দল। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে হাসিনা সরকার সেই বাধা দূর করবেই।

কথাটা সত্যি হয়েছে। সব হরকত অবহেলা করে শান্তি চুক্তি তিনি হাসিল করেছেন। ১৯৮৬তে দফায় দফায় ৭০ হাজার চাকমা শরণার্থী ত্রিপুরায় চলে আসে। এদের একাংশকে ফেরত পাঠানো হলেও দক্ষিণ ত্রিপুরার ৬টি শিবির কাঁঠালছড়ি, লেরাছড়া, পঞ্চরামপাড়া, করবুক, তাকুমবাড়ি ও শিলাছড়িতে ৫৬ হাজার শরণার্থী থেকে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
জাপা সব সময়েই শান্তি
চুক্তির পক্ষে ॥ এরশাদ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাপা'র চেয়ারম্যান লে. জে. (অব.) আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন যে, জাতীয় পার্টি সব সময়ই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির পক্ষে ছিল। শান্তি চুক্তির খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আজ তিনি প্রতিক্রিয়া জানাবেন। চুক্তিটি পর্যালোচনার জন্য আজ বৃহস্পতিবার পার্টির

প্রেসিডিয়ামের বৈঠক ডাকা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির উদ্যোগ তাঁরাই নিয়েছিলেন এবং সেখানে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। জাতীয় স্বার্থেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বুধবার সন্ধ্যায় জনাব এরশাদ নেপালে ৪ দিনের সফর শেষে ঢাকায় ফিরেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে ও
পাহাড়ী সংগঠনের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে “আপোসনামা” বলে আখ্যায়িত এবং প্রত্যাখ্যান করে পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী নারী ফেডারেশনের নেতা-নেত্রীরা বুধবার চুক্তির একটি কপি পুড়িয়ে বলেছেন, ‘এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনবে না। এর মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির কয়েকজন জনবিচ্ছিন্ন সুবিধাবাদী নেতাই লাভবান হবেন মাত্র।’

এই তিন সংগঠনের উদ্যোগে বিকালে একটি প্রতিবাদ মিছিল শেষে টিএসসি'র সড়ক চত্বরে এক সমাবেশে নেতা-নেত্রীরা আরও বলেন, চুক্তিটি হচ্ছে একটি অশান্তির দলিল। এর সঙ্গে জেলা পরিষদের কোন পার্থক্য নেই। স্বৈরাচারী এরশাদের চাপিয়ে দেয়া গণবিরোধী জেলা পরিষদকে ঘষামাজা করে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। পাহাড়ী জনগণকে ‘উপজাতি’ আখ্যায়িত করে হেয় করা হয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ীদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেদখল জমি ফিরে পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই। জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি তো দূরের কথা, বর্তমান চুক্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য পরিষদের কোন সাংবিধানিক গ্যারান্টি নেই। ফলে যে কোন সময় যে কোন সরকার কলমের এক খোঁচায় চুক্তিটি বাতিল করতে পারবে। সভাপতির ভাষণে প্রমিত বিকাশ খীসা বলেন, গুটিকয়েক অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যত সেনা কর্তৃত্ব ও খবরদারি বলবৎ থাকবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র জাপান
ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো খুবই খুশি

আমান-উদ-দৌলা ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো খুবই খুশি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট

দেশগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার অভিযোগ করে আসছিল। অবশেষে পাহাড়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় উল্লিখিত দেশের কূটনীতিকরা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এই খবর জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত হওয়ায় বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রায় সকল দাতাগোষ্ঠী এবং কূটনৈতিক মহল সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সেটা মোটামুটি প্রকাশ্যেই তাঁরা জানিয়েছেন যখন মঙ্গলবার বিকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৬টি দেশের মিশনপ্রধানদের ডেকে শান্তি চুক্তির বিষয়াবলী তাদের কাছে তুলে ধরেন। একই সঙ্গে কিছুটা উদ্বেগও ফুটে উঠেছে কূটনীতিবিদ মহলে, যখন তারা জানতে পারল বিএনপিসহ কয়েকটি বিরোধী দল পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। বিএনপি প্রশ্ন তুলেছে, এই চুক্তি সংবিধানবিরোধী। কূটনৈতিক মহলে সন্দেহ জেগেছে, প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি সংবিধানের সঙ্গে কোনভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ কিনা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদ অবশ্য মঙ্গলবারের ব্রিফিংয়ে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। এতে সংবিধানবিরোধী কিছু নেই। উৎসাহী কূটনীতিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে জানানো হয়, বর্তমান চুক্তিটি এরশাদের আমলে ১৯৮৯ সালে গৃহীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং বিএনপি'র আমলে '৯২-৯৩ সালে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে যে শান্তি আলোচনা হয়েছিল, সেসব প্রসঙ্গ ধরেই এই শান্তি চুক্তির অগ্রগতি সাধন করা হয়েছে। এবারের আলোচনায় বিএনপিসহ বিরোধীদলীয় সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। জাতীয় পার্টির প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নিলেও বিএনপির দু'জন প্রতিনিধি বরাবরই অংশ নেননি। বিএনপি'র দিক থেকে বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন কোন দাতা দেশের কূটনীতিকরা মনে করছেন, সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার একটা ইস্যু দাঁড় করানোর জন্যই মূলত বিএনপি বিরোধিতা করেছে। তাঁদের মতে এ ধরনের বিরোধিতা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আত্মঘাতী পদক্ষেপস্বরূপ। দেশের মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে না। তবে আশা পোষণ করছেন অনেকে, দেশের অধিকাংশ শান্তিকামী মানুষ এই শান্তি চুক্তির পক্ষেই থাকবে। বিরোধী দলের উত্তেজনা সৃষ্টির কোন চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত সফল হবে না এবং সাধারণ মানুষ তা সমর্থন করবে না বলেই তাঁরা ধারণা পোষণ করছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চুক্তি পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায়
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ॥
বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিক্রিয়া

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনসমূহের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা অব্যাহত রয়েছে।

বিমল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বুধবার অনুষ্ঠিত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সভায় এ সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতি সম্প্রদায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন করে আসছিল সম্পাদিত শান্তি চুক্তিটি পূর্ণাঙ্গ না হলেও সেই লক্ষ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। চুক্তিতে তাঁদের অধিকার যতটুকু অর্জিত হয়েছে তার সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, হায়দার আকবর খান রণো, আসম মাহবুবুল হক প্রমুখ নেতা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম ও সদস্য সচিব আব্দুল মান্নান চৌধুরী শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এই চুক্তি পাহাড়ী বাঙালী সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার ও পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের এনজিওগুলোর সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান এডাব-এর এক বিবৃতিতে শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়, এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস এক যুক্ত বিবৃতিতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ চুক্তির বিরোধিতা না করতে স্বার্থান্বেষী মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা আরও জানান, শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী শনিবার দেশব্যাপী 'সম্প্রীতি দিবস' পালনের অংশ হিসাবে বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী সুফিয়া কামাল ও সাধারণ সম্পাদক আয়েশা খানম এক যুক্ত বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করে বলেছেন, এই চুক্তির সঠিক বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা সংহত হবে।

শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে আরও বিবৃতি দিয়েছে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, ঢাকা মহানগর ইউনিট মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মানবাধিকার সংস্থা এন্টি জেনোসাইড অর্গানাইজেশন, প্রাইভেট মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স এ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় জনতা পার্টি, রেলওয়ে শ্রমিক লীগ, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, সিপিবি, বাসদ, শ্রমিক কৃষী সমাজবাদী দল, সাম্যবাদী দল, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধা নৌ কমান্ডো এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কর্মসংস্থান সংস্থা, জাতীয় দরিদ্র পার্টি, উগ্র মৌলবাদী প্রতিরোধ কমান্ডো কাউন্সিল, বাকশাল, সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ, পিডব্লিউডি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মারমা বুদ্ধিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মঞ্চ, ঢাকা মেট্রো দৃষ্টি মুক্তিযোদ্ধা ও পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি, সলিডারিটি বাংলাদেশ, মহানগর রিক্সা শ্রমিক লীগ, কমিউনিষ্ট কেন্দ্র, মুজিব আদর্শ মূল্যায়ন পরিষদ, তফসিল জাতি ফেডারেশন, বঙ্গবন্ধু যুব পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ পূবালী ব্যাংক শাখা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধু ভেটেরিনারি পরিষদ, সেক্রেটারিয়েট এ্যডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন, সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ, ডেমোক্রেটিক ল'ইয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বঙ্গবন্ধু অনুসারী মঞ্চ, ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ, ইসলামী ঐক্যের ডাক, দেশীয় চিকিৎসা লীগ, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ গাজীপুর শাখা, মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড।

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ (শা-পা) বুধবার মিছিল-সমাবেশ করেছে। ছাত্রলীগের মিছিল প্রেসক্লাব হয়ে আবার টিএসসিতে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সমাবেশে বক্তৃতা করেন সংগঠনের সভাপতি একেএম এনামুল হক শামীম, মাহবুবুল হক শাকিল, অজয়কর খোকন, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর বেপারী, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁরা বলেন, যাঁরা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি চান না, দেশের উন্নতি চান না, তারাই এই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

পার্বত্য শান্তি চুক্তি

গত মঙ্গলবার বহুল প্রতীক্ষিত পার্বত্য শান্তির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে স্বাক্ষর করেন সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ লারমা)। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা মহানগরীর মেয়র, তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং সামরিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ।

বস্তুত জাতীয় গুরুত্ব যতটা দেয়া সম্ভব ততটাই দেয়া হয়েছে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে। এর সঙ্গত কারণও আছে। দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গী বিদ্রোহী সমস্যা এই ছোট দেশটির সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রায় পুরো কালপর্বেই এ অঞ্চলটি অপশক্তির ষড়যন্ত্র বিলোড়িত ছিল। ৫০৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে এই পার্বত্য অঞ্চলটি দেশের বৃহত্তম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকেই দেখা গেছে, কখনই এ অঞ্চলের আদিবাসীরা পূর্ণ অধিকার পায়নি। ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের আগমন নিষিদ্ধ এবং উপজাতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিলেও তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। আবার পাকিস্তান সৃষ্টির পর ম্যানুয়েল পরিবর্তন করায় রাজনৈতিক অধিকার ভোগের সুযোগ আদিবাসীরা পেলেও বহিরাগতদের বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হয়। ফলে ক্ষেত্রের নিরসন হয়নি ঐ অঞ্চলের মানুষের। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জটিলতা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। উপজাতীয়রা স্বায়ত্তশাসন দাবি করলে তৎকালীন সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে উপজাতিরা জনসংহতি কমিটি নামে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এর অধীনে গঠিত হয় সশস্ত্র জঙ্গী সংগঠন শান্তিবাহিনী। ১৯৭৪ সাল থেকে শান্তিবাহিনী সশস্ত্র সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। সরকারও নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করে। সংঘাতের মধ্য দিয়েই কেটেছে গত তেইশ বছর। ১৯৭৯ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সামরিক কায়দায় লাখ লাখ বাঙালীকে পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসিত

করার ফলে সমস্যা নতুন মোড় নেয়। শান্তিবাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৭ সালে গুচ্ছগ্রামের বেটনীর মধ্যে নিয়ে আসা হয় বাঙালীদের। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকার সময় প্রথম দিকে পূর্ববর্তী সরকারের নীতিতে চললেও পরে রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে এক সময় দেখা গেল সংলাপ শুরু হতে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছ'টি বৈঠক হয়েছিল কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সময় একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি এবং আঞ্চলিক জোট ১৩টি বৈঠক করেছিল কিন্তু ফল হয়েছিল পূর্ববৎ। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে আবার কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি জনসংহতি সমিতির সাথে সাতটি বৈঠক শেষে গতকাল শান্তি স্থাপনে সমঝোতায় উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে।

চার খণ্ড এবং ৬৮টি অনুচ্ছেদ সংবলিত এই সমঝোতা স্মারক পার্বত্য আদিবাসীদের স্বশাসন এবং কর্তৃত্বকে সংরক্ষণ করবে। এ সমঝোতা স্মারক মোতাবেক ২২ সদস্যের একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে তিন পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদ সদস্যদের মাধ্যমে। এই আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান অবশ্যই উপজাতীয় হবেন এবং প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন। এই পরিষদের তিন ভাগের দু'ভাগ সদস্য হবেন উপজাতীয় এবং বাকিরা হবেন বাঙালী। পরিষদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া সরকার কোন জমি পাহাড় অধিগ্রহণ করবে না। চুক্তির শর্ত মোতাবেক বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম রুমা ও দীঘিনালা) ব্যক্তি সামরিক বাহিনী আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে। এই সমঝোতা স্মারকে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আদিবাসীদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চারখণ্ড সংবলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন।

চুক্তি সংবিধানের আওতায় হবে কিনা কিংবা ঐ অঞ্চলে যে কোনভাবেই হোক বসবাসরত বাঙালী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষিত হবে কিনা এ নিয়ে দেশে

রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক ছিল। কিন্তু চুক্তির ভাষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়গুলোর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এ চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণের জন্য আরও একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে, যাতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি। চুক্তি বলবৎ হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকেই।

কাজেই এখন পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে একথা নির্দিষ্ট বলা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্ত লারমা বলেছেন, এ চুক্তির মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশাবাদী। গেরিলা যোদ্ধারা অস্ত্রসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হয়েছি। এখন পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, উপজাতীয়রাও এদেশের নাগরিক এবং তাদেরও অধিকার আছে দেশের অন্য অঞ্চলে বসবাসরত ভাইদের মতো নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার।

প্রকৃতপক্ষে শান্তির এটাই মূল প্রক্রিয়া। কেউ যদি কারুর পরিচিতি বিনষ্ট কিংবা অধিকার খর্ব করতে না চায় তাহলেই আর সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। উপরন্তু যে কোন অঞ্চলের ওপর ভূমিপুত্রগণদের অধিকার স্বীকার করে নিলে বৃহত্তর জাতিসত্তার ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। গত ২৩ বছরের সংঘাতের ফলে ২০ হাজার লোকের মৃত্যু হলেও দেখা গেছে পার্বত্য অঞ্চলে উন্নতির ছোঁয়া লাগেনি। অথচ সম্ভাবনা ঐ অঞ্চলেরও কম ছিল না বা নেই। এখন সংঘাতের বিস্ময় ফল সম্পর্কে জঙ্গীরাও সচেতন হওয়াতে একটা সমঝোতার শেষ পর্বও উপনীত হওয়া গেছে। কিন্তু এই সমঝোতা পর্যন্ত যেতে অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। রাজনৈতিক বিতর্ককে বিরোধী দল বিএনপি এবং তার মৌলবাদী দোসররা এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যাতে করে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সাংবিধানিক বিধিবদ্ধতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবে সমঝোতা স্মারকের অকপটতা সেই বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন করে দিয়েছে। আসলে সমঝোতা প্রক্রিয়ার যারা বিরোধিতা করেছেন এবং একে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন তাঁরা যুগের প্রয়োজন ও জাতীয় ঐকমত্যসহ কোন ইতিবাচক যুক্তিই মানেননি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তিকে ক্ষমতার দরকষাকষির একটা স্থায়ী সুযোগ বলেই তাঁরা মনে করেছেন। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের সর্বস্তরের

পাহাড়ী-বাঙালী এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষও চেয়েছে শান্তি। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে এ চুক্তির বিরুদ্ধে উদ্ভূত সব রকম বিতর্ককে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। এ কারণেই হয়ত পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি প্রক্রিয়া গুরু হতে পারল। আমরাও আশা রাখি এ শান্তি স্থায়ী হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ॥ পাকিস্তান

পাকিস্তান বৃহস্পতিবার বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। খবর ইউএনবির।

শান্তি চুক্তি সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনারের একটি সূত্র বলেছে, ‘এটি একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের আন্তরিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। পাকিস্তান বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহী।’

সূত্রটি আরও বলেছে, ‘বাংলাদেশের জনগণ যা কিছুই চান না কেন, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাঁরাই ভাল বুঝবেন।’

দৈনিক জনকণ্ঠ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই,

শান্তি চুক্তি নিয়ে সংসদে

আলোচনা হবে ॥ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, মানুষের মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরোধী দল অপপ্রচার চালাচ্ছে। জাতিকে বিভ্রান্ত করে তাঁরা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চাচ্ছেন। এর কোন যৌক্তিকতা বা গ্রহণযোগ্যতা নেই। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য শান্তি চুক্তি জাতীয় সংসদে আলোচনার ঘোষণা দিয়ে বলেন, বিরোধী দল আসুক বা না আসুক মানুষের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আমরাই সংসদে তা বিস্তারিত আলোচনা করব। একই সঙ্গে তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে। নীতি-আদর্শের তফাত থাকতে পারে। দেশ ও জাতির স্বার্থ

সম্মুখ রেখে আসুন সবাই মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি। শান্তি না এলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া, পটভূমি, সম্ভাব্য ভবিষ্যত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পরে তিনি সম্পাদকদের প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ শোনে এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। মন্ত্রিপরিষদের কয়েক সদস্য, সরকারী দলের নেতা, সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য থেকেই এই ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিনের একটি যুদ্ধাবস্থার অবসান হয়েছে। দেশের ভিতরে অশান্তি থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কঠিন হয়ে যায়। এই চুক্তিতে পার্বত্য অধিবাসীদের সামাজিক মর্যাদা ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার কথা আছে। এতে উপজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটবে। আমরা মহান বিজয়ের মাসে এই চুক্তি করতে পেরে আনন্দিত। অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা থাকার ফলেই এই চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হয়েছে।

চুক্তির বিভিন্ন সমালোচনার বিষয়ে তিনি বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে বিশেষ অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পরবর্তী সময়েও তা অব্যাহত থাকে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে, গত দুই দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

অনেক মায়ের বুক খালি হয়েছে। শান্তির চেষ্টা চলেছে কিন্তু সফল হয়নি। ’৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় পরিষদ নামে যে আইন করা হয়েছিল তাও ছিল শান্তি প্রক্রিয়ারই অংশ। বর্তমান চুক্তির সঙ্গে এই আইনটি মিলিয়ে দেখলেই অনেক বিভ্রান্তি দূর হবে।

বিএনপির দেয়া ১৮ দফা এবং এ ব্যাপারে সরকারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এক প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন তারা এর বিরোধিতা করছে কারণ খুঁজে পাই না।

সবকিছুতেই বিরোধিতা করতে হবে— এটাই হচ্ছে বড় কথা। তাদের আমলেও একটি প্রস্তাব হয়েছে, যা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা হয়েছিল। দেশ বিক্রির কথা এলে তা করা হয়েছিল তাঁদেরই আমলে, যখন তাঁরা বিদেশের মাটিতে বসে আলাপ করেছেন। শান্তি চুক্তিতে সারা জাতি যখন আনন্দিত তখন বিএনপি এর বিরোধিতা করতে এর বিরুদ্ধে ঘোষণা করছে কর্মসূচী। ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক পানি চুক্তির পরও তাঁরা তাই করেছেন। ভাল কাজকে গ্রহণ না করে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য।

চুক্তি স্বাক্ষরের আগে এর খসড়া সংসদে উত্থাপন করে আলোচনা করা যেত— একজন সম্পাদকের এই অভিমতের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি খুবই স্পর্শকাতর একটি ইস্যু। কাজেই খুব চিন্তাভাবনা করেই এগুতে হয়েছে। সংসদে বিষয়টি নিয়ে একমত হওয়া ছিল কঠিন। এতে বিলম্ব হয়ে যেত। এই প্রক্রিয়ায় গেলে চুক্তি হতো না। চুক্তি করার ভান করা যেত।

তিনি পাঁচটা প্রশ্ন রেখে বলেন, বিএনপি তো ক্ষমতায় থাকার সময় ভারতে গিয়ে ১৩টি বৈঠক করেছে। তখন তো এসব আলোচনা সংসদে আসেনি। এ ধরনের প্রশ্নও তখন উত্থাপন হয়নি। আমরা বরং এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে বিরোধী দলের বর্তমান আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরাও বিরোধী দলে ছিলাম। তখন আমাদের আন্দোলন এবং ইস্যুতে মৌলিকত্ব ছিল। জাতীয় স্বার্থ নিহিত ছিল। বিএনপি যে আন্দোলন করেছে তাতে কোন ইস্যু নেই। আজ একথা তো কাল ওকথা। একটা দাবি মানা হলে আরেকটা দাবি। প্রতিদিন বদলাচ্ছে ইস্যু। এর তো কোন সমাধান নেই।

বিএনপি আহূত একের পর এক হরতালে সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের কথা বলে এক সম্পাদক তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধী দলে থাকার সময় আমরা এত হরতাল করেছি তাই এখন আর হরতালের বিরুদ্ধে কিছু বলব না। তবে আমাদের হরতালের পিছনে যৌক্তিকতা ছিল। এখন কি কারণে হরতাল হচ্ছে সম্ভবত এর আহ্বানকারীরাও জানেন না। এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্রের বড় ভূমিকা রয়েছে।

বিরোধী দল কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। চুক্তির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। এক সিনিয়র সাংবাদিক তাঁর এই ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে প্রশ্ন করেন— চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য এলাকায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী চুক্তির সুনির্দিষ্ট ধারা জানতে চাইলে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, যেমন সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে যদি অশান্তিকর কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে অতীতে যেভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল এখনও সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। দিনের পর দিন সৈনিকদের পার্বত্য অঞ্চলের গহীন বনে রেখে মশার কামড়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার কোন মানেই হয় না। যারা স্বামী-স্ত্রী হারিয়েছেন কেবল তারাই এর বেদনা অনুভব করতে পারবেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, এক সময় যখন সেনাবাহিনী শান্তিবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ প্রায় করেই ফেলেছিল

তখন কি রহস্যজনক কারণে সেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল? সেই রহস্য আজ সাংবাদিকদেরই খুঁজে বের করা উচিত।

চুক্তি করে আত্মতুষ্টি নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকার কিছু নেই। মনে রাখা দরকার— এর বিরুদ্ধেও মত রয়েছে। এক সম্পাদক এই অভিমত দিয়ে প্রশ্ন করেন, বিরোধী মতের অপপ্রচার রোধে চুক্তি জাতীয় সংসদে আলোচনা করা হবে কিনা। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদে আলোচনা করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে আমরা চুক্তি উপস্থাপন করব। বিরোধী দল না এলে আমরাই চুক্তি নিয়ে আলোচনা করব।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

জনসংহতি সমিতি যেভাবে

অস্ত্র সমর্পণ করবে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের আইনগত পদক্ষেপ দেখেই জনসংহতি সমিতি শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের তারিখ ঘোষণা করবে। জনসংহতি নেতারা সরকার পক্ষকে কথাটি জানিয়ে গেছেন। সরকারী একটি সূত্র দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেছে, সরকার পক্ষ এক মাস সময়ের মধ্যে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের কথা বলেছিল। জনসংহতির পক্ষে তখন এর সময়সীমা পনেরো দিন বাড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ দিন নির্ধারণের অনুরোধ করা হয়। এর পর জনসংহতির নতুন মতটি পাবার পর চুক্তির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দ্রুততর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সূত্র বলেছে, ৪৫ দিনের মধ্যেই শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে নেয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

মার্কিন সরকার শান্তি চুক্তিকে স্বাগত

জানিয়েছে ॥ “দুই দশকের

সংঘাতের অবসান ঘটবে”

আশরাফুল ইসলাম, নিউইয়র্ক থেকে ॥ ক্রিনটন প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে।

গত ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র জেমস রুবিনের দেয়া এক বিবৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী উপজাতীয়দের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এটিকে একটি আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ বলে মনে করে।

ক্লিনটন প্রশাসন তাদের বিবৃতিতে আরও বলেছে, আমরা বিশ্বাস করি যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে অনেক মতভেদ রয়েছে। আমরা আশা করছি বাংলাদেশের সকল পক্ষের স্বদৃষ্টি এই শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

মুখপাত্র তাঁর বিবৃতিতে বলেন, দীর্ঘ দুই দশকের এই সংঘাতে অনেক প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হলে এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের অবসান হবে।

বিরোধী দল বিএনপি এই শান্তি চুক্তিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের যে ডাক দিয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্টেট ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরোর এক মুখপাত্র বলেন, গণতন্ত্রে মতবিরোধ থাকবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদই হচ্ছে সকল মতভেদ ও মতবিরোধের অবসানের উৎকৃষ্ট ও যথাযোগ্য স্থান। গণতন্ত্রে গঠনমূলক সমালোচনা না হলে গণতান্ত্রিক শাসন কার্যকর হয় না।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের অবসানের লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র জেমস পি রুবিনের বিবৃতিতে বলা হয়— বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির ঘোষণাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাগত জানাচ্ছে।

“আমরা এটাও স্বীকার করি যে, এই চুক্তি বিভিন্ন শর্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশে নানা মত রয়েছে। তবে আমরা আশাবাদী যে, সকল পক্ষের সদিচ্ছায় শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করা যাবে এবং দীর্ঘস্থায়ী একটি সংঘাত, যার ফলে গত দুই দশক ধরে বহু প্রাণহানি ঘটেছে, তার অবসান হবে।”

দৈনিক জনকণ্ঠ

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

পার্বত্য শান্তির আশাবাদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এখন থেকে সম্ভাবনাময় পার্বত্য অঞ্চলে সংঘাতের বদলে গুরু হবে শান্তি ও অগ্রগতির ধারা। দীর্ঘদিনের এই সংঘাত আমাদের দেশ-জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে

রেখেছিল। আমরা অনেক রক্ত, ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন করেছি। এ দেশে কোন যুদ্ধাবস্থা থাক তা আমরা চাই না। গত মঙ্গলবার পার্বত্য শান্তির লক্ষ্যে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তাৎক্ষণিক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঐ দিনই তিনি চুক্তিটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন রাষ্ট্রপতি যদি প্রয়োজন মনে করেন, বিরোধী দল যদি চায় তাহলে এটি সংসদে উত্থাপন করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যে সমকালীন গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিফলন লক্ষণীয়। তিনি এও বলেছেন যে, “বর্তমান বিশ্ব শুধুই এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমাদের নিজ দেশে সংঘাত থাক এটা কারোরই কাম্য ছিল না।” কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, পার্বত্য অঞ্চলে সংঘাতময় পরিস্থিতি চলছে দীর্ঘ ২৩ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় ২০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে; সেই সঙ্গে বিশ্বাস ও আস্থার ব্যত্যয় ঘটেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের। পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা, টিপরা, মারমা প্রভৃতি উপজাতীয় জনগোষ্ঠী দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে গিয়ে বসতি স্থাপনকারী বাঙালীদের বিশ্বাস করতে পারেনি। আবার বাঙালীরাও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত পাহাড়ী জনগণকে বিশ্বাস করতে পারেনি। এক দেশের নাগরিক হিসাবে যে সৌভ্রাতৃত্ব থাকার কথা তা ছিল না। কিন্তু ফল কারও জন্যই ভাল হয়নি। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এতদিন কিছু না কিছু সমৃদ্ধির ছোঁয়া লেগেছে কিন্তু পার্বত্য তিন জেলায় লাগেনি। বাংলাদেশের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অঞ্চল হিসাবে যদি কোন বিশেষ অঞ্চলের মূল্যায়ন করা হয় তাহলে পার্বত্য অঞ্চলকেই করতে হয়। সেখানে শিল্পের প্রসার তো ঘটেইনি, মূল্যবান কৃষিপণ্যেরও যথাযথ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা হয়নি, অবকাঠামোরও উন্নতি হয়নি। সংঘাতের সুযোগে বরঞ্চ উজাড় হয়েছে বনাঞ্চল ও মূল্যবান বনজ সম্পদ লোপাট হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলের শান্তির সঙ্গে তাই পাহাড়ী-বাঙালী উভয়েরই স্বার্থ জড়িয়ে আছে। সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এখন ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দূর হওয়ার মতো আনুকূল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির মধ্যেও শিল্পায়ন সংক্রান্ত উন্নয়নের বিবিধ বিষয় স্থান পেয়েছে। বস্তুত দীর্ঘ ১২ বছর ধরে আলোচনা চললেও শেষপ্রান্তে এসে অর্থনৈতিক বিষয়বলী বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ দুই পক্ষই বুঝেছে ঐক্যবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সচেতন না হলে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের কেউ আর ফিরেও তাকাবে না। কারণ সারা বিশ্বে এখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিভিত্তিক গণতন্ত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই বিশ্বের জাতিসমূহ

অধিকতর সমৃদ্ধি অর্জন করছে এবং অনেক বেশি নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশের সামনেও এখন এক সোনালী সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু কোন অঞ্চলে অশান্তি থাকলে সকলেই সমভাবে এই সোনালী সম্ভাবনার সুফল ভোগ করতে পারবে না। যমুনা সেতু যেমন দেশের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জনপদের মানুষকে উন্নয়ন সহযোগীতে পরিণত করেছে, তেমনি পার্বত্য সমঝোতা চুক্তিও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের মানুষকে উন্নয়নের অংশীদারে পরিণত করবে। এ কারণেই দেখা গেল, চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই দাতা দেশ ও গোষ্ঠীসমূহ পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বৈঠকে বসেছে। প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, “দেশের সকল অঞ্চলের মতোই সেখানকার নাগরিকদের সমান অধিকার রয়েছে, সকলে মিলেমিশে আমরা এই দেশ গড়ে তুলতে চাই।” এই প্রত্যাশার বাস্তবায়নের মধ্যেই আসলে নিহিত রয়েছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূলমন্ত্র। কারণ দেশের কোন একটি অঞ্চলের মানুষ পশ্চাৎপদ থাকলে কিংবা কোথাও সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করলে তা সমগ্র দেশের সমৃদ্ধিকেই পিছনে টেনে ধরে। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী ক্ষুদ্র এই দেশটির সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় না থাকলে গণতন্ত্র ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবেই, এ কথা ইতোমধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে, সব সরকারের জন্যই একটা বিরাট বোঝায় পরিণত হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের সংঘাতময় পরিবেশ। প্রচুর শক্তি, মেধা, প্রচুর শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছে এর পিছনে। সরকারের ভাবমূর্তিও প্রশংসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাঝে মাঝেই। কাজেই আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল একমাত্র কাম্য। দীর্ঘদিন আলোচনার পর যে সমঝোতা চুক্তি হয়েছে তাতে স্থায়ী শান্তির দিকনির্দেশনা আছে। সেজন্যই এর যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর দেয়া প্রয়োজন।

এই শান্তি চুক্তি নিয়ে ইতোমধ্যে একটি রাজনৈতিক মহল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে এটি সংবিধান সম্মত হয়েছে কিনা? প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে বলেছেন, “সংবিধানসম্মতভাবে, দেশের অখণ্ডতা-স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণ অবিচল থেকেই এই সমঝোতা চুক্তি করা হয়েছে।” তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, “শান্তিকামী জনগণ এর বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন, এর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কার্যক্রমে কেউ জড়িত হবেন না।” তিনি বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “অযথা অশান্তি সৃষ্টি না করে শান্তির পথে আসুন।” সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দল চাইলে সমঝোতা চুক্তিটি সংসদে উত্থাপন সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাতে তাঁর সরকারের গণতান্ত্রিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। হয়ত সংসদে উত্থাপিত হলে আলোচনার মাধ্যমে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় বেরিয়ে আসতে পারে। সংসদ যেহেতু রাষ্ট্রের সকল

কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু সংসদের মাধ্যমে যথাবিহিত প্রক্রিয়ায় এটিকে দেশবাসীর কাছে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। আমরা আশা করব, পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদীয় ও রাষ্ট্রীয় সকল মহল গঠনমূলক দায়িত্ব পালন করবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি চুক্তি ৯ রাজা

ত্রিদিব রায় ও অস্ট্রেলিয়ার অভিনন্দন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ৯ সাবেক চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ও অস্ট্রেলিয়া সরকার সম্প্রতি স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। ঐতিহাসিক এ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পার্বত্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ইসলামাবাদ থেকে পাঠানো এক বার্তায় সাবেক চাকমা রাজা আশা প্রকাশ করে বলেন, চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখবে। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তিটি যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য জনগণ শান্তি ও ন্যায়বিচার পাবার সুযোগ পাবে। রাজা ত্রিদিব রায় শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমাকেও অভিনন্দন জানান।

এদিকে পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাওনার শুক্রবার পাঠানো এক বার্তায় ঐতিহাসিক চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে অভিনন্দন জানান। বার্তায় আলেকজান্ডার আশা প্রকাশ করে বলেন, এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দুই যুগের বেশি সময়ের সশস্ত্র পরিস্থিতির অবসান ঘটবে, এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে যা সেখানকার পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। চুক্তিকে তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা এবং দুই সরকারের উন্নয়ন সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আলেকজান্ডার বলেন, তাঁর সরকার আশা করছে, এই শান্তিচুক্তি দীর্ঘদিনের সমস্যার একটি স্থায়ী এবং টেকসই সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করতে যে সব দেশ আগ্রহী অস্ট্রেলিয়া তাদের অন্যতম।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭
বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন
পার্বত্য শান্তি চুক্তি দেশের সার্বিক
উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এই চুক্তি কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামেই শান্তি আনবে না, দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে।

বৃহস্পতিবার পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তাঁরা এই চুক্তির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা এই শান্তি প্রক্রিয়াকে বানচালের যে কোন চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দেন ন্যাপ (মোজাফফর), জাতীয় কবিতা পরিষদ, ঐক্যপ্রক্রিয়া, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবার ইউনিট কমান্ড, মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সোসাইটি, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সংস্থা, রূপালী ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন, চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি, পিডব্লিউডি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, বাস্তবায়ন সমিতি, সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিদ্যুত সরবরাহ শ্রমিক লীগ, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের ২৪৩ জন প্রকৌশলী, জাতীয় ওলামা পরিষদ, ঢাকা মহানগর বাস্তবায়ন পুনর্বাসন ও সমাজ কল্যাণ সমিতি, জাতীয় মহিলা সংস্থা, পলিটেকনিক শিক্ষক পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সমাজ কল্যাণ পরিষদ, হাজারীবাগ ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি।

বিরোধিতা

কয়েকটি রাজনৈতিক দল পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করেছে এবং এর প্রতিবাদে আহূত ৭ ডিসেম্বরের হরতাল সফল করার আহ্বান জানিয়েছে। দলগুলো হলো: জাতীয় পার্টি (জা-মো), পিএনপি, খেলাফত মজলিস ও ইসলামী ঐক্যজোট।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তি করতে কারও কারও মনে
অশান্তি দেখা দিয়েছে, তারা অশান্তি
জিইয়ে রাখতে চায় ॥ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে আমরা শান্তি চুক্তি করায় কারও কারও মনে অশান্তি দেখা দিয়েছে।

এই চুক্তির বিরুদ্ধে হরতাল ডেকে তারা অশান্তি জিইয়ে রাখতে চায়।’ তিনি শনিবার আওয়ামী যুবলীগের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও শেখ মনির ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে যুবলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। শান্তি চুক্তির বিরোধিতাকারীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি জনগণকে তা বুঝিয়ে বলতে তিনি যুবলীগ কর্মীদের নির্দেশ দেন।

শান্তি চুক্তি সহই হবার পর গতকালই প্রথম রাজনৈতিক কোন অনুষ্ঠানে দলীয় নেতা-কর্মী পরিবেষ্টিত প্রধানমন্ত্রীকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। রসিকতা করে তিনি তার প্রতিপক্ষ বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম জিয়াকে ‘অশান্তি বেগম’ নাম দিয়ে তাকে শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। গতকাল ছিল এরশাদ সরকারের স্বেচ্ছাচারী শাসনের পতনের দিন। সে কথা স্মরণ করে বিরোধী দলের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের সে বিজয় ছিল আমাদের সম্মিলিত আন্দোলনের ফল। পুনর্প্রতিষ্ঠিত সেই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে সংসদে ফিরে আসতে তাদের অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদে এসে যা খুশি বলুন, আমাদের ভুল হলে তা ধরিয়ে দিন, আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনাকে আমরা অবশ্যই সম্মান করব এবং ভুল সংশোধন করতে লজ্জা করব না। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই সংসদে বিরোধী দলের অনেক সংশোধনী গ্রহণ করে বিল পাস করার উদাহরণ রেখেছে যা অতীতে হয়নি। হরতাল সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, ‘অতীতে আমরা বহু হরতাল করেছি বলে এর বিরুদ্ধে কিছু বলব না, কিন্তু আমরা তো ভোট চুরি করিনি, অশান্তি নয় বরং শান্তি চুক্তি করেছি, তাহলে কেন, কার স্বার্থে এ হরতাল— তিনি প্রশ্ন করেন।

বিকেলে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ সেলিম এমপি, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমু, যুবলীগের সাবেক নেতা সৈয়দ আহমেদ, নুরুল মজিদ হুমায়ুন, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কাজী ইকবাল ফারুক, প্রেসিডিয়াম সদস্য ডঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক সাইদুর রহমান, মহানগর কমিটির নেতা আবুল কাসেম মন্টু ও এসএম জাহিদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাহাঙ্গীর কবীর নানক। অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ সৌদি রাষ্ট্রদূত, রাশিয়ান দূতাবাসের কাউন্সিলর এবং ফিলিস্তিনী দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে দুঃখ করে আরও বলেন, আমরা যখন একের পর এক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করছি তখন পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্য খণ্ডন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি অভিযোগ করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে চুক্তি হলে ফেনী পর্যন্ত

ভারতের অধীনে চলে যাবে। এখন চুক্তি হবার পর তাঁর কথা সত্যি হলে তাঁর তো ফেনীর নয় ত্রিপুরার এমপি হবার কথা, কিন্তু তা কি হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, নির্বাচনের আগে বেগম জিয়া বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদে নামাজ পড়া যাবে না, আজানের পরিবর্তে উলুধ্বনি শোনা যাবে, এখন প্রমাণিত হয়েছে এসব ছিল মিথ্যাচার। শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন আল্লাহ এবং জনগণই মিথ্যাবাদীদের শাস্তি দেবেন।

দেশের বেকার যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সরকারের নেয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নতুন বাংলাদেশ গড়তে যুব সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। দৃঢ়তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ আজ গরিব কিন্তু এ অবস্থা থাকবে না, আগামী শতাব্দীতে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নত দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি কিভাবে সংবিধান

বিরোধী তার প্রমাণ দিন ৯ ব্যারিস্টার আমির

স্টাফ রিপোর্টার ৯ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন, কোন যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে শান্তি চুক্তিকে সংবিধান বিরোধী চুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন তার প্রমাণ পেশ করুন। কোন যুক্তিতে বলেন যে, চুক্তি হলে দেশ বিক্রি হয়ে যাবে। যা কিছু চুক্তি হয়েছে সবটাই সংবিধানের আওতায় হয়েছে। সুতরাং একটি মিথ্যাচারকে কেন্দ্র করে হরতালের নামে রক্তের হোলিখেলা খেলবেন না। দীর্ঘদিন পর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

গতকাল শনিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এক সম্প্রীতি সমাবেশে তিনি একথা বলেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই সমাবেশ আয়োজন করে।

সমাবেশে চাকমা রাজা দেবশীষ রায়ের বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তিনি আসতে পারেননি।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুসের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ, জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদ, বামফ্রন্ট নেতা কমরেড মোর্শেদ আলী, নাট্যকার ও অভিনেতা মামুনুর রশীদ ও জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, পৃথিবীতে এখনও অনেক দেশে এই ধরনের সমস্যা রয়েছে, কিন্তু খুব কম দেশই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সমস্যা তা এ দেশে ইতোপূর্বের কোন সরকারই পুরোপুরি সমাধান করতে পারেনি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এই শান্তি চুক্তি উপহার দিতে পেরেছে। এটা কোন নির্বাহী আদেশে হয়নি। চুক্তি হয়েছে সংসদের চীফ হুইপের নেতৃত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে। আর তা ব্যাপক আলোচনা করে দু'পক্ষ সমঝোতায় উপনীত হয়ে। তিনি বলেন, আমি মনে করি সংসদ নিজেই কমিটির মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে। এর কাঠামো সংবিধানেই বিদ্যমান রয়েছে।

শান্তি চুক্তিতে নতুন কিছু করা হয়নি। তবে নতুন যা করা হয়েছে তা হলো আঞ্চলিক পরিষদ গঠন। এই পরিষদের কর আরোপের কোন ক্ষমতা নেই। বিধি তৈরি করারও ক্ষমতা নেই। একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে, যা জিয়া-এরশাদের সময় ছিল। জিয়ার সময় মন্ত্রীর পদমর্যাদায় বিনতা রায়কে, অং প্রু চৌধুরীকে পার্বত্য বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল। এরশাদের সময় উপেন্দ্র চাকমা ছিল উপদেষ্টা। তাহলে এখন একজন মন্ত্রী নিয়োগ দিতে তো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। মন্ত্রী করলে আরও সুবিধা হবে। মন্ত্রিপরিষদ সংসদে জবাবদিহিতা করতে পারবে।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, যদি চুক্তির ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকে তাহলে সেটা সংসদে আলোচনা করুন। এদেশের জীবন-জীবিকাকে জিম্মি করে অযৌক্তিক হরতাল দিয়ে দেশের সর্বনাশ করবেন না। আমরা গণতান্ত্রিক স্থিতিশীল বাংলাদেশ চাই।

অন্য বক্তারা অযৌক্তিক হরতালের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিএনপি এখন মৌলবাদী, উগ্রবাদীদের খপ্পরে পড়ে দেশে অশান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে চায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

খাগড়াছড়িতে শান্তি চুক্তির

পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল সমাবেশ

খাগড়াছড়ি, ৬ ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে শনিবার খাগড়াছড়ি শহরে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ী গণপরিষদের উদ্যোগে শনিবার সকালে পাহাড়ী ছাত্র-জনতা আনন্দ মিছিল ও পরে সমাবেশে মিলিত হয়। একই দিন বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত সমর্থিত পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ

খাগড়াছড়ির শাপলা চত্বরে হরতালের সমর্থনে সমাবেশের আয়োজন করে। এর আগে হরতালের সমর্থনে বাঙালীদের জঙ্গী মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে এই মশাল মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে খাগড়াছড়ি শহরে শনিবার সকালে পাহাড়ী ছাত্র-জনতার এক বিশাল আনন্দ মিছিল বের হয়। প্রায় সহস্রাধিক পাহাড়ী ছাত্র-জনতা ও মহিলা এ আনন্দ মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় কড়ইতলায় এসে এক গণজমায়েতে মিলিত হয়। পরে পাহাড়ী গণপরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন এ্যাডভোকেট শক্তিমান চাকমা, ডাঃ কনিষ্ক চাকমা, রূপক চাকমা, থৈয়াই অং মারমা, মৃগাঙ্ক খীসা, খগেশ্বর ত্রিপুরা ও চৈতালী ত্রিপুরা।

সভায় বক্তাগণ বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগের অধিকালের জন্ম জনগণের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও সেনা শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে এ চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নেতৃবৃন্দ এ চুক্তিকে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রগতির একটি ধাপ হিসাবে মন্তব্য করেন।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, গণপরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশন যৌথভাবে এ আনন্দ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিকে কালো চুক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে তা বাতিল ও রবিবারের হরতালের সমর্থনে শনিবার সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি শহরে সহস্রাধিক বাঙালী ছাত্র জনতা এক মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। এদিকে শহরে সম্ভাব্য সহিংস ঘটনা ও জেলার আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় নাগরিক কমিটি ও পাহাড়ী পেশাজীবী ঐক্য কমিটি পার্বত্য শান্তি চুক্তির সমর্থনে আনন্দ মিছিল স্থগিত ঘোষণা করেছে। বর্তমানে খাগড়াছড়ি শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

বাস্তবতার নিরিখে শান্তিচুক্তি

অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকায় গত মঙ্গলবার পার্বত্য চট্টগ্রাম

বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে এই চুক্তি। এই চুক্তির ব্যাপারে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। একদিকে চুক্তি সম্পাদনের খবরে দেশে আনন্দ মিছিল বেরিয়েছে। চুক্তিটিকে জানানো হয়েছে অভিনন্দন। বিপরীতে প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ কোন কোন বিরোধী দল বিরোধিতা করেছে এ চুক্তির। তাদের বক্তব্য এ চুক্তি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। এ জন্য রবিবার পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়েছে। এ চুক্তি নাকি সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন কথাও বলা হচ্ছে। ওদিকে তিনটি পাহাড়ী সংগঠন— পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী নারী ফেডারেশনের নেতা-নেত্রী এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থে চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতায় অবিচল আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রেখে সংবিধানের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এই চুক্তিতে সকলের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে এবং এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দু'যুগের সংঘর্ষ ও হানাহানির অবসান ঘটবে। চুক্তির ব্যাপারে তিনি আরও বলেছেন, বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই, শান্তিচুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে। শান্তিচুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। ফরাসী ও ব্রিটিশ দূত ব্যক্ত করেছেন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। দাতা দেশগুলো পার্বত্য তিন জেলার অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব টাকাই দিতে রাজি, তবে অধিকার দেবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। গত বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী এসএমএস কিবরিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি ঐকমত্য হয়েছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট একটি কূটনৈতিক সূত্রের উদ্বৃতি দিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠে গত পরশু প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় দাতা দেশগুলোর সম্ভ্রান্তির কথা আবার তাঁরা মন্ত্রীর কাছে উল্লেখ করেছেন। পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় খুবই খুশি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার অভিযোগ করে আসছিল। অবশেষে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় উল্লিখিত দেশগুলোর কূটনীতিকরা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মোটামুটি দু'দশক ধরে বিরাজ করছিল অশান্তি। কোন দেশের একটি অংশে হিংসা, হানাহানি, সংঘাত দীর্ঘদিন টিকে থাকলে সেজন্য শুধু সংশ্লিষ্ট এলাকারই নয়, সারা দেশেরই ক্ষতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে চলেছিল তার জন্য যে ক্ষতি হচ্ছিল, তা

গোটা দেশেরই ক্ষতি। সেখানকার ঘটনায় গোটা দেশ ছিল উদ্ভিগ্ন। এই শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সারা দেশের মানুষ দীর্ঘদিনের একটা অস্বস্তিকর উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার হাত থেকে যে মুক্তি পেল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর প্রায় দু'দশকের সশস্ত্র সংঘাত, রক্তপাত ও হানাহানিতে বিক্ষত পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী বাঙালী নির্বিশেষে সকলে বন্ধুত্বপূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশে বাস করতে পারবে, শান্তির পরিবেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে— এটাই প্রত্যাশা করা যায়। সেখানে এতকাল কোন শান্তি ছিল না, বহু রক্ত ঝরেছে। আর সম্পদও কম নষ্ট হয়নি। এই হানাহানি বন্ধ করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, সেটা চেয়েছে সারা দেশের লোক। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলাপ-আলোচনার সূচনা হয়েছিল সেই তাগিদ থেকেই। দেশের একাংশে এভাবে সংঘাত চলতে দেয়া কোনভাবেই জাতীয় স্বার্থসম্মত নয়— সেই তাগিদেই রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধানের চেষ্টার সূচনা। সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সংলাপ প্রথম শুরু হয় ১৯৮৫ সালে এরশাদ সরকারের আমলে। এরশাদ সরকার আমলে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারী প্রতিনিধিদের ৬টি বৈঠক হয়েছিল। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আবার শুরু হয় শান্তি আলোচনা। ঐ সংসদীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ১৩ বার বৈঠকে মিলিত হয়। পরে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন সংসদীয় কমিটি গঠনের পর শান্তি আলোচনার ধারাটি অব্যাহত রাখে। সেদিক থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকে সামগ্রিকভাবে একটি ধারাবাহিকতা বলা চলে। শেষ পর্যন্ত সেই ধারাবাহিকতা ফলপ্রসূ হয়েছে। সম্পাদিত হয়েছে শান্তিচুক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিকে মূল্যায়ন করতে হবে এই ধারাবাহিকতা এবং বর্তমান বাস্তবতার নিরিখেই। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই দীর্ঘদিনের রক্তপাত-হানাহানির পরিবর্তে ঐ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। অন্যদিকে সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ইত্যাদি বলা হচ্ছে প্রধান বিরোধী দলসহ অপর কোন কোন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে। চুক্তিটিকে সংসদে ওঠানো হলে সেখানে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই, সংসদে এ চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সর্বমহলে অনুভূত হয়েছে বলেই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এতকাল সেখানে শান্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উন্নয়নও তেমন হয়নি। গত ২৩ বছরের সংঘাতে ২০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু শান্তি তাতে আসেনি। শেষ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার সত্যিকার সম্ভাবনা এখন, শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর সৃষ্টি হয়েছে। অন্য কোনভাবে নয়, শান্তির এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করাই এখন জাতীয় স্বার্থসম্মত।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি গঠনমূলক ও সমন্বয়পযোগী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সম্মিলিত মানবাধিকার পর্ষদ পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে গঠনমূলক ও সমন্বয়পযোগী বলে আখ্যা দিয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, যারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে পর্ষদ তাদের প্রতি নিন্দা জানায়। অপর প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, হরতাল রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হলেও যারা হরতালের শিকার তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সোমবার পর্ষদ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলা হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবে এ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পর্ষদের আহ্বায়ক ফ.র. মাহমুদ হাসান। উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি কেএম সোবহান, সালমা খান, রাহাত খান, আবুল বাশার ও রাশেদা কে চৌধুরী।

লিখিত বক্তব্যে গত নবেম্বর মাসের প্রথম ১৫ দিনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, এগুলো রোধ করে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নত করতে হলে সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায় থেকে এবং সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে নিয়মিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার জন্য পর্ষদ দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে গণমাধ্যমের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। রোধ করতে হবে ফতোয়াবাজ।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে পর্ষদ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী পোষ্টার প্রদর্শনী। বিকাল তিনটায় একই স্থানে তথ্য প্রদর্শনী ও সন্ধ্যা সাতটায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ছ'টায় জাতীয় যাদুঘর থেকে আলোক শোভাযাত্রা বের হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭

সাক্ষাতকারে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক ও আমীর-উল-ইসলাম

শান্তি চুক্তির কোন ধারাই সংবিধানের

পরিপন্থী নয় ৥ জাতীয় স্বার্থ নয়

দলীয় স্বার্থেই বেশি কথাবার্তা হচ্ছে

ফজলুল বারী ৥ দেশের সংবিধান রচয়িতাদের অন্যতম দু'জন আইন বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বলেছেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে ভূমি সংক্রান্ত ধারা-উপধারাসমূহ কোনভাবেই সংবিধান পরিপন্থী নয়। আমাদের সংবিধানে বর্তমানেও এ ধরনের বিধান, প্রোবিধান অন্তর্ভুক্ত আছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনে রাখতে হবে, সংঘাতমুখর একটি এলাকার স্থায়ী শান্তির আশায় বিশেষ কিছু বিবেচনাসহ চুক্তিটি করা হয়েছে। এই বিশেষ বিবেচনার সুযোগ আমাদের সংবিধানের ২৮(৪) ধারাতেই সুস্পষ্ট উল্লেখ করা আছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলোও সংবিধান নির্দেশিত এসব ধারার আলোকে একটি সমাধানের চেষ্টা করেছিল। আইনজীবী বলেন, এই চুক্তি একটি শান্তি প্রক্রিয়ার পথ তৈরি করেছে। এখন এর আলোকে সংসদে আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং তার বাস্তবায়ন পর্বই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ বলেন, চুক্তি নিয়ে জাতীয় স্বার্থ নয়, দলীয় স্বার্থ দেখেই বেশি কথাবার্তা হচ্ছে। আমি কোন দল করি না। পার্বত্য অঞ্চলে এখন যুদ্ধ হচ্ছে না। ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা আত্মসমর্পণ করবে। অস্ত্র, গোলা-বারুদ জমা দেবে। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি এলে সেখানে উন্নয়ন হবে, পাহাড়ী-বাঙালী মিলেমিশে থাকতে পারবে। এর জন্যই আমি শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছি এবং এটি একটি ভাল চুক্তি হয়েছে। জমি জমা বিক্রি ও হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, সংখ্যালঘু, অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষের জন্য এমন বিধান আগেও আমাদের এখানে প্রচলিত ছিল। ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার পর মাইনরিটি প্রটেকশন অ্যাক্ট নামের একটি আইন প্রণয়ন করেছিল তৎকালীন মোনাম্মেন খাঁর সরকার। সেই আইনে উল্লেখ করা ছিল— সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রী করা যাবে না। এখন এই চুক্তিতে এ ব্যাপারে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানকে। সেজন্য এই ধারাটি তুলনামূলক অর্থেও গণতান্ত্রিক। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বলেন, জমি ক্রয়-বিক্রয় নিষেধাজ্ঞা আমাদের দেশে নতুন নয়। রাজউক, সামরিক এলাকা, বনবিভাগ,

খাস জমি এসব ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল, আছে। জনসংহতির প্রথম দাবিনামার পার্বত্য এলাকায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষণেরও কথা ছিল। এখন তারা সেই দাবি থেকে সরে এসেছে। ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত ফয়সালায় জন্য ভূমি কমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছে চুক্তিতে। ভূমি কমিশনের রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য। নতুবা আইনী দীর্ঘসূত্রতায় এ বিষয়টির ফয়সালা অনিশ্চিত হয়ে যেত। জমি ক্রয়-বিক্রয় সংরক্ষণ নীতি রাখায় পার্বত্য এলাকা পরিবেশগত বিপর্যয় থেকেও রেহাই পাবে। তা ছাড়া এটি নতুন কিছু নয় পার্বত্য এলাকার ক্ষেত্রে। ব্রিটিশরাও ১৯০০ সালে হিল ট্রাস্টস রেগুলেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে ওই এলাকার জন্য এমন সুযোগ-সুবিধার বিধান রেখেছিল। আমীর-উল-ইসলাম বলেন, আমার যতটা ধারণা পার্বত্য এলাকায় এখন ভূমি বিষয় নিয়ে যে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে তার সঙ্গে গোষ্ঠী স্বার্থ জড়িত। বিগত দিনে নানা স্বার্থে সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বেআইনী পন্থায় জমি-পাহাড়ের বন্দোবস্ত দেবার ঘটনা থাকতে পারে। এখন ভূমি কমিশনের তদন্তে যদি এসব বন্দোবস্ত বেআইনী বিবেচনায় বাতিল হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় সংশ্লিষ্টরা আতঙ্কগ্রস্ত। আমীর-উল-ইসলাম এ সম্পর্কে আইনী ব্যাখ্যায় সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন থাকবে আশা করেন।

ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বিএনপি'র চেয়ারপার্সন এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং নেতৃবৃন্দের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে শান্তি চুক্তি সম্পর্কে তাদের ১৮টি আপত্তির আইনগত জবাব দিয়েছেন। এগুলো এখানে গ্রহণ করা হয়েছে ধারাবাহিক।

বিএনপির প্রথম আপত্তি দফায় দেশের এক-দশমাংশ এলাকার সার্বভৌমত্ব বিপন্ন এককেন্দ্রিক, এককেন্দ্রিক ক্ষমতার বিলুপ্তির জবাবে আমীর-উল-ইসলাম বলেন, চুক্তির প্রথম প্যারাতেই সার্বভৌমত্ব, সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গীকার রয়েছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আমাদের সংবিধান স্বীকৃত পথ। এককেন্দ্রিক ক্ষমতা গণতান্ত্রিক রীতিনীতিরও সমার্থক নয়। সংবিধানের ৫৯/৬০ ধারায় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আছে। আমাদের ইউপি, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, থানা, জেলা পরিষদ এসব বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ। সংবিধানে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কথা উল্লেখ করা আছে। বিএনপি আমলে আপীল বিভাগ সর্বোচ্চ ছয় মাস সময়ের মধ্যে নির্বাচিত জেলা পরিষদ গঠনের জন্য সরকারকে বলেছিল। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধির বিষয়ে অঙ্গীকারের অভাবে বিএনপি তা এড়িয়ে যায়। চুক্তিতে বিভাজনের বিষয়ক রোপণের অভিযোগের জবাবে বলেন, এটাও বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে সংবিধান নির্দেশিত পথ অনুসরণে আনুগত্যের পরিচায়ক নয়। চুক্তিতে জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে

দেবার অভিযোগ একেবারেই অমূলক। আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধান পরিপন্থী এই অভিযোগের জবাবে আমীর-উল-ইসলাম বলেন, পরিবর্তিত সময়ের দাবি অনুসারে সংসদকে সংবিধানসম্মত পদক্ষেপ নেবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ১৫২(২) অনুচ্ছেদে। বিএনপি জনসংহতির সঙ্গে যেভাবে সমঝোতা করতে চেয়েছিল সেটিও আঞ্চলিক পরিষদের ধারণার বাইরে কিছু ছিল না।

আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামো, ক্ষমতা ঠিক করে দেবে সংসদ। বেগম জিয়া বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে এক্ষেত্রে সংসদে নিজস্ব ভূমিকা রাখতে পারেন। পঞ্চম আপত্তিতে বিশেষ এলাকার মন্ত্রী নিয়োগে আপত্তির জবাবে আমীর-উল-ইসলাম বলেন, সংবিধানে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে যথাযথ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ৫৫(১) অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রী এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুসারে এর আগে জিয়া, এরশাদ আমলে বিনীতা রায়, উপেন্দ্র লাল চাকমা, অংশু প্র চৌধুরী প্রমুখ উপদেষ্টা, মন্ত্রী এসব দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমান চুক্তিতে ১৯ ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদের বিধান রাখা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। সংখ্যালঘু কোটার বিধান আছে সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে। অতীতের সরকারগুলোও এটি অনুসরণ করেছে। সপ্তম আপত্তি সংসদের ক্ষমতা খর্ব এই অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, আর্টিক্যাল ৭৯ অনুসারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সংসদের সংস্কৃতিরই অংশ। বিকেন্দ্রীকরণ সত্ত্বেও সংসদই সর্বোচ্চ ফোরাম। আঞ্চলিক পরিষদের পুলিশ থাকা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা পুরনো ধারাবাহিকতার নতুন রূপ। আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব চৌকিদার আছে। ১৯৫৮ সালের আইনে সব জেলাকে নিজস্ব পুলিশ বাহিনী রাখার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ১৯৮৯ সালের পার্বত্য স্থানীয় সরকার পবিষদকেও দেয়া হয়েছে একই ক্ষমতা। উপজাতীয় নেতৃত্বকে সুযোগ দেয়া হয়েছে সংবিধানের ২৮(৪) ধারার আলোকে। ১৯৮৯ সালের আইনেও একই বিধান ছিল। এর মানে এই নয় যে, উপজাতীয়কে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদ অনুসারে চলতি ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের জায়গায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসনামলে সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ কমিশনার। চুক্তির ১৭(ক) অনুচ্ছেদে পার্বত্য এলাকায় সেনাবাহিনীর অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারের জমি অধিগ্রহণ ক্ষমতা সঙ্কুচিত করার আপত্তির জবাবে আমীর-উল-ইসলাম বলেন, কাগুই বাঁধ, রিজার্ভ ফরেস্ট, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহকেন্দ্রসহ বিশেষ এলাকা এর বাইরে সরকারের

কর্তৃত্বে রাখা হয়েছে। স্পর্শকাতর পার্বত্য এলাকায় কাগুই বাঁধে বিপুল জমি ডুবে যাওয়ার পর থেকে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে। বর্তমান সংরক্ষণ নীতি পরিবেশ ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হবে। আগে স্থানীয় সরকার পরিষদের সেকশন ৬৪তে শুধুমাত্র পাহাড়ীদের জমি ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে এই বিধান ছিল। চলতি চুক্তিতে পার্বত্য এলাকায় সকল স্থায়ী বাসিন্দার ক্ষেত্রে একই বিধান রাখায় এটি এক ধরনের অগ্রগতি। টোল আদায় স্থানীয় সরকারের পুরনো একটি ক্ষমতা। এবারে খনিজ সম্পদের রয়্যালটির বিষয়টি নতুন। এতে করে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্টতা, সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। এই লাভ সরকারের খাতায়ই যোগ হবে।

ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম সবশেষে বলেন, বর্তমান চুক্তি তিন সরকারের ধারাবাহিক চেষ্টার ফসল। যেসব পয়েন্টে বিরোধিতা হচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে তিন সরকারের মৌলিক বিরোধ নেই। কারণ এমন অথবা এর কাছাকাছি বিধান পূর্ববর্তী সরকারগুলোও অনুসরণ করে এসেছে। তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ খুবই ভাগ্যবান। সে কারণে স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের দাবিকে এই পর্যায়ে সংবিধানসম্মতভাবে ফয়সালা সম্ভব হয়েছে। তিনি বারংবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নে সতর্কতা এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর দিতে অনুরোধ করেছেন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চুক্তি প্রসঙ্গে ব্রিটিশ এমপি'র মন্তব্য

উঃ আয়ারল্যান্ডে এমন চুক্তি হলে টনি খুশি হতেন

ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন দলের এমপি উনা কিং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে একটি চমৎকার চুক্তি বলে বর্ণনা করে এর সফল বাস্তবায়ন কামনা করেছেন। উনা কিংয়ের নির্বাচনী এলাকায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটার বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। খবর ইউএনবি'র।

শ্রমিক দলের এমপি উনা কিং বলেন, “আপনাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে যা করেছেন, তা করতে পারলে এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড সমস্যার সমাধান করতে পারলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেরার নিশ্চিতই আনন্দিত হবেন।”

গতকাল বুধবার রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে উনা কিং এ কথা বলেন।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও পার্লামেন্ট প্রসঙ্গে কমনস সভার তরুণ সদস্য বলেন, একান্ত ব্যক্তিগত বৈরিতা আপনাদের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, “গ্রামীণ ব্যাংকের মতো অনেক বিষয়ে আপনাদের কাছে আমাদের শিক্ষা নেয়ার রয়েছে। আর আমাদের কাছ থেকে আপনাদের শিক্ষা নেয়ার মতো যদি একটিমাত্র বিষয়ও থাকে তাহলে সে বিষয়টিকে বলব ‘বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা পালন’ সম্পর্কে শিক্ষা নেয়া।”

তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দলের গঠনমূলক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের একমতের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উনা কিং পূর্ব লন্ডনের একটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর ঐ আসনের শতকরা ৩০ ভাগ ভোটের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। এদের শতকরা ৯৫ জনই আবার বৃহত্তর সিলেট থেকে আগত। কিং তাঁর সফরকালে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলেই ৪ দিন কাটান। কিং সংসদের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক ৯ সদস্যের সিলেক্ট কমিটির একজন হিসাবে বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চালাবেন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের হয়ে কথা বলবেন বলেও আশ্বাস দেন। তাঁর পূর্বসূরি পিটার শোর ঐ গ্রুপের চেয়ারম্যান। শোর এখন লর্ডসভার একজন সদস্য। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়ার সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা উল্লেখ করে ব্রিটিশ এমপি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীরা যাতে তাদের মাতৃভূমিতে বিনিয়োগ করে সে ব্যাপারেও তিনি চেষ্টা করবেন।

কিং বলেন, যুক্তরাজ্যে আপনাদের দেশের লোকজন যে বর্ণ সমস্যা মোকাবিলা করছেন সে ব্যাপারেও আমি চেষ্টা করব। মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে ৩০ বছরে পদার্পণকারী এই ব্রিটিশ এমপি নিজেকে বহুজাতিক গোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশীদের, বিশেষ করে সিলেটবাসীদের যুক্তরাজ্যে ভিসা পেতে সমস্যা নিরসনে তিনি তাঁর উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত

এ দিকে বাসস জানায়, সফররত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য উনা কিং সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। কিং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কিছু সময় কাটান এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।

সংসদ সচিবালয়ের সচিব কাজী মঞ্জুরে মওলা এ সময় ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সম্পাদকীয় শান্তির বিকল্প নেই

অশান্ত পার্বত্য অঞ্চলে ক্রমশ শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত খবর অনুসারে : পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ রাজ্যমাটি ও বান্দরবানে অবরোধ কর্মসূচী স্থগিত করেছে। সরকার ও বিরোধী দলের স্থানীয় নেতাদের মধ্যে সমঝোতা বৈঠকে একই সঙ্গে তারা সন্ত্রাস বন্ধ ও শান্তি রক্ষার ব্যাপারেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হরতাল-অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচীতে বিপর্যস্ত পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় নেতাদের শান্তির পক্ষে নেয়া এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কারণ তিন পার্বত্য জেলার সর্বত্র স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা শুরু হোক— দেশের শান্তিকামী মানুষ সেখানকার বাঙালী ও পাহাড়ীদের কাছে এটিই প্রত্যাশা করে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য— দীর্ঘ দু’দশকের রক্তক্ষয় ও হানাহানির অবসান এবং পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির পর গত প্রায় পঞ্চকাল ধরে পার্বত্য অঞ্চলে নতুন করে যে অশান্তি বিরাজ করছে, তার মূলে রয়েছে দু’টি প্রধান কারণ। তার একটি হচ্ছে : শান্তি চুক্তি বিরোধীদের শান্তি চুক্তির অপব্যখ্যা এবং অপরটি হচ্ছে : শান্তি চুক্তি ব্যাখ্যায় সরকারের নিক্রিয়তা। দেশের প্রধান বিরোধী দলসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল শান্তি চুক্তি দেশের সংবিধানবিরোধী, জনস্বার্থবিরোধী, বিশেষ করে এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালীরা তাদের জমি ও ভোটের ন্যায্য অধিকার হারাবে বলে যে অপপ্রচার চালিয়েছে, তাতে দেশের সাধারণ মানুষ ও পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালীদের বিভ্রান্ত ও শঙ্কিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আর এ সময়ে শান্তি চুক্তি ব্যাখ্যায় সরকারের নীরবতা ও নিক্রিয়তা জনমনে এই বিভ্রান্তির ধূমজাল আরও বিস্তৃত হয়। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালীরা। সৃষ্টি হয় এক অনাকাঙ্ক্ষিত অশান্ত পরিস্থিতির। হরতাল-অবরোধের পাশাপাশি সংঘর্ষ-সংঘাতে প্রাণহানিসহ ঘটে যায় কিছু দুঃখজনক ঘটনা। অথচ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এ ধরনের অশান্ত পরিস্থিতি কারও কাম্য ছিল না।

দেশী-বিদেশী শান্তিকামী মানুষ পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল একাধিক কারণেই। তাদের প্রত্যাশা ছিল— এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে একদিকে পার্বত্য অঞ্চলে যেমন দীর্ঘ দু’দশকের রক্তপাত ও

সংঘর্ষ বন্ধ হবে, অন্যদিকে তেমনি পাহাড়ী ও বাঙালীদের মিলেমিশে বসবাস করার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে তারা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মতোই দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রেও, যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

কিন্তু সরকার ও শান্তিকামী মানুষের এই প্রত্যাশা পূরণের পথ বিঘ্নিত করার জন্য আদাজল খেয়ে উঠেপড়ে লেগেছে শান্তি চুক্তি বিরোধীরা। তারা একে দেশের সংবিধানবিরোধী এবং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালীদের স্বার্থবিরোধী বলে এই চুক্তি বাতিলের দাবি পর্যন্ত করে চলেছে। অথচ দেশের সংবিধান-বিশেষজ্ঞরা বলেছেন— এ চুক্তি সংবিধান পরিপন্থী নয়। তথাপি বিরোধীদলীয় নেত্রী পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে অব্যাহতভাবেই সংবিধান ও রাষ্ট্রবিরোধী বলে মন্তব্য করে চলেছেন এবং এই চুক্তি করে সরকার নাকি গণঅভ্যুত্থানের ইস্যু তৈরি করেছে।

আসলে, শান্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা সরকারী নীরবতা ও নিক্রিয়তা জনমনে বিভ্রান্তি ও বর্তমান পার্বত্য অঞ্চলে সৃষ্ট অশান্ত পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী বলে আমরা মনে করি। সরকার ও সরকারী দলের শীর্ষ ও স্থানীয় নেতারা যদি শান্তি চুক্তির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তার সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে দেশবাসী বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালীদের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারতেন, তাহলে হয়ত আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টিই হতো না। অবশ্য ইদানীং সরকার এ ব্যাপারে কিছুটা তৎপর হয়েছে এবং সরকারের মন্ত্রীরা পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য মিছিল-সমাবেশ করছেন। এতে অবশ্য পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস বইবার একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ সম্ভাবনা পূর্ণ সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাক-আমরা এটাই কামনা করি।

দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের গতি ত্বরান্বিত করা যেখানে সরকার ও বিরোধী দলের রাজনীতির মূল লক্ষ্য; সেখানে এই অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির বিরোধিতা কেন? এ কি নিছক বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা? নাকি এর পিছনে শান্তি চুক্তি বিরোধীদের অন্য কোন উদ্দেশ্য বা গোপন চক্রান্ত রয়েছে? দেশের মানুষের কাছে এখনও তা স্পষ্ট নয়। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী বার বার শান্তির পথে ফিরে আসার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের বিজয় উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি আবারও বলেছেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা হবে এক আত্মঘাতী কাজ।

আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্র ও উন্নয়নে বিশ্বাসী দেশের প্রধান বিরোধী দল নিছক বিরোধিতার নামে কোন আত্মঘাতী পথ বেছে নেবে না। কারণ তাঁরাও জানেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যে তাঁরা রাজনীতি করছেন, সেই লক্ষ্য অর্জনে শান্তি ও স্থিতিশীলতার কোন বিকল্প নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

ডাচ মন্ত্রীর সাক্ষাত

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্রুত উন্নয়নে

বিশেষ সেল গঠিত হয়েছে ৯ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন এ অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ সেল গঠন করেছে। খবর ইউএনবি'র।

তিনি রবিবার নেদারল্যান্ডসের সফররত সমাজকল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এপিড্রিউ মলকার্টের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, “পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ অঞ্চলের উন্নয়নে সরকার এ সম্পদ কাজে লাগাবে।”

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অফিসে এ সাক্ষাতকালে ডাচ মন্ত্রী বাংলাদেশে চলমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এই অঞ্চল শান্তি ও উন্নয়নের অঞ্চলে পরিণত হবে। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে তার দেশের পক্ষ থেকে অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী পত্নী এলাকার উন্নয়নে তাঁর সরকারের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা তুলে ধরেন। বর্তমানে ইউপি নির্বাচনে গ্রামীণ জনগণের বিশেষ করে মহিলাদের উৎসাহ-উদ্বীপনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তাঁর সরকার গৃহহীন মানুষকে আশ্রয়দানের জন্য ‘আশ্রয়ণ’ নামে একটি বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

ডাচ প্রতিনিধি দলের সদস্য ইজে মুলক হাওয়ার, এম নাচিনোভিচ, এ ভ্যান লিউর, বাংলাদেশে ডাচ রাষ্ট্রদূত ভিসিবি ডেন হ্যাস সাক্ষাতকালে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এস এ সামাদ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

ফেব্রুয়ারিতে গঠিত হবে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে ফেব্রুয়ারিতে। সংসদে এ সম্পর্কিত বিল পাসের পরই নেয়া হবে পরিষদ গঠনের উদ্যোগ। তবে তার আগেই পার্বত্য এলাকার বাইরের ৬১ জেলার জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সংসদে উত্থাপন তথা পাসের চিন্তা করছে সরকারী দল। সম্প্রতি জমাকৃত স্থানীয় সরকার কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে বিলটি হচ্ছে। কমিশন রিপোর্টে জেলাভিত্তিক শক্তিশালী স্থানীয় পরিষদের সুপারিশ করা হয়েছে যেখানে নির্বাচিত জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব মন্ত্রণালয়ের সচিবদের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে মাসিক মনিটরিং রিপোর্টও জমা দিতে বলেছেন তাঁর দফতরে। প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ বুধবার সব সচিবের কাছে পৌঁছেছে। জানা গেছে, আগামী মঙ্গলবার সচিব কমিটির বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ ব্যাপারে একটি গাইডলাইন দেবেন।

উল্লেখ্য, প্রথম পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ হবে অন্তর্বর্তীকালের জন্য। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এই পরিষদ ক্ষমতাসীন থাকবে। ২৩ সদস্যের এই পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান হবেন জনসংহতি সমিতির মনোনীত ব্যক্তি। চেয়ারম্যান পদটি প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের অপর ২২ সদস্যকে মনোনয়ন দেবে সরকার এবং জনসংহতি পরিষদ। তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যানও পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য। শান্তিচুক্তিতে স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম পাল্টে পার্বত্য জেলা পরিষদ করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালের আইনের প্রেক্ষিতে তিন পরিষদের একবার মাত্র নির্বাচন হয়েছিল। বর্তমান শান্তি চুক্তি বিরোধী অনেক স্থানীয় নেতা সেই নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। বিএনপি আমলে পরিষদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও নতুন নির্বাচনে না গিয়ে বারবার এর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা দায়িত্ব নেবেন বলে সরকারী মহলের ধারণা। সন্ত লারমা যদি মনোনীত চেয়ারম্যান হতে না চান তবে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিই এ পদে আসবেন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়ে যাবার পর সৃষ্ট ইলেক্টোরিয়াল কলেজ নির্বাচন করবে পাঁচ বছর মেয়াদী আঞ্চলিক পরিষদের

নেতৃত্ব। এখন পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদের সদর দফতর হবে রাঙ্গামাটিতে। তবে এই সদর দফতরটি খাগড়াছড়িতে করার ব্যাপারে দাবি আছে সেখানকার স্থানীয় মহলে। কারণ পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তিতে খাগড়াছড়ি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, জর্জরিত জেলা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেছেন সরকার শান্তি চুক্তি পরবর্তী আইন প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ততার পাশাপাশি শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের তারিখের অপেক্ষায় রয়েছে। চুক্তি পরবর্তী ৪৫ দিন অর্থাৎ আগামী ১৪ জানুয়ারির মধ্যে এই তারিখ ঘোষণার কথা। জনসংহতি এই সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ করেছে কিনা জানতে চাইলে চীফ হুইপ না-সূচক জবাব দিয়ে বলেন, এর সুযোগও নেই। কারণ এতে চুক্তির বরখোলাপের নজির সৃষ্টি হবে যা কোন পক্ষেরই কাম্য নয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী নয়

মন্ত্রণালয় হচ্ছে ॥ স্পেশাল

এ্যাফেয়ার্স বিভাগ থাকছে না

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী নতুন একটি মন্ত্রণালয় গঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। নতুন মন্ত্রণালয়ের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক না উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয় হবে তা নিয়ে সরকারের নীতি নির্ধারক মহল কিছুটা দোঁটানায় আছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স (বিশেষ কার্যাদি) বিভাগের বিলুপ্তি মোটামুটি নিশ্চিত। এ বিভাগ এতদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সকল কাজ সমন্বয় করত। বর্তমান স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের জনবল আরও বৃদ্ধি করে নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে। এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন একজন উপজাতীয় নেতা বা সাংসদ। একজন সচিব, একজন যুগ্ম-সচিব, পাঁচজন উপ-সচিব এবং ১৪/১৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিবের পদ সৃষ্টি করা হবে। আগামী পহেলা জানুয়ারি '৯৮ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত বৈঠকে এ মন্ত্রণালয়ের নাম, কার্যক্রম, জনবল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ এ বৈঠকের কার্যপত্র তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

সূত্র জানায়, পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় গঠনের কথা। সরকারী নীতিনির্ধারক মহলের অনেকে মনে করছেন চুক্তির মূল বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রেখে মন্ত্রণালয়ের নাম যদি উপজাতীয় বিষয়ক করা হয় তাহলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত থাকবে। উপরন্তু সরকার উপজাতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর বিশেষভাবে নজর দিতে পারবে। এ মন্ত্রণালয় দেশে প্রায় ১৪/১৫টি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করতে সক্ষম হবে। সকল উপজাতীয় সম্প্রদায়ও এতে সম্মত থাকবে। এ চিন্তা থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে জনসংহতি সমিতির নেতাদের মতামত নেয়া হবে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭

রাঙ্গামাটিতে সাংস্কৃতিক
জোটের শান্তি অভিযাত্রা

রাঙ্গামাটি, ২৫ ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্ট সঙ্কট উত্তরণের লক্ষ্যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট বৃহস্পতিবার বিকালে রাঙ্গামাটি পুরনো কোর্ট ময়দানের মুক্তক্ষেত্রে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিযুক্ত শান্তি-সম্প্রীতি অভিযাত্রা’ নামে একটি অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি কে বা কারা পর পর দু’টি পটকা ফোটাতে অনুষ্ঠানে আগত বিপুলসংখ্যক দর্শকের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এক আলোচনাসভা বিশিষ্ট অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট অভিনেতা সৈয়দ হাসান ইমাম অতিথি ভূলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনাসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুছ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবির, নাট্যকার মামুনুর রশিদ ও আফজাল হোসেন। স্থানীয় সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিংকি রোয়াজা, সাবেক পরিষদ চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান, জসীম উদ্দিন কবির ও ডাঃ আশুতোষ বড়ুয়া। আলোচনাসভা শেষে রাতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে নারী সমাজ
রাজপথে নামবে ৥ সংগ্রামী নারী সমাজ

স্টাফ রিপোর্টার ৥ সংগ্রামী নারী সমাজ আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় পার্বত্য শান্তি চুক্তি একটি মাইলফলক। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ চুক্তি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এই কারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী সমাজ চুক্তির পক্ষে। বক্তারা আরও বলেন, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ন্যায় পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে নারী সমাজ রাজপথে নামবে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আয়োজিত নারী গণসমাবেশে বক্তারা একথা বলেন। শনিবার পল্টন ময়দানে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তারা বলেন, বিএনপিসহ সমমনা রাজনৈতিক দল যদি রাষ্ট্রপতির মধ্যস্থতায় গোলটেবিলে বসতে পারে তাহলে সংসদে বসতে তাদের আপত্তি কেন? তাঁরা বলেন, দেশবিক্রির কথা শুনতে শুনতে দেশবাসীর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। অথচ দেশ বিক্রি হলো কই? এ প্রশঙ্গে তাঁরা বলেন, বাংলাদেশ তো মুদি দোকানের দ্রব্য নয়। চাল, ডাল, নুনের মতো দেশ যেমন কেনা যায় না তেমন বেচাও যায় না। লাখ লাখ বাঙালীর রক্তের ফসল এদেশ নিয়ে যারা ছিন্মিনি খেলছে তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য বক্তারা নারী সমাজসহ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আরমা গুন। বক্তৃতা করেন শিরীন বানু মিতিল, খুশী কবীর, আয়শা খানম, রোকেয়া কবীর প্রমুখ। কবি সুফিয়া কামাল ও ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম অসুস্থতার কারণে সমাবেশে উপস্থিত না হতে পেরে বাণী পাঠান।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর বাণীতে বলেন, দীর্ঘদিন শান্তি চুক্তির প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমার মতে, এই শান্তি চুক্তি একটি শুভ উদ্যোগ। অথচ বিরোধীদলীয় নেত্রী জঘন্যভাবে এই চুক্তির বিরোধিতা করছেন। সুফিয়া কামাল নারী সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন- মায়েরা, বোনেরা শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তি নিরসনের চেষ্টা কর।

ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর বাণীতে বলেন, হিংসা উন্মত্ত পৃথিবীতে যিনি বা যারা শান্তির বাণী উচ্চারণ করেন তারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তি সম্পর্কে যারা অপব্যখ্যা দিচ্ছেন তারা অবিলম্বে জনগণের কাছে নিন্দনীয় হবেন।

সমাবেশে কবি সুফিয়া কামালের বাণী পাঠ করেন লায়লা আরজুমান্দ বানু। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের বাণী পাঠ করেন শাহনাজ সুমী। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন রেখা চৌধুরী এবং সমাবেশ পরিচালনা করেন কৃষ্ণা চন্দ।

ঘোষণাপত্রে বলা হয়, যারা অস্ত্র চোরাচালানী, মাদক ব্যবসায়ী, পাহাড় ও বন ধ্বংসকারী তারা তাদের হীনস্বার্থ বিদ্রোহিত হওয়ার ফলে এই শান্তি চুক্তি বানচালের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১ জানুয়ারি ১৯৯৮
কল্লরঞ্জন চাকমা
পার্বত্য এলাকার প্রথম মন্ত্রী

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ৯ কল্লরঞ্জন চাকমা হলেন স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে প্রথম পূর্ণ মন্ত্রী। বুধবার রাতে শপথ গ্রহণ শেষে তিনি জনকণ্ঠকে বললেন, তাঁর এই মন্ত্রিত্ব শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, দফতরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেই কল্লরঞ্জনকে প্রস্তাবিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হবে এটা প্রায় নিশ্চিত। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নতুন এই মন্ত্রণালয়টি গঠিত হবার কথা। কল্লরঞ্জন বলেন, নতুন মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় উন্নয়নের নতুন ধারার সূচনা করবে। এছাড়া দেশের অন্য উপজাতীয়দের স্বার্থ ও দেখভাল করবে এই মন্ত্রণালয়।

পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগের টিকিটে নির্বাচিত মং ও প্রু চৌধুরী প্রাদেশিক সরকারের পূর্তমন্ত্রী হয়েছিলেন। পরে তিনি হন বোমাং রাজা। জিয়া আমলে মিসেস বিনীতা রায় মন্ত্রী পদমর্যাদায় উপদেষ্টা হন। অং ও প্রু চৌধুরী হন প্রতিমন্ত্রী। উপেন্দ্র লাল চাকমা এরশাদ সরকারের সহকারী উপদেষ্টা ছিলেন। এর পর পূর্ণ মন্ত্রী হলেন কল্লরঞ্জন চাকমা। ১৯২৩ সালের ১৩ জানুয়ারি খাগড়াছড়ির দিঘিনালা থানার বাবুপাড়ায় কল্লরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁর মা চন্দ্রমুখী দেওয়ান ১১২ বছর বয়স নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন। বাবার নাম মৃত রূপসেন চাকমা। ২ ভাই ৫ বোন তাঁদের। বড় ভাই সুরেশ্বর চাকমা রাঙামাটিতে এলএমএফ ডাক্তার। ১৯৪৮ সালে ডিভিশনাল ফুড রিলিফ কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এর পর থেকে নানা দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৬৪ সালে যোগ দেন আওয়ামী লীগে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬তে এমপি নির্বাচিত হন। কল্লরঞ্জন বললেন, সংসদে আলোচনা, আইন পাসের পর শান্তি চুক্তির কাঠামোগত বাস্তবায়ন পর্ব শুরু হবে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানও হবেন প্রতিমন্ত্রী। তবে তিনি মূলত জেলা পরিষদসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় করবেন। বুধবার পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ শেষ

হয়েছে। এ ব্যাপারে কল্লরঞ্জনের বক্তব্য হলো, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পর অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বাড়ানো নিরর্থক। আমরা এখন শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের তারিখের অপেক্ষায় আছি। বুধবার রাতে সংসদ ভবনের কক্ষে প্রটোকলবিহীন সাবেক অবস্থাতেই কাটিয়েছেন কল্লরঞ্জন চাকমা। শুভেচ্ছা জানানেন তাঁর নির্বাচনী এলাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সব মানুষকে। মঙ্গলবার দিঘিনালায় একটি অনুষ্ঠানে থাকতে ঢাকা থেকে তলব যায় তাঁর রাজধানীতে পৌঁছার জন্য। শান্তি চুক্তির পর থেকেই আলাপ হচ্ছিল তিনি মন্ত্রী হচ্ছেন। অতএব খবরটি নতুন কিছু ছিল না তাঁর জন্য। এর আগে তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। এখনও দায়িত্বটি তাঁর হাতেই রয়ে গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২ জানুয়ারি ১৯৯৮
উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন আবার শুরু
প্রথম দিনে ফিরেছে ৯৪১ জন

খাগড়াছড়ি, ১ জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের ষষ্ঠ পর্যায়ের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে। জেলার রামগড় থানার মন্দিরঘাট সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে প্রত্যাবাসন কার্যক্রমের সূচনা হয়।

২৫ দিন বিরতির পর ষষ্ঠ পর্যায়ের শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার প্রথম দিনে ১শ' ৮৫ পরিবারের ৯৪১ জন শরণার্থী নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছে। কংগচাই মার্গা (৪০)-এর ৫ সদস্যের পরিবারকে সকাল ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরন দেওয়ান শরণার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এ সময় স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ি জেলার বিদায়ী ও নবগত জেলা প্রশাসক যথাক্রমে মোহাম্মদ ইসমাইল ও একেএম জাফরুল হোসেন, পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জুলফিকার আলীসহ জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে শরণার্থীদের বিদায় জানান দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক লোক রঞ্জন ও সাক্রম মহকুমার এসডিও মানিকলাল দে। এ সময় শরণার্থী নেতা অজিত বরণ চাকমা ও জধরা মগ শরণার্থী প্রত্যাবাসন কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরার কাঁঠালছড়ি শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে আসা উপজাতীয় শরণার্থীদের মধ্যে রয়েছে রামগড় থানার ১৩৫ পরিবারের ৭৩১ জন ও মানিকছড়ি থানার ৫০ পরিবারের ২শ' ১০ জন শরণার্থী। শুক্রবার ১৯৫ পরিবারের ৯শ' ২৬ জন শরণার্থী একই শিবির থেকে দেশে ফিরে আসবে। এরা পানছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি থানার বাসিন্দা। ফিরে আসা শরণার্থীদের ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধার আওতায় নগদ ২১ হাজার টাকা ও রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ত্রিপুরা রাজ্যের ছয়টি আশ্রয় শিবিরে আশ্রিত উপজাতীয় শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে উদ্বীর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রত্যাগত শরণার্থীদের সাথে কথা বললে তারা জানান, “ভগবান বুদ্ধের” আশীর্বাদে আমাদের আর শরণার্থী জীবনে যেতে হবে না। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করেছে বিধায় আমাদের খুবই ভাল লাগছে। প্রত্যাগত অসিত চাকমা বলেন, শান্তি চুক্তির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটেছে।

এদিকে ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৬টি আশ্রয় শিবিরে বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার শরণার্থী রয়েছে। শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে ৫ হাজার ৫শ' ৯০ পরিবারের ২৭ হাজার ৯শ' ৪৩ জন উপজাতীয় শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া একটানা চলবে এবং আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সকল উপজাতীয় শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণ চূড়ান্ত করতে

জনসংহতির সঙ্গে বৈঠক ১৫ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্ত করার জন্য আগামী ১৫ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের বৈঠক হবে খাগড়াছড়িতে। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র বলেছে, বৈঠকে জনসংহতি নেতা সন্ত লারমা উপস্থিত থাকবেন। বাংলাদেশ সরকার পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহসহ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা আছে। উল্লেখ্য, শান্তি চুক্তি অনুসারে ১৭ জানুয়ারির মধ্যে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদের তালিকা সরকারকে জমা দেবার কথা।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৪ জানুয়ারি ১৯৯৮

সেমিনারে দুই সাবেক সেনা কর্মকর্তা

পার্বত্য সমস্যার সামরিক নিষ্পত্তি সম্ভব

ছিল না ॥ শান্তি চুক্তি বাতিলের

দরকার নেই, সংশোধন হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দু'জন সাবেক সেনা কর্মকর্তা শনিবার ঢাকায় শান্তি চুক্তি সম্পর্কে এক সেমিনারে বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সামরিক সমাধান সম্ভব ছিল না। রাজনৈতিক সমস্যা সামরিকভাবে মোকাবিলার কোন নজিরও পৃথিবীতে নেই। তাঁরা শান্তি চুক্তিকে সমর্থন করে বলেন, এর আঞ্চলিক পরিষদের বিষয় সংবিধান বিশেষজ্ঞরা ভাল বলতে পারবেন। চুক্তি বাতিল করার দরকার নেই। ভুলত্রুটি হলে তা সংশোধন করা যেতে পারে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ইনস্টিটিউট ফর কম্প্রিহেনসিভ সিকিউরিটি স্টাডিজ এবং দ্য সার্ক সোসাইটি আয়োজিত সেমিনারে তালুকদার মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাদেক খান, আতাউস সামাদ, মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীরপ্রতীক, অধ্যাপক আফতাব আহমদ, ব্রিগেডিয়ার (অব.) মাসুক আহমদ চৌধুরী, নাজিম হাবিবুজ্জামান, ডঃ আব্দুর রব, ফেরদৌস হোসেন, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে জাতির ম্যাণ্ডেট নেবার দরকার ছিল। অসাংবিধানিক কোনভাবে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায় না। তা কল্যাণকরও হয় না। সেমিনারের বক্তব্যে সাদেক বলেন, রাষ্ট্রপতির নিজ উদ্যোগে চুক্তিটি রেফারেন্স আকারে সুপ্রীম কোর্টে পাঠানো উচিত। কোর্ট যে রায় দেবে তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। সাদেক খান জনসংহতি নেতা সন্ত লারমাকে ‘সন্তাসী নেতা’ হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অন্যান্য উপজাতীয় ভাল নেতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

চুক্তিটির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা আগামীতে পৃথক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। আতাউস সামাদ বলেন, বর্তমান চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়ত কিছুটা হবে। বাকিটা নিশ্চিত করতে হবে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশও হয়েছে গণতন্ত্রের কারণে। ৬ দফার প্রথম দফাই ছিল গণতন্ত্র সম্পর্কিত। আতাউস সামাদ বলেন, চুক্তিটি খুবই ‘কেয়ারলেস’ভাবে দেখা হয়েছে। বাহান্বরের সংবিধানের ট্রুটি ছিল তাতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। আবার এই

চুক্তির সময় ভাবা হয়নি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের কথা। চুক্তির বিষয়ে সংসদে আইন প্রণয়ন করতে হবে। কাজেই সংশ্লিষ্টরা কিভাবে মনে করলেন তাদের চুক্তি সংসদে গেলেই পাস হয়ে যাবে।

মেজরিটির গুণে তারা এটা হয়ত ভেবেছেন। ভবিষ্যতে অন্য কোন দল যদি মেজরিটি নিয়ে সংসদে যায় আর তারা যদি চুক্তি বাতিল করে তাহলে কি অবস্থা হবে? আতাউস সামাদ বলেন, পৃথিবীতে কোন সীমান্তই ঠিক থাকে না। বাংলাদেশ এখন একক একটি রাষ্ট্র। অনেকে হয়ত সে কারণে বলছেন চুক্তিটা ঠিক হয়নি। তবে এই দেশও একদিন ফেডারেল রাষ্ট্র হতে পারে। প্রয়োজনে এমন অনেক কিছু হয়। পার্বত্যবাসী একদিন স্বাধীনতা চাইতে পারে। নাও চাইতে পারে। তবে এ বিষয়টি হিসাবের মধ্যে রাখা উচিত। ব্রিগেডিয়ার (অব) মাসুক আহমদ চৌধুরী বলেন, সেনা মোতামেন হয় পরিস্থিতির ভিত্তিতে। এটা সাংবিধানিক বিধান বা কোন নির্দেশে হয় না। চুক্তির পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের অরক্ষিত এলাকাগুলোতে সেনা মোতামেনের দরকার নেই। বিডিআরের ফাঁড়ি বসালেই চলবে।

মাসুক আহমদ চৌধুরী বলেন, চুক্তি বাতিল করার দরকার নেই। ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা দূর করা দরকার। শান্তি বাহিনী সংসদে নেই। তাই চুক্তি নিয়ে আলোচনা সংসদের বাইরে হওয়া উচিত। মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, বন্দুকের নল দেখিয়েই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না। আজ এটা সবাই অনুভব করেছেন সেটাই আনন্দের বিষয়। চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে আগামীতে কেউ তা বাতিল করলে শান্তিবাহিনী আবার যুদ্ধে ফিরে যেতে পারে।

১৯৮৫ সালের আলোচনার সময়েই শান্তি বাহিনী আঞ্চলিক পরিষদের দাবি করেছিল। তাদের কথাবার্তার ধারাবাহিকতা ছিল। আমাদের ছিল না। তাদের নেতৃত্ব ১৯৮৩ সাল থেকেই সন্ত্রাস লারমার হাতে। আমাদের নেতৃত্ব বার বার বদল হয়েছে। ইব্রাহিম বলেন, বোরকা পরিয়ে রাখলেও অস্বীকার করার সুযোগ নেই কোন উদ্দেশ্যে সেখানে বাঙালীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আজ যে বাঙালীদের দেখিয়ে দাবি তোলা হচ্ছে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে। আর এখনকার উদ্দেশ্য একা শান্তি বাহিনী তখন স্থানীয় সরকার পরিষদ চায়নি। আমরা তা করেছি কিন্তু তখন এটা যাঁরা চাননি তাঁরাই বার বার এর মেয়াদ বাড়িয়েছেন। যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করা হয়েছে। এভাবে শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে শান্তি বাহিনীর। এসবের মূল্যায়ন না করে শুধু বিরোধিতা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইব্রাহিম বলেন, পার্বত্য এলাকায় অনেক ক’টি সেনানিবাস করা হয়েছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ৬টি ছাড়া অন্যগুলোর গেজেট হয়নি। শান্তি বাহিনী বিষয়টি জানে বলেই স্বীকৃত

সেনানিবাসগুলো রাখতে রাজি হয়েছে। স্বীকৃত সেনানিবাস মানে ৬টি সেনানিবাস। তিনি মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, সাধারণ যুদ্ধের জন্য পার্বত্য এলাকা ভাল জায়গা নয়। গেরিলা যুদ্ধের জন্য ভাল জায়গা।

সেমিনারের পর মেজর জেনারেল (অব) ইব্রাহিম বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব দেন। শান্তিবাহিনীকে কনসেশন না দিয়ে সামরিকভাবেই সমস্যার সমাধান ছিল কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের সরাসরি না-সূচক জবাবে তিনি বলেন, পৃথিবীর কোথাও এটি সম্ভব হয়নি। সামরিকভাবে এ ধরনের সমস্যার সমাধান হয় না। সামরিক বাহিনী এ ধরনের ইনসার্জেন্সি মোকাবিলায় শুধু একটি উদ্যোগের অংশ হিসাবেই কাজ করতে পারে। ব্রিগেডিয়ার (অব) মাসুকও এই বক্তব্য সমর্থন করেন। গিয়াস কামাল চৌধুরী প্রশ্ন রেখে বলেছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনাবাহিনী নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিল কিনা। জবাবে ইব্রাহিম বলেন, ১৯৯২ সাল পর্যন্ত পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি বলেন, তখন শান্তিবাহিনীর দুর্বল মুহূর্তে নিঃশর্ত যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৯ জানুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তির পক্ষে রাজ্যমাটিতে

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মিছিল সমাবেশ

রাজ্যমাটি, ৮ জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- বৃহস্পতিবার সকালে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাজ্যমাটি শহরে শান্তি চুক্তির পক্ষে একটি মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা স্লোগান দেয়-‘শুভেচ্ছা-স্বাগতম সন্ত্রাস লারমার আগমন’, ‘শান্তি চুক্তি সফল হোক’ ইত্যাদি। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাজ্যমাটি জেলা শাখার ৩য় কাউন্সিল ও সম্মেলন ‘৯৮ উপলক্ষে এই মিছিল বের করা হয়। বনরূপা পেট্রোল পাম্প থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে সম্মেলন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাজ্যমাটি জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তনয় দেওয়ান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা। সমাবেশে পার্বত্য শান্তি চুক্তির পক্ষে ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মকাণ্ডের ওপর বক্তব্য রাখেন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক মৃগাংক খীসা, অর্থ সম্পাদক বিপ্লব চাকমা, রণজিৎ দেওয়ান রাজু, পাহাড়ী গণপরিষদ নেতা মং নু চিং মারমা, ছাত্রনেতা সজীব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী ক্যামেলিয়া দেওয়ান, পলাশ দেওয়ান প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৫ জানুয়ারি ১৯৯৮
শান্তি চুক্তি সম্পর্কিত সকল তথ্য তুলে
ধরুন ॥ সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য জাতীয় সংসদে তুলে ধরার জন্য দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার সকালে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তি চুক্তি নিয়ে বিরোধী নেত্রীর অশান্তি কেন এটা স্পষ্ট করে মানুষকে বুঝাতে হবে। একই সঙ্গে তুলে ধরতে হবে বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতি। তিনি যথাসময়ে অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দেন।

বৈঠক সূত্র জানায়, ৪৫ মিনিট স্থায়ী এই বৈঠকে মূলত চলতি অধিবেশনে সরকারী দলের ভূমিকা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সদস্যদের ব্রিফিং দেন। শুরুতে চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ চলতি অধিবেশনের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে সময় মতো অধিবেশনে উপস্থিত হবার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার এক পর্যায়ে ঠাকুরগাঁও থেকে নির্বাচিত সদস্য ইমদাদুল হক অভিযোগ করেন, শীত বস্ত্রসহ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সংসদ সদস্যদের কোন ভূমিকা থাকে না। জেলা প্রশাসকরা তাঁদের সিদ্ধান্ত মতোই খানায় এই সব সামগ্রী বিতরণ করে থাকেন। এই সব কাজে সংসদ সদস্যদের মতও নেয়া হয় না। প্রধানমন্ত্রী এই অভিযোগের জবাব দিয়ে বলেন, জেলা প্রশাসকরা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করলেও সংসদ সদস্যদের খোঁজ-খবর নেয়ার অবশ্যই অধিকার রয়েছে। তিনি জানান, সকল জেলায় এবার শীতবস্ত্র পাঠানো হয়েছে। দরিদ্র শীতার্ভ মানুষ যাতে এই সব সামগ্রী পায় সেদিকে নজর রাখার জন্য তিনি সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বর্তমান সরকারের শাসনামলের শুরুতেই প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতিবাচক ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন, তাদের স্পীকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনেই তারা ওয়াক আউট করেছিল। এই ধারা আজও অব্যাহত আছে। তাদের সর্বশেষ ইস্যু পার্বত্য শান্তি চুক্তি। এই চুক্তি বিকৃত করে তারা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি করতে চাচ্ছে অস্থিতিশীলতা। বিএনপির এই অপপ্রচারে জনগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয় সেজন্য সংসদ সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সংসদের অধিবেশনে পার্বত্য শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় চুক্তির প্রতিটি দফা যাতে মানুষ জানতে পারে সেজন্য সদস্যদের প্রস্তুতি নিয়ে বক্তব্য রাখতে হবে। এছাড়া রাষ্ট্রপতির ভাষণের

ওপর আলোচনার সময়ও সুযোগ পাওয়া যাবে। এই সময় বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতি তুলে ধরতে হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সফলতা যথাযথ ভাবে তুলে ধরার জন্য দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ জানুয়ারি ১৯৯৮
শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের
প্রথম পর্ব ৯ ফেব্রুয়ারি

ফজলুল বারী/জীতেন বড়ুয়া ॥ আর শুধু যুদ্ধ বিরতি নয়—এবার শুরু হচ্ছে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ। ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখে শুরু হচ্ছে চার দফায় এই অস্ত্র সমর্পণের প্রথম পর্ব। সেদিন দুপুর ১২টায় খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর ৬শ' সদস্য অস্ত্র, আত্মসমর্পণ করে ফিরে আসবেন স্বাভাবিক জীবনে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং বিদ্রোহ অবসান বাস্তবায়নের প্রথম দিনেই স্বাভাবিক, প্রকাশ্য জীবনে ফিরে আসবেন জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতির্ভিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা। বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে সরকারের সঙ্গে জনসংহতির বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে জনসংহতি সমিতি, শান্তিবাহিনীর সদস্য তালিকা, অস্ত্র গোলা বারুদের হিসাব জমা দেয়া হয়েছে সরকারের কাছে। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার স্বার্থে এই হিসাবের তালিকাটি প্রকাশ করতে রাজি হননি আলোচনায় সরকার করেছে।

চুক্তি পরবর্তী দেশের এবং পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি জনসংহতি, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন নিয়েও আলোচনা হয়। সন্ত লারমা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হবার প্রস্তাব পেলে তা গ্রহণ করতে পারেন বলে জানা গেছে। তবে এ নিয়ে ভিন্ন মতও আছে। দুপুর সোয়া ১২টায় শুরু হয়ে বিকাল পৌনে ৪টা পর্যন্ত বৈঠক একটানা চলে। আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে দুই নেতা আব্দুল্লাহ, সন্তর মধ্যে রুদ্দাওয়ার একান্ত বৈঠকও হয়। বৈঠক পর্ব শেষে আব্দুল্লাহ এবং সন্ত লারমা সংক্ষিপ্ত এক প্রেসব্রিফিং-এ উপস্থিত হন। অস্ত্র সমর্পণ সম্পর্কিত লিখিত কয়েক লাইন তথ্যের বাইরে কেউ কোন প্রশ্নের জবাব দেননি। সন্ত লারমাকে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বলেন, চীফ হুইপ সাহেব যা বলেছেন আমারও একই কথা। এই বৈঠক শেষে দুদুদুদুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে সন্ত লারমার পৃথক একটি ব্রিফিং বৈঠকের কথা থাকলেও তা হয়নি। জনসংহতির এক নেতা বলেন, আমরা এমনিতেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছি। আলাদা ব্রিফিং-এর

কি দরকার এখন। ব্রিফিং শেষে জনসংহতি নেতাদের বিকালের নাস্তার জন্য সার্কিট হাউসের নিচতলার খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকাল সাড়ে ৫টায় সামরিক একটি হেলিকপ্টারে জনসংহতি নেতাদের দুদুকছড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়। বৈঠক উপলক্ষে সার্কিট হাউসকে ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত গড়ে তোলা হয়েছিল। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

তিন মন্ত্রীর সম্মেলন

বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি শাপলা চত্বরে নবনিযুক্ত শ্রম ও জনসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল মান্নান, দণ্ডবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে নাগরিক সম্মেলন দেয়া হয়, খাগড়াছড়ি নাগরিক কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে সম্মেলনায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক মহিলা সাংসদ সুদিপ্তা দেওয়ান, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নূরুনবী চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল আলম প্রমুখ। আব্দুল মান্নান তাঁর বক্তব্যে বলেন, শান্তি চুক্তির কারণে পার্বত্য এলাকায় এখন উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের মোকাবিলা করেই শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে যেতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, আমরা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সকল মহলের সহযোগিতা চাই। উন্নয়নের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

অবরোধের প্রথম দিন অতিবাহিত

পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আহূত ৪৮ ঘণ্টার সড়ক অবরোধের প্রথম দিন খাগড়াছড়িতে শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে। জেলা সদরে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ছাড়া তেমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অবরোধের কারণে শহর থেকে দূরপাল্লার কোন যানবাহন ছেড়ে যায়নি। তবে আন্তঃজেলা সড়ক যোগাযোগ ছিল স্বাভাবিক।

পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ শান্তি চুক্তি বাতিল, মাটিরাজ্য গুলিবর্ষণের বিচার, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের প্রতিবাদে জেলায় দু'দিনের সড়ক অবরোধের ডাক দেয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঐক্য পরিষদ জেলা সদর, রামগড় ও মাটিরাজ্য পৃথক পৃথক প্রতিবাদ সভা করেছে।

কৃত্রিম দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টায় উদ্বেগ

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি দীপ্তি শংকর চাকমা, সাধারণ সম্পাদক দীপায়ন খাঁসা একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজসভাটিতে কৃত্রিম দাঙ্গা

সৃষ্টির চেষ্টায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ তাঁদের উদ্বেগের কথা জানান। উল্লেখ্য, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এই অংশটি শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। নেতৃবৃন্দ সেখানকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩ জানুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে হাই কোর্টে
আনীত রিট মামলা খারিজ

সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার ৯ সরকার ও জনসংহতি সমিতির নেতা সম্ভ লারমার মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরোধের ওপর শান্তি চুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা এক রিট মামলা হাইকোর্ট নাকচ করে দিয়েছে। রিট মামলাটিতে পদ্ধতিগত ত্রুটি আছে বলে কোর্ট তার আদেশে উল্লেখ করেছে। মামলার বাদী এই আদেশকে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে চ্যালেঞ্জ করবেন বলে জানিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সুপ্রীম কোর্টের জনৈক আইনজীবী মোঃ শামসুদ্দিন আহমেদ বাদী হয়ে এই রিট মামলা দায়ের করলে বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন ও বিচারপতি সৈয়দ জেআর মোদাচ্ছির হোসেন সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানি শেষে উপরোক্ত আদেশ দেয়।

রিট মামলাটিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবদ্বয়, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য শান্তিচুক্তির সরকার পক্ষে স্বাক্ষরদাতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপিকে বিবাদী করা হয়। হাইকোর্টে প্রচলিত ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় রিট মামলার বক্তব্য উত্থাপিত রিট মামলাটিতে আইনগত যুক্তি ও ভাষা প্রয়োগের পরিবর্তে তীব্র আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক রাজনৈতিক ভাষায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও জনসংহতি সমিতির নেতাদের আক্রমণ করা হয়েছে। কোর্ট রিট মামলাটি আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক বক্তব্য সংবলিত এবং রিট মামলার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় অনুপস্থিত রয়েছে বিধায় মামলাটি নাকচ করে দেয়। শুনানির এক পর্যায়ে বিএনপি'র সাংসদ ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা মামলাটি নাকচ না করে তা ফেরত নিয়ে পুনরায় সংশোধনের মাধ্যমে সঠিকভাবে কোর্টে উত্থাপনের আবেদন জানালে মামলার বাদী রিট মামলার বক্তব্য সঠিক রয়েছে বলে দাবি করে তা ফেরত নিতে অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য, রিটের বাদী নিজেই তাঁর বক্তব্য কোর্টে পেশ

করেছেন। সরকার পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার কেএস নবী, অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল ওবায়দুর রহমান মোস্তফা বক্তব্য পেশ করেন।

রিট মামলায় সংবিধানের ৭ ও ৪৪ (১) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে এই চুক্তি আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন, আইনগত কর্তৃত্ববিহীন ও অকার্যকর বলে ঘোষণা করার পর কেন হবে না এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা তিনটির জন্য ১৯৮৯ সালে প্রণীত ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন তিনটির প্রত্যেকটির ৪, ৬২ ও ৬৪ নং ধারা এবং ১নং ধারার শিরোনামে লেখা “পার্বত্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা” অংশটুকু কেন বাতিল ও অকার্যকর বলে ঘোষণা করা হবে না-এই মর্মে বিবাদীদের প্রতি কারণ দর্শানোর আবেদন জানানো হয়। এছাড়া মামলাটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শান্তি চুক্তি বলবৎকরণ স্থগিত রাখার এবং প্রত্যাহারকৃত সামরিক চৌকিগুলো পুনঃস্থাপনের আবেদন জানানো হয়। চীফ জুজের স্বাক্ষরের পূর্বে রাষ্ট্রপতির ‘আদেশক্রমে’ কথাটির উল্লেখ নেই বলে তার আইনগত ভিত্তি নেই বলে উল্লেখ করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বৈঠক ৥

শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের

খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা

চট্টগ্রাম, ২৭ জানুয়ারি।- শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের খুঁটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে মঙ্গলবার চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কল্লরঞ্জন চাকমা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। খবর তথ্য বিবরণী’র।

প্রথম পর্যায়ে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তি বাহিনীর সদস্যগণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করবে। শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের এক ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করতে চাই।

বৈঠকে উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের

চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানদ্বয়, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক মোবায়দুল ইসলাম, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট ব্রিগেড ও সেক্টর কমান্ডারগণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও জেল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তি বাহিনীর অনুরোধ

স্টাফ রিপোর্টার জানান, অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে শান্তি বাহিনী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খাগড়াছড়ির ৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার, ১৭টি ক্যাম্প স্থগিতের অনুরোধ করেছে। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার মাধ্যমে সরকারের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে মঙ্গলবার এই অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণের প্রথম অনুষ্ঠানটি হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৯ জানুয়ারি ১৯৯৮

দীপঙ্কর তালুকদার শরণার্থী পুনর্বাসন

টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান নিযুক্ত

সরকার রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদারকে তিন পার্বত্য জেলার ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন।

উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদাসহ সংশ্লিষ্ট সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।-খবর তথ্য বিবরণী’র।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে

খালেদা জিয়াসহ শীর্ষ নেতারা আমন্ত্রিত

স্টাফ রিপোর্টার ৥ আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য সরকার বিএনপি’র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াসহ দলের কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু বিএনপি নেতারা উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রিত বিএনপি নেতাদের ঐদিন সকালে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু বিএনপি নেতারা এ ব্যাপারে সরকারকে তাঁদের অপারগতার কথা জানিয়েছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির বৈঠক চলাকালে প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় সাংবাদিকরা দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার কাছে জানতে চান, ‘বিএনপি অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবে কিনা?’ তিনি এ সময় বলেন, ‘অবাস্তব প্রশ্ন। চুক্তির বিরোধিতা করছি। সংসদে আলোচনা না করে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি শান্তির নামে অশান্তি সৃষ্টি করবে।’ তিনি বলেন, ‘সংসদে আলোচনার পর সকল পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমেই কেবল পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি আসতে পারে।’

দৈনিক জনকণ্ঠ

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

প্রশ্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ৥

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ

খাগড়াছড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- পার্বত্য উপজাতীয় বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রাক প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ খুঁটিনাটি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বুধবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব) রফিকুল ইসলাম এতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সেনাপ্রধান, সংশ্লিষ্ট সচিব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ফেব্রুয়ারির অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠু করা যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পেরাছড়ায় প্রস্তাবিত ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোর পাশে যেখানে আত্মসমর্পণের পূর্বে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত হবেন। এরপর সেখান থেকে অস্ত্র সমর্পণের পর খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আনা হবে। বৈঠকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে অপর একটি মনিটরিং সেল গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকরা তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে পারে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে ইতোমধ্যেই ফ্যাক্স-টেলিফোন এবং টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধাসহ একটি মিডিয়া সেন্টার খোলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

লেগেছে আনন্দ উৎসবের ছোঁয়া

আর মাত্র ৪ দিন বাদে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র

সমর্পণ ৥ খাগড়াছড়িতে ব্যাপক প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, খাগড়াছড়ি থেকে ৥ আর মাত্র চার দিন পরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী তাদের অস্ত্র সমর্পণ করবে। এরই মাধ্যমে বিদ্রোহী সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সদস্যরা। যবনিকাপাত ঘটবে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান সহিংসতা, হানাহানি আর ভুল বোঝাবুঝির। বিগত সরকারগুলোর শান্তি প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সকলের সমন্বিত উদ্যোগে সাফল্যজনকভাবে এ অধ্যায়ের ইতি টানা সম্ভব হচ্ছে।

চলতি মাসের ১০ তারিখে অস্ত্র সমর্পণের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হবে। এটাকে ঘিরে পুরো খাগড়াছড়ি এখন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। সবখানেই যেন এক আনন্দ উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে। প্রশাসনই এখন দারুণ কর্মব্যস্ত। জাতীয় গৌরবের প্রতীক সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেল আর্মড পুলিশ ও পুলিশের সদস্যরাও অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করতে খুবই তৎপর। যেখানে অস্ত্র সমর্পণের মতো ঐতিহাসিক কর্মটি সম্পাদন হবে, সেই খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম এখন কর্মমুখর। দিনরাত চলছে স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ ও সাজানোর পরিকল্পনা। গ্যালারি, ডিসপ্লের জন্য মহড়া চলছে।

ঘণ্টাব্যাপী অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও দর্শকদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া থাকছে উপজাতীয়দের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যগীত। গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়াসে সব ধরনের আয়োজনই এগিয়ে চলছে। সব মিলিয়ে পার্বত্য খাগড়াছড়ি এখন এক উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে। শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ববহ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের দিকে এখন পৃথিবীর সংবাদ মিডিয়াগুলোর দৃষ্টি। বিশ্বের স্বীকৃত সংবাদ সংস্থাগুলো খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আসন্ন অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। এখন থেকে এ বিষয়টি ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্ত লারমার অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমেই শান্তিবাহিনীর স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের ধারার সূচনা হবে। এই অনুষ্ঠানেই শান্তিবাহিনীর ছয়শ' সদস্য সরকারের কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ

সমর্পণ করবে। সরকারের দফতরবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা অনুষ্ঠানকে সুচারুভাবে শেষ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা-আলোচনার জন্য বর্তমানে খাগড়াছড়ি অবস্থান করছেন। ইতোমধ্যে অস্ত্র সমর্পণ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জনসংহতি সমিতির দু'শীর্ষ নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা সার্বক্ষণিকভাবে মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমাকে সহযোগিতা দিচ্ছেন।

এদিকে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে পার্বত্য শান্তি চুক্তির সুবাদে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার যে ধারা সূচীত হতে চলেছে সেই অনুষ্ঠানের প্রাক প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যালোচনামূলক এক সভা স্টেডিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের দফতরবিহীন মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমা এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠু ও বর্ণাঢ্যভাবে সম্পন্ন করার জন্য কল্লরঞ্জন চাকমা সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ও তৎপর হবার নির্দেশ দেন এবং সর্বস্তরের মানুষের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা কামনা করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা

ফজলুল বারী ॥ শান্তিবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সম্পর্কিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে এই সাধারণ ক্ষমা। উল্লেখ্য, আগামী মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে অস্ত্র সমর্পণের প্রথম পর্ব। চার পর্বে মোট ১৯৩৩ সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করে ফিরে আসবেন সাধারণ জীবনে। এদের ৮৬০ জন সশস্ত্র সদস্য। এদিকে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন, শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেজী ভাব লাগতে শুরু করেছে পার্বত্য এলাকার হাটবাজারে। শরণার্থী, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন অনুদানসহ অন্যান্য খাতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা লাগছে। প্রত্যাগতদের বেশিরভাগ খাগড়াছড়ি জেলার বাসিন্দা হওয়াতে এই জেলাতেই এসব টাকা পয়সার সিংহভাগ প্রয়োগ সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়াতে তেজী ভাবের প্রভাব সেখানেই বেশি স্পষ্ট হচ্ছে।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধারণ ক্ষমার আওতায় শান্তিবাহিনীর যে সকল সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা বা হলিয়া

আছে এর সমুদয় ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হবে। অনুপস্থিতিতে বিচারে যাদের সাজা হয়েছিল তাদের সাজা মওকুফ, কারাগারে আটক ব্যক্তিদের মুক্তির আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর জনসংহতি সমিতির কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন সকল স্থায়ী বাসিন্দার ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে সাধারণ ক্ষমা। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র, গোলাবারুদ জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর বাহিনী ও জনসংহতি সমিতি সংশ্লিষ্টতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের, গ্রেফতার বা শাস্তি প্রদান করা হবে না। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শুক্রবার স্বরাষ্ট্র সচিব স্বাক্ষরিত ঘোষণায় আশা প্রকাশ করে বলা হয়েছে— স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে শান্তিবাহিনী, সংহতি সমিতির সদস্যরা বাংলাদেশের সুনামগরিক হিসাবে জীবনযাপন করবেন, দেশের উন্নয়নে সার্বিক ভূমিকা রাখবেন।

উল্লেখ্য, এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ববর্তী সূচী অনুসারেই ১০, ১৬, ২২, ২৮ ফেব্রুয়ারি চার দফায় অস্ত্র সমর্পণ হচ্ছে। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৪৩ জনের অস্ত্র সমর্পণের যে প্রস্তাব শান্তিবাহিনী দিয়েছিল নিজস্ব প্রস্তুতির অভাবে সরকার তা গ্রহণ করেনি। প্রস্তুতি পূর্বের চূড়ান্ত পর্যায়ের তদারকিতে মন্ত্রী কল্লরঞ্জন চাকমাসহ কর্মকর্তাবৃন্দ এখন ব্যস্ত দিনরাত কাটাচ্ছেন খাগড়াছড়িতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, চীফ হুইপ, পর্যটন মন্ত্রী, তথ্য, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সোমবারই খাগড়াছড়ি পৌঁছে যাবেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য স্পেশাল এ্যাক্ফেয়ার্স বিভাগের কাছে প্রায় ৯৪ লাখ টাকার বাজেট এসেছিল। বিভাগ ১১ লাখ টাকার মতো বরাদ্দ দিয়েছে। তবে স্বরাষ্ট্র, তথ্য মন্ত্রণালয় স্ব স্ব খাতে আলাদা আলাদা বাজেট বরাদ্দ করেছে। পর্যটন করপোরেশন অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবে। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে অস্ত্র সমর্পণ এবং ভারতের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সর্বশেষ দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের কাজ ৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বাংলাদেশ সরকার তরফ থেকে অস্ত্র সমর্পণ উপলক্ষে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩/৪ দিনের জন্য প্রত্যাবাসন বন্ধ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ত্রিপুরায় নির্বাচন হচ্ছে ১৬ তারিখ থেকে। সে জন্যও সেখানকার কর্মকর্তারা তাদের ব্যস্ততার কারণে প্রত্যাবাসন কয়েকদিন পিছিয়ে দিতে বলেন। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ৫২ সহস্রাধিক শরণার্থী ফিরে এসেছেন। আর বাকি আছেন ১১ হাজারের মতো। এরশাদ আমলে পার্বত্য এলাকার সংঘাতমুখর পরিস্থিতিতে মোট ৬৩ হাজার ৬৯৩ জন শরণার্থী দেশ ছেড়ে যান। বিএনপি আমলে সরকারী উদ্যোগে ৫১৮৯ জন, স্বৈচ্ছায় ২৯৮৮ জন দেশে ফিরে এসেছিলেন। এরপরও ৫৫

হাজার ৫১৬ জন রয়ে যান ত্রিপুরায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে গত বছরের ২৮ মার্চ শুরু প্রত্যাশন পর্বেই এ ব্যাপারে গতি প্রবাহের সৃষ্টি হয়। দেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে পরিবারপিছু এককালীন অনুদান, গৃহ নির্মাণ, গরু কেনার অনুদানসহ বিভিন্ন খাতে দেয়া হচ্ছে নগদ ২১ হাজার টাকা করে। শুধুমাত্র এ খাতেই লাগছে ২৬ কোটি টাকার বেশি। এ ছাড়া পরিবারপিছু দুই বাঙালি ডেউটিন, চাল, ডাল, তেল, লবণসহ রেশন সামগ্রীও দেয়া হচ্ছে এক বছরের। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের পর পুনর্বাসন অনুদান দেয়া হবে নগদ ৫০ হাজার টাকা। প্রায় ১০ কোটি টাকা লাগছে এ খাতে। রেশন ব্যয়, পুনর্বাসন প্রস্তুতি, তদারকিসহ অন্য নানা খাতের ব্যয় ১০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে ধারণা করা হচ্ছে। নগদ এসব অর্থের বড় অংশ ইতোমধ্যে বাজারে চলে এসেছে। বাকি অর্থ আসার পর বাজারের তেজী ভাব আরও বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। এর সঙ্গে যোগ হবে পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের টাকা পয়সা। সব মিলিয়ে পার্বত্য এলাকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য শুরু হচ্ছে বিশেষ একটি সুবর্ণকাল।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

খাগড়াছড়ির সর্বত্র সাজ সাজ রব ৥ অস্ত্রসমর্পণের জন্য শান্তি বাহিনী সদস্যরা আসছে আজ থেকে

ফজলুল বারী/জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে ৥ পাহাড়ী ভ্যালির শহর খাগড়াছড়ির চেহারা যেন পাল্টে গেছে। সর্বত্র শুধুই সাজ সাজ রব। শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ কেন্দ্র করে এই শহর, জনপদ এখন কর্মমুখর। মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে যে ৭৪৩ জন অস্ত্রসমর্পণ করবেন তাঁরা আজ রবিবার আসতে শুরু করবেন তিনটি সমাবেশ শিবিরে। আজই তাঁদের অস্ত্র-গোলাবারুদ জমা নেবে নিরাপত্তা বাহিনী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে প্রথম দফার এসব অস্ত্র গোলাবারুদ সমর্পণ করা হবে আনুষ্ঠানিকভাবে।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে এখন স্থানীয় সামরিক-বেসামরিক কর্তৃপক্ষের পুরো জনশক্তিই দিন-রাত কাজ করছে। ছোট শহরটিতে যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অতিথি আসছেন তাদের ধারণক্ষমতা এখানে নেই। সর্বত্র তাই ঠাই নেই ঠাই নেই পরিস্থিতি। সার্কিট হাউসসহ সব রেস্ট হাউস, স্থানীয় হোটেলগুলোর সব কক্ষ কর্মকর্তাদের জন্য অগ্রিম বুকিং নিয়ে রাখা হয়েছে। আজ রবিবার শিল্পীদের যে বড়সড় দলটি ঢাকা-চট্টগ্রাম থেকে আসছেন তাঁদের একটি স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই

শিল্পীদের জন্য কেনা হয়েছে দেড় শ' বালিশ। কন্সলের ব্যবস্থা করেছে রেড ক্রিসেন্ট। মন্ত্রী-কর্মকর্তারাও আজ থেকে আসা শুরু করবেন। মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা আজ সকালে পানছড়ির সীমান্তগ্রাম দুদুকছড়িতে যাচ্ছেন জনসংহতি নেতা সন্ত লারমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সন্ত লারমা সোমবার পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে পৌঁছবেন। সেখান থেকে মঙ্গলবার সকালে তাঁদেরকে অস্ত্র সমর্পণের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে নিয়ে আসা হবে।

শান্তিবাহিনী ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁদের যে ১৪৩ সদস্যের অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তাব করেছিল তাঁরাও ১০ ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে ফিরে আসছেন স্বাভাবিক জীবনে। এর আগে ১০ ফেব্রুয়ারি ৬শ' সদস্যের অস্ত্র সমর্পণের কথা ছিল। প্রস্তুতি হিসাবে প্রথম দফার তালিকাভুক্ত সদস্যদের আজ ঘিলাছড়ি, মাইচছড়ি এবং দুদুকছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ইতোমধ্যে এ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরা লাল চাকমা, শক্তিপদ ত্রিপুরাকে ঘিলাছড়িতে, রূপায়ন চাকমা, কৈশয়ং মারমাকে মাইচছড়ি, বিশ্বজিৎ চাকমা, আশিস চাকমাকে দুদুকছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পের তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা তিন ক্যাম্পে আসার পর সেনাবাহিনী, বিডিআর এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের অস্ত্র গোলাবারুদের তালিকা তৈরি করা হবে। এর পর এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়া হবে নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে। মঙ্গলবার নিরাপত্তা বাহিনীই এসব অস্ত্র নিয়ে আসবে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বেতার-টিভিতে। টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারের জন্য ওয়ার্ল্ড টেল-এর তিন প্রকৌশলী শনিবার সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় এসেছেন। আজ তাঁদের খাগড়াছড়ি পৌঁছবার কথা। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের সুবিধার জন্য একটি মিডিয়া সেন্টার খোলার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। টিএ্যান্ডটি সেখানে দু'টি আইএসডি, দু'টি এসটিডি ফোন-ফ্যাক্সের ব্যবস্থা করেছে।

শনিবার পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে গিয়ে সেখানে সেনাবাহিনীর সদস্যদের তাঁবু স্থাপনসহ নানা কাজে ব্যস্ত দেখা যায়। একটি হাইস্কুলের কয়েকটি ভবন ছাড়াও ৭৪৩ জনের থাকার জন্য ২৫টি তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া সেখানে স্থাপন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি টিউবওয়েল ও সেনিটারি লেট্রিন। পুরো এলাকাটি কাঁটা তারের বেড়ায় ঘিরে নেয়া হয়েছে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণের পরেও এই ট্রানজিট ক্যাম্পে চাইলে একমাস সময় থাকতে পারবেন। অস্ত্র সমর্পণ প্রস্তুতি তদারকিতে জনসংহতির দুই নেতা সুধাসিন্দু খীসা এবং রক্তোৎপল ত্রিপুরা এখন খাগড়াছড়িতে অবস্থান করছেন। এদের মধ্যে রক্তোৎপল অসুস্থ হয়ে পড়ায়

গুত্রবার রাতে তাঁকে দু'দফায় ডাক্তার দেখানো হয়। এখন তাঁর অবস্থা উন্নতির দিকে। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র বলেছে, ১০ ফেব্রুয়ারি অস্ত্র সমর্পণের পর জনসংহতির নেতা সন্ত লারমা আবার দুদুকছড়ি ফিরে যাবেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ দলটির সঙ্গে তিনি আবার ফিরে আসবেন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ানের সরকারী বাসভবনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ওই বাসভবনটি সাজানো হয়েছে প্রায় তিন লাখ টাকার আসবাবপত্র, টিভি-ফ্রিজসহ নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীতে। খবরটি জানার পর নাকি সন্ত লারমা এতে তাঁর আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, তিনি বিলাসবহুল জীবন পছন্দ করেন না।

অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়ি শহরের সবক্ষেত্রে প্রাণচাঞ্চল্য দৃশ্যমান। কোথাও কোন কালো পতাকা নেই। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর পর এখানে যে কালো পতাকার বহর তোলা হয়েছিল, বিক্ষোভ সংক্রামিত করা হয়েছিল তা কোথায় হারিয়ে গেল? প্রশ্নের জবাবে নানাজন নানা বক্তব্য দিয়েছেন। এক দোকানী বললেন, চুক্তিবিরোধী নেতারা গ্রেফতারের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন। নেতারা নেই, আন্দোলন, কালো পতাকাও নেই। তাঁরা ভয়-ভীতিতে যে পতাকা তুলেছিলেন তা ওড়াতে তাঁদের কেউ আর জবরদস্তিও করছেন না। এক কর্মকর্তা বললেন, তাঁরা এসব বিষয়ে কোন জোরাজুরি করেননি। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই নিশ্চিত করা হয়েছে যে চাইলেই কারও পক্ষে গণ্ডগোল করা সম্ভব নয়। অস্ত্র সমর্পণ উপলক্ষে বাড়তি লোকজন আসায় দোকানী, রিক্সা চালকরা খুশি। সরবরাহ তুলনামূলক কম হওয়ায় খাদ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে গেছে। ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৮-২০ টাকা হালিতে। এদিকে আজ রবিবার উদ্বোধন করা হচ্ছে নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম। প্রায় সোয়া ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে নির্মিত স্টেডিয়ামটিতে ১৬০০ দর্শকের ধারণক্ষমতা রয়েছে। আজ মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এর উদ্বোধন করবেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের প্রস্তুতি

চূড়ান্ত করতে প্রশাসন ব্যস্ত ॥

হরতালের কারণে বিশেষ সতর্কতা

ফজলুল বারী/জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে ॥ আগামীকাল মঙ্গলবার অস্ত্র সমর্পণ করছে শান্তিবাহিনীর ৭৫২ সদস্যের প্রথম দলটি। প্রথম দিনে তারা জমা দেবে ৪৬৩টি অস্ত্র। জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয়

লারমা ওরফে সন্ত লারমা জমা দেবেন একটি বিদেশী পিস্তল। অস্ত্র সমর্পণ উপলক্ষে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা আজ সোমবার এসে পৌছবেন পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক একেএম কাফরুল হোসেন রবিবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, হরতাল কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে সারা জেলায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পুলিশের মোট ১৮ কোম্পানি জনশক্তি থাকবে পুরো নিরাপত্তা তদারকিতে। এছাড়া সেনাবাহিনী, বিডিআর, আর্মড পুলিশ, আনসারের স্থানীয় সমস্ত জনশক্তিই নিরাপত্তার কাজে লাগানো হচ্ছে। খাগড়াছড়িমুখী সব সড়ক, সেতু প্রহরায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে।

রবিবারই জনসংহতি শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ ইচ্ছুক প্রথম দলটির তিনটি সমাবেশ ক্যাম্পে পৌছবার কথা থাকলেও বিকাল পর্যন্ত তারা আসেনি। তবে জেলা প্রশাসক বলেছেন রাতের মধ্যে তাদের পৌঁছে যাবার কথা। মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা আজ দুদুকছড়িতে সন্ত লারমার নেতৃত্বাধীন দলটিকে গ্রহণ করে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসবেন। টাঙ্কফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান, সাংসদ দীপংকর তালুকদার ঘিলাছড়ি, সাংসদ বীরবাহাদুর মাইচছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে সমবেতদের নিয়ে আসবেন ট্রানজিট ক্যাম্পে। মাইচছড়ি ক্যাম্প থেকে যারা আসবেন তাদের নেতৃত্ব দেবেন ব্রিগেড কমান্ডার মেজর রণক ওরফে বিনয়কৃষ্ণ চাকমা। দুদুকছড়ি থেকে উল্লেখযোগ্য যারা বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে আসবেন তাঁরা হলেন মেজর দেবানীষ চাকমা ওরফে আশাপূর্ণ চাকমা, মেজর খীসা ওরফে উষাবিন্দু চাকমা, লেফট্যানেন্ট রেনন, লেফট্যানেন্ট নবোদয়, লেফট্যানেন্ট অরিন্দু। জনসংহতির পক্ষে দুদুকছড়িতে গৌতম চাকমা, ঘিলাছড়িতে সুধাসিন্ধু খীসা, মাইচছড়িতে রঞ্জনপল ত্রিপুরা প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া তদারকি করছেন। সমাবেশ ক্যাম্পে নাম রেজিস্ট্রেশনের পর সদস্যদের অস্ত্র থেকে গোলাবারুদ বের করে সরকারী হেফাজতে নেয়া হবে। দুপুরের খাবারের পরেই তাদের আনা হবে ট্রানজিট ক্যাম্পে। দুদুকছড়ি থেকে বাহিনীর সদস্যদের ১০টি বাস, ৩টি ট্রাক; মাইচছড়ি থেকে ৭টি বাস, ৩টি ট্রাকে করে পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে আনা হবে। সেই ট্রানজিট ক্যাম্পেই অস্ত্র সমর্পণকারীদের টাকা পয়সা বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর জন্য সেখানে খোলা হয়েছে সোনালী ব্যাংকের একটি বিশেষ শাখা। উল্লেখ্য, শান্তি চুক্তি অনুসারে বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের পর নগদ ৫০ হাজার টাকা দেয়া হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে এ খাতে বরাদ্দ করেছে ৯ কোটি টাকা। বাহিনীর সদস্যরা চাইলে ট্রানজিট ক্যাম্পেই পুরো টাকা বুঝে নিতে পারবেন। আংশিক টাকা নিয়ে কেউ যদি বাকি টাকার চেক নিতে চান বা টাকা ব্যাংকে রাখতে চান সে

ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ট্রানজিট ক্যাম্পে উপস্থিত যোগাযোগ কমিটির সদস্যরা বাহিনীর সদস্যদের শনাক্ত করতে সহায়তা করবেন। জনসংহতি নেতা সন্ত লারমাকে বিশেষ অতিথির মর্যাদায় খাগড়াছড়ি শহরেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রবিবার সীমান্ত গ্রাম দুদুকছড়ি গিয়ে বিডিআরকে সমাবেশ ক্যাম্প সজ্জার কাজে ব্যস্ত দেখা যায়। খোলা মাঠে প্যাডেল, তাঁবুসহ সেখানে বিশ্রামের নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্ত লারমাসহ জনসংহতির নেতারা গতকালই পৌঁছেছেন সেখানে। ছোট একটি কাঠের সেতু অতিক্রম করে যেতে হয় দুদুকছড়ির ছোট বাজারে। আগে যেখানে বাঁশের সাঁকো ছিল। সেখানেই করা হয়েছে কাঠের সেতু। জনসংহতি নেতারা আলোচনা উপলক্ষে পাহাড়ী বরনার ওপরের এই সেতু পথেই আসতেন। সেজন্য এটিকে শান্তি সেতু বা ‘ব্রিজ ফর পিছ’ নামকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে পাকা একটি সেতু নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ লাখ টাকা। দুদুকছড়ির ছোট বাজারে উৎসাহী পাহাড়ী জনতার ভিড়। বাজারে মাছ কম এসেছে কাল। শান্তি বাহিনীর সদস্যদের খাবারের জন্য মাছ কেনা হচ্ছে বাজারে আসার আগেই। স্থানীয়দের বাধা এড়িয়ে এ পথের দ্বিতীয় একটি কাঠের সেতু অতিক্রম করে বুঁকি নিয়ে আমরা চলে গেলাম প্রত্যন্ত এলাকায়। ছোট একটি টিলার আড়াল অতিক্রম করতেই বাঁয়ে প্রায় দেড় শ’ গজ দূরত্বে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র প্রহরা নজরে আসে। টিলার ওপর একটি জায়গায় একটি বাড়ির সামনে ক্যাম্প। সেখানকার প্রবেশ মুখে চেয়ার পেতে বসে আছেন কয়েকজন। এদের দু’জন শান্তি বাহিনীর সবুজ ইউনিফর্ম পরিহিত। দু’জনেরই হাতে অস্ত্র। অপর চার জন সাধারণ পোশাকে নিরস্ত্র। ইশারায় ডাকতেই সাদা পোশাকের এক যুবক এগিয়ে আসেন। কুশল বিনিময়ের পর বললেন, তিনি ক্যাম্প ইনচার্জ। কিন্তু নাম বললেন না। পানি খেতে চাইলে একজন মাটির একটি জার, কাচের গ্লাস নিয়ে আসে। ১৯৮৩তে এসএসসি, ১৯৮৫তে এইচএসসি পাস যুবক বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আমাদের সঙ্গে তিনি বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারবেন না। আমাদের সেখানে বেশি সময় অবস্থান না করার জন্যও অনুরোধ করে তিনি ফিরে যান। আমরা ফিরে আসছিলাম। দূর থেকে ছবির কাজ শেষে সম্ভাষণ জানাতেই তাঁরা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে প্রতিউত্তর দেন। অস্ত্র সমর্পণের দু’দিন আগে সম্ভবত গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে এটিই ছিল শান্তি বাহিনীর সর্বশেষ সাক্ষাত।

অস্ত্র সমর্পণের খুঁটিনাটি প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে খাগড়াছড়ির সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন এখন পুরোদস্তুর ব্যস্ত। প্রস্তুতি দেখতে আজ সোমবার

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, চীফ হুইপসহ কয়েক মন্ত্রী আসছেন খাগড়াছড়িতে। রবিবার মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটি ছিল অগোছালো। মঙ্গলবারের কর্মসূচী যাতে সেরকম না হয় সেজন্য সতর্কতা নেয়া হয়েছে। তবে এখনও আমন্ত্রণপত্র বিলি নিয়ে সমস্যা আছে। খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান আবুল কাশেম রবিবার বিকাল পর্যন্ত আমন্ত্রণপত্র পাননি। অনুষ্ঠানে সন্ত লারমা বক্তব্য রাখতে চান। এ বিষয়ে ব্যবস্থা না রাখায় যোগাযোগ কমিটির একাধিক সদস্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এখন পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে তা হলো, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা স্বাগত বক্তব্য রাখবেন। অপর এবং একমাত্র বক্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার পর্যন্ত শান্তি বাহিনীর ৭৪৩ জনের প্রথম দিনে অস্ত্র সমর্পণের কথা জানা গেলেও রবিবার জানানো হয় এই সংখ্যা বেড়ে ৭৫২ জন হয়েছে। এদের মধ্যে ২৬৯ জন ঘিলাছড়ি, ২০৭ জন মাইচছড়ি এবং ২৭৬ জন দুদুকছড়ি হয়ে আসবে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, শান্তি বাহিনী নামের তালিকা বদল করেছে একাধিক বার। প্রথম দিনে রবিবার পর্যন্ত ঠিক করা ৪৬৩ অস্ত্র জমা দেবার বিষয়টিও চূড়ান্ত নয়। আজ সোমবার এটি চূড়ান্ত হতে পারে। এখন পর্যন্ত তালিকা অনুসারে অস্ত্রের মধ্যে রাইফেল, এসএমজি, এলএমজি আছে। প্রথম দিনে ২শ’ গোলাবারুদ জমা দেবার কথা। সব অস্ত্রই জাতীয় যাদুঘরে রাখার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। সন্ত লারমা অস্ত্র জমা দেবার পর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে যে সাদা গোলাপের তোড়া দেবেন সেটি তৈরি হচ্ছে খাগড়াছড়ি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে। তবে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী খাগড়াছড়ি পৌছবার পর তাঁকে লাল গোলাপের তোড়া দিয়ে বরণ করবে দুই শিশু। অস্ত্র সমর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী ৪শ’ কবুতর উড়িয়ে দেবেন। ৪শ’ কবুতরই যাতে শান্তির প্রতীক সাদা রঙের হয়, সবগুলোই যাতে উড়ে সেজন্য সংশ্লিষ্টদের বিশেষ ফরমায়েশ দেয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজ শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ শুরু

লক্ষ্য দু’ যুগের বৈরিতার

অবসান ॥ প্রস্তুতি সম্পন্ন

ফজলুল বারী/জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে ॥ আজ প্রত্যাশার সেই দিন। পাহাড়ের দিগন্তে শান্তির নতুন সূর্যোদয়ের দিন। সব আয়োজন, প্রস্তুতি সম্পন্ন। নিশ্চিন্দ নিরাপত্তার ভিতর বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর প্রথম দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করবে আজ। এ উপলক্ষে খাগড়াছড়ি

স্টেডিয়ামকে মনোরম, বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রথম অস্ত্রসমর্পণ করবেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হবে। সন্ত লারমার অস্ত্র গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উপহার দেবেন শান্তির প্রতীক একগুচ্ছ সাদা গোলাপ। শান্তির পায়রা ওড়াবেন প্রধানমন্ত্রী। একে একে অস্ত্রসমর্পণ করবে বাংলাদেশের স্বীকৃত বিদ্রোহী বাহিনীটির প্রথম দল। ‘সঙ্গীত মৈত্রীর বন্ধন’ দেশাত্মবোধক গানের তালে তালে আনন্দ নৃত্য অংশ নেবেন বাঙালী-পাহাড়ী একদল শিল্পী। এরপর সেনাবাহিনীর অর্কেস্ট্রা দল বাজাবে পাহাড়ী গানের সুর ‘উত্তম ফেগে মেঘে মেঘে’ (উড়ছে পাখি আকাশে)। সকাল ১১টায় শুরু অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে পাঠ, ত্রিপিটক, গীতা, বাইবেলের নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে তিরিশ মিনিট। দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠান শেষ হবে বেলা সাড়ে ১২টায়। অনুষ্ঠানটি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম থেকে সম্প্রচার করা হবে সরাসরি। ওয়ার্ল্ডটেল পঞ্চাশ হাজারে ডলারের বিনিময়ে অনুষ্ঠানটি টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পুরো আয়োজনের বিরোধিতা করে বিএনপিসহ সাতদলের হরতালের পক্ষে খাগড়াছড়িতে সাড়া লক্ষ্য করা যায়নি।

প্রথম অস্ত্রসমর্পণ উপলক্ষে শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ সদস্যের প্রথম দলটি সোমবার দুদুকছড়ি, মাইচছড়ি, ঘিলাছড়ি সমাবেশ ক্যাম্প হয়ে পেরাছড়ার ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান নিয়েছে। দুদুকছড়িতে তাদেরকে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, ঘিলাছড়িতে টাঙ্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, মাইচছড়িতে সাংসদ বীর বাহাদুর অভ্যর্থনা জানান। সেখানে বিশ্রাম, নাম রেজিস্ট্রেশন, অস্ত্র গোলাবারুদ জমা, দুপুরের খাবারের পর তাদের স্থানীয় পেরাছড়া হাইস্কুলে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ সকালে তাদেরকে সরাসরি অনুষ্ঠানস্থল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে নিয়ে আসা হবে।

সোমবার তিন ক্যাম্প মোট অস্ত্র জমা হয়েছে ৪৬৫টি। গোলাবারুদ ১০৩৮টি জমা হয়েছে। দুদুকছড়িতে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে মেজর দেবশীষ, মেজর নৈতিক, মেজর খীসা, মেজর রেনন, লেঃ নবোদয়, লেঃ অরিন্ড অস্ত্র জমা দেন। দুদুকছড়িতে জমা অস্ত্রের মধ্যে ৬টি চাইনিজ রাইফেল, ৬৫টি এসএলআর, ৭৩টি জি থ্রী রাইফেল, ২৭টি এস এমজি, ১০টি ৯ মিঃ মিঃ এসএমজি, ৪টি থ্রী নট থ্রী।

এলএমজি, ৭টি মর্টার রয়েছে। দুদুকছড়িতে ২৬৫টি অস্ত্র, ৯০০ গোলাবারুদ জমা হয়। মাইচছড়িতে ৭৭টি অস্ত্র, ৪০টি গুলি রয়েছে জমার

তালিকায়। চাইনিজ রাইফেল, একে-৪৭ ৮টি, কারবাইন ৮টি, এলএমজি ১টি, ৩টি দেশী বন্দুক রয়েছে সেখানকার জমা হিসাবে। ঘিলাছড়িতে ১২৩টি অস্ত্র, ৯৮টি গোলাবারুদ জমা হয়েছে। সোমবার রাত পর্যন্ত সেনা কর্মকর্তারা এসব অস্ত্র গোলাবারুদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিলেন। আজ স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে মূল মঞ্চের সামনে ডানে-বাঁয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের র‍্যাকে এসব অস্ত্র গোলাবিহীন অবস্থায় সজ্জিত রাখা হবে। বাহিনীর সদস্যরা মাঠে প্রবেশ করে তাদের জন্য সারিবদ্ধভাবে রাখা ফোন্ডিং, চেয়ারে বসবেন। সন্ত লারমা যে অস্ত্রটি জমা দেবেন সেটি হলো একটি অটোমেটিক বিদেশী পিস্তল। প্রধানমন্ত্রী সেটি গ্রহণ করেই তুলে দেবেন খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক একেএম জাফরুল হোসেনের কাছে। এসব অস্ত্র জাতীয় যাদুঘরে রাখার চিন্তা ভাবনা রয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে মঞ্চের জনসংহতি নেতা সন্ত লারমার জন্য একটি খালি চেয়ার, রাখা হবে। অস্ত্র জমা দেয়ার পর তিনি সেটায় এসে বসবেন। তবে সন্ত লারমাকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়নি সোমবার পর্যন্ত।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামকে মনোরম সাজে সাজানো হয়েছে। বিশিষ্ট অতিথিসহ ত্রিশ সহস্রাধিক লোক সংকুলানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্টেডিয়ামের মূল ফটক পেরিয়ে মাঠের লাগোয়া প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মূল মঞ্চ। প্রধানমন্ত্রীর ১০ জনের আসন রাখা হয়েছে মঞ্চের। স্বামী রফিকুল ইসলাম, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, আতাউর রহমান কায়সার ও এস এম চাকমা মঞ্চের মঞ্চের সামনের দিকের গ্যালারিতে পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সদস্যদের, ‘অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান’ লেখা ব্যানার টানা হয়েছে। আরেকটি ব্যানারে ইংরেজীতে লেখা হয়েছে ‘বি ইউনাইটেড টু ইলিমেন্ট সিএইচটি পিস একর্ড’। মঞ্চের বামদিকে সাংবাদিক, ডানদিকে ফটোসাংবাদিকদের অবস্থানের এলাকা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আছে সরাসরি টিভি, বেতার সম্প্রচারের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিমান মন্ত্রী, চীফ হুইপসহ কর্মকর্তারা সোমবার স্টেডিয়ামে মূল অনুষ্ঠানের মহড়া দেখেছেন। অস্ত্রসমর্পণ উপলক্ষে পুরো খাগড়াছড়ি এখন নিশ্চিন্দ নিরাপত্তার শহর। নির্দিষ্ট সড়কগুলোতে পাঁচ-দশ হাত অন্তর-অন্তর সেনা, বিডিআর, আর্মড পুলিশ, পুলিশের সশস্ত্র সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। সড়ক, সড়ক সেতুসমূহ পাহারা দিচ্ছেন সেনাবাহিনী, আনসারের জওয়ানরা। নিশ্চিন্দ নিরাপত্তার

ব্যবস্থা করা হয়েছে করে হাট-খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কে। আজ ঢাকা থেকে আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিকসহ ভিআইপিদের বিমানের এয়ারবাসে চট্টগ্রাম আনা হবে। হেলিকপ্টারে এবং সড়কপথে তাঁদের আনা হবে খাগড়াছড়িতে। সড়কপথে তাঁদের আসতে যাতে কোন সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য করা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিতে পুলিশ এবং আর্মড পুলিশের ১৯০০, সেনাবাহিনীর ২০০০, বিডিআরের ১৫০০ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাগড়াছড়ি বর্ণাঢ্য সাজ নিলেও হরতাল কর্মসূচীর কারণে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। যদিও হরতাল আহ্বানকারী বিএনপিসহ ৭ দলের নেতা-কর্মীদের কোন তৎপরতা সোমবার পর্যন্ত দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে মন্তব্য সংগ্রহের জন্যও খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁদের নেতৃবৃন্দকে। খেফতার এড়াতে তাঁরা আত্মগোপন করেছেন বলে জানা গেছে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর বিএনপি'র আন্দোলনের সমর্থক পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী সোমবার আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সোমবার সারাদিন শহরে আওয়ামী লীগের খণ্ড খণ্ড মিছিল হয়েছে। সাদা পতাকা ওড়ানো হয়েছে সারা শহরে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে কয়েক শ' অতিথি নানা পেশার ব্যক্তিত্ব এখন শহরটিতে অবস্থান করায় আবাসন, খাদ্য সঙ্কট তীব্র হয়েছে। খাদ্য মূল্যের দামও বেড়ে গেছে। সবচেয়ে সমস্যার শিকার সাংবাদিকরা। মিডিয়া সেন্টার খোলা হলেও ত্রুটিপূর্ণ সীমিত সংখ্যক টেলিফোন সংযোগের কারণে তাদের রিপোর্ট পাঠাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি চুক্তির

সমর্থনে 'যুব শান্তি র্যালি' অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ যুব সমন্বয় কাউন্সিল 'পার্বত্য শান্তি চুক্তির' সমর্থনে সোমবার রাজধানীতে যুব শান্তি র্যালি করেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তন থেকে সকাল সাড়ে ১০টায় র্যালি শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সেগুনবাগিচা সংগঠনের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র্যালিতে 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান-পার্বত্য সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান', 'বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একা চাই', 'বাঙালী-পাহাড়ী ভাই ভাই-সকলে শান্তিপূর্ণ দেশ চাই' স্লোগান দেয়া হয়। র্যালি শুরুর পূর্বে শিখা চিরন্তন চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে যুব সমন্বয়

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শেখ ফারুক বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে দেশের শান্তিকামী জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। পাহাড়ী জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পেয়েছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করে এই চুক্তি সুখী-সমৃদ্ধিশালী জাতি ও দেশ গঠনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখবে। জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেখ ফারুক বলেন, দেশের শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক হীনমন্যতা পরিহার করে শান্তি চুক্তি মেনে নিন, নতুবা অশান্তি সৃষ্টির জন্য জনগণ আপনাকে অভিযুক্ত করবে।

শেখ ফারুক শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্ত লারমাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সহযোদ্ধাদের প্রতি সন্ত লারমার

আবেগময় বিদায়

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে ॥ সোমবার সকালে দুদুকছড়ি শান্তি সেতুর কাছে দলের সদস্যদের আবেগঘন বিদায় জানান- জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা। দুই যুগের বেশি সময়ের সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের পর ২৭৬ সদস্যের দলটি অস্ত্রসমর্পণ উপলক্ষে দেশে ফিরে এসেছে সে পথে। সেই সময়ে সেখানে সমবেত পাহাড়ী নারী পুরুষের অনেকে চোখের জল মুছছিলেন। শান্তিবাহিনীর অনেক সদস্যেরও চোখে জল ছিল। মাইচছড়ি, ঘিলাছড়ি উভয় সমাবেশ ক্যাম্পের আশপাশেই ছিল একই পরিস্থিতি। হাজার নারী পুরুষ রাস্তায়, সমাবেশ ক্যাম্পের চারপাশে দূরে দাঁড়িয়ে অস্ত্র জমাদান দেখেন। সে এক বিরল দর্শন অভিজ্ঞতা।

শান্তিবাহিনীর সদস্যরা কাল সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কাছে প্রথম অস্ত্র সমর্পণ করেননি। তাঁদের দাবি ছিল জনপ্রতিনিধির কাছে অস্ত্র সমর্পণের। সে অনুসারে দুদুকছড়ি সমাবেশ শিবিরে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, ঘিলাছড়িতে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার, মাইচছড়িতে সাংসদ বীর বাহাদুর অস্ত্র গ্রহণ করেন। এর পর সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা সেগুলো থেকে গুলি বের করে আলাদা করে রাখেন। জনসংহতি নেতা সন্ত লারমা অস্ত্রসমর্পণজনিত টেকনিক্যাল কারণে কাল আসেননি। দুদুকছড়ি সমাবেশ কেন্দ্রে এলেই সিদ্ধান্তমুখিক তাঁকে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা

অথবা সেনা কর্মকর্তাদের কাছে অস্ত্র জমা দিতে হতো। কিন্তু সস্ত্র তার অস্ত্রটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিতে চান। সেজন্য তিনি আসেননি। আজ সকালে দুদকছড়ি থেকে তাকে সরাসরি নিয়ে আসা হবে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। টেকনিক্যাল কারণে না এলেও সোমবার, সরকারী তরফ থেকে বলা হয়েছে, অসুস্থ থাকায় সস্ত্র আসতে পারেননি।

সোমবার দুদকছড়ি, ঘিলাছড়ি রুটে শান্তিবাহিনীর বেশ কিছু লড়াকু যোদ্ধা অস্ত্রসমর্পণের উদ্দেশ্যে এসেছেন। মাইচছড়ি রুটে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেকেই তরুণ বয়সী। ১৬-১৭ বছর বয়স হবে এমনও কয়েকজন ছিলেন। মনে হয়েছে সদ্য রিক্রুটকৃত। তবে বাহিনীর একটি সদস্য জনকণ্ঠকে বলেছেন, সর্বশেষ নিয়মিত ক্যাডার হিসাবে যাঁরা তৎপর ছিলেন তাঁদেরকেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নিষ্ক্রিয় অথবা পারিবারিক কারণে যাঁরা দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের তালিকাভুক্ত করা হয়নি। তিন রুটেই কাল যাঁরা এসেছেন তাঁদের গেরিলাযোদ্ধা মনে করার উপায় ছিল না। যেন সবাই নিয়মিত আর্মির সদস্য। সেভ করে ইস্ত্রি করা নতুন সবুজ রঙের ড্রেস পরে তারা কেতাদুরস্ত হয়ে আসেন। তবে সমাবেশ ক্যাম্পে হেঁটে আসার সময়টাতে তাদের অনেকে হতবিস্ত্রল মনে হয়। গামারিটোলা পাহাড়ী গ্রাম থেকে মাইচছড়ি সমাবেশ ক্যাম্পে আগতরা দুই লাইনে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে আসেন। কাঁধে অস্ত্র ঝুলানো থাকলেও তাঁদের অনেকে মাথা নিচু করে হেঁটে আসছিলেন। একটি রাজনৈতিক, সামরিক যুদ্ধের পর বাস্তবতা মেনে নিয়ে তাঁরা ফিরে এসেছেন সাধারণ জীবনে। এটা জয় না পরাজয় সে নিয়েই যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব। সমাবেশ ক্যাম্পের সামনের তোরণের কাছে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে, হাতে রজনীগন্ধার স্টিক দিয়ে তাঁদের বরণ করা হয়। তাঁরা উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে করমর্দন করেন। করমর্দনের পর একজন সাংবাদিক মন্তব্য করে বলেন, হাতগুলো বড় শক্ত, পাথরের মতো।

যাঁরা ফিরছেন না

জনসংহতি সমিতির প্রধান সস্ত্র লারমা আজ মঙ্গলবার অস্ত্র জমাদান উপলক্ষে দেশে ফিরলেও ফিরছেন না তাঁর স্ত্রী সন্তানরা। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রয়াত মানবেন্দ্র লারমার স্ত্রী ও সন্তানরাও ফিরছেন না। মানবেন্দ্র স্ত্রী পঞ্চজিনী চাকমা সন্তানদের নিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় স্থায়ী হয়ে গেছেন। সস্ত্র লারমার ছোট মেয়ের জামাই প্রদীপ তালুকদার ২৮ ফেব্রুয়ারি দুদকছড়িতে অস্ত্র জমা দিয়ে ফিরে আসবেন স্বাভাবিক জীবনে। আজ অস্ত্র জমাদানের পর সস্ত্র আবার ফিরে যাবেন দুদকছড়ির গোপন ডেরায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ দলটির সঙ্গে তিনি ফিরে আসবেন। তাঁর স্ত্রী তখন ফিরবেন কিনা জানা যায়নি। শান্তিবাহিনীর নিষ্ক্রিয় প্রীতি গ্রুপের নেতা প্রীতি কুমার

চাকমাও আসছেন না। জনসংহতি সমিতির সদস্য হলেও তাঁকে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। তালিকাভুক্ত করা হয়নি জনসংহতির অঙ্গ সংগঠন গ্রাম পঞ্চায়েত, যুব সমিতির অনেক সদস্যকেও। এদের সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার। এত লোককে সরকার টাকা দিতে পারবে না বলেই এদের বিষয়ে ফয়সালা হয়নি। উল্লেখ্য অস্ত্র জমা দেয়ার পর জনসংহতি শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নগদ ৫০ হাজার টাকা দেয়া হচ্ছে। তালিকাভুক্ত সদস্য সম্পর্কে সমিতির এক নেতা বলেছেন, যাঁরা সক্রিয় নয় তাঁদের তালিকা হয়নি।

সাদা পতাকার শহর খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি এখন সাদা পতাকার শহর। শহর জুড়ে দোকানে বাড়িতে উড়ছে শান্তির সাদা পতাকা। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাহাড়ী ভ্যালির এই শহরকে সাজানো হয়েছে বর্ণাঢ্য সাজে। সারা শহরেই এখানে-সেখানে অসংখ্য তোরণ, রঙিন পতাকার সারি। নানা রঙের কাপড়ে লেখা ব্যানার এখানে সেখানে। এর সবই শান্তি চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করে আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ সংগঠনসমূহের উদ্যোগে লাগানো। ভিআইপিদের চলাচলে পুরো শহর মুখরিত। সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী, চীফ হুইপ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী খাগড়াছড়ি পৌঁছেছেন। আজ আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী, কর্মকর্তা, কূটনীতিক, সম্পাদকসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। সব মিলিয়ে ছোট শহরটিতে রমরমা অবস্থা। শত শত নতুন গাড়ি এসেছে শহরে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দু'যুগের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের অবসান

শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ শুরু

ফজলুল বারী/জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে ॥ ঐতিহাসিক অস্ত্র সমর্পণ শুরু হয়েছে শান্তিবাহিনীর। মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ সদস্য তাঁদের অস্ত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে। জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সস্ত্র লারমা প্রথম একটি চায়নিজ এসএমজি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তারপর বাহিনীর প্রথম দফার অপর সদস্যরা লাইনে হেঁটে গিয়ে তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করেন। পাহাড়ী ভ্যালির শহর খাগড়াছড়ির নবনির্মিত স্টেডিয়াম ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ৪০ সহস্রাধিক দর্শক করতালিমুখর পরিবেশে সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি প্রত্যক্ষ করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত কূটনীতিক, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা,

বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, কয়েক শ’ সাংবাদিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অস্ত্র জমা হবার পর প্রধানমন্ত্রী উড়িয়ে দেন শান্তির পায়রা, বেলুন। প্রধানমন্ত্রী সস্ত্র লারমাকে উপহার দেন সাদা গোলাপ। অস্ত্র সমর্পণ পর্বটি ছিল মাত্র ৭ মিনিটের। দুপুর ১২টা ৪৮-এ শুরু হয়ে ১২টা ৫৫তে শেষ হয়ে যায় তা। এর মাধ্যমে একুশ বছরে শান্তিবাহিনীর তিলে তিলে সঞ্চয় করা বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডারের একাংশ হাতছাড়া হয়ে গেল। বাহিনীর অপর সদস্যরা ১৬, ২২, ২৮ ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের অস্ত্র জমা দেবেন।

মঙ্গলবার প্রথম দলের সদস্যদের অস্ত্র জমা দেয়ার পর তাদের মনে হচ্ছিল একেবারে শান্ত সমুদ্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শান্তিবাহিনী যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল ১৯৭৬ সালে, এর মীমাংসায় গত ২ ডিসেম্বর যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কাল অস্ত্রসমর্পণের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটল এর একটি অধ্যায়ের। এ ব্যাপারে শান্তিবাহিনীর একজন আশাপূর্ণ চাকমা তাঁর এক সময়ের অধিকার আদায়ের হাতিয়ার দেখিয়ে বললেন, “এটা এখন অকেজো। আগেও দেশের মাটিতে ছিলাম। অস্ত্র ফেলে আবার স্বাভাবিক জীবনের একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে গেলাম।” আরেকজন দয়াশঙ্কর চাকমা বলেন, “আমরা বড় আশা নিয়ে ফিরে এসেছি। আশা করছি সবাই মিলেমিশে থাকতে পারব। বাংলাদেশ হবে আমাদের শান্তির সুবর্ণ দেশ।”

শান্তিবাহিনীর প্রথম দলটি গতকাল মোট ৪৬৩টি অস্ত্র ১,০৯৮টি গোলাবারুদ জমা দিয়েছে। অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে এসএলআর, জি-৩ রাইফেল, চায়নিজ রাইফেল, ৯ এমএম এসএমজি, গ্রী নট গ্রী এলএমজি, একে-৪৭ রাইফেল, স্টেনগান, রকেট লঞ্চার, মার্টার, টিমগান, দেশী বন্দুক। সস্ত্র লারমার অস্ত্রটি প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিক সেনাবাহিনীর হাতে তুলে নেন। এসব অস্ত্র আপাতত পুলিশের হেফাজতে থাকবে। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র বলেছে, সস্ত্র লারমা নিজে অস্ত্র বহন করতেন না। প্রতীকী একটি অটোমেটিক পিস্তল তাঁর জমা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফটোসাংবাদিকদের ছবির স্বার্থ বিবেচনা করে তাঁর জন্য বাহিনীর জমা দেয়া একটি চায়নিজ এসএমজি নির্বাচন করা হয়। অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে সস্ত্রকে কখনও হাসিখুশি, কখনও গম্ভীর দেখায়। তাঁর এক সহকর্মী বলেছেন, কয়েকদিন থেকে তিনি মানসিকভাবে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে আছেন। প্রয়াত, মানবেন্দ্র লারমার স্মৃতিত্যাগিত হয়ে আছেন জনসংহতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সস্ত্রর বড় ভাই মানবেন্দ্র লারমা ১৯৮৩ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হন।

মঙ্গলবার সকাল ৯টার মধ্যে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তবে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সচিব, কর্মকর্তা, কূটনীতিকসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ভেন্যুতে পৌঁছেছেন সকাল ১০টার পর। পুরো স্টেডিয়াম বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হয়েছিল। মঞ্চের মুখোমুখি গ্যালারিতে আকাশী রঙের কাপড়ে সাদা হরফে বাংলায় লেখা ছিল—‘মাননীয় শেখ হাসিনার নিকট জনসংহতি সমিতির অস্ত্র জমা দান অনুষ্ঠান’। প্রধানমন্ত্রী আসার আগে থেকেই যন্ত্রসঙ্গীতে দেশের গান বাজান সেনাবাহিনীর বাদক দল। শেফালী ঘোষ, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণবসহ অন্যরা দরাজ গলায় গাইলেন চট্টগ্রামের জনপ্রিয় আঞ্চলিক গান, ‘লুসাই পাহারুন্তন নামি আই যারগাই কর্ণফুলী’ (লুসাই পাহাড় থেকে নেমে নেমে এসেছে কর্ণফুলী নদী)। সৈয়দ হাসান ইমাম, আবেদ খান, শাহরয়ার কবির, আলী যাকের, ডঃ হারুনুর রশীদ প্রমুখ অনুষ্ঠানটির ধারা বর্ণনা করেন টেলিভিশনে। ১১টায় শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার তালুকদারের নেতৃত্বে মাঠে প্রবেশ করেন বাহিনীর সদস্যরা। সুধাসিন্ধু খীসা, রজোৎপল ত্রিপুরা এই প্রবেশ পর্বের তদারকি করেন। জলপাই রঙের পোশাক পরিহিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা মাঠে প্রবেশ করতেই করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে সারা স্টেডিয়াম। প্রথম এসেছেন নিরস্ত্র সদস্যরা। একই রঙের প্যান্টে ইনকরা সার্ট পরনে ছিল তাঁদের। বেশির ভাগ সদস্যের পায়ে রাবারের কালোজুতা, সাদা পিটি সুও পায়ে ছিল কারও কারও। উষাতন পরেছিলেন সাধারণ পোশাক। সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট। বাহিনীর সদস্যদের বেশির ভাগের মুখ ছিল মলিন। লাইনে কেউ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে, কেউ মার্চ করে গিয়ে তাঁদের জন্য নির্ধারিত চেয়ারে গিয়ে বসেন। সুশৃঙ্খলভাবে প্রথম যাঁরা এসেছেন তাঁরা গিয়ে বসেছেন পিছনের সারিতে। সবশেষে আসেন সশস্ত্র সদস্যরা। তবে তাঁদের অস্ত্রে গুলি ছিল না। সোমবার সমাবেশকেন্দ্রে পৌঁছার পরই এসব অস্ত্র থেকে গুলি বের করে নেয়া হয়। সশস্ত্র সদস্যরা বসেন সামনের সারিতে। অস্ত্র তখন মাটিতে ঠেস দিয়ে কাঁধে হেলান দিয়ে রাখা ছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে নিষেধ থাকায় কেউ কেউ শুধু নাম বলেছেন। সর্বশেষ দুদুকছড়ি ক্যাম্প ইনচার্জ শান্তিময় চাকমার সঙ্গে জনকণ্ঠ প্রতিনিধির দেখা হয়েছিল গত রবিবার দুপুরে দুদুকছড়িতেই। মঙ্গলবার দেখা হতেই হেসে হাত বাড়িয়ে দেন। কুশল বিনিময় করেন। বেলা সোয়া ১১টায় সস্ত্র লারমা আসেন স্টেডিয়ামে। লিয়াজোঁ কমিটির জন্য রাখা চেয়ারে তিনি গিয়ে বসেন। চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহও গিয়ে বসেন সেখানে। তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করেন। কথাবার্তা বলেন। তখনই মূল মঞ্চের মুখোমুখি গ্যালারিতে প্রতিবাদের ঘটনায় সারা স্টেডিয়ামের নজর সেদিকে চলে যায়। পার্বত্য

গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের চুক্তিবিরোধী অংশ সেখানে নানা পোষ্টার, ব্যানার দেখিয়ে প্রতিবাদ প্রকাশ করে। পুলিশের সঙ্গে সেখানে তাদের হাতাহাতিও হয়। ১১টা ৫৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী পৌছেন মঞ্চে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, চীফ হুইপ তাঁকে হেলিপ্যাড থেকে অভ্যর্থনা করে আনেন। সেখানে ছোট দু'জন শিশু ফুলের তোড়া উপহার দেয় প্রধানমন্ত্রীকে। সাদা পাড় সবুজ জমিনের শাড়ি পরিহিত প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে দাঁড়িয়েই তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সবাইকে সম্ভাষণ জানান। শান্তিবাহিনীর সদস্যসহ পুরো দর্শকসমাজ দাঁড়িয়ে সম্মান জানান প্রধানমন্ত্রীকে। জাতীয় সঙ্গীত শুরু হলে আবার দাঁড়িয়ে যান সবাই। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ান অস্ত্র অবনত করে। কোরান, ত্রিপিটক, গীতা, বাইবেল থেকে পড়ে শোনানো হয় নির্বাচিত অংশ। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপবিষ্ট ছিলেন স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, টাস্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, সাংসদ বীর বাহাদুর, সেনা বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, চট্টগ্রামের জিওসি ফজলুল কবির, সাবেক যুগ্মসচিব এসএস চাকমা। মন্ত্রী কল্পরঞ্জনের পাশের চেয়ারটি খালি রাখা হয়েছিল সম্ভ্র লারমার জন্য।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি রাখা মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুরু হয় বেলা ১২-১০ মিনিটে। প্রায় ৪০ মিনিটের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী স্বভাবসুলভ লিখিত বক্তব্যের বাইরেও আবেগঘন তাৎক্ষণিক বেশ কিছু কথা বলেন তাঁর নিজস্ব। বক্তৃতার শেষে প্রধানমন্ত্রী সম্ভ্র লারমাকে অস্ত্রসমর্পণের আহ্বান জানান। চীফ হুইপ মঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে এগিয়ে আনেন লারমাকে। শান্তিবাহিনীর সব সদস্য তখন আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান তাঁদের নেতার সম্মানে। সম্ভ্র প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেন একটি চায়নিজ এসএমজি। সারা স্টেডিয়াম তখন করতালিমুখর। ফটোসাংবাদিকদের ফ্ল্যাশগান বিলিক-বিলিক জ্বলে ওঠে বার বার। তাঁদের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী মঞ্চ থেকে সম্ভ্রকেসহ নেমে দাঁড়ান ক্যামেরার সামনে। প্রধানমন্ত্রী সম্ভ্রকে দেন সাদা একগুচ্ছ গোলাপের স্তবক। শান্তির পায়রা উড়িয়ে দেন আকাশে। বড় একটি বেগুনের সাথে ছোট অনেক বেগুনের নিচে বাঁধা ‘শান্তি চিরন্তন হোক’ লেখা ব্যানার আকাশে উড়িয়ে দেয়া হয়। সারা স্টেডিয়াম থেকে একই সঙ্গে ওড়ানো হয় অসংখ্য বেগুন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যরা মঞ্চে ফেরার পর সেনাবাহিনী প্রধানসহ অন্য কর্মকর্তারা সম্ভ্রর সঙ্গে কোলাকুলি করেন। শান্তিবাহিনীর অপর ৭৩৯ সদস্য এক লাইনে হেঁটে গিয়ে জমা দেন তাঁদের অস্ত্র। মাঠের দু'পাশে রাখা র্যাকে তাঁরা হাতের

অস্ত্র হেলান দিয়ে রাখেন। নিরস্ত্র সদস্যরাও একই সময়ে লাইনে হেঁটে গিয়ে র্যাক এলাকা ঘুরে আবার এসে বসেন আসনে। সেনাবাহিনীর ব্যান্ডে তখন বাজছিল দেশাত্মবোধক গানের সুর—‘সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তে তুমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি’। শামীম আরা নীপার পরিচালনায় শিল্পকলা একাডেমী ও তিন পার্বত্য জেলার শিল্পীরা এ সময় ‘এসো ভাইয়ের পাশে ভাই, একসাথে দাঁড়াই’ গানের সুরে সুরে অংশ নেন আনন্দ নৃত্যে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন আজাদ রহমান। অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী, চীফ হুইপ সম্ভ্রসহ অন্যদের নিয়ে র্যাকে জমা অস্ত্র দেখতে যান। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তাঁকে সে সময়ে খুবই উৎফুল্ল দেখায়। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থল ছেড়ে যাবার পর সাংবাদিকরা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের জন্য মন্ত্রী-নেতাদের ছেকে ধরেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা দমন করা হবে ॥ প্রধানমন্ত্রী

পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ী-বাঙালী

মিলেমিশে থাকবেন, কোন বাঙালীকে

প্রত্যাহার করা হবে না

মোয়াজ্জেমুল হক, খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে ॥ দীর্ঘক্ষণ গণনা শেষে বহুপ্রতীক্ষিত শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের শুরুতে আয়োজিত জমকালো সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য সমুন্নত রেখেই পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিষয়ে কারও মনে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচীন নয়।

মঙ্গলবার সকালে গভীর সবুজ অরণ্য বেষ্টিত পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির নবনির্মিত স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান পর্বের আগে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কঠোর ঘোষণা করেন, চুক্তিতে পাহাড়ী-বাঙালী সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সকলেই একসাথে থাকবেন, কোন বাঙালীকে বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হবে না।

অস্ত্রসমর্পণের এ দিনটি বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাহাড়ী-অপাহাড়ী উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীর্ঘদিনের ইতিহাস রয়েছে। যে কারণেই হোক আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। শান্তিবাহিনী প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সদস্য আজ অস্ত্র ও

গোলাবারুদ জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন। আমি তাদের স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁদের বরণ করে নিচ্ছি অন্তরের গভীরতম ভালবাসায়। আজকের এ অস্ত্র জমাদান পর্ব আমাদের দেশের ইতিহাসে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নবদিগন্তের সূচনা করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আশা করি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী-অপাহাড়ী উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিতে কোনরূপ অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা কঠোর হাতে দমন করা হবে। এ সরকার সকল নাগরিকের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আবেগাপ্ত কণ্ঠে শেখ হাসিনা বলেন, দীর্ঘ দু'দশকের বেশি সময়ের ভ্রাতৃঘাতী হানাহানিতে কত মা পুত্র হারিয়েছে, স্বামীহারা হয়েছে কত নারী, আত্মীয়স্বজনের রক্তে রঞ্জিত এ জনপদ। ভারাক্রান্ত হয়েছে আকাশ বাতাস। আজ থেকে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অতীতের দুঃখজনক ঘটনাবলী এবং তিজ্ঞ অভিজ্ঞতার কথা আমরা ভুলে যেতে চাই। তিনি আহ্বান জানান, এসব কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাকে অতীতের বিষয় হিসাবে গণ্য করে ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধ এক নতুন জীবনের প্রত্যাশায় আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে কাজ করি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রায় ৪২ মিনিটব্যাপী বক্তৃতায় পার্বত্য শান্তি চুক্তির দীর্ঘ পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, অতীতের সরকারগুলো পার্বত্য সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করেছে এবং কখনও কখনও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এর সমাধান চেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি ছিল মূলত একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আমিই প্রথম '৮২ সালে এই সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে ঘোষণা করি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাই। আমরা সরকার গঠনের পর এ কাজে সফল হয়েছি। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বিরোধী দল বিএনপি'র নাম উল্লেখ করে বলেন, এ দল এবং কয়েকটি সমমনা দল অযৌক্তিকভাবে ভুল তথ্যনির্ভর এবং একপেশে বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে। তিনি তাদের অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে আসার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামকে সকল দিক থেকে উন্নয়নের আদর্শ এলাকা হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এ সরকার। ইতোমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে ১৬৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা। পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট ২ হাজার ১৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংঘাত নয় শান্তি চাই, ধ্বংস নয় সৃষ্টি চাই, পশ্চাৎপদতা নয়, অগ্রগতি চাই। কবির ভাষায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক'। নতুন পথের যাত্রী আমরা নতুন শতাব্দীকে শান্তির বার্তা নিয়ে বরণ করতে চাই।

বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের অধিকাংশ সদস্য, সাংসদ, কূটনীতিক, দেশী-বিদেশী দু'শতাধিক গণমাধ্যম সদস্য, উর্ধ্বতন সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী কর্মকর্তা এবং সন্ত্রাস লারমাসহ জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

চট্টগ্রাম বিভাগে হরতাল ৯ কয়েকটি

জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে, দুয়েকটি

স্থানে সংঘর্ষের মধ্যে পালিত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বিভাগে বিএনপি ও সমমনা সাতদল আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতালে জনগণের উল্লেখযোগ্য সাড়া মেলেনি। কয়েকটি জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে এবং দু'য়েকটি জেলায় সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আংশিক হরতাল হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগ ছাড়া দেশের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে বিরোধী দল কর্তৃক মিছিল সমাবেশের খবর পাওয়া গেছে।

হরতাল চলাকালে লক্ষ্মীপুরে বিএনপি-আওয়ামী লীগ সংঘর্ষে ১০ ব্যক্তি আহত হয়েছে। রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হলেও তা ছিল নিস্প্রাণ।

চট্টগ্রাম থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির অস্ত্রসমর্পণের প্রতিবাদে বিএনপি ও সমমনা দল আহূত চট্টগ্রাম বিভাগে হরতালে জনগণের সাড়া মেলেনি। নগরীতে যানবাহন চলাচল ছাড়া সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। বিএনপি আহূত পূর্ণ দিবস এ হরতাল ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। হরতালের কারণে নগরবাসীর অস্ত্রসমর্পণের সরাসরি সম্প্রচারিত বিটিভির অনুষ্ঠান দেখতে সুবিধা হয়েছে।

মঙ্গলবার হরতাল চলাকালে রেল ও নৌ যোগাযোগ স্বাভাবিক ছিল। সড়ক পথে দূর পাল্লার যানবাহনগুলো চলাচল করেনি। নগরীতে রিক্সা চলাচল করেছে স্বাভাবিকভাবে। খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া সব গাড়িই নিরাপদে পৌঁছেছে। একইভাবে ফেরতও এসেছে। হরতালের সময় অফিস-আদালতে উপস্থিতি কম ছিল। ব্যাংক ও বাণিজ্য পাড়া নীরব ছিল।

রেল কন্ট্রোল জানিয়েছে, সবক'টি ট্রেন যথাসময়ে আসা-যাওয়া করেছে। কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। রাজপথে হরতালের পক্ষে কোন পিকেটার ছিল না, গুলি-বোমার আওয়াজ হয়নি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সামান্য ব্যাহত হয়। খাগড়াছড়ি থেকে বিটিভি সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় রাজপথ ফাঁকা হয়ে যায়। লোকজন ঘরে বসে টিভি অনুষ্ঠান দেখতেই ব্যস্ত ছিল।

বিএনপি-ছাত্রদল হরতালের সমর্থনে সমাবেশ করেছে। ওয়াহিদুল আলম এমপি, দস্তগীর চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ সমাবেশগুলোতে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা অস্ত্রসমর্পণের অনুষ্ঠানকে নাটক অবিহিত করে চট্টগ্রামবাসী তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে দাবি করেছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার নতুন করে অশান্ত করছে বলে তাঁরা অভিযোগ আনেন। পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাভাষীকে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত বলেও তাঁরা বক্তব্য রাখেন। সমমনা দলগুলোও পৃথক সমাবেশ করেছে।

এদিকে মঙ্গলবার নগরীতে সম্ভাব্য যেকোন সংঘাত দমনের জন্য পুলিশ বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়। বিডিআর স্কোয়াড ছিল স্ট্যান্ডবাই। খাগড়াছড়ি সড়কে বিশেষ নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত ছিল।

রাস্তামাটি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, রাস্তামাটিতে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছে। তবে শহরে হরতালকারীদের তৎপরতা তেমন চোখে পড়ার মতো ছিল না। সকালে শহরে হরতালের সমর্থনে দুটি খণ্ড মিছিল হয়। সকালে দোকানপাট বন্ধ থাকলেও বিকালে খোলা ছিল।

লক্ষ্মীপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, লক্ষ্মীপুরে আংশিক হরতাল হয়েছে। হরতাল চলাকালে লক্ষ্মীপুরে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ১০ ব্যক্তি আহত হয়েছে। সকালে হরতাল সমর্থক শহরের বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করে। বেলা এগারোটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরিত হয়। হরতালের সময় মাকারী চন্দ্রগঞ্জ ও দক্ষিণ তেমুহনীতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে ১০ ব্যক্তি আহত হয়।

কক্সবাজার থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে মঙ্গলবার কক্সবাজারে আংশিক হরতাল পালিত হয়েছে। হরতাল চলাকালে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ ছিল। অফিস আদালতে উপস্থিতির হার ছিল স্বাভাবিক। ব্যাংকগুলোতে লেনদেন হয়নি। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল খোলা। জেলার সর্বস্তরের মানুষ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছিল টেলিভিশনমুখী। হরতাল সমর্থক ৩ যুবক সকাল ১০টার দিকে কক্সবাজার সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে হরতাল চলাকালে চকরিয়া থানা সদরে হরতাল সমর্থক কয়েকজন কর্মী সকাল ১১টার দিকে থানা রাস্তার মোড়ে ৩টি জীপ, ১টি বেবি ট্যাক্সি ও কয়েকটি রিক্সা ভাংচুর করে। কিছুক্ষণ পর তারা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ইসলাম ট্রেডিং কনসোর্টিয়াম অফিসে হামলা চালায়। এ সময় দুই কর্মকর্তাসহ ৮ কর্মচারীকে নাজেহাল ও মারপিট করা হয়। কুমিল্লা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কুমিল্লায় শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়েছে। হরতাল চলাকালে অফিস আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

নোয়াখালী থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, পার্বত্যঞ্চলে শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে নোয়াখালীতে হরতাল পালিত হয়েছে। সকাল ১০টার দিকে হরতালের সমর্থকরা কয়েকটি টেম্পো ভাংচুর করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিএনপি বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

জয়পুরহাট থেকে সংবাদদাতা জানায়, শহরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে জেলা বিএনপি শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদসভার আয়োজন করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

‘পাহাড়ী জনগণের সঙ্গে

সম্মিলন প্রতারণা করেছে!’

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের তিনটি সংগঠন সম্মিলন প্রতারণা নতুন শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে; পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসবে না। তিন সংগঠনের নেতারা মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে একথা বলেছেন।

সংগঠনগুলো হলো পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইম্যান্স ফেডারেশন। পাহাড়ী গণপরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত খীসা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রেসিডেন্ট দীপ্তি শঙ্কর চাকমা ও হিল উইম্যান্স ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কবিতা চাকমা এ যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, অস্ত্রসমর্পণের মাধ্যমে সম্মিলন প্রতারণা পাহাড়ী জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

অস্ত্রসমর্পণ নয়, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি আনতে পারে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। তাঁরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে বলেছেন, অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
সবাই উৎফুল্ল ও আশাবাদী

মনিরুল ইসলাম মনু, খাগড়াছড়ি থেকে ॥ অস্ত্র জমার প্রথম পর্বের পর নানা জন তাঁদের আনন্দ উল্লাসের কথা জানিয়েছেন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়। ঢাকাস্থ কূটনৈতিক কোরের ডিন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রদূত শাহতা জারের পুরো বিষয়টিকে ‘গ্রেট ভিক্টরি’ আখ্যা দিয়ে বলেন- পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে ফিলিস্তিন চুক্তির সাথেই তুলনা করা চলে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বললেন, জাতির আজ খুবই আনন্দের দিন, সাফল্যের দিন। অস্ত্রসমর্পণ শুরু হওয়ায় আমি খুশি, খুবই খুশি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বলেন- এটি জাতির জন্য আনন্দদায়ক ঘটনা। শান্তিবাহিনীর প্রকৃত সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বললেন- ২৮ ফেব্রুয়ারি অস্ত্র জমাদান শেষ হবার পর এটা জানা যাবে। স্টেডিয়ামে শান্তি চুক্তি বিরোধী পাহাড়ীদের বিক্ষোভ সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন, একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধেরও অনেকে বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু আমরা সফল হয়েছি। জনসংহতির নেতা সন্ত লারমা বললেন, খুব ভাল লাগছে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমার যে অনুভূতি হয়েছিল আজকের অনুভূতি তারই অনুরূপ। সরকার আন্তরিকভাবেই শান্তি চুক্তি করেছে। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পার্বত্য সমস্যার সমাধান হবে। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বলেন, ৬ বছর ধরে আমি এই সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আছি। আওয়ামী লীগ সরকার সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা দেয়ায় সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। সমাধান হবে জানতাম, তবে এতটা সফল হব তা ভাবতেও পারিনি। খাগড়াছড়ির পৌরসভা চেয়ারম্যান আবুল কাশেম বলেন- দীর্ঘদিনের সমস্যার প্রত্যাক্ষিত সমাধান হতে যাচ্ছে। এত লোক অস্ত্রসমর্পণ করেছে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা এ কালের স্মরণীয় একটি ঘটনা। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল আলম বলেন, দীর্ঘদিনের কাক্ষিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নই আজকের অনুষ্ঠান। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানের দর্শকের সারিতে বসা গৃহবধূ তাহেরা বেগম বললেন- এত খুশির অনুষ্ঠান জীবনে দেখিনি। অস্ত্রসমর্পণ উপলক্ষে হাজার মানুষের ভিড়ে কাল বিশেষ একটি দিন গেছে খাগড়াছড়ির রিক্সা চালকদের। শহর থেকে জনপ্রতি তাঁরা দশ টাকা হারে যাত্রীদের আনা নেয়া করেছেন। এমন এক চালক সোহরাব মিয়া (৩৫) বললেন- ‘ঘটনা এত খুশির আগে বুঝি নাই। আগে খালি কইছে চুক্তি হইলেই মারামারি হইবো। কোন বাঙালী থাকবার পারবো না। এখন দেখতাছি সব ভুয়া। চালবাজি।’

দৈনিক জনকণ্ঠ
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
রক্তাক্ত তমসার প্রহর পেরিয়ে
পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির শ্বেতশুভ্র সূর্যোদয়

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ প্রায় আড়াই দশকের অশান্তি ও অস্থিরতার রক্তাক্ত তমসার প্রহর পেরিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির শ্বেতশুভ্র সূর্যোদয় ঘটেছে মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। এ স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ জন মন্ত্রীর এক বহর নিয়ে। রক্তে রঞ্জিত পার্বত্য জনপদের হিংসাত্মক সকল ঘটনার অবসান ঘটিয়ে নজিরবিহীন আনন্দঘন পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা ও তাঁর বাহিনীর ৭৩৯ সদস্য অস্ত্রসমর্পণ করে সূচনা করল এক নবঅধ্যায়ের। স্টেডিয়াম অভ্যন্তরের প্রায় ৪০ হাজার অতিথি ও দেশ-বিদেশের কোটি কোটি টিভি দর্শক পুলকিত মনে উপভোগ করল জমকালো এ অনুষ্ঠান। উল্লসিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার দৃঢ় প্রত্যয়ে হাস্যোজ্জ্বল সন্ত লারমা যৌথ হাতে উড়িয়ে ছিলেন বিশালাকৃতির একটিসহ একঝাঁক বেলুন। সারা স্টেডিয়াম থেকে পত পত করে উড়ে গেল শান্তির প্রতীক অজস্র পায়রা। সেনাবাহিনীর চৌকস দল ততক্ষণে ব্যান্ডে তুলেছে ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’ গানের সুর মূর্ছনা। স্টেডিয়াম জুড়ে তখন চলাছে মুহূর্তে মুহূর্তে করতালি। পার্বত্য এলাকার ইতিহাসে সূচিত হলো অভূতপূর্ব, কাক্ষিত স্বপ্নের আলোক উদ্ভাসিত উন্মোচন। ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ার আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ প্রচার মাধ্যমে দর্শকগণ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন পাহাড়ের বুকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ধ্যা। পাহাড়ী বরনায় যেন বয়ে যাচ্ছে আনন্দের অমৃতধারা। শান্তি ও মৈত্রীর আনন্দধারায় স্নাত পাহাড়ের চিরসবুজে বুলিয়ে দিল শান্তির পরশ। সুদীর্ঘ সময়ের ধূমায়িত অসন্তোষ, হাজার মানবের আত্মদান, অসংখ্য জীবনের আত্ননাদ পার্বত্য ইতিহাসের অধ্যায়কে করেছে ভারাক্রান্ত। এতে রচিত হলো রক্তের হোলিখেলার নিরসনের নতুন পর্ব।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে
তিন পাহাড়ী সংগঠনের প্রতিবাদ

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে ॥ মঙ্গলবার খাগড়াছড়িতে হরতাল হয়নি। হরতাল আহ্বানকারী বিএনপিসহ সাত দলের নেতা-কর্মীদের কোন

তৎপরতাও চোখে পড়েনি। তবে অঙ্গসমর্পণ অনুষ্ঠানের ভেন্যুতেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখিয়েছে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের শান্তি চুক্তি বিরোধী অংশ। আবার এই তিন সংগঠনের চুক্তির পক্ষের অংশ একই সময়ে সাদা পতাকা প্রদর্শন করে আনন্দ প্রকাশ করেছে। বেলা সোয়া ১১ টায় চুক্তিবিরোধীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সারা স্টেডিয়ামে আলোড়নের সৃষ্টি করে। তারা উঠিয়ে ধরে একটি লাল রংয়ের ব্যানার। তাতে লেখা ছিল আপোস চুক্তি মানি না, পূর্ণস্বায়ত্ত্ব শাসন চাই। ইংরেজীতে লেখা বেশ কিছু পোষ্টার, কালো সোয়েটার, ওড়না দেখিয়েও তাঁরা প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন। এসব পোস্টারে লেখা ছিল উই ডিমান্ড ফুল অটোনমি ফর পিচ ইন সি এইচটিসহ আরও কিছু দাবির কথা। বিক্ষোভকারীরা উচ্চস্বরে শ্লোগান দিতে শুরু করলে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক, সাংবাদিকদের নজর তাদের দিকে নিবিষ্ট হয়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করলে অনেক ভয়ভাঙিত হয়ে ছুটছুটি শুরু করেন। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করেন। সংগঠনের পক্ষে তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে বাধা সৃষ্টির নিন্দা করা হয়েছে পরে এক বিবৃতিতে। উল্লেখ্য, শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে বিএনপি, জামায়াত সমর্থিতদের আন্দোলনে ভাটা পড়লেও পার্বত্য এলাকায় এই তিন সংগঠনের ভূমিকা এখন জোরাল হচ্ছে। সোমবার রাতে তাঁরা খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে কঠোর নিরাপত্তার ভিতরও এসে তাঁদের একটি বড় পোস্টার লাগিয়ে যান। নিরাপত্তা কর্মীরা তা পরে তুলে নিয়ে যান। সোমবার তাঁরা একাধিক তোরণের ক্ষতিসাধন করেন। এছাড়া পাহাড়ী বিভিন্ন গ্রামে তাঁরা দুলু (টাকা রাখার ঝুলির পাহাড়ী নাম) ঝুলিয়ে রেখেছে। পাহাড়ী সমাজে এই দুলু ঝুলানোকে দালালীর প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তিউত্তর উন্নয়ন কার্যক্রমে

অস্ট্রেলিয়া সাহায্য করবে ৥ আলেকজান্ডার ডাওনার

কূটনৈতিক রিপোর্টার ৥ দুই দিনের সফরে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকায় পৌঁছে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাওনার বলেন, আমার সফরের উদ্দেশ্য দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা। আমরা চাই বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের আরও বিকাশ ঘটুক। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ আরও বাড়তে চায়, বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে চায়, যা এখন খুবই ভাল অবস্থায় রয়েছে। বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সামাদ আজাদ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, অস্ট্রেলিয়া আমাদের প্রয়োজনের বন্ধু এবং কাজের বন্ধু। বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দু'দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক আনুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়েই কথা হয়।

বৈঠকে মিঃ ডাওনার পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তিউত্তর উন্নয়ন কার্যক্রমে অস্ট্রেলিয়া সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীতে অস্ট্রেলিয়া সাহায্য অব্যাহত রাখবে। অস্ট্রেলিয়া অতিরিক্ত আরও ২৪ জন ছাত্রকে স্কলারশিপ প্রদান করবে; সেই সঙ্গে বাংলাদেশের দু'জন তরুণ ক্রিকেটারকে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট একাডেমীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের আলেকজান্ডার ডাওনার বলেন, আমরা খুবই উষ্ণ আন্তরিক আলোচনা করেছি। আমরা এদেশে একটি শক্তিশালী উন্নয়ন কর্মসূচী চালিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশে বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগকারীরা খনিজ-জ্বালানি এবং কৃষি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশে একটি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠনের ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দেবার কথা ভাবছে।

সমাজ আজাদ বলেন, খুবই অর্থপূর্ণ এবং কার্যকর আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, দ্বিপাক্ষিক বিষয় ছাড়াও আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও কথা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক আশরাফ-উদ-দৌলা বলেন, মিঃ ডাওনার বৈঠকে গঙ্গা পানি চুক্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি এবং ত্রিদেশীয় বাণিজ্য সম্মেলনের পদক্ষেপ নেয়ায় সরকারের প্রশংসা করেন।

ডাওনার ধারণা দেন, অস্ট্রেলিয়া একটি উদার বাণিজ্য নীতি প্রণয়নের পথে, এতে বাংলাদেশী রফতানিকারকরা উৎসাহিত হতে পারেন।

বাংলাদেশ সরকার যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করে তাহলে অস্ট্রেলিয়া তাতে সাহায্য করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে ভারত মহাসাগর উপকূলবর্তী দেশগুলোর সংস্থা ইন্ডিয়ান ওসেন রিমে সদস্য পদ লাভের জন্য সমর্থন দিয়ে আসবে বলে তিনি জানান।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহাখালীর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক অনুদান ৩ লাখ ২৫ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলারের চেকও হস্তান্তর করেন। আইসিডিডিআরবির ডিরেক্টর ডঃ রবার্ট সুসকিন্দ তাঁকে গবেষণা কেন্দ্রে স্বাগত জানান। এছাড়া ১ লাখ ডলারের আরেকটি চেক ক্লিনিক সার্ভিস ও শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য প্রদান করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানকে স্বাগত! আনন্দের
জোয়ার আর স্লোগানে স্লোগানে মুখর মহানগর

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এ অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। বিভিন্ন সংগঠন বের করে আনন্দ মিছিল। এসব মিছিলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি বহন করা হয়। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপথ। বাদ্যের তালে তালে রাজপথে মিছিলকারীদের নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সোসাইটির উদ্যোগে বিজয় মিছিল বের হয় সায়েদাবাদ থেকে। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গের বিশাল মিছিলে নেতৃত্ব দেন সোসাইটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এমএ সামাদ সরকার। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য শান্তি মিছিল আয়োজন করে ছাত্রলীগ। মিছিলে ‘ধন্য পিতার ধন্য কন্যা’ পার্বত্য সমস্যার সমাধান, শেখ হাসিনার অবদান’ প্রভৃতি স্লোগান দেয়া হয়। ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রদক্ষিণের পর এ শান্তি মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা সমবেত হয়ে অপরাজেয় বাংলার সামনে। এখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু লোক ও তাদের নেতা-নেত্রীরা আবোল-তাবোল বকছেন। তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পান্না বলেন, আসুন শান্তির পতাকাতলে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি। সমাবেশে বক্তৃতা করেন মনিরুজ্জামান মনির, আখতার হোসেন, সুজিত রায় নন্দী, নজরুল ইসলাম বাবু, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন প্রমুখ।

ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করে। ঢাকা মহানগর আওয়ামী যুব লীগের (দক্ষিণ) একটি আনন্দ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণকে স্বাগত জানিয়েছে। জাসদ সভাপতি আসম আব্দুর রব ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু এক বিবৃতিতে বলেন, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অস্ত্রসমর্পণ একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের আরও অনেক কিছু করণীয় আছে।

অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে আরও যারা বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁরা হলেন ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা এমএ কুদ্দুস ও মহাসচিব মাওলানা জিয়াউল হাসান, বঙ্গবন্ধু আদর্শ বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি ডাঃ এসএম ইফতেখার। জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতির সভাপতি আইনুল হক সোহেল, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আইডি রহমান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি আলহাজ মাওলানা একেএম নূরুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া সোনারগাঁ ফাউন্ডেশনের এক আলোচনাসভায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মীর আফতাব উদ্দীন আহমেদ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ঘরে ফেরাকে
কেন্দ্র করে পাহাড়ী গ্রামগুলোতে
বইছে আনন্দের ফল্গুধারা

ফজলুল বারী/ জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে ॥ অস্ত্রসমর্পণের একদিন পরেই স্বগ্রামে ফিরে গেলেন শান্তিবাহিনীর ৫২৪ সদস্য। প্রথম দফায় মঙ্গলবার যে ৭৩৯ জন অস্ত্র জমা দিয়েছেন তাদের অবশিষ্ট ২১৫ জন আজ বৃহস্পতিবার ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে ফিরে যাবেন যার যার গ্রামের বাড়িতে। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা নিয়ে পাহাড়ী গ্রামগুলোতে যেন আনন্দের বান ডেকেছে। শুরু হয়েছে আনন্দ-আবেগের বিশেষ মিলন উৎসব। মঙ্গলবার বাহিনীর প্রথম দলের যে ৪৬৩টি অস্ত্র, ১০৯৮ গোলাবারুদ জমা পড়েছে বুধবার পর্যন্ত তা সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কমান্ডারের হেফাজতে ছিল। জেলা প্রশাসক একেএম জাফরুল হোসেন বলেছেন, তিনি এসব অস্ত্র, গোলাবারুদ পুলিশের মালখানায় জমা নেবার জন্য চিঠি লিখেছেন ব্রিগেড কমান্ডারকে। জনসংহতি সমিতি, শান্তিবাহিনীতে বেশ কিছু মহিলা সদস্যও ছিলেন। তবে সমিতির নেতা সুধাসিন্ধু খীসা বুধবার জনকণ্ঠকে বলেছেন তারা তাদের সর্বশেষ সক্রিয় এক মাত্র সদস্যের নাম জমা দিয়েছেন সরকারের কাছে। ইনি দেশে ফিরে আসবেন ১৮ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রসমর্পণের শেষ দিনে দুদকছড়ি সমাবেশ কেন্দ্রের মাধ্যমে। জানা গেছে, এই মহিলা যোদ্ধার নাম লতিকা চাকমা। পঞ্চগশোর্ধ এই মহিলা চিরকুমারী। জনসংহতির আন্দোলন সংগ্রামের জন্য বিয়ে থা করেননি। খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার কমলছড়ি গ্রামে তাঁর বাড়ি।

পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে সদস্যদের প্রয়োজনে এক মাস থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও অস্ত্রসমর্পণের পর কেউ আর সেখানে থাকতে চাননি। সবার তাড়া বাড়িতে স্বজনের মাঝে ফিরে যাবার জন্য। বুধবার ট্রানজিট ক্যাম্পে মঙ্গলবার আত্মসমর্পণকারী সকল সদস্যেরই অস্ত্রদানের টাকা হস্তান্তরের পালা শেষ হয়েছে। অস্ত্র জাম দিয়ে সাধারণ জীবনে ফিরে আসার সম্মানী হিসাবে শান্তি চুক্তির শর্তে প্রত্যেককে দেয়া হয়েছে ১০০টি ৫০০ টাকার নোটে নগদ ৫০ হাজার টাকা। ৭৩৯ জনকে এর জন্য দেয়া হয়েছে মোট টাকা ৩ কোটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার। দুপুরের খাবারের পর এদের প্রত্যেককে কড়া প্রহরায় ভাড়া করা গাড়িতে করে স্ব-স্ব থানার পুলিশ স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বুধবার খাগড়াছড়ি সদর থানার ৫৮ জন, মহালছড়ির ১২৫ জন, দিঘিনালার ১০৭ জন, মাটিরাঙ্গার ১১৮ জন, পানছড়ির ৮১, বাঘাইঘাটের ৩৫ জন ফিরে গেছেন স্ব-স্ব বাড়িতে। মঙ্গলবার অস্ত্রসমর্পণ করলেও জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্ত লারমা অনুদানের টাকা নেননি। সমিতির কেন্দ্রীয় অন্যান্য নেতার কাছে ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি ফিরে আসবেন প্রকাশ্যে জীবনে। উল্লেখ্য, সন্ত অস্ত্রসমর্পণের পরেই পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্প ঘুরে ফিরে গেছেন দুদুকছড়ির গোপন ডেরায়। ১৬, ২২, ২৮ ফেব্রুয়ারিতে পরবর্তী অস্ত্রসমর্পণ হবে। বাকি তিন দফা অস্ত্রসমর্পণ তদারকির জন্য জনসংহতির দুই নেতা সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা সরকারী অতিথি হিসাবে এখনও খাগড়াছড়িতে অবস্থান করছেন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক বুধবার জানান, সন্ত লারমার জমা দেয়া অস্ত্রটি যাদুঘরে রাখার জন্য খুব শীঘ্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। সন্ত একটি পিস্তল জমা দেবেন এমন কথাবার্তাই হয়েছিল। কিন্তু দুদুকছড়ির সমাবেশ ক্যাম্পে কোন পিস্তল জমা না পড়ায় পরে চায়নিজ এসএমজিটিই জমার জন্য ঠিক করা হয়। পেরাছড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের শৃঙ্খল আচরণ নজর কেড়েছে ক্যাম্প সংশ্লিষ্টদের। দুই নেতা সুধাসিন্ধু, রক্তোৎপলের কমান্ডে এদের সবাই আগাগোড়া শৃঙ্খলা রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন। বুধবার সকালে ট্রানজিট ক্যাম্পে গিয়ে তাদের বাড়ি ফেরার অপেক্ষার তাড়া চোখে পড়ে। স্বজনদের অনেকে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নেতার অনুমতি দিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে তারা স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এ সময় স্বজনদের চোখে ছিল আনন্দের অশ্রু। মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা সকালে ট্রানজিট ক্যাম্পের কাজকর্মের খোঁজ নিতে যান। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে ২শ' সদস্যের অনুদানের টাকা দেয়া শেষ হয়।

বাকিদের টাকা দেয়া শেষ হয়েছে বুধবার বিকাল ৩টার মধ্যে। জন্ডিসে অসুস্থ এক সদস্যকে সেখানকার অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে সেলাইন দেয়া হয়। তাঁর টাকারই পেমেন্ট হয়েছে। ট্রানজিট ক্যাম্পে সোনালী ব্যাংকের অস্থায়ী শাখা খোলা হলেও কোন সদস্য সেখানে এ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখেননি। সবাই তাদের টাকা নগদেই বুঝে নিয়েছেন। এই টাকার যাতে অপচয় না হয় সেজন্য তাদেরকে স্বনির্ভর ছোট ছোট স্কিম গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

দীর্ঘ দিনের সশস্ত্র নির্বাসন জীবন থেকে ঘরে ফেরার আনন্দে সংশ্লিষ্ট পাহাড়ী গ্রামগুলোতে এখন বইছে আনন্দের ফল্লধারা। স্বজনরা দলে দলে এসে দেখা করছেন তাদের আপনজনের সঙ্গে। কুশল বিনিময়ে একেকজন ভেঙ্গে পড়ছেন আনন্দের কান্নায়। খাগড়াছড়ি শহরতলীর নারাইনখাইয়া পাড়ার শিক্ষক হরিদাশ চাকমার বোনের জামাই কোয়েল ওরফে রূপায়ণ চাকমা কাল ফিরেছেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হরিদাশ বললেন, শান্তিবাহিনীর সদস্যের সঙ্গে বোনের বিয়ের পর থেকেই ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কখন না বোনটি আমার বিধবা হয়। ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদে শান্তি চুক্তি হয়েছে। বোনের স্বামীটি ফিরে এসেছে। এ আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা নেই। হরিদাশের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় আনন্দঘন পরিস্থিতি। কোয়েলকে ঘিরে স্বজনরা আনন্দ আলোচনায় মশগুল ছিলেন। বসে বসে পাহাড়ী হুঁকু ডাকবা টানছিলেন কোয়েল। প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেই সংক্ষেপে বললেন— খুব ভাল লাগছে। আশীর্বাদ করবেন যেন আমরা সবাই মিলেমিশে ভাল থাকতে পারি শান্তিতে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি ঐতিহাসিক ও
নজিরবিহীন ঘটনা ॥ অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ দুই দিনের সফর শেষে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাওনার বিমানবন্দরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি একটি ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিশেষত তৃতীয় কোন দেশের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এ ধরনের শান্তির উদ্যোগ বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিবাদ মেটাতে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়া সব সময় রাজনৈতিকভাবে যে কোন সংঘাত নিরসনের পক্ষে, সামরিক উপায়ে নয়। তিনি বলেন, শান্তি প্রক্রিয়া সংহত করার জন্য আমরা ঐ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কার্যকর সাহায্য-অবদান রাখতে চাই। কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়েই আমরা গুরু করতে চাই। গতকাল

বুধবার দুপুরে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে আলেকজান্ডার ডাওয়ার বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সামাদ আজাদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব এম আমিনুল ইসলাম এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তিবাহিনী সদস্যদের
নিরাপত্তা দিচ্ছে সেনাবাহিনী

মনিরুল ইসলাম মনু, খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে ॥ খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এলাকায় এখন ভিন্ন চিত্র। একদিন যারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, আজ তাদের একটি পক্ষ নিশ্চিত করেছে অপর পক্ষের নিরাপত্তা। দিবারাত্রি পালা করে চলছে প্রহরা। শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণকারী সদস্যরা যেখানে থাকছেন সে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল স্কুলের চতুর্পাশ ঘিরে রেখেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা। সাবেক শান্তিবাহিনীর সদস্যদের কেউ কেউ বাইরে বেরিয়ে এসে সেনা সদস্যদের সাথে কুশল বিনিময়ও করছেন। একদিন যাঁরা ছিলেন অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি, আজ তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সখ্য।

প্রত্যাগত শান্তিবাহিনীর দু'একজনের সাথে কথা হয়েছে। নাম বলতে চান না কেউই। তাঁরা অস্ত্রসমর্পণ করে একদিকে যেমন স্বস্তি বোধ করছেন, অন্যদিকে হতাশাও বাসা বেঁধেছে অনেকের মনে। একদিন যে বিশাল প্রত্যাশা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, সে প্রত্যাশার কতটুকু পূরণ হয়েছে—হিসাব মিলাতে পারছেন না কেউ। একজন বললেন, বেশ কিছু বছর তো জীবন থেকে খসে গেল, ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে পারিনি। কি জবাব দেব তাদের কাছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ ॥
প্রধানমন্ত্রীকে সমন্বয় কমিটির অভিনন্দন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির জাতীয় সমন্বয় কমিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দিত করেছে।

বুধবার সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে কমিটির সভায় এ প্রসঙ্গে গৃহীত প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে একাত্তরের স্বাধীনতারিরোধী শক্তি এবং তাদের সহযোগী বিএনপি ও অপরাপর মৌলবাদী দল “গৃহযুদ্ধের” হুমকি দিচ্ছে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাজী আরেফ আহমদ, শাহরিয়ার কবির, মোর্শেদ আলী ও আবদুল মতিন চৌধুরী। খবর বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক দল
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে

ফজলুল বারী ॥ সশস্ত্র অধ্যায় শেষ। অতঃপর প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। সংগঠনের এক নেতা জনকণ্ঠকে বলেন, সম্ভবত আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি এ ব্যাপারে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হবে। ঘোষণাটি দেবেন সংগঠনের প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললে সেদিন থেকেই প্রকাশ্য কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে এই সমিতির।

২৮ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতির সব শীর্ষ নেতা একযোগে অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে কিয়ে আসছেন। খাগড়াছড়ির পানছড়ির সীমান্ত গ্রাম দুদুকছড়িতে চূড়ান্ত দফার অস্ত্র সমর্পণ হবে। সন্ত লারমা ইতোমধ্যে গত মঙ্গলবার তাঁর অস্ত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। ২৮ ফেব্রুয়ারি অস্ত্র জমা দেবেন শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার, শীর্ষ নেতা সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, গৌতম চাকমাসহ অন্যরা। জনসংহতির বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য লতিকা চাকমাও সেদিন ফিরে আসবেন স্বাভাবিক জীবনে। সমিতি সূত্র বলেছে, তাদের নতুন রাজনৈতিক যাত্রার পর্বটি হবে সতর্ক ধীর পদক্ষেপের। সব কিছু দেখে শুনে তারা পা ফেলবেন। এ উপলক্ষে পুনর্গঠন করা হবে সমিতির শাখা সংগঠনসমূহকে। ১৯৭৩ সালে জনসংহতি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়ী জুম্মু সম্প্রদায়ের জাতিগত স্বীকৃতি আদায়সহ অন্যান্য দাবি ছিল সংগঠনের মেনিফেস্টোতে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সংগঠনটি আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায়। তখন এর গ্রাম পঞ্চায়েত, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি শিরোনামের শাখা সংগঠন ছিল। ১৯৭৬ সালে সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলে অন্য সব শাখার কার্যক্রম তৎপরতা বেড়ে যায়। সামরিক সংঘাত বেড়ে যাবার পর কৌশলগত কারণে গুটিয়ে

নেয়া হয় মহিলা সমিতির কার্যক্রম। এখন সামরিক বাদে অন্য সব শাখার কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে। পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের শান্তি চুক্তির সমর্থক অংশের কার্যক্রমকে মূল সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত বা সমন্বয়ের কৌশল নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে।

সংগঠন সংশ্লিষ্ট সূত্র স্বীকার করেছে, দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্য জীবনে ফিরে আসার পর্বে জনসংহতি নেতারা সব কিছুতেই সতর্ক পর্যবেক্ষণের নীতি নিয়েছেন। এর মাঝে প্রজন্ম-প্রজন্ম নানা ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। ১০ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রসমর্পণ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে কার্যত বিলুপ্ত হয়ে গেছে শান্তিবাহিনী। এর প্রথম দলের যে ৭৩৯ জন ইতোমধ্যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন সামাজিকভাবে তাদের গ্রহণ প্রতিক্রিয়ার ওপর রাখা হচ্ছে সতর্ক দৃষ্টি। প্রথম দলের সদস্যদের বলে দেয়া হয়েছে গণমাধ্যম প্রতিনিধিসহ কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির সঙ্গে কথা না বলার জন্য। দু'য়ুগের রক্তক্ষয়ী সময়গুলোতে বাহিনীর সঙ্গে নানা জনের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের বিরোধ তৈরি হয়েছে। এ সবার প্রতিক্রিয়ায় যাতে নতুন কোন ঘটনা না ঘটে সে জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সদস্যদের। কেউ কোন অঘটনের চেষ্টা করলে সে ক্ষেত্রেও নীরব নিশ্চুপ থাকতে বলা হয়েছে। সূত্র বলেছে, সমিতির সদস্যদের যে রাজনৈতিক দীক্ষায় গড়ে তোলা হয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সেটি কঠোরভাবে অনুসরণ ও সংরক্ষণই সমিতির প্রথম লক্ষ্য। এর মধ্যে কৌশলগত অন্যান্য দিক ঠিক করে নেয়া হবে। সমিতির সদস্যদের যাতে নিরাপত্তা কোনভাবে বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে ঐকমত্য হয়েছে। সমিতি সাংগঠনিকভাবেও বিষয়টির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখতে গঠন করবে বিশেষ একটি মনিটরিং সেল।

২৮ ফেব্রুয়ারি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর সন্ত লারমা আপাতত খাগড়াছড়ি শহরেই থাকবেন। সরকারিভাবে তাঁর আবাসন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবসদস্যের বাড়ি ঘরে ফেরার পর জনসংহতির বিশেষ একটি কংগ্রেস আহ্বানের চিন্তাভাবনা আছে। সেই কংগ্রেসে ঠিক হবে পরবর্তী রাজনৈতিক কৌশল। সমিতির নেতৃত্ব ও কার্যক্রমে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত বাঙালী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব রাখার বিষয়েও চিন্তাভাবনা হচ্ছে বলে জানা গেছে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর রাজনৈতিক উদ্যোগে সংঘটিত বাঙালী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি তিন পাহাড়ী সংগঠনের তরুণ বয়সী একাংশের প্রতিবাদ বিক্ষোভকে ওয়াকিফহালরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এটা পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে বলে অনেকের আশঙ্কা। জনসংহতি সমিতি এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া

প্রকাশ না করার নীতি অব্যাহত রেখেছে। তবে ২৮ ফেব্রুয়ারি বা তার পরে এ ব্যাপারে সংগঠনের অবস্থান স্পষ্ট করার সম্ভাবনা আছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ

নব যুগের সূচনা ৥ আহাদ চৌধুরী

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হলো বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলা।

তিনি গত বুধবার বিকালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ৩৯৩, নিউইস্কাটনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হলরুমে মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে একথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আশরাফ-উদ-দৌলা ভূঁইয়া (চাঁন) অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সর্বজনাব এমএ কাইয়ুম, সাকবীর আহমদ, নিজাম উদ্দীন, কামরুল হাসান, নজরুল ইসলাম, শাহরিয়ার সিরাজী, মাহবুবুল আলম প্রমুখ।-খবর বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সম্পাদকীয়

শান্তির সুবাতাস

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতার পক্ষে যত উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অন্যতম। গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে এই অস্ত্রসমর্পণ পর্ব শুরু হয়েছে খাগড়াছড়ি থেকে। ঐ দিন বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ সদস্য তাঁদের অস্ত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে। জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা প্রথম একটি চাইনিজ এসএমজি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। এদিন খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র স্টেডিয়ামটিতে ৪০ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছিল, দর্শকরা শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রথম দফার অস্ত্রসমর্পণ প্রত্যক্ষ করেন। অস্ত্র জমা হওয়ার পর

প্রধানমন্ত্রী উড়িয়ে দেন শান্তির প্রতীক পায়রা, উড়িয়ে দেন বেলুন। প্রধানমন্ত্রী সাদা গোলাপ উপহার দেন জনসংহতি নেতা সন্ত লারমাকে।

এই অস্ত্রসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায় গুরু হলো ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়। দীর্ঘ দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে যে সশস্ত্র বৈরিতা ছিল তার অবসান হলো। অবশ্য অস্ত্রসমর্পণ চলবে। ১৬, ২২ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর বাকি সদস্যরা অস্ত্র জমা দেবেন। গত ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত হয়েছিল যে-শান্তিচুক্তি, সেই চুক্তি অনুযায়ীই অস্ত্রসমর্পণ করা শুরু করেছে শান্তিবাহিনী। ইতোমধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের অশান্ত পরিস্থিতির কারণে বাস্তবহীন হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীরাও দেশে ফিরে আসতে শুরু করেছে আরও আগে থেকে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার।

প্রকৃত অর্থেই শান্তির একটি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, যে-শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল দু'দশক আগে। এর মধ্যে দেশের এক-দশমাংশ ভূখণ্ড জুড়ে চলেছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত, বহু নৃশংস ঘটনাও ঘটেছে। পাহাড়ী ও বাঙালী মিলিয়ে প্রায় হাজার বিশেক লোক নিহত হয়েছেন এই সংঘাতে। এর ফলে এই দশকের শুরুতেও অনেকে মনে করতেন পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি বুঝি কখনই প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে এটা উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, সমস্যাটি যেহেতু রাজনৈতিক সেহেতু এর সামরিক সমাধান সম্ভব নয়। যে-কারণে প্রায় বছর দশেক আগে থেকেই শুরু হয় আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বিগত সরকার এবং তার পূর্ববর্তী সরকারের আমলেও বহু আলোচনা হয়েছে, সেগুলো যে একেবারে নিষ্ফল ছিল তা নয়, তবে বর্তমান সরকারের আমলে সেসব আলোচনার ধারাবাহিকতাতেই সম্পাদিত হতে পেরেছে শান্তিচুক্তি, শুরু হয়েছে অস্ত্রসমর্পণ ও শরণার্থী প্রত্যাবাসন। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধান বিরোধীদলসহ পার্বত্য অঞ্চলের অশান্তি থেকে ফায়দা তোলায় উদ্দেশ্যে কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল চেষ্টা করেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকর উদ্যোগগুলো যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে শুরু হলো অস্ত্রসমর্পণ। ১০ ফেব্রুয়ারিও হরতাল ডাকা হয়েছিল, কিন্তু হরতাল অস্ত্রসমর্পণ কর্মসূচীকে বানচাল করতে পারেনি। পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অপচেষ্টাও দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তেমন কার্যকর হয়নি। কিছু উত্তেজনা যে এখনও নেই তা নয়। তবে, শান্তি প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আন্তরিকভাবে চালাতে পারলে এবং পাহাড়ী-বাঙালী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তেজনা প্রশমিত হবে। আসলে এই বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়াই ছিল এতদিনকার মূল সমস্যা। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব

পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল হলেও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা সৃষ্টির জন্য আরও বহু কাজ করতে হবে। কারণ ঐ অঞ্চলের পাহাড়ী-বাঙালী উভয় জনগোষ্ঠীকেই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে নানাভাবে।

প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবারের অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং আনুগত্য সমুন্নত রেখেই পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ-বিষয়ে কারও মনে কোনরূপ ভুল বোঝাবুঝি, দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা থাকা সমীচীন নয়। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, চুক্তিতে পাহাড়ী-বাঙালী সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, সকলেই একসাথে থাকবেন, কোন বাঙালীকে বলপূর্বক প্রত্যাহার করা হবে না।

অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেছেন, জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা আন্দোলন করেছেন, সরকারের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পর যে অধিকার পেয়েছেন, সেই অধিকার নিয়েই বাঁচতে চান, তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফেরার বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকৃত অর্থেই অধুনা যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা শুধু পার্বত্য তিন জেলার বাসিন্দাদের জন্যই নয়, সমগ্র দেশের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ-অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দু'পক্ষই যে, সদিচ্ছা প্রদর্শন করেছেন, সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্থ। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এরকম ব্যয়বহুল একটি সঙ্কট জিইয়ে রাখার বিলাসিতা শোভা পায় না। এর বদৌলতে হয়ত কয়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশ ও জাতি। এখন শান্তিপ্রতিষ্ঠা হলে, সকলেই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারলে উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান হয়ে উঠবে। আর এটাই এখন বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন। আমরা চাই দেশের সকল অঞ্চলের, সকল ধর্মের, সকল গোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রার মান সমমাত্রিক থাকুক। এই নিরিখে পার্বত্য শান্তিপ্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং কামনা করি দেশের সকল অংশে প্রাণচাঞ্চল্য ও শান্তি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজ শান্তিবাহিনীর

দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ৯ আজ সোমবার শান্তিবাহিনীর দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণের দিন। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি হাই স্কুল মাঠে সকাল ১১টায়

শান্তিবাহিনীর আরও ৫৪২ জন অস্ত্র সারেভার করবে। দ্বিতীয় দফায় যাঁরা সশস্ত্র আলোচনার পথ পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন, তাঁদের মধ্যে ৩৮৬ জন অস্ত্রধারী এবং অবশিষ্টরা জনসংহতির রাজনৈতিক কর্মী বলে জানা গেছে।

মহসিন চৌধুরী ও মোহাম্মদ আলী বাঘাইছড়ি থেকে জানান, শান্তিবাহিনীর দ্বিতীয় দফার অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে রাঙ্গামাটি থেকে প্রায় দেড় শ' কিঃ মিঃ দূরে দুর্গম বাঘাইছড়ি থানার হাই স্কুল মাঠে অস্ত্র সমর্পণের এ অনুষ্ঠানের আয়োজন ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। বাঘাইছড়ি থানা সদর থেকে দুই কিঃ মিঃ পূর্বে হাই স্কুল মাঠে রবিবার সকাল থেকে প্রায় সাড়ে ৫শ' সদস্য জাতীয় কমিটির সদস্যের কাছে অস্ত্র জমা দেয়ার কথা থাকলেও তারা তা করেনি। আজ সকালে ৫শ' ৪২ জন অস্ত্র জমা দিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করবে।

শান্তিবাহিনীর সদস্যরা রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সিডিউল মোতাবেক অস্ত্র জমা দিতে অনীহা জানানোতে প্রশাসন কিছুটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে। জাতীয় কমিটির দুই সদস্য ও এমপি দিপঙ্কর তালুকদার এবং বীর বাহাদুরের কাছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র গোলাবারুদ জমা দেয়ার কথা ছিল। সন্ধ্যায় শান্তিবাহিনীর সমন্বয়কারী এবং সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা প্রশাসনের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে আজকের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের সিডিউল পুনর্বিন্যাস এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে। শান্তিবাহিনীর গাইড লাইন অনুযায়ী আজকের অনুষ্ঠান অস্ত্র সমর্পণ এবং প্রধান অতিথির শ্বেত কপোত ওড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অন্য আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিতে বলেছে। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধির অস্ত্র তুলে দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পূর্বেই অস্ত্র জমা দেবে। প্রশাসন কি পরিমাণ অস্ত্র জমা পড়বে তা নিশ্চিত কিছু করতে পারেনি। তবে ঐ স্কুল মাঠে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

উৎসবমুখর পরিবেশে বাঘাইছড়িতে

শান্তিবাহিনীর ৫৪৩ সদস্যের অস্ত্রসমর্পণ

মহসিন চৌধুরী/মোহাম্মদ আলী, বাঘাইছড়ি থেকে ॥ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শান্তিবাহিনীর দ্বিতীয় দফায় অস্ত্রসমর্পণ সোমবার সকালে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে সম্পন্ন হয়েছে। মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী অনুষ্ঠানে

শান্তিবাহিনীর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল 'বি পোস্টের' এরিয়া কমান্ডার তাতেন্দ্র লাল চাকমা (মেজর পেন্সন) প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের হাতে নিজের 'পিস্তল' জমা দেন। মন্ত্রী তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান।

এর আগে সকাল থেকে শান্তিবাহিনীর অপর ৫শ' ৪২ জন সশস্ত্র সদস্য তাদের অস্ত্র জমা দেন অনুষ্ঠানস্থলে এসেই। প্রায় ৩ ঘণ্টার সিডিউল অনুষ্ঠানটি ১০ মিনিটেই সম্পন্ন করা হয় আগের রাতে শান্তিবাহিনীর সমন্বয়কারীদের দেয়া শর্ত অনুযায়ী, তবে আড়াই শ' অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং বিপুল গোলাবারুদসহ ৫শ' ৪৩ জন শান্তিবাহিনী সদস্যের অস্ত্রসমর্পণকালে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

সোমবার সকালে যে দলটি অস্ত্রসমর্পণ করতে এসেছিল তা শান্তিবাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দল বলে ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে। এ দলটির নাম ছিল এসটিএফ (স্পেশাল টার্কফোর্স) বাঘাইছড়ি থেকে ৬ কিঃ মিঃ দূর অরণ্যের একটি রাবার বাগান এলাকায় তাদের গোপন ঘাঁটি ছিল। ৫শ' ৪৩ সদস্যের দলের এ অংশটির অধিকাংশ সদস্য বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং দক্ষিণ পার্বত্য এলাকার। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রয়েছে বান্দরবান এলাকার। অস্ত্র ত্যাগের পর পর তারা স্ব স্ব জিনিসপত্র নিয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে গেছে।

সোমবার সকাল থেকে ৩ ঘণ্টাব্যাপী অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানটি আড়ম্বরভাবে আয়োজনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও আগের রাতে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বেকে বসে। তারা খাগড়াছড়ির প্রথম অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, দীর্ঘ সময় তাদের রৌদ্রতাপে বসিয়ে দুর্ভোগ সৃষ্টি, আপ্যায়ন অসুবিধাসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়। সে কারণে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। এতে দ্বিতীয় দফায় অস্ত্র জমাদানে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হলেও রবিবার রাত পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন জাতীয় পরিষদের দুই সদস্য দিপঙ্কর তালুকদার এমপি এবং বীর বাহাদুর এমপি, দুই সমন্বয়কারী সুধাসিন্ধু খাসী ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা কয়েক দফায় বৈঠকে মিলিত হয়ে সোমবারের অনুষ্ঠানে শর্ত সাপেক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত হয়। এতে আগের দিন অস্ত্রজমা প্রদান, সমাবেশে অস্ত্রসমর্পণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাদ দেয়ার শর্তারোপ করা হয়। এছাড়া সমর্পণকারী সদস্যরা ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান না নিয়ে সরাসরি বাড়ি ফিরে যাবে বলে জানিয়ে দেয়।

এদিকে বাঘাইছড়ি থানা সদর থেকে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ দূরে হাই স্কুল মাঠে অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে সমগ্র এলাকা উৎসবে মেতে ওঠে। রং বেরঙের

পাহাড়ী কাপড় পরে দুর্গম পাহাড় থেকে দীর্ঘ লাইনে দলবঁধে আসার মনোরম দৃশ্য সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান নয়, যেন বিযু উৎসব। স্বজন-পড়শী বা সম্প্রদায়ভক্তদের বরণ করতে এসেছিল পাহাড়ীদের মিছিলের পর মিছিল। কিন্তু মাঠ ৪/৫ হাজারের বেশি শরণার্থী ধারণে অক্ষম হওয়ায় হাজার হাজার লোক অনুষ্ঠান স্থলের ধারেকাছেও ঘেষতে পারেনি। এক পর্যায়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করতে তাঁরা চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মাঠে বিপুল লোক প্রবেশ করিয়ে সেনাবাহিনী ও বিডিআর জোয়ানদের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। সংক্ষিপ্ত এ অনুষ্ঠানটি ছিল পুরোপুরি বিশৃঙ্খল। সোমবার সকালে বাঘাইছড়ি হাই স্কুলের মাঠে দুর্গম পাহাড় থেকে আসা বহু পাহাড়ী বাঙালী শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে পারেননি। হাজার হাজার নারী-পুরুষের ভীড় এবং একদল বিক্ষুব্ধদের ইটপাটকেল নিক্ষেপে ও পুলিশসহ ১০ জন পাহাড়ী বাঙ্গালী আহত হয়েছে। প্রশাসনের দুর্বল ব্যবস্থাপনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মূলত দর্শনার্থীরা হামলা চালায়। আধা ঘণ্টার বেশি পুলিশী অভিযানের পর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের বাইরে বিক্ষুব্ধদের পুলিশ শাস্ত করতে সক্ষম হয়।

শান্তিবাহিনীর ৫শ’ ৪৩ জন সশস্ত্র সদস্য বিপুল রবিবার অস্ত্র জমাদানের পরিবর্তে দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার সকাল থেকে সরাসরি অস্ত্রসমর্পণ করতে বাঘাইছড়ি হাইস্কুল এলাকায় চলে আসে। নিকটবর্তী উগলছড়ির রাবার বাগান এলাকায় তাদের নিজস্ব ক্যাম্পে তারা কয়েকদিন ধরে অবস্থান করছিল। সকাল সোয়া ৮টা থেকে জাতীয় কমিটির দুই সদস্য দিপঙ্কর তালুকদার এমপি, ও বীরবাহাদুর এমপির কাছে অস্ত্রসমর্পণ শুরু করে। ৫শ’ ৪২ জন সদস্য ২শ’ ৪১টি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও ৪০ হাজার রাউন্ড গুলি পর্যায়ক্রমে জমা ও নাম রেজিস্ট্রি করে। এরপর শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সরাসরি অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে নির্ধারিত আসনে বসে শুধুমাত্র দলনেতা ও এরিয়া কমান্ডার তাতেন্দ্র লাল চাকমা (মেজর পেলো) তাঁর চাইনিজ এমআর পিস্তল আনলোড অবস্থায় সকাল সাড়ে ১১ টায় প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে জমা দেন। এ দিন কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠান ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অস্ত্রের বিনিময়ে মেজর পেলেকে একটি সাদা গোলাপের তোড়া তুলে দেন এবং স্বাগত জানান। পরে তিনি “শান্তি চিরস্থায়ী হউক” প্রেকার্ডসহ বেলুন ওড়ান; সাদা কপোত উড়িয়ে দেন। অনুষ্ঠানে রাখা অস্ত্রগুলো সমর্পণকারীদের সাথে সংক্ষিপ্ত কুশালাদী বিনিময় করে অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন। প্রধান অতিথি রফিকুল ইসলাম তখন কোন বক্তৃতা দেননি (যদিও তাঁর বক্তৃতা দেয়ার সিডিউলে ছিল)। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পীদের রাখা হলেও কোন অনুষ্ঠান হয়নি, সব মিলিয়ে ৭/৮ মিনিটেই সংক্ষিপ্ত, কিছুটা বিশৃঙ্খল

অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, স্থানীয় এরিয়া কমান্ডার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটির স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যান প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি চুক্তি সই হওয়ার আগে সংসদে

আলোচনা হলে জটিলতা বাড়ত ॥ প্রধানমন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি সই হবার আগে বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা হলে জটিলতা বাড়ত, চুক্তির ভাগ্যই অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। কারণ এটি ছিল দু’পক্ষের সমঝোতার ব্যাপার। তবে তিনি বলেন, আমরা সংবিধানের বাইরে কিছু করছি কি না তা দেখার অধিকার সবারই আছে। চুক্তি নিয়ে যখন সংসদে আলোচনা এবং এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে তখন এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে তিনি বিরোধীদলীয় সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার সংসদে ‘প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নকালে’ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি এবং শান্তি চুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। সরকারী দলের মহিলা এমপি মেহের আফরোজের মূল প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদকে জানান, ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে শুরু করে ’৯৭-৯৮ সালে শান্তি চুক্তি সই হবার পূর্ব পর্যন্ত ২০ বছরে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলায় প্রতিরক্ষা খাতে খরচ হয়েছে ১০৫ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। আর ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ২১ বছরে সেখানে সহিংস ঘটনায় নিহত হয়েছে ৯৩৭ জন। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বছরওয়ারী যে হিসাব তিনি দেন তা থেকে দেখা যায় ’৯২-৯৩ সালে যেখানে ব্যয় হয় প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা, পরের বছরেই তা ১২ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়, পরবর্তী ৩ বছর প্রায় একই হারে চলার পর ’৯৬-৯৭ সালে ব্যয় বেড়ে প্রায় ১৪ কোটি টাকায় ওঠে, তবে চলতি ’৯৭-৯৮ সালের এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ১১ লাখ টাকা।

জাতীয় পার্টির ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজীর সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপজাতি নিয়ে সমস্যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে এবং বিদেশী মধ্যস্থতা সত্ত্বেও তার অধিকাংশেরই সমাধান হয়নি। বাংলাদেশই একমাত্র ব্যতিক্রম যারা অভ্যন্তরীণ এই সমস্যটি নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করেছে এবং এ ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘন বা কারও কাছে নতজানু হবার প্রশ্নই ওঠে না।

সরকারী দলের লতিফ মির্জা চুক্তির পর পার্বত্য এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, এখন সেখানে সবাই স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে, নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আত্মমর্যাদা নিয়ে সবাই বাঁচতে পারবে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। তিনি বলেন, যুগ যুগ ধরে সবাই শান্তির অন্বেষণ করে চলেছে, ব্যতিক্রম শুধু আমাদের বিরোধী দল। তারা শান্তি চুক্তি মানে না, অসত্য বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে অশান্তি ছড়াচ্ছে। অশান্তির পথ ছেড়ে শান্তির পথে আসতে বিরোধী দলের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তির পক্ষে সবাই মিলে কাজ করলে কোন অশান্তির প্রশ্নই উঠবে না।

ফেনী থেকে নির্বাচিত সরকারদলীয় এমপি জয়নাল আবেদীন হাজারী সম্পূরক প্রশ্ন করতে গিয়ে বলেন, চুক্তি হলে ফেনী পর্যন্ত ভারতের অধীনে চলে যাবে বলে বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রচারণায় তাঁর এলাকার শিক্ষার আলোবিহীন ৮০ ভাগ মানুষ এখনও আতঙ্কিত। তাঁরা আশ্বস্ত হবেন কিভাবে— এ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চুক্তি হবার পর বেশ কিছু দিন পার হয়ে গেছে, আপনারা নিজেরাই তো উপলব্ধি করতে পারছেন বিরোধী দলের প্রচারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।

প্রধানমন্ত্রী জানান, যেসব পাহাড়ী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে তাদেরকে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ ঘরবাড়ি নির্মাণ ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সহায়তা করা হচ্ছে। শান্তি চুক্তির পর বিশ্বব্যাপকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে অর্থায়নের আশ্বাস পাওয়া গেছে এবং এসব নিয়ে আলোচনা চলছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি বিনিয়োগের পরিবেশ

সৃষ্টিতে সহায়ক হবে ৥ ব্রিটিশ দল

ব্রিটিশ সংসদীয় দলের নেতা মিস উনা কিং এমপি আশা প্রকাশ করে বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ বিনিয়োগ প্রবাহের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। খবর বাসস'র।

বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত ব্রিটিশ সংসদীয় দলের ভাইস চেয়ারম্যান মিস উনা কিং এমপি লন্ডনে দলের এক বৈঠকে উল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতায় শান্তি বাহিনীর

তৃতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ সম্পন্ন

চুক্তি বিরোধীদের বিক্ষোভ সংঘর্ষ

জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে ৥ পার্বত্য শান্তি চুক্তির ভিত্তিতে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তৃতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান রবিবার সকালে খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা থানার বড়াদম দীঘির পাড়ে সম্পন্ন হয়েছে। ৪৫ মিনিটের স্থায়ী অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর মেজর চতুরপময় খীসা ওরফে ক্রেভারের নেতৃত্বে আরও ৪শ' ৪৩ জন সদস্য ১শ' ১০টি অস্ত্র ও ১ লাখ ১৮ হাজার ৯শ' ৭৪টি গুলি জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলো।

জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর কাছে জনসংহতি সমিতির অন্যতম ক্যাডার মেজর ক্রেভার একটি একে ৪৭ রাইফেল জমা দেন। এ সময় চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ তাঁকে সাদা গোলাপের একটি তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। এর পর চীফ হুইপ, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়দ শান্তির প্রতীক কবুতর উড়ান। এর আগে সকাল থেকে বড়াদম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর ৪৪২ জন সশস্ত্র সদস্য অস্ত্র জমা দেন দফতরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার কাছে। অস্ত্র সমর্পণকালে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তৃতীয় দফায় অস্ত্রসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর এই দলটি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল বলে একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে। ৩ দফায় এ নিয়ে ১ হাজার ৭শ' ২৫ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য ৮শ' ১৪টি অস্ত্র জমা দিয়েছে।

শান্তিচুক্তি বিরোধীদের বিক্ষোভ

শান্তিচুক্তি বিরোধী পাহাড়ীরা রবিবার দিঘীনালা বড়াদম দীঘির পাড়ে অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। সকাল ১০টার দিকে বড়াদম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পের বাইরে শান্তিচুক্তি বিরোধী মুষ্টিমেয় কিছু পাহাড়ী বিক্ষোভ ও কালো পতাকা প্রদর্শন করলে চুক্তির পক্ষের পাহাড়ীরা এতে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এতে বাধা দিলে চুক্তি বিরোধীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে ধাওয়া পাল্টাধাওয়ায় সেনাবাহিনীর মেজর নজরুল ইসলামসহ পুলিশ বিডিআর ও চুক্তিবিরোধী পাহাড়ী ছাত্রজনতা মিলে প্রায় ২০ জন আহত হয়। আহতদের

ট্রানজিট ক্যাম্পে স্থাপিত চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পরে অনুষ্ঠান শুরু হলে চুক্তিবিরোধী পাহাড়ী ছাত্রজনতা অনুষ্ঠানস্থলে এসে কালো ব্যানার, পোস্টার দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ব্যানারে কালো, আপোস চুক্তি মানি না, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই, ভূমির অধিকার চাই, অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যাহার করতে হবে, ‘আমরা উপজাতি নই’, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও সাংবিধানিক গ্যারান্টি চাই- এসব লেখা ছিল। এ সময় হাজার হাজার জনতার মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে চুক্তির সপক্ষে পাহাড়ী জনতা চুক্তি বিরোধীদের ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায়। উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হলেও মূল অনুষ্ঠানের কোন ক্ষতি হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
শেখ হাসিনার কাছে চিঠি
পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে
স্বাগত জানিয়েছেন অলব্রাইট

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট সরকার ও উপজাতীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রশংসা করেছেন। খবর ইউএনবি’র।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো অলব্রাইটের চিঠিটি ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হস্তান্তর করেছেন। চিঠিতে তিনি বলেন, ‘আমি আনন্দের সঙ্গে ইতিবাচক এই ঘটনার উল্লেখ করছি এবং ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে আপনার সরকারের উদ্যোগকে অভিনন্দিত করছি।’

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারও উপজাতীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে সম্পর্কিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানায়। যুক্তরাষ্ট্র আশা করে, শান্তি চুক্তি পূর্ণভাবে বাস্তবায়নে সকল পক্ষের সদিচ্ছা থাকবে, যাতে পার্বত্য এলাকার জনগণ শান্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
উৎসবমুখর পরিবেশে উপজাতীয়
শরণার্থী প্রত্যাবাসন শেষ হলো ৥
এক যুগের সমস্যার অবসান

জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে ৥ শরণার্থী জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট পিছনে ফেলে সর্বশেষ দফায় উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে ৩৩ পরিবারের

১শ’ ১৯ জন উপজাতীয় শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ এক যুগের শরণার্থী সমস্যার অবসান ঘটল। ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরার ৬টি আশ্রয় শিবিরে এখন আর কোন বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থী থাকল না। ভারত-বাংলাদেশ শরণার্থী প্রত্যাবাসন চুক্তির সুবাদে ৬ দফায় ১২ হাজার ৩ শ’ ৮৭ পরিবারের ৬৩ হাজার ৪ শ’ ৭ জন উপজাতীয় শরণার্থী নিজ মাতৃভূমিতে নিজেদের পৈতৃক ভিটামাটিতে ফিরে এসেছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম তবলছড়ি ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়ে অত্যন্ত বর্ণাঢ্য আয়োজন এবং উৎসবের আমেজে শুক্রবার সকাল ১১টায় ৩৩টি শরণার্থী পরিবারকে স্বদেশে বরণ করে নেয়ার মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের শরণার্থী সমস্যার নিষ্পত্তি হলো।

ত্রিপুরার শিলাছড়ি পয়েন্ট দিয়ে সর্বশেষ দলের প্রথম শরণার্থী হিসাবে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমা তাঁর দুই পৌত্র, ছেলের বৌ, এবং স্ত্রী যুগতারা দেওয়ানকে নিয়েই দেশের মাটিতে পা রাখেন। তাঁকে বাংলাদেশ সীমান্তে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা। অপরদিকে শেষ দলটিকে বিদায় জানান, ত্রিপুরার বিদ্যুত ও জ্বালানি মন্ত্রী কেশব মজুমদার। এ সময় এপারে শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, সাংসদ বীর বাহাদুর ফুলের তোড়া দিয়ে স্বদেশে শরণার্থীদের অভ্যর্থনা জানান।

শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সমাপনী দিন বলে সীমান্তবর্তী তবলছড়ি, শিলাছড়ি ট্রানজিট পয়েন্টে আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। তবলছড়িতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ অভ্যর্থনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দফতরবিহীন মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, বিশেষ অতিথি ছিলেন ত্রিপুরার বিদ্যুত ও জ্বালানি মন্ত্রী কেশব মজুমদার, অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, সাংসদ বীরবাহাদুর, উপজাতীয় শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমা, স্পেশাল এ্যাক্শনার্স বিভাগের মহাপরিচালক মোবাইদুল ইসলাম ও ত্রিপুরার মুখ্য সচিব সুধির শর্মা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক একেএম জাফরুল হোসেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন, ভারতে আশ্রিত সকল বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থী নিজ দেশে ফিরে আসায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

ত্রিপুরার বিদ্যুত ও জ্বালানি মন্ত্রী কেশব মজুমদার তাঁর ভাষণে বলেন, যারা ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন তাঁদেরকে আমরা বোঝা মনে করিনি। আমরা তাঁদের জন্য ভাল কিছু করতে না পারলেও জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছি। আজকের দিনের জন্য, শরণার্থীদের প্রকৃত সমাধানের জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম আজ তাই এর বাস্তব রূপ নিয়েছে বলে আমি আনন্দিত।

শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর পর সকল শরণার্থীকে নিয়ে দেশে ফিরতে পেরে সুখ অনুভব করছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

অভ্যর্থনা সভা শেষে খাগড়াছড়ি জেলা শিল্পকলা একাডেমী ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে।

এদিকে সর্বশেষ দফায় ফিরে আসা শরণার্থীদের ৩৩টি পরিবারই হচ্ছে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দের পরিবার। শুক্রবার যারা ফিরে এসেছেন তাঁরা সকলেই ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে গেছে। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা তাঁর পরিবারসহ খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজনপাড়াস্থ নিজ বাড়িতে উঠেছেন। ইতোপূর্বে যে সব শরণার্থী স্বদেশে ফিরে এসেছে তারা সকলেই সরকার প্রতিশ্রুত নগদ ২১ হাজার টাকাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে বসতবাড়ি নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১ মার্চ ১৯৯৮

পার্বত্য শান্তি চুক্তি মডেল হতে পারে ৥

রুশ সংসদ দলনেতা

কূটনৈতিক রিপোর্টার ৥ বাংলাদেশ সফররত রুশ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের নেতা এবং রুশ ডুমা কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান ভাগদুল ভাহিত বাগাউদ্দিনভ বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির মডেলটি বিশ্বের অন্যান্য স্থানের জাতিগত বিরোধ-সংঘাত নিরসনের জন্য অনুসরণীয়। রাশিয়ায় চেচনিয়ার বিরোধ নিষ্পত্তিতেও এই মডেল কাজে লাগানো যায় কিনা তা আমরা পার্লামেন্টে উত্থাপন করব। যদিও বাংলাদেশের পার্বত্য সমস্যা এবং চেচনিয়ার সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন, একইভাবে তা কাজে লাগান সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের ১৫টি

এলাকায় জাতিগত কিংবা উপজাতিগত সংঘাত চলছিল, সর্বশেষ ফিলিপিন্স এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের নিষ্পত্তির পর বর্তমানে ১৩টি স্থানে সংঘাত চলছে। তবে বাংলাদেশের ব্যতিক্রম ঘটনাটি হচ্ছে, তৃতীয় কোন পক্ষের সাহায্য ছাড়াই এখানে নিষ্পত্তি হয়েছে। আমরা আশা করছি পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন এবং স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে চুক্তি কার্যকর করার কাজ সম্পন্ন করতে শেখ হাসিনার সরকার সক্ষম হবে।

সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত বৃহস্পতিবার পার্বত্য অঞ্চল ঘুরে এসেছেন বলে জানান। সেখানে তাঁরা শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সরেজমিনে ঘুরে দেখেন।

রুশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গতকাল শনিবার গুলশানের রুশ দূতাবাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন। তারা বলেন, তাদের এই সফর কেবলমাত্র শুভেচ্ছা সফর, দুই দেশের জনগণের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের উন্নয়নই আমাদের সফরের লক্ষ্য। প্রতিনিধিদল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করেন। রাশিয়ায় এখনও বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম স্মরণ করা হয় বলে তিনি জানান। সফরকালে রুশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বন ও পরিবেশমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

বন্দর, জাহাজ চলাচলমন্ত্রী ও ঢাকার মেয়রের সঙ্গেও তারা দেখা করেন। আগামী সোমবার তাঁরা সাতদিনের সফর শেষে ঢাকা ত্যাগ করবেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য হলেন, ইউরী পালদনিকভ ও আজাদ খামায়েভ। বাংলাদেশে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত ইউগুনি ইভানভও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৫ মার্চ ১৯৯৮

আজ আনুষ্ঠানিক

বিলুপ্তি ঘটবে শান্তি বাহিনীর

ফজলুল বারী ৥ আজ আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটছে শান্তি বাহিনীর। খাগড়াছড়ির দুদুখড়িতে সর্বশেষ দফার অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের এই বিদ্রোহী দলটির সশস্ত্র অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটছে। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের কাছে অস্ত্র তুলে দেবেন শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার। দলের সিনিয়র নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরাসহ অন্যরাও জমা দেবেন তাঁদের

বিদ্রোহের অস্ত্র। একই সাথে স্বাভাবিক জীবনে সক্রিয় ফিরে আসবেন জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা। জনসংহতির সর্বশেষ সক্রিয় একমাত্র মহিলা সদস্যা লতিকা চাকমাও ফিরে আসবেন আজ। সরকারী সূত্রগুলো বলেছে, আজ যাঁরা ফিরছেন তাঁদের মধ্যে শান্তি বাহিনীর বেশ কিছু প্রবীণ, অসুস্থ নেতাও আছেন। ২১ বছরের সশস্ত্র জীবনে নানা সংঘর্ষের ঘটনায় তাঁদের অনেকে অসুস্থ, আহত হয়েছিলেন। শেষ দলটির দেশে ফেরা উপলক্ষে সীমান্ত গ্রাম দুদুকছড়িতে সরকারী সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত। চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কাজী গোলাম রহমান, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক একেএম কাফরুল হোসেন, ব্রিগেড কমান্ডার মোহাম্মদ আলীসহ কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য, গত বছর ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুসারে গত ১০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি বাহিনীর বিলুপ্তি পর্ব শুরু হয়। বাহিনীর সদস্যরা ১৬ ফেব্রুয়ারি বাঘাইছড়িতে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি দিঘীনালা বরাদম দীঘির মাঠে অস্ত্র জমা দিয়েছেন। তিন পর্বে তাঁরা জমা দিয়েছেন তাদের ২১ বছরের সঞ্চয়ের অস্ত্র ভাণ্ডারের বিভিন্ন রকমের ৮১৩টি অস্ত্র, ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮৫টি গোলা, ৪৫ কেজি বারুদ।

প্রথম তিন পর্বে শান্তি বাহিনী যেসব অস্ত্র জমা দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে- এলএমজিটি-৫৬ (৭৬২ ক্যালিবার) ২৫টি, এলএমজি (৩০৩ ব্রেন, ভারত ও রাশিয়া) ১৪টি, পিস্তল ও রিভলবার (৭.৬২ এম এম দেশী-ভারত-চায়না মিলিয়ে) ৩৮টি, সিএম স্ট্যান্ড (৯এমএম) ২৪টি, এসএমজি (৯-এমএম) ৫৫টি, মর্টার (২") ২টি, মর্টার (৬০ মিমিটি-৬৩ চায়না) ৩টি, মর্টার (৬০ এমএম ব্রিটিশ) ৪টি, রকেট লঞ্চার (৪০ এমএম) ১টি, পাইপগান (দেশী) ২৬টি, রাইফেল (৭.৬২ এমএমটি-৫৬ চায়না) ১৪টি, এসএলআর (৭.৬২ এমএম-ভারত রাশিয়া-চায়নার) ১৫২টি, রাইফেল জি-৩ (৭.৬২ এমএম পাকিস্তানী) ১৬৫টি, রাইফেল এনপি-৪ (৩০৩-ভারত-রাশিয়া, ব্রিটেন ও পাকিস্তানের) ২১০টি, রাইফেল (স্মলবার ২২" জেএমএম ডিলাক্স) ১টি, এসবিবি এলগান (১২ বোর) (আমেরিকা-চীন-ভারতের) ৫২টি, এলএমজি (৭.৬২ এমএম-পাকিস্তানী) ৬টি, রাইফেল (২২ বোর

ভারত-চীনের) ১৩টি, এসএমসি (৯এমএম ভারতের) ১৫টি, রাইফেল (ডাবল ব্যারেল) ১টি। এছাড়া এলএমজি টি-৭.৬২'র ৩৯ হাজার ৪০৬টি গোলাবারুদ, এলএমজি'র ২৫ কেজি বারুদ, এলএমজির ৮৬ হাজার গোলাবারুদ, বিভিন্ন ধরনের ১ লাখ ২৮ হাজার ৯৭৪টি বুলেট, সেফটিফিউজ কয়েল ৫০টি, ডেটোনেটর ২টি, প্রাইমা কর্ড ১২০ কেজি, ইলেকট্রিক ডেটোনেটর ৬৭০টি, বারুদ ২০ কেজি, গ্রেনেড ডেটোনেটর ৭৬টি এবং ৪৯৭টি গ্রেনেড জমা দিয়েছে প্রথম তিন পর্বে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৬ মার্চ ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ৯

আনন্দমুখর পরিবেশে সর্বশেষ দলের অস্ত্র সমর্পণ

মহসিন চৌধুরী/জিটেন বড়ুয়া, দুদুকছড়ি থেকে সর্বশেষ দলের অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র বিভাগের শান্তিবাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটল। ভারতের সীমান্তবর্তী বহুল আলোচিত দুদুকছড়ির একটি পাহাড়ী টিলায় আয়োজিত আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র বিভাগের হাই কমান্ডের নেতৃবৃন্দ, মহিলা ও যুদ্ধাহতসহ ২শ' ২২ জন অস্ত্র সমর্পণ করে। জনসংহতি সমিতির আত্মায়ক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমার উপস্থিতিতে এরিয়া কমান্ডার জগদীশ চন্দ্র চাকমার নেতৃত্বে সর্বশেষ দলটি অস্ত্র জমা দেয়। প্রধান অতিথি বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী মোশারফ হোসেন প্রত্যাভর্তনকারীদের স্বাগত জানান এবং সমর্পিত ৫৬টি বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ও ৫২ হাজার গোলাগুলি পরিদর্শন করেন। দুদুকছড়ি শান্তিবাহিনীর জন্য বহুল আলোচিত সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য শান্তিবাহিনীর হাই কমান্ডের মিলনকেন্দ্র ছিল এখানে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুদুকছড়ির চেহারা পাল্টে যায়। ফাগুনের হালকা রৌদ্র উপেক্ষা করে দূরদূরান্ত থেকে নারী-পুরুষরা এসেছে। সুশৃঙ্খল আয়োজন। পাহাড়ের ঢালে কিছুটা দূরে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের আগমন পথে দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে-বসে সর্বশেষ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানটি দেখেছে। অনুষ্ঠানে বাঙালীদেরও উপস্থিতি ছিল। দূর পাহাড় থেকে মাথায় সাদা-হলুদ ব্যান্ড বেঁধে শান্তির পক্ষে স্লোগান নিয়ে দল বেঁধে এসেছে অনুষ্ঠানস্থলে। পাহাড়ী ছাত্রপরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ এবং হিল উইম্যান ফেডারেশনও মিছিল করে এসেছে। শান্তির সুবাতাস যেন পুরো এ পাহাড় ছেয়ে গেছে। পাহাড়ী মেয়েরা রংবেরঙের কাপড়ে দুদুকছড়ি এসেছে।

অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনী সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন সিনিয়র ও বয়োবৃদ্ধ। তিনজনকে দেখা গেছে যুদ্ধাহত মাধবীলতা চাকমা (৬২) ছিলেন একমাত্র মহিলা সদস্য। তিনি ছিলেন শান্তিবাহিনীর মহিলা উইংয়ের প্রধান। জনসংহতি সমিতির ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার বহরে থাকলেও অনুষ্ঠানে উপস্থিতির নেতৃত্ব দিয়েছেন এরিয়া কমান্ডার জগদীশ চন্দ্র চাকমা (দেবাংশু)। জনসংহতি সমিতির প্রেসিডিয়াম সদস্য রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসীন্দু খীসা, গৌতম চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে আসেন। তবে তাঁরা তাদের পরিবারসমূহ এখনও আনেননি। অবশ্য এর আগেই সব শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে।

পর্যায়ক্রমে ৫৬টি বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র, ৫১ হাজার ৯শ' ৬৪টি গোলাগুলি জমা দেয়ার পর এরিয়া কমান্ডার জগদীশ প্রধান অতিথির হাতে তাঁর অস্ত্র (চাইনিজ এসএমজি) জমা দেন। মন্ত্রী তাঁকে সাদা গোলাপ দিয়ে স্বাগত জানান। এরপর তিনি সমর্পিত অস্ত্রগুলো পরিদর্শন করেন। শান্তিবাহিনীর সর্বশেষ এ দলটির অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র শাখার আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটল। শান্তি চুক্তি অনুযায়ী মোট ৪ দফায় ১ হাজার ৯শ' ৪৭ জন সদস্য মোট ৮শ' ৭৫টি বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ও ২ লাখের বেশি গোলাবারুদ জমা দেয়। শান্তিবাহিনীর ঘোষণার চেয়ে ১৪ জন বেশি অস্ত্র সমর্পণ করে।

প্রধান অতিথি মোশারফ হোসেনের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী, শরণার্থী বিষয়ক টাক্সফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, বান্দরবানের এমপি, সেনাবাহিনী প্রধান, স্বরাষ্ট্রসচিব, বিডিআরের মহাপরিচালক এবং বিভাগীয় কমিশনার। অনুষ্ঠান শেষে অস্ত্র সমর্পণকারীরা পর্যায়ক্রমে নিজ বাড়িঘরের উদ্দেশে রওনা হয়।

দীর্ঘ ছয় বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় দুই যুগের সশস্ত্র সংঘাতের অবসানের চূড়ান্তরূপ দেখতে পেরে পরম তৃপ্ত হংসধ্বজ চাকমা। তিনি ছিলেন যোগাযোগ কমিটির চেয়ারম্যান। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে তিনি ছিলেন, সেতু বন্ধন রচনাকারী। তাঁর নিরলস ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় দুই পক্ষকে এক করতে পারার এদিনটি ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে সফল ও আনন্দময় মুহূর্ত। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, সবচেয়ে বড়কথা একটি সংঘাতের সমাপ্তি ঘটেছে। তিনি বলেন, '৯২ সাল থেকে '৯৮ সাল পর্যন্ত ৬ বছরের বেশি সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। এসব কাজ করতে গিয়ে ৬ বার তিনি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। প্রতিদান কিছু তিনি চান না। সংঘাতের সমাধান হওয়াতেই তিনি তৃপ্ত। তবে শান্তি চুক্তিতে তাঁর স্বীকৃতি আসেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৬ মার্চ ১৯৯৮

পাহাড়ে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে

আসুক এটাই এই মুহূর্তের কামনা ॥ সন্ত লারমা

দুদুকছড়ি, ৫ মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—জনসংহতি সমিতির আহ্বায়ক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্ত লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি সমগ্র দেশের জনগণের স্বার্থে। এতে কমবেশি সকলের অবদান রয়েছে। তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান। জনকণ্ঠের সাথে সংক্ষিপ্ত এক সাক্ষাতকারে তিনি জানান, পার্বত্য চট্টগ্রামের অফুরন্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সকল ক্ষেত্রে তিনি সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। দুদুকছড়িতে সর্বশেষ দফায় অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সশস্ত্র শাখার বিলুপ্তির ঠিক আগে জনসংহতি সমিতির প্রধান জনকণ্ঠকে এ সাক্ষাতকার প্রদান করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্ত লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সকল ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ কিন্তু এখানে অফুরন্ত সম্পদ রয়ে গেছে। এ সম্পদ যদি আমরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করে সুফল বয়ে আনতে পারি তা হলে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সর্বশেষ দফায় অস্ত্র জমা দেয়া সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, এ ব্যাপারে বিশেষ কোন অনুভূতি থাকার কথা নয়। এই মুহূর্তে কামনা করছি পাহাড়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসুক, পাহাড়ী জনগণের সার্বিক উন্নতি হোক। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে সে সরকারের সাথে আমরা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছি। একটা আশা নিয়ে, এই এলাকা এবং সমগ্র বাংলাদেশের উন্নয়নের আশা নিয়ে এই চুক্তি হয়েছে। যখন সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তখন থেকেই তো শান্তির একটি বাতাবরণ শুরু হয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্যরা অস্ত্র জমা দেয়ার পর কী করবে এ প্রশ্নে সন্ত লারমা বলেন, যে সব সদস্য অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন তাঁরা সবাই জনসংহতি সমিতির সদস্য থাকবেন। জনসংহতি সমিতি আঞ্চলিক দল হিসাবে ভূমিকা রাখবে। পাহাড়ী জনগণের তথা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং উন্নতির স্বার্থে কাজ করে যাবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন এক প্রশ্নের উত্তরে সন্ত লারমা বলেন, এ মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে বেশি জরুরী।

বর্তমানে পাহাড়ী বাঙালীর মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিবদমান যে অবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছিল সেদিক বিবেচনা করে বর্তমান প্রেক্ষাপট ভাল বলা যায়।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্তু লারমা বলেন, ক্ষমতার প্রতি আমার কোন লোভ নেই। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়া বড়কথা নয়, তাঁর পুরনো পেশা শিক্ষকতাই মহান। এ পেশায় ভাল ভূমিকা রাখা যায়। মানুষের মতো মানুষ করতে শিক্ষকের ভূমিকা বেশি।

প্রকাশ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন

খাগড়াছড়ি থেকে ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি জানান, সশস্ত্র বিপ্লবের সংগ্রামী জীবনে আত্মগোপন দশা থেকে জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা বৃহস্পতিবার থেকে জনারণ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সর্বশেষ দলের অস্ত্র জমাদানের পর সন্ধ্যায় তিনি জনসংহতি সমিতির অন্যান্য নেতাদের নিয়ে খাগড়াছড়ির একটি সরকারী বাসভবনে উঠেছেন। এটি খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নবনির্মিত সরকারী বাসভবন। তাঁকে বহনকারী গাড়ির বহর দুদুকছড়ি হতে ৩৫ কিঃমিঃ দূরে খাগড়াছড়ি সদরে ফিরতে হাজারও পাহাড়ী নারী-পুরুষ দুর্গম রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে স্বাগত জানিয়েছেন।

ঠিক সন্ধ্যায় তিনি জেলা শহরে এসে পৌছান প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও দলীয় নেতাদের সাথে নিয়ে। সশস্ত্র বিভাগ বিলুপ্তির পর তিনি প্রথম জনারণ্যে প্রকাশ্যে রাত যাপন করবেন। সন্তু লারমা স্বদেশে এলেও তাঁর পরিবার এখনও আসেনি। বৃহস্পতিবার থেকে তিনি স্বাভাবিক জীবনধারা শুরু করেছেন।

THE BANGLADESH OBSERVER

The Bangladesh Observer

December 4, 1997

**2 envoys hail
CHT treaty**

Western diplomats in Dhaka on Wednesday welcomed the peace accord on Chittagong Hill Tracts, calling it a great success and significant achievement.

Giving his reaction to UNB, British High Commissioner David Walker said, "This is a very significant and considerable achievement and I congratulate warmly all those involved in recent negotiations and those in 1992 to '95."

Walker said, "They have found a political solution to a very longstanding problem."

He hoped that the quality and security of life of those people living in the Hill Tracts would be enormously improved.

French Ambassador Ms. Renee Veyret described the peace agreement as a great success and said, "I'm sure peace is going to be restored in the Hill Tracts."

The Ambassador said she had been in Khagrachhari and Rangamati a few weeks ago and talked to the people there, who were "expecting this for a long time."

"I'm very happy... What is good for CHT is also good for Bangladesh," said Renee Veyret.

She hoped that more investment will now come from outside for development in the Hill Tracts and for Bangladesh as well.

The Ambassador said France will cooperate with Bangladesh for development of the CHT. "I'm trying to help the people in CHT because they need help for their development."

The Bangladesh Observer

December 4, 1997

Amirul says

**CHT Treaty in
no way contradicts constitution**

A top legal expert has observed that the accord signed between the government and tribal leaders for peace in the Chittagong Hill Tracts "no way contradicts" the country's constitution, reports UNB.

"The peace treaty is in accordance with the Constitution," said constitutional expert Barrister Amirul Islam, participating in a

discussion programme telecast by the Bangladesh Television (BTV) (Wednesday night).

Mentioning articles and clauses of the Constitution, he said the peace accord signed Tuesday was within the existing framework of the local government provision. There was no scope for any constitutional complication, he mentioned.

The Bangladesh Observer

December 4, 1997

**JP was always in
favour of CHT
treaty: Ershad**

Jatiya Party Chairman Hussain Mohammad Ershad came back home on Wednesday after his four-day visit to Nepal, says BSS.

After his return, the JP Chairman said his party had always been in favour of the peace treaty.

He, however, said his Jatiya Party would give its reaction on the Tuesday's peace treaty after examining the pros and cons of the treaty.

Ershad said a meeting of the Jatiya Party presidium would be held today (Thursday) to review the peace treaty.

The JP Chairman said he had met King Birendra Bir Bikram Shah Dev, Prime Minister Surya Bahadur Thapa and Foreign Minister Kamal Thapa during his visit.

Those received the JP Chairman at the airport included Anwar Hossain Manju, Naziur Rahman Manju, Dr. T.I M. Fazle Rabbi MP and Munirul Huq Chowdhury.

The Bangladesh Observer

December 4, 1997

CHT people hail treaty
Chittagong Office

CHITTAGONG, Dec. 3:—The people of Chittagong Hill Tracts (CHT) hailed the signing of the historic Peace Agreement between the government and the tribal leaders with great rejoicings over the ending of the decades-old insurgency in the CHT region.

Both tribals and non-tribals welcomed the treaty as the beginning of a new era of peace and development in CHT.

Tens of thousands of jubilant people mostly from tribal families paraded the main thoroughfares in streams of processions in the three hill districts following signing of the Peace Agreement

at the Prime Minister's office in the Capital yesterday morning. They carried placards and banners and raised full throated slogans hailing the treaty. Many of them danced on the streets with joy.

The hilly people huddled in their huts with bated breath to listen to the Radio broadcast on the signing of the Peace Treaty, the positive outcome of the excruciating talks over the last one year that aimed at restoring peace in the Hill Tracts region which was ravaged by decades-old insurgency. As soon as the news on the Peace Agreement was aired by Radio the people jumped out of their houses to join the mass jubilations on the street.

People from far flung areas also came in the district Headquarters of Rangamati, Bandarban and Khagrachhari riding crammed wily model jeeps locally called "Chadder Gari" and on foot to share joys. The crowd gradually surged over and swelled into a big size in each of three hill district headquarters.

The jubilant celebrators then blasted crackers at intervals and distributed sweets among themselves all over CHT receiving the news of Peace Agreement, according to our Rangamati correspondent.

Life in the remote hilly hamlets across the CHT began pulsating too with the much-awaited news of Peace Agreement. Some elderly tribesmen even trekked to nearby tiny markets to verify the news.

At Rangamati town, a big rally was held at the premise of Local Government Council in support of the Peace Agreement. The council's Chairman Ching Kwi Rowaja attended the rally as chief guest. Besides, the ruling Awami League and its front organisations and Bengali Gano Parishad separately took out processions hailing the peace agreement, according to the report of our Rangamati correspondent.

Contrary to the outburst of popular support the Jamaat-e-Islami and BNP took out separate processions in hill district headquarters—Rangamati and Khagrachhari in protest against the Peace Agreement.

The Bangladesh Observer
December 4, 1997
More bodies hail CHT accord
Staff Correspondent

Different political parties, professional bodies, bar association, social and cultural organisations on Wednesday hailed signing of

peace accord on Chittagong Hill Tracts between the Government and Parbaitya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) on Tuesday in Dhaka.

The Left Democratic Front (LDF) in its central executive committee meeting on Wednesday called upon all concerned to help implement the peace treaty on Chittagong Hill Tracts.

Presided over by the Convenor of the LDF Bimal Biswas, the meeting said that LDF had been demanding establishment of constitutional rights of the minority communities and self administration to protect their respective religious, social and cultural rights and tradition.

The convenor of Bangladesher Samajtrantink Dal A.T.M. Mahbubul Huq in a statement on Wednesday hailed the peace treaty on Chittagong Hill Tracts. He said, the signing of this peace treaty is a positive progress towards the implementation of the constitutional rights of minorities.

Convenor of Bangladesher Samajtantrik Dal (BSD) Khalequzzaman in a statement on Wednesday said that the past regimes instead of solving the problems democratically, they rather forced the Hill Tracts into a bloody conflicts.

Giving his reaction on the peace treaty, Khalequzzaman demanded establishment of rights of the minorities in the constitution to protect the national identities.

Mr. Shamsul Huda, Director of Association of Development Agencies in Bangladesh (ADAB), the apex body of the non-governmental organisations in a statement on Wednesday, hailed the signing of the peace treaty on Chittagong Hill Tracts.

Ganotantri Party at a meeting on Wednesday said, the signing of peace treaty on Chittagong Hill Tracts will establish permanent peace there. Both tribal and non-tribals will also be able to contribute to the nation building activities the meeting added.

Syed Hasan Imam and Prof Abdul Mannan Chowdhury, Convenor and Member Secretary to respectively of National Coordination Committees for the Elimination of the killers and Collaborations of 1971 and Implementation of the Spirit of the Liberation War, in a joint statement on Wednesday said that the signing of this peace treaty would play an effective role in restoring harmony and cordial relations among the tribals and non-tribals by establishing of peace in the region.

Dhaka Bar Association at a rally on Tuesday hailed the signing of the peace treaty. The speakers of the rally said that with

the signing of this treaty, the long-outstanding unrest and misunderstanding between the tribals and non-tribals would be removed.

Presided over by Advocate Syed Rezur Rahman, President of the Association, the rally was addressed, among other by former President of the Association Faizur Rahman Khan, Advocate Shahara Khatoon, General Secretary Mohammad Nuruzzaman (Nani), Khondaker Abdul Mannan.

Prof. Mohammad Mostafa Chowdhury and Prof. Mohammad Hossain Mansoor, President and General Secretary respectively of Dhaka University Teachers Association in a joint statement on Wednesday hoped that both sides would strictly follow the clauses of the peace accord for establishing permanent peace in the Chittagong Hill Tracts.

General Secretary of Bangladesher Shayambadi Dal Dilip Barua, Siddiqur Rahman of Sramik Krishak Samajbadi Dal, Abul Khair Sajjad, General Secretary of Jatiya Sramik Jote, Bangladesh Youth Union, Prof. Dr. Makhteruzzaman and Principal Mohammad Shajahan, President and General Secretary respectively of Bangladesh College University Teachers' Association, Ramendu Majumder and Golam Quddus, President and General Secretary respectively of Sammeleta Sanskritik Jote, Bangladesh Marma Buddhist Association, Bangladesh Boudha Krishti Prachar Sangha, General Secretary Deba Priya Barua, Dr Mohammad Abdur Razzaq, Secretary General of Krishibid Institution, Bangladesh Bangabandhu Youth Society, Solidarity Bangladesh, Muktijuddher Chetana Manchaya, the Command Council for the Resistance of extreme fundamentalists, Jatiya Daridra Party and Bangladesh Karma Sangsthan Sangstha in separate statements on Wednesday hailed the signing of the historic peace treaty accord on Chittagong Hill Tracts.

They said in their statements that with the signing of this treaty, the two decades long insurgency in three Chittagong Hill Districts would bring an end for establishing permanent peace there.

Anti-Genocide Organisation a human rights body said that Chittagong Hill Tract peace treaty would contribute a lot to stop genocide and promote human rights there.

Dr. Md. Abdus Shahid, Dr. Moniruzzaman Bhuiya and Dr. Md. Nurul Islam, President, Secretary General and Treasurer respectively of Bangladesh Private Medical Practitioners

Association, Gazipur unit of Bangabandhu Parishad and the Teachers' Council of the Institute of Post Graduate Studies in Agriculture in separate statements on Wednesday hailed the signing of the peace treaty on Chittagong Hill Tracts.

The Bangladesh Observer

December 4, 1997

Jamaat rejects peace treaty

Staff Correspondent

Jamaat-e-Islami, Bangladesh rejected the Peace Treaty signed between the government and the PCJSS on Tuesday and termed it a conspiracy against the constitution, independence, national sovereignty, national integrity and national interest.

Addressing a press conference at Jamaat central office, at Maghbazar on Wednesday, Jamaat Secretary General Maulana Motiur Rahman Nizami said the agreement signed between the government and the PCJSS is nothing but a treachery with the people.

Maulana Motiur Rahman Nizami in his written statement said the so-called Peace Treaty is a "suicidal treaty" intended to separate one tenth of our territory including CHT from the rest Bangladesh.

He said Awami League has destroyed the national prestige and sovereignty by signing this treaty. He said people will not accept this treaty which is against the interest of nation and meant to satisfy India.

Maulana Motiur Rahman Nizami said the government would have no control on CHT if this Peace Agreement is implemented. Moreover it will pave the way for establishing Chakma land.

The Jamaat leader also said the AL government has given power in the Peace Agreement to PCJSS to challenge our national Parliament. He also said the government virtually handed over the Chittagong Hill Tracts to the insurgents through their commitment to withdraw 70 camps and 547 army camps. This will enable neighbouring India to hatch conspiracy to destroy our national sovereignty. He said the government has shown disrespect to national army which protected national integrity and sovereignty for long time. The Assistant Secretary General AHM Quamaruzzaman and Office Secretary Abdul Kader Molla and other Jamaat leaders were present in the press conference.

The Bangladesh Observer

December 4, 1997

BNP, allies

call hartal on Sunday

Staff Correspondent

Bangladesh Nationalist Party (BNP) and its rallies including Jamaat-e-Islami have called a countrywide dawn-to-dusk hartal on Sunday in protest against what they said signing of "black" treaty by the Government with Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity, the political wing of Shanti Bahini insurgents. They termed the peace agreement as anti-constitution.

Chairperson of Bangladesh Nationalist Party (BNP) and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia on behalf of seven political parties announced a four day action programmes including hartal on Sunday at a press conference at her official Minto Road residence on Wednesday evening.

The four-day programmes include demonstrations and allies in the capital and five other divisional headquarters today (Thursday), processions and demonstrations at thana and divisional headquarters on Friday, rallies and torch processions in districts and metropolitan cities on Saturday and countrywide dawn-to-dusk hartal on Sunday.

The Bangladesh Observer

December 5, 1997

BCS Foreign

Assoc hails CHT treaty

Bangladesh Civil Service (BCS) Foreign Affairs Association on Thursday hailed the landmark peace accord between the Government and the PCJSS, says BSS.

The Association expressed the hope that the agreement would bring an end to insurgency that lasted for the last two decades in the Chittagong Hill Districts, a release of the Association said.

It said "the agreement will have a most positive impact on national unity, solidarity and development. It will also help project Bangladesh to the international community as a nation worthy of honour and respect for its ability to bring an end to a long drawn out insurgency through peaceful means".

The Association hailed Prime Minister Sheikh Hasina for bringing an end to insurgency following signing of peace agreement on Chittagong Hill Tracts and said "this will help our nation move a

step forward towards materialisation of the vision of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for building Sonar Bangla...a nation of peace with itself and with the world.

The Bangladesh Observer

December 6, 1997

More hail CHT treaty

Staff Correspondent

More political, social and professional organisations in separate statements on Friday hailed the "peace treaty" signed between the Government and Shanti Bahini to end the two-decade old burning issues of Chittagong Hill Tracts on Tuesday last.

The organisations include National Christian Fellowship of Bangladesh, Bangladesh Jatiya Hindu Parishad, Bangladesh Gram Theatre, Bangladesh Gano Azadi League, Naogaon District Awami League and Bangladesh Workers Party.

They termed the treaty as a historic and grand success of the government of Prime Minister Sheikh Hasina and said that our independence and sovereignty which were under threat for two decades due to frequent attacks by insurgent Shanti Bahini people from outside the country would be further consolidated and well-protected due to the peace agreement.

They said the treaty is the second major achievement of the present government after the "Ganges water treaty" and it was proved through signing the two treaties that the government of Sheikh Hasina is very much sincere to resolve all long-standing problems of the country to make progress and prosperity of the nation.

They ruled out the observation made by some quarters that the treaty was unconstitutional. But they claimed that the CHT peace treaty was made in accordance with the Constitution.

They called upon all to extend help and cooperation to implement the treaty and restore normal life in CHT.

The Bangladesh Observer

December 6, 1997

Australia hails Peace Accord

Australia has welcomed and congratulated the historic Peace Agreement between Bangladesh government and tribal people of Chittagong Hill Tracts, reports UNB.

"I congratulate the government and people of Bangladesh on the signing of the historic Peace Agreement between the government and the tribal people of the Chittagong Hill Tracts," said Australian Minister for Foreign Affairs Alexander Downer in a statement from Ottawa on Friday.

"This event promise to end over two decades of armed insurgency in the CHT and establishes an administrative structure to meet the desire of the tribal peoples for enhanced autonomy," the Minister said.

The statement which was released by the Australian High Commission in Dhaka said "The agreement represents a significant achievement for Bangladesh and the Australian government recognises the commitment and dedication that Bangladesh government have brought to negotiations since 1986."

We hope that the Peace Agreement will bring about a durable peace in the region.

The Bangladesh Observer
December 6, 1997
Workers Party
welcomes CHT treaty

Workers Party Friday welcomed the signing of peace agreement on Chittagong Hill Tracts.

It also strongly opposed the stands of BNP, Jamaat-e-Islami and other rightwing groups about the accord, saying the statements of those parties are highly communal and politically motivated.

The Workers Party gave the reaction after its standing committee meeting with President Amal Sen in the chair.

The meeting said the peace agreement has been signed following the discussions the previous governments held with tribal leaders.

It expressed the hope the accord would remove the threat against country's integrity and sovereignty and end the hostile activities by Shanti Bahini.

Reviewing the various aspects of the agreement, the meeting said it has been signed by improving the Hill Tracts District Local Government Council Act of 1989 which the Shanti Bahini had so long declined to accept.

The meeting said it is ill motivated to say that the Constitution was violated by signing the agreement. It, however, criticised the

ruling party for not taking into confidence other parties before signing of the accord.

Workers Party leaders Rashed Khan Menon, Haider Akbar Khan Rono, Bimal Biswas and Nurul Husan were present in the meeting.

The Bangladesh Observer
December 7, 1997
BNP, allies call
countrywide hartal today
Staff Correspondent

Bangladesh Nationalist Party (BNP) and its six allies including Jamaat-e-Islami and Jatiya Party (Zafar-Moazzam) have called a nationwide dawn-to-dusk hartal today (Sunday) in protest against what they said signing of "black" treaty on Chittagong Hill Tracts by the Government with Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia on behalf of the seven political parties announced the hartal programme at a Press conference at her official Minto Road residence on Wednesday. Ambulance, transports of the newspapers and law enforcing agencies and medicine and foods shops are exempted from the hartal.

Some other political parties including Bangladesh Islamic Party, Nezam-e-Islami Party and Ganotantrik Sharbahara Party have lent their support today's (Sunday) hartal programme.

Torch procession

UNB adds: BNP brought out torch procession from different parts of the city on Saturday in support of their today's (Sunday) nationwide hartal.

The main torch procession was brought out from the BNP city office at Nayabazar in the evening. BNP leaders Abdullah Al Noman, Khandaker Delwar Hossain and Mirza Abbas led the procession.

However, five of the processionists suffered injury as they entangled in a clash that ensued following pelting of stones on the procession by some people at North South road. The procession was dispersed there.

The trouble makers damaged several vehicles during the clash.

Meanwhile, a BNP Press release alleged that the Awami League supporters attacked their peaceful procession. Chhatra Dal workers Al Amin and Monir were injured in the attack, it said.

BNP Secretary General Abdul Mannan Bhuiyan in a statement condemned the incident and demanded immediate arrest of the 'terrorists' who attacked the procession.

Torch processions were also brought out from Mirpur, Farm Gate, Tejgaon and Badda.

The Bangladesh Observer

December 7, 1997

SSJ rally told

CHT treaty in line with Constitution

Speakers at a rally in Dhaka on Saturday observed that the peace accord signed between the Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) was very much in line with the Constitution and it has paved the way for a permanent solution of over two decades of armed insurgency problem in the Chittagong Hill Tracts (CHT), reports BSS.

The accord was not signed under an executive order from the President or the Prime Minister, rather the National Committee formed in Parliament reached an understanding to solve the problem and sign an agreement in this regard, Executive Chairman of Bangladesh Bar Council Barrister Amirul Islam told the rally organised by Sammilito Sangskritik Jote (SSJ) to felicitate the peace accord.

Chaired by President of SSJ Ramendu Majumder, the rally was addressed by central leader of Jatiya Samajtantrik Dal (JSD) Kazi Aref Ahmed, Left Democratic Front leader Comrade Morshed Ali, SSJ leaders Nasiruddin Yusuf and Golam Quddus.

Barrister Amirul Islam said the peace accord was signed in continuation of the initiatives carried out by the past governments. The National Committee led by Col (Rtd) Oli Ahmed held discussions 13 times with the PCJSS to bring an end to the CHT crisis.

Refuting BNP's allegation, Barrister Amirul Islam said that the proposal to form Parbattya District Council in the peace accord was Constitutional as there was provision in Articles 59 and 60 of the Constitution to establish local government administrations for socio-economic development.

He said the then government of President Ershad formed three district councils in the hill tracts in 1989 following the same Articles of the Constitution, but, BNP did not repeal the three district councils during its regime, he pointed out.

Barrister Amirul Islam said, the proposed Parbattya District Council will, in fact, act as a coordinator of the three district councils.

He said the peace accord has opened a window to economic development of the region, as well as the country. The foreign investors have shown keen interest to invest in a bigger way in oil and gas exploration due to the Government's initiative to create a congenial investment climate, Islam said. But, narrow political intents are now becoming hindrances to such initiatives, he observed.

The noted constitutional expert Barrister Amirul Islam urged the opposition political parties to discuss all issues in the Parliament for resolution.

Kazi Aref Ahmed urged the government to apply its best endeavours to implement the peace accord signed between the Government and the JSS. The peace agreement will bring about a durable and lasting settlement to this long running problem, he said.

Kazi Aref criticised BNP for misleading the people by making false statements and said the government has signed the peace accord as per Constitution. The agreement is not violative to any clause of the Constitution, he added.

Renowned cultural personality Ramendu Majumder said Begum Zia wants to keep alive the abnormal situation in the CHT in the interest of certain vested groups involved with trafficking of drugs and arms.

He said with the signing of the peace agreement one-tenth land of the country has been freed, instead of being lost, as alleged by BNP.

UNB adds:-The Dhaka University Teachers' Association (DUTA) on Saturday urged the opposition political parties to shun the politics of hartal and resolve all problems through discussions.

In a statement, the association said if the peace treaty on Chittagong Hill Tracts violates the Constitution, then it is desirable that the issue would be discussed in the Parliament, not on the street.

The peace agreement between the government and the tribal leaders is being hailed not only locally but also by the international community, said the statement signed by DUTA President Prof M Mostafa Chowdhury and Prof M Hossain Mansur.

BSS Adds:—Justice KM Sobhan, Chairman of the Human Rights International (Bangladesh) and Advocate Shah Khasruzzaman, Executive Secretary-General of the organisation on Saturday expressed their satisfaction over the signing of the peace treaty between the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati (PCJSS) ending insurgency in the Chittagong Hill Tracts area.

In the statement they hoped that the mutual trust and confidence that made the landmark treaty possible will also help towards materialisation of its terms. Once materialised, the treaty will definitely usher in a new era of social, political, economic and cultural development and integration not only in the Hill Tracts area but also in the country as a whole, the statement observed.

Buddhist Assoc

BSS further adds:—More socio-political and cultural organisations on Saturday hailed the peace treaty to end the decades old conflict in the Chittagong Hill Tracts.

Bangladesh Buddhist Association in a statement said the accord would strengthen the bondage of brotherhood and communal harmony among all and accelerate the development process of the country.

We congratulate Prime Minister Sheikh Hasina as well as those including the previous governments who directly or indirectly helped in reaching the agreement", President and General Secretary of the Association's Dhaka Branch Dr. Kanok Kanti Barua and Swapan Barua Chowdhury said.

Bangladesh Muktiyoddah Smurity Sangrakkhan Sangsad in a statement called the opposition's today's strike call as a part of a conspiracy against the country's stability and peace.

The statement welcomed the treaty as a "milestone" towards development and urged the people to protect the accord from all conspiracies.

The Bangladesh Observer

December 7, 1997

Ershad against CHT regional council

Jatiya Party Chairman HM Ershad has protested the proposed regional council in the CHT, saying that it would curtail the power of the government, reports UNB.

"Instead of regional council, there should have been a hill tracts division with three hill districts," he told a religious gathering at Jummapara Nurul Ulum Madrasha in Rangpur on Saturday.

Ershad reiterated that his party would not accept any deal against the interest of vast majority of the people. It would not be possible to implement the Peace Accord, if confusion about it could not be removed, he said.

The former President said "We were in favour of the Peace Agreement. But we cannot agree on some points of it. So we demand amendments of the accord."

The Bangladesh Observer

December 7, 1997

CHT students hail peace accord Staff Correspondent

The Dhaka Unit of the Greater Chittagong Hill Tracts Hill Students Council in its 8th Council meeting on Saturday, hailed the signing of Peace Agreement on Chittagong Hill Tracts between the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

The council demanded of the government to properly implement the agreement. A 21-member Executive Committee for Dhaka Unit of Greater Chittagong Hill Tracts Students' Council was also formed with Shanti Moni Chakma, Ushingmaung Marma and Santosh Tripura as President, General Secretary and Treasurer respectively.

The Council meeting was addressed by the Central Committee leaders including Biplab Chakma, Jiten Chakma and Matraching Chakma.

The Bangladesh Observer

December 7, 1997

Call to resolve issues in Parliament Hasina urges BNP to shun politics of hartal Staff Correspondent

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday called upon the major opposition BNP to return to parliament by shunning the "path of

hartal and agitation on the streets" in order to resolve issues through discussion in the House.

She said that her Government wanted to discuss everything in parliament including the mistakes if they committed. She added that there was no shame to acknowledge and correct mistakes.

Addressing as the chief guest a discussion meeting at the Institution of Engineers organised by Awami Jubo League in connection with the observance of 25th founding anniversary of the organisation and 58th birth anniversary of its founding Chairman Sheikh Fazlul Haque Moni, she said that there was enough scope for the opposition in the House to discuss about the peace treaty.

She said that in present parliament, the Treasury Bench had accepted and passed many amendments and bills tabled by the opposition BNP members. While, she recalled, BNP did not accept or pass any bill tabled by Awami League MP's in last parliament.

She criticised the BNP for calling hartal in protest against the peace treaty on Chittagong Hill Tracts and asked "Does the BNP not want peace in CHT"? She also blasted the BNP for failing to resolve the problems in CHT during its five-year term.

Sheikh Hasina said that her Government had signed the peace treaty in order to settle the long-standing problems in the Chittagong Hill Tracts region to kick-off socio-economic development of the people both tribals and settlers living in CHT region.

She lashed out at BNP for launching propaganda campaign against the peace treaty that was signed between the present Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) on Tuesday last. She said that people now see that Bangladesh territory from Feni upto Chittagong Hill Tracts had not been annexed to India after the signing of the peace treaty.

She alleged that BNP had resorted to destructive political activities since her Government had been resolving long-standing national issues like the sharing of Ganges water with India in December last year. For whose interest the BNP has chosen the policy of "destruction"? She asked and said that her Government had been trying to resolve the national problems with a view to taking steps towards meeting urgent need for alleviation of poverty and hunger from society.

The Bangladesh Observer

December 8, 1997

AL CWC welcomes

CHT peace accord

Awami League Central Working Committee on Sunday welcome the peace treaty and thanked the PCJSS, tribals and Bangalees in the hill tracts for making commitment to return to peaceful life by surrendering arms, showing allegiance to independence, sovereignty and Constitution of the country, reports BSS.

The Working Committee at an emergency meeting held at Ganobhaban in the evening with Sheikh Hasina in the chair observed that all classes of people, pro-liberation political parties, professionals, cultural and human rights organisation as well as tribals and a non-tribals welcomed the agreement barring a certain quarter.

The international community, United States, Britain, France, Australia, Japan and other foreign countries also welcomed the peaceful political solution of the longstanding problem, it said

Already, the meeting informed, donor agencies have come forward to cooperate with the government for the development of Chittagong Hill Tracts.

The signing of the treaty once again proved that if there is firm political commitment, accountability and sympathy for the people, any complicated problem can be resolved through peaceful negotiation, it observed.

The meeting said the government of Prime Minister Sheikh Hasina has enhanced the image of the Bengali nation by resolving the 21-year-old CHT problem politically without shedding a drop of blood after settling the Ganges Water Sharing Treaty.

It said when people in the country and the international community amid enthusiasm welcomed the treaty, BNP and its anti-liberation allies, including Jamaat, have united against the peace and involved in a heinous conspiracy to destabilise the situation by issuing imaginary fabricated and misleading statements.

They have been exposed to the people after signing of the treaty which has been made public through newspapers. As a result BNP and its allies have become imbalanced and resorted to destructive activities, including unreasonable hartals.

"People remain complete alert against BNP's evil design which is detrimental to the national interest," it said.

The meeting alleged that the BNP has been creating artificial and baseless issues one after another to create chaos and discourage domestic and foreign investment.

"Being envious of the success of Sheikh Hasina's leadership, BNP is engaged in conspiracy to unseat an elected government. People will give a befitting reply to it."

The AL Working Committee, however, reiterated its call to BNP to give up the path of conspiracy and anarchy, return to parliament and play its due role as responsible opposition by joining open discussion on national issues.

The Bangladesh Observer
December 9, 1997
Indian dailies
hail CHT peace accord

NEW DELHI, Dec 8:—A leading Indian daily 'The Hindu' today welcomed the recently signed accord between the Bangladesh government and the Parbattya Chattagram Jana sanghati Samity (PCJSS) and described it as major achievement of the Sheikh Hasina regime, reports BSS.

In an editorial the paper said the 68-point agreement signed by the chief negotiator of the Bangladesh government, Hasnat Abdullah and Chittagong Hill Tracts (CHT) leader, Jyotindra Bodhi Priya, is indeed a historic accord.

The accord, the editorial said, holds promise to end the two-decade old insurgency in the hill areas which has claimed over 20,000 innocent lives.

That the accord has been signed in the presence of the Bangladesh Prime Minister, her cabinet colleagues and other dignitaries, apart from members of tribal delegation, clearly proves that Dhaka is now earnest in trying to restore peace in the Chittagong Hill Tracts, the paper said.

The editorial said that the Opposition BNP led by Begum Khaleda Zia has made the accord a political issue stating that it is a "conspiracy" to hand over the CHT to India and even it called a hartal in Dhaka to protest against the accord, ignoring the ethnic and cultural realities of the hill areas.

Prolonged ethnic strife in the hill areas had hit the development of the region "persisting with its opposition to the accord, the BNP, as the main opposition of the nation, only serving narrow political ends", the paper said.

It said the recent visit of an official Bangladesh team to finalise the modalities for repatriation has raised hopes that the remaining refugees would be able to return to their homeland soon.

Earlier, in another editorial, "The Hindustan Times" hailed the accord and said the government of Sheikh Hasina and leaders of Chittagong tribal insurgency have shown commendable pragmatism in signing the landmark agreement to end two decades of hostilities in the Chittagong Hill Tracts.

"The Awami League government must be congratulated for finding an amicable solution to the seemingly intractable question of tribal insurgency almost immediate after assuming office, the paper said.

It said the opposition leader, Begum Khaleda Zia's outburst against the peace pact is not entirely unexpected. "In Bangladesh, politics is so polarised that everything that the government does would be attacked by the BNP".

The editorial described as "patently absurd" the charge of Begum Zia that the deal would help New Delhi gain control over the territory of greater Chittagong upto Feni (Begum Zia's constituency).

The paper said "incidentally her (Begum Zia) husband Gen Ziaur Rahman actually started the policy of alienating the Chakmas".

It said the BNP government assured New Delhi from time to time that Chakma refugees would be welcome back home but she did precious little to create a conducive atmosphere for their repatriation.

The Bangladesh Observer
December 9, 1997
CHT treaty legal,
says Law Minister
Staff Correspondent

Minister for Law and Parliamentary Affairs Abdul Matin Khasru outright rejected on Monday the opposition contention that the peace treaty on Chittagong Hill Tracts (CHT) was ultra vires of the Constitution.

In a straight rebuttal of the opposition logic that the creation of a regional council for CHT had upset the unitary structure of the Government and curtailed the law-making rights of parliament, the

Minister told the Bangladesh Observer that it has been provided for in the peace treaty as per Articles 59, 60 and 29 of the Constitution governing formation of such councils for people of backward areas of the country.

What is of utmost interest for the nation is that it has brought an end to bloodshed, conflict and conflagration after long 21 years and restored peace in CHT. This has saved the Government a recurring expenditure of roughly 700 crore Taka every year to contain the insurgents. The Minister disclosed during the past 21 years the Government had to incur an expenditure of Taka 14,700 crore from the national exchequer to contain the insurgents.

Turning to the opposition objection to the provisions in the peace treaty on constitutional grounds he said the Article 59(1) states Local Government in every administrative unit of the Republic shall be entrusted to bodies composed of persons elected in accordance with law and everybody such as is referred to in Clause (1) shall be subject to this Constitution and any other law and perform within the appropriate administrative unit such functions as shall be prescribed by Acts of parliament.

Thus the regional council for Chittagong Hill Tracts sought to be formed is very much within the framework of the Constitution, the Minister said.

The Article 29 of the Constitution makes it abundantly clear that there shall be equality of opportunity for all citizens in respect of employment or office in the service of the Republic and that no citizen shall on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office in the service of the Republic.

Thus it is quite clear that special provisions have been made in the constitution in the interest of people of CHT which is a backward area. In other words, these special provisions have been made to bring people of backward area at par with their counterparts of the developed area. The peace agreement on CHT provides for creation of the Ministry for CHT affairs and the regional council for CHT to remove the inequality between the people of CHT other parts of Bangladesh and in no way do they run counter to the spirit of the Constitution, the Law Minister stated.

He said such provisions are made all over the world to deal special situations. He made a pointed reference to Moro rebels in the Philippines. The Government of the Philippines has created an

autonomous council for Mindanao province and appointed Noor Misuari as the head of that autonomous council with the rank and status of governor to deal with Moro rebels. But that provision neither undermined the Constitution of the Philippines nor did it subvert the sovereignty of that country.

France has a unitary government. But it created a Ministry for Overseas Department Territories. Similarly, Australia has created a Ministry for Aboriginal Affairs. The creation of these ministries has not made any dent on the unitary structures of the government of France and Australia. The regional council for CHT provided for in the peace agreement will be collectively responsible to Prime Minister and to parliament of Bangladesh, the Law Minister said. Those who are raising hue and cry on these provisions in the peace treaty are, in fact, suffering misconception of law.

The Law Minister said the present Government has been mandated for five years to conclude any treaty in the interest of the people without contravening the Constitution. "We are under no obligation to place internal treaty we conclude before the parliament. We are certainly under an obligation to place international treaty we conclude before the parliament for debate and discussion. Since the peace treaty on CHT is an internal treaty, we are not required to place before the parliament. But we are ready to table it before the House for discussion. Let the opposition return to the parliament and discuss it threadbare and present their viewpoint" the Minister added.

The Bangladesh Observer

December 9, 1997

AL concern over

false propaganda

against CHT accord

Staff Correspondent

Awami League has noted with concern that the opposition BNP and the identified anti-liberation forces like Jamaat and Shibir launched a campaign of slander and mounted a false propaganda to undermine the peace treaty on CHT concluded after years of fratricidal conflict and bloodshed.

The meeting of the Presidium was presided over by the Acting President of the Presidium Ameer Hossain Amu on Tuesday at Dhanmondi office of the party.

According to party press release, the meeting stated the peace treaty had been made possible due to political sagacity and foresightedness of Prime Minister Sheikh Hasina.

The meeting noted with satisfaction that the treaty had been hailed by the international community.

It also denounced hartal inflicted on the nation on December 7-the day marked for vaccination of children and again hartal on December 11 and 12 on Chittagong and Chittagong Hill Tracts on the same issue.

The hartal called by BNP on December 10 and 11 at Chittagong was intended to paralyse country's export-import trade. Similarly the hartal on CHT was aimed at creating rift between tribals and non-tribal settlers. All these activities of BNP are intended to create despair and disorder in the country.

Awami League Presidium concluded with a call to people, particularly pro-liberation political parties, social and cultural organizations, to be alert against the conspiracies being hatched against sovereignty and independence of the country.

The Presidium adopted a resolution in condole the deaths in the bus accident at Jalakathi.

The Bangladesh Observer
December 11, 1997
**Kamal demands
consensus on CHT accord**

Gano Forum President Dr Kamal Hossain on Wednesday said solution to the debate over the recently signed accord on Chittagong Hill Tracts lies in a fruitful discussion and national consensus for the sake of national security, reports UNB.

If, no understanding can be reached, help of the Supreme Court can be taken for the answers on complicated legal matters, he said addressing a public meeting at Paltan Maidan in the afternoon.

The Supreme Court holds the authority and right for giving solution to complicated legal matters as it has the power of giving the last word on the Constitution, said Dr Kamal, a noted jurist.

He, however, appealed to the Parliament Speaker to take initiative for a dialogue between the political parties, having representation in Parliament, to discuss the accord.

The President, he said, can also take steps for establishing a national consensus on the ongoing debate about the accord by involving personalities whom he considers necessary.

The Gano Forum chief said when one side is saying that everything about the agreement was done as per the Constitution, the other group is giving a totally opposite view.

The process of establishing peace is becoming more complex with the contradictory views and statements, he added.

Dr Kamal categorically said hartal and unrest cannot bring solution to the crisis. But as debate has cropped up that some of the clauses of the accord are contrary to the Constitution and existing laws, it should be resolved on the basis of national consensus identifying the point of differences.

He said people of Bangladesh want peace in the CHT as well as in the whole country.

Without naming, the Gono Forum leader said both the major political parties are busy in mud-slinging against each other, ignoring the rights of people and forgetting the national interest.

"Implement the agreement by shunning all differences", he urged the political parties.

The meeting, organised to observe the "Fall of Autocracy Day", was addressed, among others, by Forum leaders Saifuddin Ahmed Manik, Maulana Ahmedur Rahman Azmi, Mostafa Mohsin Mantu, Matin Chowdhury. Engr Abul Kashem and Sarwar Hossain.

Maj Gen (retd) Khalilur Rahman and Nurjahan Murshid attended the meeting.

Reading out the resolution of the meeting, Gano Forum leader Saifuddin Ahmed Manik said the party will observe a countrywide "Demand Day" on February 10 by holding meetings, rallies and processions.

In the resolution, the Gano Forum demanded removal of political conflicts and reaching understanding on national issues submission of statement of assets by ministers, MPs and bureaucrats, repeal of all black laws and separation judiciary from the executive.

The Bangladesh Observer
December 12, 1997
PM spends very busy day
**Annan lauds CHT accord,
Ganges water treaty**

TEHRAN, Dec 11:- Prime Minister Sheikh Hasina spent a very busy day on the concluding day of the OIC summit here today meeting a number of dignitaries attending the summit, reports BSS.

She met with Malaysian premier Mahathir Mohammad, Palestine President Yasser Arafat, UN Secretary General Kofi Annan, Crown Prince of Saudi Arabia Prince Abdullah, President of the Sudan Omar Hossain Ahmed Al-bashir.

During the meeting with Mahathir Mohammad the two leaders exchanged views on matters of bilateral relations. They also discussed the coming D-8 Summit in Dhaka.

Palestine President Arafat and Sheikh Hasina met for the second time during the summit and discussed matters of mutual interest.

During her meeting with the Sudanese President the two leaders agreed to further strengthen the friendly ties between the two countries.

Mr. Bashir said that Sudan and Bangladesh have age-old relations and it should be harnessed further.

Prime Minister Sheikh Hasina stressed that the developing countries of the Muslim Ummah should work with each other for improving the standard of living of their peoples.

The UN Secretary General, Kofi Annan, praised Sheikh Hasina's role in the government of women in Bangladesh. Sheikh Hasina referred to the signing of the water sharing treaty with India and the recent peace agreement for ending strife in the Chittagong Hill Tracts.

Appreciating her role, Mr. Annan said the signing of the water treaty is a positive development in the region.

"This is a positive contribution by you to the maintenance of peace in the region," Mr. Annan told Sheikh Hasina.

On the Chittagong Hill Tracts peace accord, Mr. Annan said "I congratulate you for taking such a bold step for Chittagong Hill Tracts."

The Prime Minister referred to the construction of the proposed Ganges Barrage for proper utilisation of the water resources.

Prime Minister Sheikh Hasina said that her government got positive response from the Japanese government and the Asian Development Bank in this regard.

On the question of empowering of woman, the UN Secretary General said it was encouraging to know that in Bangladesh women were taking part in development activities at the grass-roots level.

He was informed that some 40,000 women were contesting for about 13,000 women seats in the local body election.

Sheikh Hasina referred to the growth triangle and said that no country can live in isolation. "In the inter-development world we must work together to develop ourselves," she said.

During the meeting with the Saudi Crown Prince the two leaders exchanged views on matters of mutual interests.

Foreign Minister Abdus Samad Azad, Foreign Secretary Mostafizur Rahman, Press Secretary to the Prime Minister Jawadul Karim and Bangladesh Ambassador to Iran Syed Muazzem Ali were present.

The Bangladesh Observer

December 13, 1997

Bangladesh given rare honour at OIC summit

BNP creating unrest in country

over CHT issue: PM

Staff Correspondent

Prime Minister Sheikh Hasina Friday accused the main opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP) and its allies of creating unrest and disturbance in the country over the issue of Chittagong Hill Tracts (CHT).

"The opposition BNP does not want peace and the resolution of Chittagong Hill Tracts problem only to serve the cause of the arms and drug smugglers", said the Prime Minister at a Press conference at the VVIP lounge of Zia International Airport on her return from the Summit of the Organisation of the Islamic Conference (OIC) in Tehran, Iran.

Prime Minister Sheikh Hasina left Dhaka on Monday for Tehran to attend the Eighth Summit of the OIC. She was accompanied by Foreign Minister Abdus Samad Azad at the summit.

The Prime Minister termed the role of Bangladesh Nationalist Party (BNP) on the peace agreement on CHT "very unfortunate". She said that the opposition was spreading falsehood and canards in the country to misguide the people. Posing a question, Sheikh Hasina said how these parties could resort to lies and falsehood when they believed in Islam and Allah.

The Prime Minister referring to the agitations of BNP and its allies on the CHT peace agreement said that they were calling hartals and blockades to increase the people's sufferings. She wanted to know from BNP and its allies about their issue. Making an oblique reference, Sheikh Hasina said BNP could not stick to any issue so far. All their issues were rejected by the people, she commented.

The Prime Minister called upon the opposition BNP to refrain from making the CHT peace accord an issue of their agitation as it aimed at ending the war-like situation in the hill districts. She said that a war-like situation in the country could not be deserved by any citizen.

The Prime Minister said that what BNP could not do in its five-year rule, Awami League government made it in 17 months and signed the peace accord with Parbattya Chattagram Janasanghati Samity (PCJSS).

She said that the success of the Awami League government should not cause heart burning to BNP. Hasina said that the opposition BNP was agitating only to hide its failure on CHT issue.

The Prime Minister explaining the conclusion of CHT peace agreement said that it was necessary to develop tourism, exploit the vast natural resources lying underneath the soil of CHT. She said the country needed the exploitation of gas and oil resources of CHT for the overall development and prosperity.

Sheikh Hasina ridiculed BNP for their shedding of crocodile tears for the settlers. She said "when BNP goes to CHT they call the settlers Bangalee and outside the CHT all are Bangladeshi" she called the politics of BNP as contradictory in itself.

Replying to a question, Sheikh Hasina said Ershad was inconsistent in his words and deeds. She said the people of the country know what he is. She advised Ershad to go through the Constitution before calling the peace agreement ultra vires of the Constitution. She pointed out that a Jatiya Party MP was a member of the national committee on CHT.

Sheikh Hasina answering a question said that the people of the country would know about the peace agreement concluded by the present government as well as the proposals made by BNP on CHT when both would come up for discussion in Parliament. She told it while commenting on the denial of BNP Secretary General Mannan Bhuiyan that BNP had ever proposed autonomy to CHT during talks with PCJSS.

When a correspondent wanted to know whether a third country was behind the opposition's agitation on CHT, the Prime Minister avoided a direct reply and said "the people know who is doing what in the country". She ruled out the possibility of special session of Parliament as BNP made it conditional.

The Bangladesh Observer

December 13, 1997

Bangalees won't be withdrawn from CHT, says Mohiuddin

CHITTAGONG, Dec. 12:— Co-Chairman of the National Committee on Chittagong Hill Tracts (CHT) Affairs and Chittagong City Mayor Alhaj A.B.M. Mahiuddin Chowdhury today categorically said that there was no provision in the peace treaty that Bangalee settlers will be withdrawn from the regions of CHT, says BSS.

"On the contrary, the rights of all inhabitants of the CHT irrespective of cast, creed and religion was ensured in the peace agreement", the Mayor said this while addressing a series of way side meetings at Tabalchhari, Reserve Bazar and Banarupa at Rangamati hill town here today.

But he regretted that BNP, Jamaat and other anti-liberation and communal forces are leaving no stone unturned to mislead the people by misinterpreting the peace treaty.

He said we have reached a peace accord as a continuation of peace dialogue that the BNP started in 1992 but difference is that what BNP had failed to do so in three years we have completed it only by one year. And that is the reason of its heart burn, the Mayor said.

Mahiuddin Chowdhury said the peace treaty which was signed to end decades long arms insurgency in CHT was widely welcomed and acclaimed by people of all strata especially tribals and non-tribals of CHT.

Even foreign countries and donor agencies have extended their whole hearted support to the peace treaty, Mahiuddin Chowdhury said adding that with the completion of the peace accord a new horizon of development opened up in CHT through exploration of vast natural resources and development of tourism.

He posed several questions to BNP that why Chittagong was chosen as the connoisseur of hartal if the party has special attention toward the port city. He said the people now very much understood the negative and destructive activities of BNP.

The wayside meetings were addressed among others by Chairman of Rangamati Local Government Council Ching Que Rowaja and Dipankar Talukdar MP.

The Bangladesh Observer

December 13, 1997

**Three German
dailies hail CHT accord**

Leading German dailies have hailed the peace accord on Chittagong Hill Tracts and called the opposition campaign against the agreement as a part of destructive politics, says UNB.

Neues Deutschland, a daily published from Berlin ran a story a day after signing of the agreement with heading "Historic Pact with the Chakmas".

The newspaper wrote "the agreement offers a compromise. Its core is the obligation of all sides to realise the resettlement programme correctly, not only for the clan people. But especially for the returning refugees, as also for the Muslim settlers."

The Junge Welt, another daily of Berlin, published an article, saying "The coalition government led by the Awami League under the leadership of Sheikh Hasina Wazed, has managed to make a compromise with the representatives of the Chakmas.

It said, the signing of the agreement would pave the way to the development of the Chittagong Hill Region, which has been neglected up till now, and to the improvement of the living conditions of the Chakmas.

Bangladesh would profit from this act as it would have peace and quiet at long last in the border region to Myanmar and India and would be able to save the amounts frittered away in the war.

Mass circulated daily of the Gulf region, Khaleej Times made its headline "Peace-Maker Hasina". It said: The peace accord between Dhaka and tribal rebels may not quite match the fizz and drama of the political development in New Delhi and Islamabad. But it is possibly the best piece of news to emerge in many weeks from the subcontinent.

Like all peace agreement this one too needs to be given some time before results can be expected, the paper commented.

The Bangladesh Observer

December 13, 1997

**Accord within
CHT act of '89: Suranjit**

KHAGRACHARI, Dec. 12:— The Prime Minister's Parliamentary affairs advisor, Suranjit Sengupta, here today said the recent peace

agreement on CHT was made within the framework of the Chittagong Hill Tracts Local Government Parishad Act of 1989, says UNB.

"The CHT local government Act of 1989 was a law and the recently signed one is an agreement," he said exchanging views with local political leaders and civil and military officials at the Circuit House.

Suranjit Sengupta, Food and Agriculture Minister Begum Motia Chowdhury and State Minister for Youth and Sports Obaidul Kader along with Chittagong Area commander Maj Gen Abdul Matin flew in here this morning.

The PM's parliamentary affairs advisor called upon all to work unitedly to implement the agreement for establishing peace in the Hill region and also in the country.

Begum Motia Chowdhury said a vested quarter is opposing the peace accord and making statements about it to "mislead" the people.

"People want peace," she said and hoped that propaganda against the accord would soon run out of steam.

Saying if the rights of Bangalees in the CHT were curbed by this agreement as alleged by the vested quarters, the food and agriculture minister asked: How are they exercising their voting rights in the UP elections?

She termed the recently signed accord on CHT "an honourable agreement."

Obaidul Kader told the meeting that the government's objective was to establish peace which, he said, was achieved politically.

The government leaders later sat with the civil and police administration and took note of the overall law and order situation of the hill districts.

Begum Motia Chowdhury stayed back at Khagrachhari, officials said. She will stay there till Sunday, they added.

Five other ministers are likely to visit Khagrachhari on Monday (December 15).

The Bangladesh Observer

December 18, 1997

**Ershad's call
to send CHT treaty to SC**

Jatiya Party Chairman HM Ershad has urged the government to send the recently signed CHT treaty to Appellate Division of the

Supreme Court to examine whether it contradicts the constitution, reports UNB.

"Amendment to the accord is a must if it is unconstitutional," he said addressing a party discussion meeting at its office on the occasion of the Victory Day Tuesday.

He said people should be provided an explanation by the Supreme Court to help dispel their confusion that the agreement on the Chittagong Hill Tracts is not anti-constitutional.

The meeting was also addressed by Naziur Rahman Manjur, Sardar Amjad Hossain, Dr. MA Matin, Dr. TIM Fazle Rabbi MP, Monirul Haq Chowdhury, Col (Retd) M Gaffar, Jahangir Mohammad Adel, Saifur Rahman, Abdus Salam, Humayun Kabir Hiru and Sinha MA Syyed.

On the Victory Day, former President Ershad visited the disabled freedom fighters at Mohammadpur in the city and offered Fateha at the Mazar of Bhasani in Tangail.

The Bangladesh Observer

December 19, 1997

CHT road blockade continues

**Non-tribals' rights
won't be affected, says Ministers**
Chittagong Office

CHITTAGONG. Dec 18:—A flurry of drives initiated in three hill districts today to heal all communal discords over the CHT peace accord.

To achieve these ends, three ministers and Chief Whip in Parliament in addition to some senior officials are now camped in the Chittagong Hill Tracts.

At Rangamati town, there were three separate rallies that addressed by these ministers today, according to the report of our Rangamati correspondent. The speakers at these rallies dwelt at length about the merits of the CHT peace accord.

In the noon, a rally was held at Reserve Bazar with Dipanker Talukder MP in the chair. State Minister for Planning and Tourism Dr. Mohiuddin Khan Alamgir was the main speaker. Among other speakers were Juba League leader Iqbal Rahim, Awami League leader S.M Kamal Hossain and AL's Rangamati Unit General Secretary Abdul Wadud. The speakers reiterated that the peace accord neither downgraded the status of non-tribals nor degenerated their rights in the CHT.

The peace e accord would usher in a new era in the region where the tribals and non-tribals would live in peace and tranquility.

The second rally, as reported by the Rangamati correspondent, was held at Tabalchhari market also with Dipankar Talukder MP in the chair. The rally was addressed, among others, by the Posts and Telecommunications Minister Muhammad Nasim, Chief Whip in the Parliament Abul Hasnat Abdullah and local leader Selim Chowdhury.

Likewise, another rally was held at Banarupa in the afternoon. The rally was addressed, among others, by Posts and Telecommunications Minister, Chief Whip in Parliament, State Minister for Planning and Tourism and Rangamati Local Government Council Chairman Chyang Qui Rawja.

Besides, the three ministers and Chief Whip in the Parliament held a meeting with the local officials and some elite at DC's conference room today to discuss the ways for quick implementation of the CHT peace accord. Among the discussants were the Special Affairs Division Secretary Kazi Golam Rahman and the Commissioner of Chittagong Division M. Shakhwat Hossain who exhorted the officials to work sincerely for the implementation of peace accord.

The indefinite road blockade enforced at three hill districts—Rangamati, Kagrachhari and Bandarban by the Sarbadaliya Oikya Parishad since December 9 demanding the annulment of peace accord continued today. The road blockade put the three hill districts snapped to the plight of tens of thousands of commuters. The blockade also stuck up the supply of essential to these districts and thus caused price hike of these items.

According to the report of our Rangamati correspondent, two motor vehicles—one truck at Banarupa and a coaster at Bhetbeti point of Rangamati town were damaged by the hartal supporters today.

At Khagrachhari the Sarbadaliya Oikya Parishad today held some rallies demanding the annulment of the peace accord and release of those persons arrested in connection with anti-peace accord movement.

The three ministers while visiting Khagrachhari on Wednesday offered Taka fifty thousand for the bereaved family members of the two persons died in Matiranga firings by the BDR and Taka ten thousand to each of the bullet injured person.

The Bangladesh Observer

December 19, 1997

Kofi Annan

hails CHT peace accord

NEW YORK, Dec. 18:— United Nations Secretary General Kofi Annan has hailed the peace agreement on Chittagong Hill Tracts, saying that this accord would bring peace, stability and greater prosperity to the people of the Chittagong Hill Tracts and to all of Bangladesh, reports BSS.

At a press briefing at the U.N. headquarters on Wednesday, the spokesman of the UN Secretary General issued a statement on behalf of U.N. Chief Executive regarding the peace accord in which Mr. Kofi Annan said that he was pleased with the conclusion of the peace agreement with the PCJSS, an organisation representing the tribal people of CHT. "Such an agreement is aimed at bringing an end to the quarter-century conflict in the country's south-east", he said.

Mr. Kofi Annan noted that the agreement included an end to the fighting, the formation of the CHT Regional Council and the return of refugees.

The spokesman said that the matter arose in the course of a meeting that the Secretary General recently held in Tehran on the margins of the OIC Summit with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina.

The Secretary General extended his warm congratulations to the government of Bangladesh and the PCJSS and hoped that this accord would bring peace, stability and greater prosperity to the people of Chittagong Hill Tracts and to all of Bangladesh.

The Bangladesh Observer

December 20, 1997

**BNP to launch movement
against CHT agreement**

Main Opposition BNP has decided to launch an allout movement to resist the "black agreement" signed by the government on the Chittagong Hill Tracts issue, reports UNB.

The decision was taken by the party's Standing Committee at a meeting Thursday night at 29 Minto Road with BNP Chairperson Begum Khaleda Zia in the chair.

The BNP Standing Committee opined that the CHT accord is against the country's independence, sovereignty, territorial integrity, Constitution and national interests.

It condemned the killing, harassment, arrest and repression of the government on the people living in the hill tracts and asked it to refrain from such activities.

The meeting expressed deep shock at the death of several people at Matiranga, prayed for the departed souls and conveyed sympathy to the members of the bereaved families.

The main opposition sounded a note of warning to the government for its "bid to formulate new repressive black laws to suppress the opposition".

It called upon the government to give up such a plan and urged the people to remain alert. "No evil attempt to foil the hard-earned democracy and democratic rights will be allowed to succeed," the meeting said in a resolution.

The BNP standing committee expressed concern over the price-hike of essentials, deterioration of law and order, violence in the ongoing UP elections and the failure of the government to tackle the situation.

Prof AQM Badruddoza Chowdhury, M. Saifur Rahman, Abdul Mannan Bhuiyan, Barrister Abdus Salam Talukdar, KM Obaidur Rahman, Chowdhury Tanvir Ahmed Siddiqui, Abdul Matin Chowdhury, Dr. Khandaker Mosharraf Hossain and Advocate Khandaker Mahub Uddin Ahmed attended the meeting.

The Bangladesh Observer

December 20, 1997

**CHT treaty ensures civil rights
of Pahari, Bangalees: Nasim**

BANDARBAN, Dec. 19:— Minister for Post, Telecommunications, Housing and Public Works Mohammad Nasim today said the historic peace treaty opened up an avenue towards establishing permanent peace in the Chittagong Hill Tracts by bringing an end to the years of bloodshed, animosity and violence, reports BSS.

"The Awami League government led by Prime Minister Sheikh Hasina has ensured all civil rights as well as safety and security of the 'Pahari Bangalee' people living in the region", he said adding that the voting rights and right on land of both 'Pahari' and 'Bangalee' people of the CHT were guaranteed under the peace treaty.

The Minister was addressing as the chief guest a large public meeting in front of the local press club in the town. Chief Whip of the Jatiya Sangsad Abul Hasanat Abdullah and State Minister for Planning, Civil Aviation and Tourism Dr. Mohiuddin Khan Alamgir also addressed the meeting.

Besides, Bir Bahadur MP, Engr. Mosharraf Hussain MP, Divisional Commissioner of Chittagong M. Shakhawat Hussain and Awami League leaders Moslehuddin and Jahangir Hussain Tinky also addressed the meeting.

Earlier, a large peace procession led by local Awami League leaders was brought out with the participation of the people of all strata in favour of the peace treaty.

Mohammad Nasim told the meeting that the government would spend Taka nearly 100 crore to install the most modern telecommunication system in the CHT districts. The work for establishing a 1000-line digital telephone exchange will start soon at the Bandarban district, he added.

Later, the ministers and others held a peace meeting with the government officials, political leaders, journalists and the local elite.

Mohammad Nasim, Abul Hasanat Abdullah, Dr. Mohiuddin Khan Alamgir, Bir Bahadur MP, District Local Government Council Chairman Thawainch Prue Master and Divisional Commissioner M. Shakhawat Hussain spoke at the peace meeting held at the Deputy Commissioner's Office.

Region Commander Brigadier Ismat Ahmed Chowdhury, Deputy Commissioner Atiqul Islam Chowdhury and senior police officials were present at the meeting.

In another meeting, Dr. Mohiuddin Khan Alamgir said that a university of technology and a tourism motel would be established in Bandarban.

The Bangladesh Observer

December 20, 1997

CHT peace treaty hailed abroad

The governments and top political leaders around the world were full of praise for the historic peace accord signed in Dhaka earlier this month with the tribal rebels aimed at ending more than two decades of hostilities in the Chittagong Hill Tracts, reports BSS.

Countries as far as the United States in the northern hemisphere and Australia at the other end and some nations in between them came in support of the accord which ensures equal rights to all citizens—tribal and non-tribal. The accord, which is the culmination of the efforts of three government of Jatiya Party, BNP and the present Awami League, has been formulated within the Constitutional framework and safeguarding the country's sovereignty and territorial integrity", the agreement's preamble said.

Besides governments, top political leaders and world's mass circulated and prestigious dailies including Washington Post, New York Herald Tribune, Asahi Shimbun, Daily Yomiuri of Japan, Neus Deurshland of Germany and the Hindu of India printed articles appreciating the deal and terming it a 'landmark' accord which came as Bangladesh celebrates the 25th year of adoption of its Constitution.

The main highlights of the accord that came at the end of seven rounds of talks between National Committee on Chittagong Hill Tracts and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Sumity under the present administration interlaid includes preservation of the specific characteristics of the region as a tribal dominated area. A total of 26 rounds of talks were held between the two sides—six during Jatiya Party and 13 rounds while BNP was in power.

The US government has welcomed the agreement which provides for upholding the political, economic, educational and socio-cultural interests of all permanent residents of the CHT region within the jurisdiction of the Constitution of the country.

The US State Department in an announcement soon after the signing said the agreement "will put an end to a long-standing conflict that has claimed many lives over more than two decades". The United States expressed the hope that with goodwill on all sides, the peace agreement could be implemented.

Raja Tridib Roy, a former Chakma chief now living in Pakistan congratulated Prime Minister Sheikh Hasina for the historic peace accord. In a message from Islamabad, the Raja expressed the hope that sincere implementation of the peace accord would undoubtedly contribute towards progress and prosperity of the whole of Bangladesh.

Chief Whip in the House of Commons in London Nick Brown appreciated the government move in reaching the agreement and expressed the hope that the signing of the accord will be followed by unfettered implementation. Britain's Opposition Whip and shadow

Secretary of State for International Development Sir Alastair Goodland expressed his appreciation of the steps undertaken.

Australia congratulated the government and people of Bangladesh on the signing of the peace agreement and said this event promises to end over two decades of armed insurgency in the Chittagong Hill Tracts and establishes an administrative structure to meet the desire of the tribal people for enhanced autonomy. The Australian Minister for Foreign Affairs Alexander Downer said the agreement represents a "significant achievement for Bangladesh".

"We hope that the peace agreement will bring about a durable and lasting settlement to this long running problem and we urge all parties to apply their best endeavours to ensure its success". Downer said in a statement.

The 68-point accord is expected to make very positive and long-lasting contribution to enhancing the image of the country around the international community and at the United Nations particularly from the human rights perspective, observers maintain.

Lord Peter Shore, Member of House of Lords appreciated the CHT accord and hoped that government's efforts in this field will bear fruit.

US influential daily Washington Post published the news of the accord and the International Herald Tribune published similar story with picture showing jubilant people parading the streets chanting slogans in favour of the peace accord.

German daily "News Deutschland" in an article said the agreement will "bring peace in the Chittagong region". The core of the agreement is the "obligation of all sides to realise the resettlement programme correctly, not only for the calm people but especially for the returning refugees, as also for the Muslim settlers". It said the campaign of the BNP is a part of the destructive politics with which they want to topple the government. Shorter stories on the issue in other German dailies like "Die Tageszeitung", "Berliner Morgenpost" and "Frankfurter Rundschau" also appeared.

Turkish daily News gave a lengthy coverage of the signing of the accord and published a picture of the accord being signed by Chief Whip Hasmat Adbullah and Jyotirindra Bodhipriya Larma of PCISS. It highlighted several aspects of the accord which included peaceful coexistence between tribals and Bangalee settlers in the Hill districts.

Prestigious Indian daily "The Hindu" welcomed the peace accord and described it as a major achievement of the Sheikh Hasina regime.

In an editorial the paper described the accord "historic and said, "it (accord) holds promise to end the two-decade old insurgency in the hill areas which has claimed over 20,000 innocent lives. It said the Opposition BNP led by Begum Khaleda Zia has made the accord a political issue "ignoring the ethnic and cultural realities of the hill areas". The prolonged ethnic strife in the hill areas had hit the development of the region and by persisting with its opposition to the accord, "the BNP as the main opposition of the nation, only serving narrow political ends" the paper said.

Another prominent Indian daily "The Hindustan Times" while hailing the accord said the two sides have "shown commendable prudence, in signing the landmark agreement to end two decades of hostilities in the Chittagong Hill Tracts".

The Awami League government must be congratulated for finding an amicable solution to the seemingly intractable question of tribal insurgency almost immediately after assuming office", the paper commented. It said the Opposition Leader, Begum Khaleda Zia's outburst against the peace pact is not entirely unexpected". In Bangladesh, politics is so polarised that everything the government does would be attacked by the BNP, the Hindustan Times said.

The Khaleej Times, the influential Arab daily, in an editorial commended Bangladesh for "demonstrating courage to stand up to enormous opposition pressure to invite rebel leaders for talks. hammer out an agreement and, finally, put the seal to it". The Dubai based mass circulated daily said, "by being present at the signing ceremony in Dhaka between the government officials and representatives of the political wing of the Chakma rebels, Prime Minister Sheikh Hasina signalled her assent to the final terms of the pact, including the legal and constitutional aspects". "Sheikh Hasina has unveiled a more sensitive face of Bangladesh and set the peace for sub continental counterparts in settling insurgencies peacefully" the editorial concluded.

All the major Japanese dailies such as Asahi Shimbun, Asahi Evening News, the Japan Times and the Daily Yomiuri welcomed the historic peace treaty and highlighted the signing of the accord. The dailies highly appreciated the accord as the Daily Yomiuri mentioned that "soon after coming to power in June 1996, Hasina

stepped up efforts to end the insurgency". The Japanese media expressed appreciation of the sympathetic understanding of the political goodwill with which the present government approached the complicated issue leading towards a solution of the long-standing insurgency problem. The papers in their report expressed the hope that the accord would ensure peaceful coexistence of the tribal people and Bangalee settlers in the Chittagong Hill Tracts.

Japanese Parliamentarian Shin Sakurai expressed full support of the LDP government to the peace accord and added that the ruling Liberal Party also fully supports the accord.

Murat Sungar, acting Turkish Foreign Secretary, while commenting on the signing of the peace accord said, "he would study the accord with great care", Turkey has its own insurgency problem in the south eastern part of the country which is continuing for long.

The Chief Executive of Hong Kong Turg-Chee Hwa congratulated the government for signing the treaty, the Head of China's Autonomous Region opined that the treaty will expedite the overall socio-economic development of Bangladesh and at the same time preserve the rights of all citizens".

Canada expressed satisfaction at the efforts of Bangladesh government to conclude the accord. An official of Canadian Department of Foreign Affairs expressed the hope that "this (accord) will bring peace and prosperity to the people of CIT in particular and the people of Bangladesh in general.

British High Commissioner and French Ambassador based in Dhaka hailed the accord in separate statements issued following the signing. The British government's initial reaction expressed through the High Commissioner's statement mentioned that this is a very significant and considerable achievement and I congratulate warmly all those involved in recent negotiations and those in 1992-95. "All concerned have found a political solution to a very long-standing problem. The quality and security of life of the people living in the hill tracts will be enormously improved", the statement said.

French Ambassador in Bangladesh expressed her firm belief that the peace accord would restore peace in the hill tracts, Kuwait's Foreign Office said the peace accord was a very welcome development and it (Kuwait) was happy for the brotherly country of Bangladesh.

Others who have agreed to send congratulatory messages. Included Russian Federation European Community Malaysia and

Thailand even as the main opposition vows to torpedo the treaty which they say was a "complete sell out of the country's independence and sovereignty."

The Bangladesh Observer

December 21, 1997

Govt taking step for economic uplift

BNP trying to create unrest

opposing CHT treaty: PM

MYMENSINGH, Dec. 20:— Prime Minister Sheikh Hasina today (Saturday) said the government is taking every possible step for the economic development of the nation, but that is being hampered by the opposition repeatedly, reports UNB.

"They (opposition BNP) don't want development of the nation, they don't want economic emancipation of the people," she said addressing a huge public meeting at the local Circuit House Maidan in the afternoon.

The BNP has lost its head being rejected by the people in the last election and is even opposing the CHT peace agreement and trying to create unrest, she said.

Their peace of mind has been disturbed because of opening up of the way for restoring peace, she said.

"People want the peace," Hasina said mentioning the signing of peace accord on the Chittagong Hill Tracts with the tribal leaders for restoring peace.

"We've taken the step to restore peace in the troubled region which was wracked by unrest for last 20 years. We've taken steps for improving the life of the tribal people."

She said the government has created a congenial atmosphere for investment, but the BNP is trying to create unrest at a time when the foreign entrepreneurs are coming to invest in the country.

The Bangladesh Observer

December 21, 1997

Treaty to bring peace

in CHT: Zillur

LGRD and Cooperatives Minister Zillur Rahman said in Dhaka on Saturday that the peace agreement on Chittagong Hill Tracts was signed upholding the country's independence, sovereignty, integrity and the constitution, says BSS.

In a statement the Minister said there was nothing anti-constitutional or contrary to the interests of the country in the peace agreement of any of its paragraph, or section or clause.

Zillur Rahman, also the General Secretary of Awami League, accused the BNP and its anti-independence allies of carrying out propaganda against the peace accord to serve their mean political ends and to create unrest in the country. He urged the people to remain united against all ill-designs.

The Minister said the speeches and statements made by the BNP and fundamentalists and reactionary forces have no congruity with the peace accord.

He said there is nothing against the interests of the Bangalees in the peace agreement. Rather the agreement, he said, would ensure coexistence of Bangalee and the hill people, harmony and establishment of rights in their respective areas.

The Minister said under the agreement both the Bangalees and the tribals would be able to exercise their rights of franchise equally.

Zillur said since after its defeat in the last parliamentary elections the BNP has been resorting to various ill tactics to take revenge on the people. He accused the BNP of making false and misleading statement on the peace accord to fish in the troubled waters.

Zillur said the peace agreement was signed as a continuation of the efforts of the past governments on the basis of the constitution, democracy and fundamental human rights to strengthen the national solidarity and unity. He said it was not an unequal agreement or the accord of dividing the country.

He urged all pro-liberation forces to unitedly face the intrigues being hatched by the BNP and the anti-independence forces against the Chittagong Hill Tracts.

The Minister will pay a two-day visit today (Sunday) to three hill districts to attend the peace rallies and meet the local administration and the law-enforcing agencies.

The Bangladesh Observer

December 21, 1997

Nasim says

Evil designs of BNP on CHT treaty exposed

Telecommunications Minister Mohammad Nasim on Saturday said the "smoke-screen of fear and confusion created by the opposition"

has cleared from the minds of the Bengalees who are getting back confidence about the peace accord.

Talking to UNB at his residence, Nasim, who extensively toured the remote villages in the hill tracts in last five days, said the "evil designs" of BNP and its allies about the agreement have been exposed to the people in the three hill districts.

"Bengalees, living in the hill tracts permanently, are now assured that their rights to land and vote will not be denied and army will continue to be there", he said.

Nasim said, "Alongside the implementation of the peace agreement, all development works in the CHT will start soon to give the benefit of the accord to both tribals and Bengalees there".

Nasim, who was accompanied by Chief Whip Abul Hasnat Abdullah and State Minister for Planning Dr Mohiuddin Khan Alamgir during his CHT trip, said steps are being taken for surrendering arms by the Shanti Bahini and to bring back refugees from Tripura as per provision of the agreement.

He said the peace agreement will be discussed in details in the coming session of parliament and broadcast live through radio and television to prove the transparency of the government.

"The present peace accord is just a modification of the local government hill district council acts, framed by the Ersahd and Begum Zia governments", the Minister said.

Referring to the opposition's antiaccord agitations, Nasim said having failed to make any substantive issue, the BNP and its allies, including Jamaat, have concentrated on the CHT and are trying to confuse the people.

In a pointed reference, he said some big fishes, including some former BNP ministers, who had taken lease of hundreds of acres of land in the name of rubber plantation and got huge bank loans and made no investment there, are now raising hue and cry about the peace accord.

"These parties and yested groups are trying to impose programmes like hartals and blockades on the innocent people in the hill tracts... but their designs will not succeed as people want peace".

Narrating his experience about his hectic tour in the CHT, Nasim said he had exchanged opinions with local leadership, Bengalees and administrative officials and said all welcomed the peace agreement.

He also visited different cluster villages in Dighinala, Matiranga and Panchhari thanas of Khagrachhari district where he

found that the Bengalees, who were earlier confused by the opposition propaganda, are now getting back confidence and resumed normal life.

Refuting the opposition's antiaccord campaign, Nasim said Bengalees in the CHT used their voting right in the Union Parishad elections and the army kept their position and continued their activities.

He said the opposition's allegations, made before and after the peace agreement, proved false and they have finally failed to mislead the people.

As a matter of fact, the peace agreement, hailed at home and abroad, has ensured security of the Bengalees and their trading rights as well as the ethnic, cultural and political rights of the tribals, he said.

The Minister said all the provisions of the hill district local govt council acts enacted and implemented during the Ershad and the BNP regimes were not only kept unchanged, rather the peace accord has enhanced the rights and privileges of the tribals and non-tribals.

Replying to a question, Nasim said his party would politically face the opposition campaign aimed at destabilising the situation in the country by opposing the peace agreement.

But people in the hill tracts, he said, will soon get the benefit of the accord with huge investment in the gas and oil, agriculture and health sectors.

He said investment will be made to develop tourism and ensure all infrastructure facilities, including electricity and telecommunications, in Khagrachhari, Rangamati and Bandarban hill districts.

The peace agreement will be considered as a landmark accord ending the longstanding bloody conflict by improving the quality of life of both tribals and Bengalees in the hill tracts, Nasim observed.

The Bangladesh Observer
December 22, 1997
JS discussion on CHT treaty urged
Staff Correspondent

Speakers at a round-table discussion on "Chittagong Hill Tracts peace treaty: legal and economic perspective" called for discussing the peace treaty, signed between the Government and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity, in parliament.

Participating in the discussion organised by Society for Development and Cooperation (SODAC) at the office of Bangladesh Unnayan Parishad (BUP), most of the speakers said that the peace treaty was a big and historic step towards restoring peace and normalcy in the troubled region of the country.

Presided over by SODAC Chairman Dr. Kazi Kholiquzzaman, the discussion was participated by Barrister Amir-ul-Islam, Prof. M. Aminul Islam, Vice-Chancellor of Open University, Hasanul Haque Inu, General Secretary of Jatiya Samajtantrik Dal (JSD), Dr. Harun-or Rashid, Professor of Political Science, Dhaka University, M.M. Rezaul Karim, former ambassador, Ferdous Hossain, Associate Professor of Political Science, Dhaka University and Manjurul Islam, Chairman of Islam Group. Syed Shafiq Ahmed and Qamrul Islam Siddique presented two keynote papers at the discussion.

The speakers said that peace treaty was done within the framework of the constitution and it was the continuation of the peace process that began in 1982.

They said that the peace treaty was the improved version of the 1989 Act on CHT under which local government council were set up in three hill districts of Khagrachhari, Rangamati and Bandarban.

The speakers also called for sending the peace treaty for constitutional interpretation to the Judiciary.

Barrister Amir-ul-Islam said that the peace treaty was done within the framework of the constitution and added that the formation of regional council was in line with the provisions of the constitution that enshrined the setting up of local government institutions. Referring to the clause of the peace treaty that empowers the regional council to collect revenue and giving permission for land purchase, he said that it was the devolution of power from central to the local government body.

He termed the peace treaty as the best one as it was done within the framework of constitution. He said that in many countries constitution had been amended to incorporate such treaty. He said it was also a big achievement as the present Government had succeeded in signing the treaty while many governments around the world failed to do settle problems like CHT.

Prof. M. Aminul Islam emphasised the need for arranging more discussion on the peace treaty to mobilise public opinion in favour of it and to dispel misinterpretation of the treaty.

Hasanul Haque Inu urged political parties not to play with the peace treaty and not to instigate Bengali settlers against the tribal people. He criticised the BNP and Jatiya Party for opposing the peace treaty. He said it was the continuation of the process that Ershad started and BNP continued. He said that the peace treaty could be sent to court for constitutional explanation and emphasised the need for massive campaigning through radio and television in favour of peace treaty for understanding of the public.

Prof. Harun-or-Rashid said that BNP and Jatiya Party had no moral and political right to oppose the peace treaty as both when in power worked for the peace process. He said that the Government did not violate the unitary character of the state by signing the peace agreement.

M.M. Rezaul Karim said that the Government could discuss the peace treaty in parliament and make it public before signing the agreement. He said the Government has still chance to discuss the peace treaty with other political parties before its implementation. He said that the peace treaty could be sent to court for constitutional explanation.

Ferdous Hossain said that Government could not create division between tribals and non-tribals by signing such peace treaty.

Manjurul Islam discussed about prospect and problems of tourism in the hill tracts region.

The Bangladesh Observer

December 23, 1997

Cabinet okays CHT treaty

PM discusses memorandum of opposition with President

Prime Minister Sheikh Hasina called on President Justice Shahabuddin Ahmed at Bangabhaban on Monday, reports BSS.

The memorandum submitted by the Leader of the Opposition Begum Khaleda Zia to the President on Sunday was the main topic of discussion between them.

The Prime Minister was of the opinion that parliament is the most suitable forum for threadbare discussion of the draft peace agreement on the Chittagong Hill Tracts.

The President referred to the suggestion for a round-table conference between the government and the opposition leaders but he prefers to remain above all controversy. He will give his decision later, Bangabhaban sources said.

Minister for Post, Telegraph and Telephone and Works Muhammad Nasim was present during the meeting.

Meanwhile, the Cabinet on Monday approved the peace agreement signed recently by the government nominated National Committee on the Chittagong Hill Tracts (CHT) and the "Parbatya Chattagram Jana sanghati Samity (PCJSS).

The approval to the historic treaty was given at a meeting of the Cabinet which was presided over by Prime Minister Sheikh Hasina.

The meeting decided to form a Cabinet committee to give recommendations for framing laws to control medical and dental treatment, private clinics and laboratories. The meeting also approved the list of government holidays for 1998.

Ministers, state ministers in charge of different ministries, Cabinet Secretary, Principal Secretary to the Prime Minister and relevant secretaries attended the meeting.

The Bangladesh Observer

December 26, 1997

CHT people urged to be alert against evil move

Our Correspondent

RANGAMATI, Dec 25:— Sammilita Sanskriti Jote held a peace rally and cultural function at Rangamati Court Building Maidan today in support of the recently signed Peace Treaty.

Presided over by Asaduzzaman Noor the function was addressed among others by Dipanker Talukder MP, former Chairman of Rangamati Local Government Council Goutam Dewan, current Chairman Chingkui Roaza, Jote leader Hasan Imam, Mamunur Rashid, Abdul Quddus, Khaled Khan and Jasimuddin Babul.

Three cocktails were exploded at the function by some unidentified persons to disrupt the peace rally. But none was injured or arrested in this connection and the function ended peacefully.

The speakers in the rally said that a dreadful situation had been prevailing in the Chittagong Hill Tracts for long two decades and this situation came to an end through signing a historic Peace Treaty recently. Now a peaceful co-existence of tribal people and Bangalee settlers in the whole CHT region was ensured by the present government, they said.

They called upon the CHT people to be alert against all conspiracies being hatched by some political parties to create unrest in the name of opposing the Peace Treaty.

The Bangladesh Observer

December 27, 1997

550 citizens say

**Opposition trying to provoke
communal conflict in CHT**

A total of 550 distinguished citizens in a statement on Friday observed that the main opposition party in the name of opposing the CHT peace accord is trying to provoke a planned communal conflict in alliance with the anti-liberation extreme right wing and fundamentalist parties, says BSS.

The statement said, "those who collaborated with the Pakistani military regime in 1971, are still acting as signalled by the Pakistani intelligence agency to make Bangladesh a second Pakistan destroying all achievements of the liberation war, political and international image of the nation and the socio-economic progress.

"Efforts to keep alive the unrest and war situation in the Chittagong Hill Tracts is the part of their conspiracy," it added.

The statement said the peace talks between the government and the insurgents started during the Jatiya Party regime in 1985 and continued till 1989 when the hill district local government council act was promulgated. It recalled that the subsequent BNP govt carried on the talks and held 13 rounds of meeting.

In the continuation of the process the present government held seven rounds of talks from October 1956 to November 1997 which resulted in the peace accord on December 2, 1997," the statement said.

It observed that though the fact which was signed in line with articles 9, 11, 26, 28, 29, 42, 59 and 60 of the constitution and the universal declaration of human rights and was widely hailed at home and abroad," the fascist communal and fundamentalist parties are trying to push the nation towards a civil war in the name of campaigning against the treaty."

The Bangladesh Observer

December 28, 1997

Expose conspiracy against CHT peace: Kibria

Finance Minister Shah AMS Kibria said in Dhaka on Saturday that the real faces of those who were conspiring against the peace process in the Chittagong Hill Tracts (CHT) should be exposed to know "whether they working for the country's interest or serving other nation's interest", says BSS.

"How can somebody protect the country's interest by encouraging destabilisation defying the reality that it would serve the interest of foreign country", the Finance Minister said while giving the summing up speech at a round table conference on "Chittagong Hill Tracts peace agreement: Bangladesh socio-economic development" organised by Bangladesh Foundation for Development Research in the CIRDAP auditorium.

Dismissing the opposition's view that the present government had sold out the sovereignty by signing the CHT peace agreement the Minister said the country's sovereignty was jeopardised due to insurgency not for peace.

Agriculture Minister Motia Chowdhury, former Finance Minister AMA Muhi, Justice KM Sobhan, Bangla Academy Director General Syed Anwar Hossain, Chairman of Agrani Bank HT Imam, Bangladesh Unnayan Parishad (BUP) Chief Kazi Khalikuzzaman, Dhaka University Vice Chancellor AK Azad Chowdhury, Barrister Amirul Islam, peace maker Ali Aksad, ATM Shamsul Huq, Awami League leader Mozaffar Hossain Paltu and chief of Nijera Kari, a voluntary organisation, Ms. Kushi Kabir took part in the round table which lasted for three and a half hours.

The Finance Minister said signing of treaty was the best possible solution that could be reached for solving the complex problem of insurgency.

He said throughout the ages peace making remain the fundamental goal in the questions of augmenting process. By signing of the peace agreement it had been proved that Bengali nation was truly united in the question of peace making.

Agriculture Minister Motia Chowdhury said "we are not in the most difficult stage of implementing the peace agreement".

She called upon all concerned to implement the agreement sympathetically with clear perception and promptness.

She said the countrymen had been eagerly awaiting for the peace agreement to be signed, but unfortunately a certain quarter was misguiding them on the basis of wrong interpretation, taking the advantage of the ignorance of the people in hill districts.

The Minister said that the vested interested quarters were out to create instability with a view to prolonging the trouble in the CHT to reap their personal benefit.

The Agriculture Minister said the agreement was drafted in line with the Local Council Act, 1989. BNP never opposed the '89

act when it was in power, but unfortunately they are working against the agreement now.

"In the back of their mind they wanted to create suspicion among the people in the CHT and create instability for advancing their narrow interest", she said.

The country's eminent constitution expert Justice KM Sobhan said the agreement did not override the constitutional framework of the country in the question of equality of the citizens of the country or unilateral authority of the government.

Criticising the opposition's remark that the sovereignty was sold out by signing the treaty Justice Sobhan said the sovereignty of the country could not be sold because it was not a saleable commodity. He said sovereignty remained threatened if any region of the country is disturbed due to insurgency.

Barrister Amirul Islam said "the government has not separated the Chittagong Hill Tracts rather the agreement is one step forward to bring the ethnic minority under purview of the constitution.

The Bangladesh Observer

December 30, 1997

Nasim to talk to BNP leaders soon

JS winter session Jan 14

Amidst a strained relation between the Government and the main opposition, winter session of Parliament has been summoned by the president on January 14, reports UNB.

The session is seen as very important as it will pick up general discussion on the much debated peace agreement on CHT and is likely to opt four bills to give legal coverage on the accord.

Besides, President Shahabuddin Ahmed will deliver his speech at the spring session of Parliament in the new year as per the Constitutional provision.

There will be general discussion on the President's speech.

But the session may lose its significance if main opposition BNP continued to abstain from Parliament.

Opposition and BNP Chairperson Begum Khaleda Zia earlier said her party would not back scrapped.

BNP and its partners called the accord a "black law" and said it posed a "threat to sovereignty of the country."

The new issue of CHT accord has been added to BNP's previous 4-point and 14-point demands.

Telecommunications Minister Mohammad Nasim on Monday said he would initiate fresh talks with the BNP leadership in a bid to bring them back to Parliament.

Meanwhile Telecommunications Minister Mohammad Nasim, who is planning to open talks with the BNP leadership, said on Monday that the BNP MPs should join the parliament and place their opinions on the CHT peace agreement.

"In a day or two, I'll talk to the BNP Secretary General and others leaders and invite them to give their opinion on the peace accord in Parliament," he said.

Talking to UNB at his Secretariat office, Nasim said the peace accord, signed on December 2, has not yet been given a legal coverage. "Before it turns into a law, a bill will be placed in the House and there'll be extensive discussion on it."

The draft bill, he said, will be scrutinised at the Select Committee before its adoption by Parliament following the parliamentary procedure.

"So, in the process, there will be detailed scrutiny of the peace agreement and BNP can give its opinion or objection at different stages," Nasim said.

He added, "I think a national consensus can be built up through discussion on the propositions of the agreement and the opposition's opinions."

All the apprehensions expressed by BNP about the peace accord would be removed through discussion on it in the Select Committee and also within the chamber of Parliament, the minister observed.

Replying to a question about the BNP's plea for scrapping the agreement, he said "there is no scope of cancelling the agreement. Even had BNP been in power, it would not scrap the peace agreement in the face of the demand of a party."

He said misunderstandings created over the peace accord were removed to a large extent following "correct interpretations" of the agreement by government leaders, academicians, journalists and professionals.

"Hesitation of the people in the hill tracts has been removed and they got back confidence in it," he said.

Responding to another query. Nasim, who has been assigned to talk with the opposition, said "if necessary, I may also talk to Leader of the Opposition Begum Khaleda Zia" to break the standoff facing the Parliament.

“... and if opposition wants, even Prime Minister Sheikh Hasina can sit with them and settle their problems.”

He, however, made it clear that discussion on the peace accord must be held in Parliament and other demands of BNP can be discussed at any place, including at the chamber of the Speaker.

Referring to the BNP's 4-point and 14-point charters of demand, Nasim said most of their demands have already been met, but BNP is coming up with new demands everyday.

He said the government party has accepted the BNP's original demand for representation of 113 MPs in parliamentary standing committees. Now they are demanding 117 which, he said, will deprive Jamaat and other small groups in Parliament.

About cases against the BNP leaders and MPs, Nasim said the government unilaterally withdrew some cases against them. But there are some others which can only be disposed off through legal process and by respective courts, he added.

He, however, said if BNP could sit across the table, cases against its MPs could have been considered. In this context, he said although BNP claimed that there were cases against its 19 MPs, it was found that there were no cases against 11 of them.

Regarding the 14-point charter of demand, the minister said most of the demands, including the prices of jute and paddy, are not related to BNP's joining the Parliament. The demand for holding meeting on the street is not also related to Parliament, he added.

In reply to a question, Nasim said BNP's abstention would not obstruct the parliament proceedings. He said other opposition parties, including Jatiya Party and Jamaat-e-Islami, are attending the sessions.

He recalled that while in power, BNP ran parliament without any opposition for three years.

The Bangladesh Observer

January 2, 1998

941 more refugees return

**No further extension of
ceasefire in CHT**

Chittagong Office

CHITTAGONG, Jan. 1:— The ceasefire that persisted for almost five and a half years between the Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the apex political body

of the Shanti Bahini in the Chittagong Hill Tracts ended on Wednesday.

The ceasefire that was enforced on August 10, 1992 in the battle-scarred CHT, for the first time, ended without further extension.

The PCJSS unilaterally declared the ceasefire in the CHT to facilitate the peace negotiations with the government of the then Prime Minister Begum Khaleda Zia. Since then the on-going ceasefire was extended for 36 times on consensus agreements between the two sides.

Although there were allegations of numerous violations of ceasefire till 1996, it was put in force more effectively over the past one year.

Now against the backdrop of landmark peace accord signed between the two sides on December 2 last, the necessity for further extension of ceasefire deemed useless, said an official source. "In the changed situation, preparations are afoot to bring back the Shanti Bahini men to normal life and to put at rest all discords for a lasting peace in the CHT," said the official who is connected with the CHT peace process.

BSS adds from Khagrachhari:— A total of 941 tribal refugees belonging to 185 families returned home as the sixth phase of repatriation resumed here today after a break of 25 days, officials said.

According to an official handout 7,505 tribesmen of 1,501 families are scheduled to come back home during this phase until January 9, the first after the landmark peace agreement on the Chittagong Hill Tracts was signed last month.

The refugees stepped into the country crossing a wooden bridge on the Feni river at Mandirghat point of Ramgarh here.

Secretary of Specil Affairs Division Kazi Golam Rahman, Khagrachhari Hill District Council Chief Samiran Dewan, Divisional Commissioner of Chittagong Shakhawat Hossain, local officials and political leaders, relatives and old neighbours welcomed them back home.

Senior officials of South Tripura district of the Indian state of Tripura saw the refugees off as they left the Indian soil spending more than a decade in exile.

They said 26,063 tribesmen belonging to 5,590 families returned home in the last five phases. Of them 24,075 returned under government sponsorship while the rest came back home on their own.

Officials said the remaining refugees who await repatriation in their refugee camps are expected to return home by mid-February as the repatriation process would continue without any long recess. Thousands of tribesmen left the country and took refuge in makeshift camps in Tripura as the insurgency flared in the Hill Tracts in 1986.

The Bangladesh Observer
January 4, 1998
Meeting with NCCHT proposed
PCJSS orders SB
men to deposit arms
Chittagong Office

CHITTAGONG, Jan. 3:— The Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) is understood to have passed instructions to its armed cadre members (Shanti Bahini men) to submit their all arms and ammunition forthwith.

The PCJSS, apex political body of the Shanti Bahini has taken this urgent initiative for disarming its armed cadre members as per the peace agreement reached with the government on December 2 last.

The peace agreement envisaged the PCJSS to surrender its all stocks of arsenal to the government within the stipulated 45 days since the signing of the accord.

The Liaison Committee Convenor Hangsha Dhaj Chakma when contacted over telephone at Khagrachhari also said that he is in touch with the PCJSS leadership for expediting the surrender of arms and ammunition that are in the possession of the Shanti Bahini.

In the process of the surrendering, the Shanti Bahini men deposited their arms and ammunition to their commanders at Ghilachhari of Kawkhali Thana under hill district Rangamati on December 30, according to a report of our Rangamati correspondent. The local tribal elite were also present during the surrender of the weapons, the report said.

Likewise, as reported by our correspondent, the Shanti Bahini men handed over their all weapons and ammunition to their commanders at Wagga area of Chandraghona Thana on December 25 and at Furaman area of Naniarchhar Thana on December 21 under Rangamati district.

Meanwhile, the government has taken initiative for raising mauzas to 167 from present 163 in Rangamati district. The new

four mauzas will be created curving out the Sajek Union in Baghaichhari Thana under Rangamati district, according to the report of our correspondent.

UNB report from Khagrachhari adds:— Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) has proposed to hold a meeting with the National Committee on Chittagong Hill Tracts on January 15 to finalise the arms surrender issue.

Liaison Committee Convenor Hangshadhaja Chakma today (Saturday) sent a letter to this effect to the National Committee on CHT, requesting a reply by January 7.

The Liaison Committee convenor, in his letter, said the aim of the meeting is to submit to the National Committee the lists of the PCJSS members and the arms and ammunition in their possession, and also to fix the time, date and place where the arms would be surrendered.

Besides the meeting will also discuss fixing the deadline for transferring the temporary camps of Army, Ansar and Village Defence Party in the Hill Tracts region to the permanent camps, excepting the BDR and permanent army cantonment.

PCJSS sources said the lists of their members and the arms and ammunition they possess are ready for handing over to the National Committee as per the CHT peace agreement.

Under the agreement signed by the PCJSS and the National Committee on December 2, the Shanti Bahini members would have to surrender their arms within 45 days of signing the accord.

The Liaison Committee also urged the government to hold the meeting at Khagrachhari Circuit House and arrange helicopter and necessary security measures for the movement of the PCJSS leaders from Dudukchharas.

The Bangladesh Observer
January 7, 1998
PCJSS-Govt talks Jan 16

KHAGRACHHARI, Jan. 6:— The National Committee on CHT and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) have agreed to hold a meeting on January 16 to discuss the process of surrendering arms by Shanti Bahini, reports UNB.

The meeting, to be held in the district, is also expected to fix the date, time and place where the arms should be surrendered as per provision of the CHT peace accord.

Convenor of Liaison Committee Hangshadhaja Chakma told UNB that the date has been shifted from January 15 after a telephonic contact with the National Committee this (Tuesday) evening.

The government earlier sent a letter, signed by Director (Development) of Special Affairs Division Moshir Rahman, urging the PCJSS to hold the meeting on January 12 or 13 instead of January 15.

The meeting on January 15 as opposed by the PCJSS coincides with the three-nation business summit in Dhaka. The meeting on January 14 is not also possible as Parliament goes into winter session on that day.

The Liaison Committee convenor said both the sides have now agreed to hold the meeting on January 16 when the PCJSS leaders are expected to hand over the lists of its members and the arms and ammunition which are now in their possession.

Under a provision of the CHT peace agreement, armed cadres of the PCJSS are to surrender all the stocks of arsenal to the government by 45 days since the signing of the accord on December 2 last year.

The Bangladesh Observer

January 8, 1998

NCCHT-PCJSS talks now Jan 15

KHAGRACHHARI, Jan. 7:— The date of the proposed meeting between the National Committee on CHT and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) has been refixed on January 15, reports UNB.

The meeting to be held at Khagrachhari circuit house will discuss the process of surrendering of arms by Shanti Bahini guerillas as per provision of the CHT peace agreement.

The two sides are also expected to fix the date, time and place for surrendering the arms and ammunition.

Earlier, the NCCHT and the PCJSS agreed to hold the meeting on January 16, but the date has been refixed to comply with the provision of the peace agreement.

Under the agreement, the armed cadres of the PCJSS would have to surrender all their stocks of arsenal to the government within 45 days from the signing of the peace deal on December 2 last.

The stipulated 45 days limit expires if the meeting is held on January 16.

Liaison Committee convenor Hangshadhaja Chakma said both the sides have now agreed to hold the meeting on January 15 when the PCJSS leaders are expected to hand-over the list of its armed cadres and of the arms and ammunition in their possession.

Earlier, the PCJSS urged the NCCHT to hold the meeting on January 15. But the government did not agree on the date as it coincides with the three-nation business summit which will be held in Dhaka on the same day.

The Bangladesh Observer

January 9, 1998

CHT talks Jan 15

Surrender of arms to be finalised

Staff Correspondent

The National committee on Chittagong Hill Tracts (NCCHT) and the Parbattya Chhatagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) will now sit for talks at Khagrachhari Circuit House on January 15 to set the motion for the implementation of the CHT peace agreement. The Issue of arms surrender by the Shantibahini personnel will come up for discussion in the talks.

According to the provision of the CHT peace agreement concluded between the Government and the PCJSS on December 2 in Dhaka, the Janasanghati Samity will send the complete list of the Shantibahini (armed guerillas) personnel arms and ammunition to the Government within 45 days from the signing of the agreement. As per agreement, the stipulated 45 days will expire on January 16. The Special Affairs Division of the Government sent a letter to the Jana Sanghati Samity refixing the date for talks on January 15. The Government earlier sent letters to the Janasanghati Samity to sit for talks on January 12 and 13 as it has constraints to hold talks on January 16. The Government will be preoccupied with the opening of the eighth session of the Jatiya Sangsad which will be addressed by the President. Moreover, Government leaders will remain busy in connection with the three-nation business summit beginning January 15.

Meanwhile, the Shantibahini personnel have started assembling in Dudukchari with arms from their hideouts. After getting the complete list of arms, ammunition and the number of armed Shantibahini personnel the Government and the PCJSS will fix a date for the surrender of arms. According to the provision of the peace agreement, Shantibahini personnel who will surrender arms will be given amnesty and allow them to return to normal life.

The Bangladesh Observer
January 10, 1998
Support to CHT accord extended

Another report from our Chittagong Office says:- The Sangrami Nari Samaj (Revolutionary Women Society) today held a women rally at Shilpa Kala Academy at hill district town Rangamati today to extend support for the peace accord on the CHT.

The rally attended by several hundreds tribal and non-tribal women was presided over by Mrs Tuku Talukder, according to the report of our Rangamati Correspondent.

Among the speakers were the women right activists Aroma Goon, Rokeya Kabir, Shyamali Majumder. S.Z. Anowar Chenu and Shankari Chakma.

The speakers, as reported by the correspondent, made a clarion call to the womenfolk in the Chittagong Hill Tracts to extend all out support to the implementation of CHT Peace Accord so that the female genders are protected from the hunts of faclons in the trouble-torn CHT. In this connection, they reminded how the increasing number of women including Kalpana Chakma fell prey to the lust of uniform people when the militancy ruled the roost in the life of CHT over the past years.

After the rally, the Sangrami Nari Samaj leaders and activists took out a procession which paraded the throughfares of the hill resort town Rangamati.

The Bangladesh Observer
January 13, 1998
Indian daily hails CHT peace accord

NEW DELHI, Jan. 12:- A leading Indian daily 'The Statesman' has described the peace accord between Sheikh Hasina's government and the Parbattya Chhattagram Janasanghati Samity (PCJSS) after 22 years of violence in the Chittagong Hill Tracts (CHT) as a 'major break-through and said probably it is the last chance to resolve the hill tracts problem in a humane manner, says BSS.

"The success of the agreement depends on certain vital clauses... the PCJSS must ensure that all armed guerillas will surrender their weapons by January 17", the paper said in an article 'striking a chord of harmony' by its resident Editor Manash Ghosh published Sunday.

It said a breach will not only render the agreement useless but strengthen the hands of fundamentalists who have been preaching disharmony over since the accord was signed.

In fact, the article said the accord is contingent upon arms surrender tribals also have to ensure that they live as good neighbours with the settlers.

It said compromise was the only way out for the tribals, their armed rebellion made no headway.

BNP Chairperson Begum Zia's contention that the regional council under the new agreement is against the unitary character of the constitution and is untenable since the council, a supervisory and co-ordinating body overseeing functioning of three hill zilla parishads has no legislative powers, the paper said adding that having herself demanded greater powers for local bodies and favoured the council idea, Begum Zia's criticism of the regional council does not carry conviction.

The Bangladesh Observer
January 15, 1998
**NCCHT, PCJSS to discuss
arms surrender today**
Chittagong Office

CHITTAGONG, Jan. 14:- The National Committee on CHT and the Parbattya Chhattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) will hold a meeting at hill district Headquarters Khagrachhari tomorrow (Thursday) to discuss the process of surrender of arms and ammunition by the Shanti Bahini.

The meeting which will be the first since the signing of CHT peace accord on December 2 last is expected to fix the date, time and place where the arms and ammunition should be surrendered as per provision of the CHT peace accord.

Under the accord, the armed cadre members (Shanti Bahini men) would have to surrender all their stooks of arsenal to the government within 45 days from the signing of the peace deal on December 2 last. The stipulated 45 days limit expires next Friday (January 16).

The PCJSS Chief Jatindra Buddhi Priya Larma alias Shatu Larma and his followers are already encamped at tiny border hamlet Dadukchhari in Panchari thana of Khagrachhari district. They will be flown to Khagrachhari district Headquarters from Dadukchhari by an Army helicopter tomorrow for attending the meeting with the National Committee on CHT.

At the meeting that will take place at Khagrachhari Circuit House., the government side will be led by the Convenor of the National Committee on CHT and Chief Whip in Parliament Abul Hasnat Abdullah while Jatindra Buddhi Priya Larma will head the PCJSS's 5-member delegation. All arrangements for the meeting have already been completed.

Meanwhile, eight military camps of the security forces were dismantled and five more made inoperative in and around Daduckchhari hamlet in Panchhari thana since January 10 so that the PCJSS leaders came on surface for attending the meeting.

Earlier, the National Committee on CHT and the PCJSS agreed to hold the meeting on January 16, but the date has been refused to comply with the provision of the peace accord.

At the meeting, the government is likely to ask the PCJSS leaders to arrange the surrender of arms and ammunition of the Shanti Bahini immediately after the holy Eid-Ul-Fitr, according to a highly placed official source. "The government is just in favour of a single ceremony", said the official who is connected with the peace process.

On the contrary, the PCJSS has been favouring a phase by phase surrender of arms and ammunition. However, the PCJSS is expected to present a list of the members of its armed wing.

The Bangladesh Observer

January 16, 1998

Shantibahini to start surrendering arms from Feb. 9

KHAGRACHHARI, Jan. 15:— Shantibahini, the armed wing of the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), will start surrendering arms to the government formally from February 9 next, reports BSS.

It was decided at a meeting between the National Committee on Chittagong Hill Tracts (NCCHT) and the PCJSS held at Khagrachhari Circuit House today.

Chief Whip of Parliament Abul Hasnat Abdullah, Chairman of the NCCHT, told newsmen after today's meeting on behalf of both the sides.

400 tribal insurgents, better known as 'Shantibahini' with 200 numbers of weapons will surrender, led by Jyotirindra Bodhipriyo Larma alias Shantu Larma, Chariman of the PCJSS on February 9 next at 9 a.m. at the Khagrachhari Circuit House premises, Abdul Hasnat Abdullah said.

The surrender of arms in the second phase will be held at Baghaichhari High School field in Baghaichhari Thana of the hill district of Rangamati on February 16 while the third phase will be held at Boradham High School field in Dighinala Thana of the district, the Chief Whip said.

The last group of the tribal insurgents will give themselves up to the government with the last stock of arms and ammunition on February 28 at Dudukchhara in Panchhari Thana of the district, Chairman of NCCHT added.

The chairman of the PCJSS was present besides the Chief Whip Abul Hasnat Abdullah at the time of the press briefing.

The PCJSS has also submitted the complete list of the tribal insurgents and the quantity of weapons to be surrendered today in the meeting.

Today's meeting—last in its series—ended at 3.45 p.m. was attended by Minister for Civil Aviation and Tourism Engineer Mosharraf Hussain, Minister without portfolio Kalpa Ranjan Chakma, Chittagong City Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, Members of Parliament Dipankar Talukder and Bir Bahadur, Chittagong Divisional Commissioner Shakhawat Hussain and the Deputy Commissioner of Khagrachhari hill district AKM Zafrul Hussain from Bangladesh side while Raktautpal Tripura, Sudhansindhu Khisa and Dr Babul Chakma from PCJSS side.

Immediately after the meeting the PCJSS team was flown off to Dudukchhara by an army helicopter.

The Bangladesh Observer

January 23, 1998

PM to receive arms from Shantibahini at Khagrachhari Feb. 10

Prime Minister Sheikh Hasina is expected to receive arms from Shantibahini insurgents on February 10 at the Khagrachhari Stadium, official sources in Dhaka said on Thursday, reports UNB.

Around 2,000 tribal guerillas are likely to surrender their arms, according to a list the National Committee on CHT received on January 15 from PCJSS, the political umbrella of Shantibahini.

The tribals will lay down their arms as per the peace accord signed between the government and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) on December 2.

A NCCHT-PCJSS meeting on January 15 decided that the Shantibahini men will surrender their arms and ammunition to the government on February 9, 16, 22 and 28.

Meanwhile, the government has constituted a three-member Implementation Committee headed by NCCHT Convener Chief Whip Abul Hasnat Abdullah to monitor the implementation of the agreement.

Two other members of the committee are Dipankar Talukder, MP, and PCJSS Convener Jyotirindriya Bodipriya Larma alias Shantu Larma.

The committee will supervise the implementation of the agreement, fix up programmes and implement all works related to arms surrender and general amnesty under the agreement, provide suggestions and directives to all the concerned ministries, departments and other offices.

It will also coordinate among the offices involved in the process of implementation of the accord.

Other terms of reference set for the committee are to take measures and give suggestions to the government if any problem arises in implementing the accord and also to supervise the repatriation and rehabilitation of tribal refugees and internally displaced people of the three hill districts.

The government has also reorganised the Task Force, headed by Dipankar Talukder MP, that will look into the rehabilitation of repatriated refugees and internally displaced people of CHT.

Of around 50,000 tribal refugees, who took shelter in six camps in the Indian State of Tripura, a large number have already returned home. The rest are expected to come back by February 16. Four of the six camps have been dismantled after the return of refugees to the CHT.

Meanwhile, the Special Affairs Division has received Tk 30 crore against the required Tk 40 crore for the rehabilitation of refugees. The remaining Tk 10 crore will be made available shortly.

A source said the Division has requested the government for an additional Tk 10 crore for the rehabilitation of about 2,000 tribal guerillas after their surrender.

Each of the surrendered guerillas will get Tk 50,000 as per the CHT agreement. This amount is equal to what is spent for ration and house building of a repatriation refugee.

A meeting with Home Minister Rafiqul Islam in the chair in Dhaka on Thursday discussed various aspects of the implementation of the CHT peace accord.

The meeting constituted a committee, headed by the minister without portfolio, Kalparanjan Chakma MP, to recommend necessary steps for implementation of the accord.

The meeting was attended, among others, by Chief Whip Abul Hasnat Abdullah, Bir Bahadur MP, Khagrachhari Local Government Parishad Chairman Samiran Dewan and Chief of Army Staff Lt Gen Mostafizur Rahman.

The Bangladesh Observer

January 23, 1998

Writ against CHT treaty rejected

The High Court on Thursday rejected a Writ petition challenging the legality of the Chittagong Hill Tracts Peace Agreement signed between the government and the tribals on December 2, reports UNB.

After hearing the writ petition on the question of issuance of rule, the court comprising Justice Kazi Safiuddin and Syed JR Modassir Hossain summarily refused to accept it.

Attorney General Barrister KS Nabi seriously objected issuance of rule on the Writ petition filed by Advocate Shamsuddin. The petitioner sought the issuance of rule on the agreement.

The AG submitted that the Writ petition was premature, suffering from one-sided political views and full of politically motivated facts which were not sufficient as the ingredients of a Writ petition.

The court, after hearing the submission from the petitioner as well as the AG, asked the petitioner to take back the Writ petition as it is not maintainable.

BNP legislator Barrister Nazmul Huda prayed to the court to allow the petitioner to take back the Writ petition so that he (Huda) could correct the petition and file it again.

But the petitioner Advocate Shamsuddin, affirmed to the court that the contents of the Writ petition were correct and he won't take back.

At this stage, the court passed the order refusing the Writ petition.

It was contended in the Writ petition that the signatories to the Hill Tracts Peace Agreement were no authorised by law to put their signatures on the instrument.

The petition said Chief Whip Abul Hasnat Abdullah for the government did not sign as per order of the country's President whereas Shantu Larma (Jyotirindra Bodhipriya Larma) also cannot be said to be a "legal person" and not any way legally treated person to sign the agreement.

As such, the Peace Agreement not legally valid and acceptable as per existing provision of law of the country, the Writ contended.

Attorney General KS Nabi with Additional AG Abdul Wadud Bhuiyan and Deputy AGS Obaidur Rahman Mostafa and M Faruque appeared for the government.

The Bangladesh Observer

January 22, 1998

Shantu Larma to lead SB arms surrender

Chittagong Office

CHITTAGONG, Jan. 20:— Shanti Bahini Supremo Jyotirindra Buddhi Priya Larma alias Shantu Larma will be among the first batch of 600 insurgents to lay down arms, a source close to Shanti Bahini said.

Shantu Larma and some of his core followers are likely to accompany those six hundred armed cadre members (Shanti Bahini (SB) men) who will lay down their arms and ceremonially surrender to the government in the stadium at hill district town Khagrachari on February 9.

The Chairman of the Parbattya Chattagram Jana Shanghati Samity (PCJSS), Mentor of the Shanti Bahini insurgents with some of his ardent supporters are supposed to give up their fugitive lives so that they can join the government's efforts to bring about lasting peace in the Chittagong Hill Tracts (CHT).

Shantu Larma is learnt to have intimated the National Committee on the CHT (NCCHT) of his intention to return to public life on February 9 during the meeting between the government and PCJSS at Khagrachari on January 15 last.

Immediately after his surrender, the government will take all initiatives to induct Jatindra Buddhi Priya Larma as the First Chairman of the Regional Council which will be the top tier in the administration of three hill districts in CHT, said a high official connected with the CHT Peace Process.

Meanwhile, a meeting of Inter-Ministerial Committee approved the set up of the new Ministry of CHT Affairs. It is now awaiting the endorsement of the Prime Minister Sheikh Hasina.

The Bangladesh Observer

January 25, 1998

Hill women hail CHT accord

Chittagong Office

CHITTAGONG, Jan. 24:— The Hill Women Federation (HWF) today took a resolution hailing the CHT peace accord.

The HWF held a conference in the Pahari Chhatra Parishad office at Banarupta. The conference attended by the HWF members coming from all over the CHT was presided over by its central organising secretary Wai Ching Prue Marma.

According to the report of our Rangamati correspondent, a new 11-member Convening Committee of the Hill Women Federation was elected at the conference. Wai Ching Prue Marma will head the Governing Committee as the Governor. Apart from the Convenor, Uttara Chakma and Shima Chakma have been made joint Convenors while Noyranjan Chakma appointed as the Member-Secretary of the new Committee.

Earlier, the conference was addressed, among others, by Uttara Chakma, Shima Dewan, Noyranjan Chakma, Arumita Chakma, Sajib Chakma of the Pahari Gano Parishad, Rajib Chakma and Palash Khisha of the Pahari Chhatra Parishad.

The speakers condemned those tribal leaders who are still opposing the implementation of the peace accord. They called them as "traitors to the just causes of Jumma people".

The Bangladesh Observer

January 28, 1998

PCJSS seeks highest security

Shanti Bahini to surrender

arms from Feb. 10

Chittagong Office

CHITTAGONG, Jan. 27:— A high powered meeting was held at Chittagong Circuit House today to discuss preparations for the surrender of arms by the first batch of the guerilla outfit—Shanti Bahini.

The meeting presided over by Kalparanjan Chakma, Minister without portfolio recommended some necessary steps to make the

arms surrender ceremony at the Khagrachhari Stadium on February 10 a success. Prime Minister Sheikh Hasina is expected to be present at that ceremony.

The meeting was attended, among others, by Dipankar Talukder MP, Bir Bahadur MP, Khagrachhari Local Government Parishad Chairman Samiran Dewan, Rangamati Local Government Parishad Chairman Chink Qui Rowaja. Bandarban Local Government Parishad. Chairman Thoai Chai Prue, Chittagong Divisional Commissioner M. Shakhwat Hossain, Director General of the Special Affairs Division Mobaidul Islam, Khagrachhari Army Brigade Commander, BDR Sector Commanders, Deputy Commissioners of three hill districts and SPs of three hill districts. The three-hour meeting began at 12 noon.

In the first phase about 2,000 members of the guerilla outfit-Shanti Bahini will give up their arms during the coming arms surrender ceremony at Khagrachhari, according to a list the National Committee on CHT received on January 15 from the PCJSS, the political umbrella of the Shanti Bahini. They will be led in the surrender ceremony on February 10 by their supremo Jyotirindriya Bodhipriya Larma alias Shantu Larma.

The tribal guerillas will surrender their arms as per the peace accord signed between the Government and Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) on December 2.

Meanwhile, the government has constituted a three-member Implementation Committee headed by NCCHT Convenor Chief Whip Abul Hasnat Abdullah to monitor the implementation. Two other members of the committee are Dipankar Talukder MP and PCJSS Chairman Jyotirindriya Bodhipriya Larma.

The committee will be responsible for supervising the implementation of the peace accord, fixing up the programmes and implementing all works relating to arms surrender and general amnesty under the accord, providing suggestions and directives to all the concerned ministries, departments and other offices. It will also coordinate among the offices involved in the process of implementation of the accord and supervise the repatriation and rehabilitation of tribal refugees.

The Special Affairs Division has already received Taka 30 crore against the required Tk 40 crore for the rehabilitation of refugees. The remaining Taka 10 crore will be made available shortly.

APB report from Khagrachhari adds: PCJSS has proposed temporary troops withdrawal from 22 remote camps four days

ahead of the tribal insurgents arms surrender scheduled for February 10.

Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity, in a letter to the government through the liaison committee, sought "highest security measure" for its high command and members.

It requested arrangements for the first phase of the arms surrender February 10-11, sources here said.

The PCJSS letter, signed by Ushaton Talukder, was sent to the concerned Ministry, liaison committee convener Hangsa Dhawaj Chakma informed.

The PCJSS, the political wing of the Shanti Bahini, had sent to the regional commander and the deputy commissioner the letter seeking camp withdrawal on the occasion of arms surrender.

The Bangladesh Observer

February 4, 1998

Arms surrender ceremony Feb 10

**Rafiq leaves for CHT today
to see preparations**

Staff Correspondent

Preparations are underway to hold the arms surrender ceremony by the Shanti Bahini guerillas, the armed wing of the Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity at Khagrachhari on February 10. Some 600 Shanti Bahini guerillas led by PCJSS leader and Commander-in-Chief of Shanti Bahini Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma will lay their arms to Prime Minister Sheikh Hasina at Khagrachhari Stadium.

A 20-member team led by Home Minister Rafiqul Islam BU will visit Khagrachhari today (Wednesday) to see the preparations for the arms surrender ceremony to be held on February 10. Chief Whip of the Bangladesh Jatiya Sangsad and Chairman of the National Committee on Chittagong Hill Tracts Abul Hasanat Abdullah will be among the team members. They will discuss with the authorities at Khagrachhari about the preparations for the arms surrender as well as the guard of honour to be given to Prime Minister Sheikh Hasina by the Shanti Bahini guerillas before laying their arms.

The surrender of arms by Shanti Bahini guerillas is being arranged as per peace accord concluded between the Government and PCJSS in Dhaka on December 2. At least 2000 Shanti Bahini members will surrender their arms on February 10, 11, 16, 22 and

28 at different places. However, the main arms surrender ceremony will be held at Khagrachhari Stadium on February 10. Following the surrender of arms by the Shanti Bahini members, the two-decade old insurgency by tribals of three Chittagong Hill Districts will come to an end. After the arms surrender, the tribal guerillas will return to normal life under an amnesty. The Government will pay Taka 50,000 to each Shanti Bahini guerilla for rehabilitation.

Meanwhile, the Government has imposed restrictions on meetings, rallies and demonstrations from Chittagong to Ramgarh point from February 6 to 10 to ensure smooth and peaceful conduct of arms laying ceremony. About 5000 security personnel including police, paramilitary BDR and 2000 Army will remain on guard at different points to ensure strict security of the arms surrender ceremony.

The arms surrender ceremony will be witnessed by at least 100 foreign diplomats and dignitaries, 200 journalists from both the national and foreign media, high civil and military officials. The Government has invited leaders of different political parties including BNP, Jatiya Party and Left Democratic Front to attend the arms surrender ceremony at Khagrachhari.

Leader of the Opposition in Parliament and BNP Chairperson Begum Khaleda Zia and Jatiya Party Chairman H.M. Ershad were invited by the government to attend the arms surrender ceremony. But Begum Khaleda who rejected the Chittagong Hill Tracts peace accord with Shanti Bahini and organising protests across the country against it will leave the country for Saudi Arabia for treatment on February 8. Jatiya Party Chairman H.M. Ershad already in the United States will also not be available on the day to attend the ceremony.

The Bangladesh Observer

February 6, 1998

Chronology of CHT issue

KHAGRACHARI, Feb. 5:— The first batch of former "Shanti Bahini" tribal insurgents will surrender their weapons here on February 10 before the Prime Minister Sheikh Hasina, reports BSS.

Following is a brief chronology of the events centering the Chittagong Hill Tracts.

January 7, 1973: "Shanti Bahini" emerged as the armed wing of Parbatya Chattagram Jana Sangha Samity (PCJSS) with

Jyotirindra Bodhipriya Larma, better known as Shantu Larma, as its Commander in the Chittagong Hill Tracts.

May 29, 1977: Shanti Bahini insurgents launched a major offensive against a tiny band of local security force. The security was beefed up with Bangladesh Army and Navy personnel after the surprise attack. The ratio between people and security men stood at 1:5 immediately as security was tightened.

March 25, 1980: Kalampati mass killing, Local Parliament Member Upendra Lal Chakma accused the army for the incident at a press conference in Rangamati and alleged that some 300 tribals were killed. Visiting opposition MP Shahjahan Siraj and Rashed Khan Menon were present in the conference.

December 1980: Ziaur Rahman's government condemned the Kalampati mass killing and passed a bill in Parliament relating to the "Troubled Areas (CHT)". The bill made provisions for the police Sub-Inspectors and Army non-commissioned officers to shoot any insurgent and launch search (without warrants) against any person possessing illegal arms.

February 5, 1982: A tribal delegation led by Subimal Dewan, Tribal Affairs Secretary to the President, called on President Justice Abdus Sattar to discuss problems relating to the CHT. Justice Sattar cancelled some educational and service quotas granted to the tribals by Ziaur Rahman's government.

July 27, 1982: New President H.M. Ershad discussed CHT issue with three major tribal leaders. He authorised Major General Mannaf, General Officer Commanding (GOC) of Chittagong Area, to visit Rangamati as the government representative.

October 24, 1982: Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) split at its annual conference. Manabendra Narayan Larma, a former MP and founder of the organisation, became leader of one faction, while the other was led by Priti Kumar Chakma.

June 14, 1983: The two factions of Shanti Bahini locked in armed clashes against each other for the first time.

November 10, 1983: MN Larma and his seven comrades were killed at Kalyanpur refugee camp in Ejara village of Amarapur sub-division in the Indian state of Tripura in an offensive launched by the rival "Priti Group".

June 29, 1985: Two hundred and thirty three (233) members of "Priti Group" surrendered their arms after agreements with the government. But leaders of the group Priti Kumar Chakma and Bhabatosh Dewan remained in hiding.

October 21, 1985: First round of official talks was held between the army officers and PCJSS, the political wing of Shanti Bahini, at Pujgang area at Panchari thana under Khagrachhari hill district.

June 2, 1986: Shanti Bahini ravaged some settlers' villages. They also killed some members of the Bengali non-tribal settlers in a gruesome way.

July 27, 1986: Shanti Bahini launched their second massive offensive against the non-tribal settlers in the Hill Tracts (CHT). The non-tribals, in retaliation, revaged some tribal villages. As tension mounted, hundreds of tribals from the CHT left home for Indian state of Tripura as refugees. The government denied the tribal claims that 50,000 non-tribals Bangalees is 30,000.

September 19, 1987: tribal leaders called on President H.M. Ershad and sought political solution to the insurgency problem in the Hill Tracts. Ershad formed a National Committee to look after the CHT issue with Planning Minister A.K. Khandoker as its chief.

December 7, 1987: After a long break of two years Second Round of talks between army officials and PCJSS leaders, began at Pujgang village.

January 24 and 25, 1988: Third round of official talks between army officers and the PCJSS began at Pujgang village.

February 17, 1988: Fourth round of official talks between army and the PCJSS began.

June 19, 1988: Fifth round of official talks between army and the PCJSS was held at Khagrachhari Circuit House.

May 4, 1989: Shanti Bahini launched armed attacks to foil Local Government System in the hills. Abdur Rasheed Sarkar, Chairman of a local Upazila Parishad was killed in the attack. The Bengali settlers, in retaliation, set Chakma villages on fire resulting in huge casualties. This is known as "Langadu Incident".

April 10, 1992: BNP Government forms an Enquiry Committee to probe the "Logang incident" where several persons were reportedly killed in a clash between the tribals and non-tribals.

July 8, 1992: BNP Government passed a bill in Jatiya Sangsad for extending the time-frame of the Local Government Councils in the three hill districts despite strong opposition by Awami League and tribal legislators.

July 10, 1992: The government formed a committee headed by Communications Minister Colonel (retd) Oli Ahmed to resolve the

insurgency problem in the Hill Tracts. But the lawmakers from the hills term the Committee as "illegitimate" as none of them were included in the Committee.

August 1, 1992: Shanti Bahini declared unilateral ceasefire. The time limit for the ceasefire was extended for 35 times until December 31, 1997.

October 7, 1992: The probe body report on Logang Incident was published. It charges Shanti Bahini for the massacre.

November 5, 1992: Oli Ahmed Committee held its first meeting with PCJSS at Khagrachhari Circuit House. Shantu Larma led the PCJSS delegation.

November 17, 1992: Reported army action against tribal students protest. The government forms a probe body to investigate the matter known as "Naniarchar Incident."

December 26, 1992: Second round of official talks was held between the Government Committee led by Oli Ahmed and the PCJSS at Khagrachhari Circuit House.

May 22, 1993: Third round of talks was held between the two sides at Khagrachhari Circuit House.

July 14, 1993: Fourth round of talks was held between the two sides at Khagrachhari Circuit House.

September 18, 1993: Two sides met for the Fifth round of talks at Khagrachhari.

November 24, 1993: Sixth round of official talks was held between the Government and the PCJSS at Khagrachhari Circuit House.

February 22, 1994: One thousand eight hundred and forty one (1,841) tribals returned home from the Indian state of Tripura in the past seven days.

May 5, 1994: Seventh round of official talks was held between the BNP government and the PCJSS at Khagrachhari Circuit House.

June 4, 1994: A sub-committee led by lawmaker Rashed Khan Menon met the PCJSS leaders at Dudukchhari of Panchhari thana under the Khagrachhari hill district.

July 10, 1994: The sub-committee met PCJSS leaders for the second time at Dudukchhari.

July 1994: Second phase of repatriation of the tribal refugees three thousand three hundred and forty five refugees returned home from the Indian state of Tripura.

August 28, 1994: The sub-committee met PCJSS leaders for the third time at Dudukchhari.

December 26, 1994: The sub-committee held talks with PCJSS for the fourth time at Dudukchhari.

July 12, 1995: Sub-committee met PCJSS for the Fifth Round of talks at Dudukchhari.

October 25, 1995: The Sixth round of talks (13th round of official meeting) between the sub-committee and PCJSS ended without any resolution.

June 23, 1996: Twenty eight wood-cutters were brutally killed, allegedly by Shanti Bahini men in the deep forest in the first such incident since Awami League government of Prime Minister Sheikh Hasina came to power.

September 30, 1996: The Cabinet formed the National Committee on Chittagong Hill Tracts headed by Chief Whip Abul Hasnat Abdullah involving BNP and Jatiya Party law makers. The two BNP MPs, however, although remained absent from the Committee activities.

December 21, 1996: The National Committee (of Awami League Government) met the PCJSS for the first time at Khagrachhari Circuit House. The meeting resumed deliberation on December 24 after a two-day recess.

January 25, 1997: PCJSS leaders led by Shantu Larma arrived in the capital Dhaka for the first time since the insurgency began. They stayed in the state guest house "Padma" during the three-day second round of official talks.

March 12, 1997: The Third Round of talks (two-day) began at Padma state guest house in Dhaka.

March 28, 1997: Six thousand seven hundred and eight tribal refugees returned home from Indian state of Tripura.

May 11, 1997: The Fourth Round of talks began at Padma (Dhaka). On May 14, the National Committee and PCJSS announced before the reporters waiting in front of the guest house that they had reached a "consensus" and would sign a peace treaty soon.

July 14, 1997: Fifth Round of talks between the National Committee and PCJSS began at Padma (Dhaka). It continued up to July 18.

September 14, 1997: Sixth Round of talks between the two sides began at Padma, on September 17, Shantu Larma announced that the National Committee and PCJSS had formulated the draft of the Peace Agreement.

October 14, 1997: Leader of the Opposition and BNP Chief Begum Khaleda Zia alleged at a public meeting in Bogra that the Awami League Government is planning to withdraw military from the Chittagong Hill Tracts.

October 17, 1997: Prime Minister Sheikh Hasina refuted the claim by Begum Zia saying the Government has no plans to withdraw military from the Hill Tracts.

November 1, 1997: In response to the opposition demand for disclosing the draft of the peace accord, Prime Minister Sheikh Hasina says it may create complicacies if the draft is disclosed before its signing.

November 30, 1997: Seven thousand six hundred and twenty tribal refugees returned home under the nine-day repatriation package.

November 26, 1997: Seventh round of official talks began at Padma state guest house.

November 30, 1997: The National Committee and the PCJSS agreed on all issues of the draft accord after mid-night.

December 2, 1997: The two sides signed the historic peace accord in presence of Prime Minister Sheikh Hasina at her Tejgaon office.

The Bangladesh Observer

February 7, 1998

Effective from date of arms surrender General amnesty for Shantibahini men

The Government Friday declared general amnesty for the Shanti Bahini Guerillas, armed members of the Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), to surrender their arms and return to normal life, reports UNB.

The general amnesty was announced in accordance with the CHT peace accord signed by the government and the PCJSS in Dhaka on December 2 last year, providing autonomy to the Hill Tracts.

A Home Ministry notification said amnesty will be effective from the date of surrendering arms and ammunition in their possession, control or supervision to the government.

Places and dates fixed for surrendering arms and ammunition, as per the agreement signed between the National Committee on CHT and the PCJSS are: Khagrachari Stadium (February 10), Bangaichhari High School ground (Feb. 16). Bardam High School (Feb. 22) and Dudukchhari (Feb. 28).

After the general amnesty becomes effective as per clause 2 of the Home Ministry notification, the cases, arrest warrants or Hulia against the members will be withdrawn and steps taken to pardon the convicts tried in absentia and release the imprisoned members.

The amnesty would also be applicable to other permanent residents, who were involved in the activities of the PCJSS, after they return to normal life.

The Home Ministry notification said after the Shantibahini men deposit their arms and ammunition and return to normal life, no case will be filed, no arrest will be made nor anyone will be awarded punishment for his membership of the PCJSS.

The government hopes that after returning to normal life, the PCJSS members would lead their life as good citizens of Bangladesh and contribute adequately to overall national development, the notification said.

Official sources said around 2,000 guerillas are expected to lay down their arms responding to the government's amnesty offer.

On February 10, some 600 insurgents headed by PCJSS Leader Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma will surrender their arms.

Prime Minister Sheikh Hasina will receive the arms at the newly built Khagrachhari Stadium amidst foolproof security measures.

The Bangladesh Observer

February 8, 1998

White flags dominating skyline of Khagrachhari

KHAGRACHHARI, Feb. 7:— White flags are dominating the skyline here with black flags disappearing as the people of the hill township await with enthusiasm for the ceremonial laying down of weapons by the Shanti Bahini to mark the end of the more than two-decade-old insurgency in the region, reports BSS.

The small township by the tiny and serpentine Changi river wore a festive look with the arrival of hundreds of peace-loving people from different parts of the Chittagong Hill Tracts to witness the historic event on Tuesday.

Scores of officials, observers and journalists have crowded the hotels and government rest houses, while local officials are struggling to make room for others expected to reach here tomorrow and afterwards.

Scores of volunteers joined hands with the local administration for preparing the ground for staging the 90-minute event in a befitting manner.

"Good senses have returned as those who were opposed to the peace accord are now working for the success of the ceremony," said Jiten Barua, a local cultural activist.

He added; "now you will see white flags instead of black ones all along the Chittagong-Khagrachhari Highway."

Local residents have hoisted the white flags atop their shops and houses at Garitana, Tin Tohori, Manikchhari, Jaliapara, Guimara and Matiranga to express their support to the peace agreement.

Zahidul Alam, General Secretary of Khagrachhari Awami League, said, "those who were against the peace agreement have now become its strong supporters realising their mistakes."

"There is no denying the fact that there was a misunderstanding particularly among the Bengali-speaking settlers initially due to the opposition campaign against the accord," he said.

Most leaders of the opposition bloc in the most troubled suburban Matiranga thana, who led the violent anti-accord campaign last month, have now changed their stand and working for moulding public opinion in favour of the agreement, local Awami League leaders said.

They said, "several BNP leaders are expected to formally join Awami League tomorrow cutting off their relations with the opposition."

Two people were killed and many others were injured when the protesters of the agreement turned violent and encountered the security forces last month in Matiranga, 5 kilometres off here.

Armed Forces are supervising the preparedness for the event in the newly-built Khagrachhari stadium where Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma, Chairman of the Parbatya Chhattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political front of Shanti Bahini, will ceremonially lay down his arms before Prime Minister Sheikh Hasina. More than 700 former insurgents will surrender their weapons during the event.

"My troops are now the happiest people in the world for getting the opportunity of giving their labour for the ceremony," said a senior army official supervising the preparation at the stadium.

He added; "for many years, we were here on a different assignment... now the tense atmosphere has disappeared and we are working for the peace."

The stadium, having a capacity of accommodating some 20,000 people will be used for the first time on Tuesday for the landmark event.

Minister without portfolio Kalparanjan Chakma will inaugurate the stadium tomorrow.

"It is a good start for the stadium and we are very happy to begin our journey by staging the historic ceremony here," said Tarun Bhattacharya, Secretary of the District Sports Association.

UNB adds: Security measures have been tightened starting from Chittagong to Ramgarh point. The army, paramilitary BDR, armed police have been geared with instructions to keep close vigilant and to ensure complete peace at the arms surrendering ceremony.

The Deputy Commissioner of Khagrachhari has banned all sorts of gatherings, meetings and processions effective from Friday to Tuesday in areas from Chittagong to Ramgarh.

A media centre has been set up at Khagrachhari stadium to allow local and foreign journalists to feed them with relevant information. The centre is equipped with telecommunication facilities.

At least 100 foreign diplomats and dignitaries and 200 foreign and local journalists, high civil and military officials and members of public will assemble at the stadium to witness the arms surrender.

Following the submission of arms, all insurgents will be given general amnesty, warrant of arrest against them will be withdrawn and a hefty purse of Tk 50,000 given to each insurgent for their resettlement in normal life and later with job.

The PCJSS, the political wing of the tribal guerillas, were demanding regional autonomy in the three hill districts of Khagrachari, Bandarban and Rangamati since mid 70s.

As the surrendering of arms will take place, repatriation of all the 50,000 tribal refugees from the Indian state of Tripura will be completed by February 16.

The 22-year insurgency in the CHT has claimed lives of more than 20,000 people, including 500 security men.

The Bangladesh Observer

February 9, 1998

Build up resistance against those opposing peace: PM

SATKHIRA, Feb. 8:— Prime Minister Sheikh Hasina today (Sunday) called upon the people to build up resistance against those opposing peace and trying to create unrest in the country, reports UNB.

"People want peace and stability for which the government is striving hard, but certain quarters are trying to create unrest opposing the peace," she told a huge public meeting at the Satkhira Government High School ground in the afternoon.

The Prime Minister also urged the opposition to return to Parliament and discuss their problems inside the House.

"We've restored transparency and accountability in the parliament," she said adding that the BNP could speak on any issue after coming to the parliament.

"We don't know on what issue they boycotted the parliament, they can raise any issue on the floor of the House," she added.

Referring to the signing of Chittagong Hill Tracts accord, Hasina said the members of the Shantibahini would return to normal life surrendering their arms and ammunition on February 10.

Peace will be restored in the troubled region of the country that is very much important for the overall development of that region as well as the whole country, she said. "Only BNP and some of its alliances are opposing the peace."

She said that following the signing of CHT peace accord, the longstanding war-like situation has stopped and an environment for development has been created.

Criticising the BNP leadership, the Prime Minister said the opposition leader had told that the region from Feni will become part of India after the signing of CHT peace agreement.

"It was a damn lie... that area of the country didn't become part of India and the opposition leader was not carrying an Indian passport while going to Saudi Arabia," she said.

BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia left here for Jeddah this (Sunday) morning on a fortnight's visit during which she will perform Omrah and have a medical check-up.

The Bangladesh Observer

February 10, 1998

Decades of armed insurgency ends

Shanti Bahini Surrenders arms today

All roads lead to Khagrachhari, a tiny hill town in CHT where tribal guerillas today (Tuesday) surrender their arms to Prime Minister Sheikh Hasina ending the two decades of insurgency and bush war. The arms surrender ceremony begins at 11 a.m. at the newly built Khagrachhari stadium.

The first batch of more than 700 tribal guerillas known as Shanti Bahini led by their chief Jyotirindra Bodhiprio Larma alias Shantu Larma will lay their arms before the Prime Minister. The entire nation will be eying the historic arms laying ceremony by the tribal guerillas when the Bangladesh Television (BTV) will telecast live the programme directly from the Khagrachhari stadium at 11-30 a.m. Bangladesh Betar will also broadcast live the programme from the same venue.

The Prime Minister who receives the first arm from the insurgents' leader Shantu Larma will reciprocate with a bunch of white roses as symbol of peace. Some 25000 people including ministers, political leaders, diplomats and observers are expected to witness the ceremony at the Khagrachhari stadium. At least 200 mediamen from home and abroad will cover the historic arms surrender event.

The arms surrender by the tribal guerillas is a part of the implementation of the landmark peace agreement signed between the government and Parbattya Chhatragram Janasanghati Samity (PCJSS) in Dhaka on December 2 last year. The completion of the Chittagong Hill Tracts Peace Accord is another landmark achievement of Awami League government led by Prime Minister Sheikh Hasina after the historic 30-year Ganges Water Sharing Treaty with neighbouring India on December 12, 1996.

The first batch of more than 700 tribal guerillas out of an estimated 1933 armed members of Shanti Bahini assembled at Dudukchhari Monday.

The signing of the landmark peace agreement on CHT by the government with tribal insurgents was widely acclaimed by the international community including the major powers, the United States, Britain, Japan, Australia, Canada, India and Pakistan.

According to the negotiated programme the rebels will deposit their arms to the Bangladesh Army in the transit camps for inventory by the security forces.

Meanwhile, strict security measures have been taken by the security forces including the Bangladesh Army, Bangladesh Rifles (BDR), Police and Ansars for the smooth conduct of the arms laying ceremony at Khagrachhari stadium. Security forces will remain on guard at all entry points leading to Khagrachhari. Rallies and demonstrations in the district were banned since February 6 to prevent any untoward incident. The main opposition Bangladesh Nationalist Party, its six allies including Jamaat-e-Islami called for a day-long hartal in Chittagong division and countrywide demonstrations today (Tuesday) to registered protest against the CHT peace accord. The opposition BNP and its allies blamed the government for what it called unequal accord ignoring the interest of the country. They also called the peace agreement unconstitutional.

BNP's hartal call in Chittagong division in protest against the peace agreement seemed to have lost force and militancy as a good number of its leaders in Chittagong questioned the justifiability of calling the shutdown. The BNP leaders are reportedly hard pressed from their workers against the hartal. According to party insiders the departure of BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia from the country two days before the hartal have had a demoralising effect on the leaders and workers. Chairperson of BNP and Leader of the Opposition Begum Khaleda left for Saudi Arabia on Sunday for treatment.

The Bangladesh Observer

February 10, 1998

BNP to oppose

Implementation of CHT treaty

BNP Secretary General Abdul Mannan Bhuiyan has warned that his party will not allow the government to implement the CHT agreement as the people rejected the accord, reports UNB.

"The unconstitutional black accord will never bring peace... it will rather create unrest in the country," he said addressing a central committee meeting of Jatiyatabadi Krishak Dal in Dhaka Monday.

The BNP leader said people across the country have been demonstrating for cancellation of the agreement and the movement will take a serious turn if the government tries to implement it rebuffing public opinion.

He accused the government of trying to implement the accord forcibly disregarding the people's opinion by resorting to repressive acts. "The government will not be able to stop the movement by harassing its political opponents."

Bhuiyan said BNP always wants peace in the CHT within the constitutional framework and safeguarding the interests of tribal and non-tribal people in the region.

The BNP Secretary General said, "a silent famine is sweeping the country as the price of essentials, particularly the rice, have gone up."

Bhuiyan called upon the people to make today's (Tuesday's) hartal in the Chittagong division and demonstration elsewhere in the country a success.

BNP and its allies called the programmes demanding cancellation of the CHT agreement.

Presided over by Mahbubul Alm Tara, the meeting was addressed, among others, by Shamsuzzaman Dudu, Advocate Shamsul Bari Mia Mohon, Alamgir Kabir, Majibur Rahman and Mohammad Borhanuddin.

The Bangladesh Observer

February 10, 1998

Khagrachhari wears

a festive look

Chittagong Office

CHITTAGONG, Feb. 9:— The stage is now set for the landmark surrender of first group of Shanti Bahini men at Khagrachhari stadium tomorrow (Tuesday) heralding "a new era of peace in the battle-scarred Chittagong Hill Tracts (CHT)."

Prime Minister Sheikh Hasina will set forth the milestone ceremonially receiving the first gun from the supremo of guerrillas Jyotirindriya Bodhipriya Larma alias Shantu Larma at 11 a.m. "The lay down of arms first by Shantu Larma before the Prime Minister will be marked as a gesture of allegiance to the Government," said Khagrachhari Deputy Commissioner AKM Jafrul Hossain.

The Prime Minister accompanied by her cabinet colleagues and dignitaries will fly in Khagrachhari tomorrow morning. She will return to Dhaka the same day.

Kalparanjan Chakma MP, Minister without portfolio today left for border hamlet Daduckchhari where Shantu Larma with some of

his close followers are now encamped. The Minister is scheduled to come back to Khagrachhari this evening escorting the PCJSS leaders under tight security measures. Shantu Larma is expected to stay overnight at Khagrachhari Circuit House.

Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) Chairman Shantu Larma will lead the first group of 757 guerillas in the surrender. They are all brought to Perachara transit camp at Khagrachhari by the jeeps today. Of them, 207 were transported from Maichhari, 269 from Khilachhari and 276 from Daduckchhari.

After arriving at the transit camp, they deposited their arms and ammunition to the security force. They will be taken to Khagrachhari stadium by jeeps at 9 a.m. tomorrow. These armed cadre members of the PCJSS also include some women members.

The 752 Shanti Bahini men deposited 463 fire arms of which 400 arms different categories will be put on display at Khagrachhari stadium tomorrow (Tuesday).

Among the prominent Shanti Bahini Commanders scheduled to lay down their arms on the first day are Major Debashish Chakma, Major Debangshi, Major Naitik, Major Khisha, Lieutenant Renon, Lieutenant Nabodoy and Lieutenant Tarit.

The gate of the stadium will open from 9 a.m. and close at 11 a.m. Prime Minister Sheikh Hasina accompanied by her cabinet colleagues will reach the venue at 11 a.m. The 90-minute ceremony will immediately start with playing of national anthem, releasing of pigeons and balloons and display of posters and banners.

"We have undertaken a massive preparations for the big show which will be witnessed by the dignitaries and diplomats in the hill tracts," said Minister Kalparanjan Chakma who is coordinating the tribals arms surrender process with top ranking leaders of the PCJSS-Ushaton Talukdar. Sudha Sindhun Khisa, Rakta Utpal Tripura and Gutam Chakma. Task Force Chairman Dipankar Talukder MP is coordinating with those Shanti Bahini men who will arrive from Rangamati side. Huge volunteers joined hands with the local administration for preparing the ground for the grand ceremony.

About one thousand tribal leaders from hill districts—Rangamati and Bandarban also reached Khagrachhari for attending the surrendering of arms ceremony. Scores of officials, observers and journalists have crowded the town.

Khagrachhari town now wears a festive look. White flags now galore the skyline in the town as the symbol peace in CHT.

Fiftyfour platoons of police have been deployed for the maintenance of law and order in Khagrachhari on the occasion of grand ceremony. The police will also guard 30 culverts along Chittagong-Khagrachhari Road and Panchhari Road tomorrow to check any possible hindrance in the movement of transports.

Around 2000 tribal guerrillas are expected to surrender their arms and return to normal life in phases by February 28. Each of the guerillas will get Taka 50,000 as per the CHT agreement. Meanwhile, the Special Affairs Division has already procured Taka 10 crore for the rehabilitation of the guerillas after their surrender. Those who are eligible will be absorbed in Government and other jobs. They will also be provided with security, if asked for, as per the peace accord.

The Bangladesh Observer

February 10, 1998

**BTV to telecast
live arms surrender**
Staff Correspondent

Bangladesh Television (BTV) will telecast live the arms surrender ceremony of the tribal Shanti Bahini insurgents from Khagrachhari stadium at 11-30 a.m. today (Tuesday). Bangladesh Betar has also arranged the live broadcast of the ceremony from the Chittagong Hill Tracts district headquarter Khagrachhari.

The special session of Bangladesh Television today (Tuesday) will begin at 10-30 a.m. for the live telecast of the Khagrachhari arms surrender programme. Bangladesh Television has made arrangement for the live telecast of the programme through the US owned company Panam Satellite.

The Bangladesh Observer

February 10, 1998

**AL protests hartal
on arms surrender day**

CHITTAGONG, Feb. 9:— Awami League and its front organisations today brought out processions and held rallies in different parts of the city protesting tomorrow's proposed hartal call in Chittagong divisions by BNP, it's ally Jamaat and other fundamentalist and reactionary forces on the day of arms surrendering ceremony at Khagrachhari hill district, reports BSS.

City Awami League, City Juba League, its local branches and Chhatra League held wayside meeting and processions at Panchlaish, Lalkhan Bazar, New Market Square, Agrabad and Kotwali crossing where they called upon the city people to resist the so-called hartal which is against the national interest, according to separate press release received here tonight.

They said BNP and other allies have given the hartal call when the people of the whole world in general and people of the country in particular are eagerly waiting to witness the arms surrendering of the tribal insurgents at Khagrachhari.

They urged the city people to ignore the hartal at any cost. Meanwhile, leaders of Muktiyuddha Juba Command city unit in a statement also condemned the hartal call and called upon the city people to reject it as BNP in collaboration with other reactionary forces do not want peace and stability in the country.

The Bangladesh Observer

February 11, 1998

Era of peace begins in CHT

739 Shanti Bahini men surrender arms

CHITTAGONG, Feb. 10:— After two and a half decades of much bloody blitzkriegs, the people in Chittagong Hill Tracts (CHT) region finally longed for a lasting peace. Peace at last descends on the hills of CHT and lust for peace replaced the gun battle in the troubled terrains of three hill districts.

The peace has now dawned and made deep furrows in CHT when Jyotirindriya Bodhipriya Larma alias Shantu Larma, Chairman of the PCJSS under which umbrella the Shanti Bahini waged warfare today showed his public allegiance to the Bangladesh government by handing his Chinese SMG (Short Machine Gun) over to Prime Minister Sheikh Hasina at Khagrachhari stadium.

With this, the cult of violence and gun culture that ruled the roost in CHT so long has come to a halt and the Shanti Bahini guerillas ceased to exist. And hopefully there will be no more carnivorous sort of animals there whose appetite is always whipped up by taste of blood. "No more blood letting, loss of child by mothers and reverberation of the sky by the heart-rendering cry of these bereaved mothers', declared the Prime Minister. When the sun was shining at noon across the range of hills, an era of peace crept up. It was, as if by the touch of a magic wand, the entire CHT

landscape got transformed when the first armed Shanti Bahini man in his olive green guerilla fatigue slowly walked in the lush green field of stadium through stadium's east gate at around 10.45 a.m. Behind him came in steadily walking the others—all clad in olive green uniform one by one. All through the numerous photographers clicked their cameras to take snap of each of them.

As they arrived a good number of spectators at the gallery gave them standing ovation. However, they all, took seat on chairs in four rows in the middle of the stadium.

Their eyes sparkled as shy grin pushed back their chubby, round cheeks. Some of them looked very much teen-aged. The 739 members of the Shanti Bahini took about 40 minutes to get in the stadium.

By that time, oval shaped newly build stadium decorated with banners and festoons with inscription of welcome note and hail of peace accord was brimmed with spectators. There were about 30,000 men, women and children attired in their best outfit gathered at gallery of stadium. The VIP's were also seated at their earmarked gallery. In the morning, the stream of people—tribal or non-tribal came to the stadium on foot. It seemed that the 80 per cent town dwellers were at the stadium, said Chittagong Divisional Commissioner M. Shakhwat Hossain who worked tirelessly for past few days to make the occasion a success. Some invited guests also could reach Khagrachhari by their care defying opposition hartal to witness the grand show.

But the Shanti Bahini supremo Shantu Larma had not arrived till then. Bir Bahadur, an Awami League MP from Bandarban district along with liaison committee member Bishwajit Chakma left Khagrachhari for border hamlet Daduckchhari of Panchhari thana where Shantu Larma along with some of his close followers encamped two days ago. However, Shantu Larma along with his three followers—Sudha Sindhu Khisha, Rakta Utpal Tripura and Gautam Chakma reached the stadium at 11.35 a.m.

Prime Minister Sheikh Hasina accompanied by most of his cabinet colleagues, some dignitaries and journalists arrived at the venue at around 11.45. At the specially decorated dais, with her Home Minister Major (ret'd) Rafiqul Islam, Chief Whip in Parliament and Convenor of the National Committee on CHT Abul Hasnat Abdullah, Minister Kalpa Ranjan Chakma, Civil Aviation and Tourism Minister Eng. Mosharraf Hossain, Dipankar Talukder MP and Bir Bahadur MP. Within 200 yards at a corner sat on the

chair were Shantu Larma with his three followers and Liaison Committee Convenor Hangsha Dhaj Chakma.

The function began with recitations from holy books, playing of national anthem, releasing of pigeons and balloons. The Prime Minister spoke for about 40 minutes. After that, Jyotirindriya Bodhipriya Larma (Shantu Larma) went up to the Prime Minister at the dais and handed her Chinese SMG over to the Prime Minister. Reciprocating Sheikh Hasina immediately presented Shantu Larma a bunch of white roses and told him to take seat beside her. Shantu complied her.

Then the 739 Shanti Bahini men deposited their arms one by one placing against a rack on stadium's south corner. They deposited altogether 463 fire arms which include 97 303 rifles, ten Chinese SMG, four 303 SMG, 15 Chinese rifles, one Rocket Launcher, some AK-47 rifles, mortars and LMGs.

Among the prominent surrendered Shanti Bahini Commanders were Major Nimai, Major Kanok, Major Debongshi Roy, Major Debashis, Lt. Renon, Lt. Biswajit.

The Bangladesh Observer

February 11, 1998

**Coexist peacefully in CHT,
work unitedly for uplift: PM**
Special Correspondent

KHAGRACHHARI, Feb. 10:— Prime Minister Sheikh Hasina made a fervent call to all tribals and Bengalees to peacefully coexist and work unitedly in the Chittagong Hill Tracts forgetting past bitterness and dispelling misunderstanding with the aim to build a prosperous Bangladesh.

Addressing the historic ceremony of arms surrender by the members of Shanti Bahini, the armed guerilla wing of the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), at the packed Khagrachhari stadium on Tuesday, she said that the country needed peace and stability for its development.

She said that the overall development of the country was not possible leaving one part of the country in a conflict. “We want peace, not conflict, creation not destruction, progress not backwardness, she said amid thunderous applause and cheer from the tribals and Bengalees, she said, our aim is to build a peaceful and prosperous society free from poverty and hunger. But this is not possible keeping a particular region underdeveloped. So we

accord emphasis on the restoration of peace, which brings stability, helps democracy to flourish and gives democracy and human rights an institutional shape. Peace brings welfare and harmony to humanity”.

“We do not want any more bloodshed, we want peace and stability, progress and prosperity. This country belongs to all of us. Political and social stability are essential for sustained economic development of the country” she told the jubilant audience.

The prime minister said that the long period of instability in the Chittagong Hill Tracts region would come to an end with the return of the members of the PCJSS to normal life. She hoped that the members of the PCJSS would contribute to the national development after returning to normal life.

“I know people from all walks of life in hill tracts had underwent untold sufferings and colossal losses in their day-to-day life”, she said, adding “let us take all these painful happenings as a matter of the past and move forward with new promise”.

Reaching at the fag end of the 20th century, the prime minister said, “let us pronounce in soft words of the poet-“Jirnaya Puraton Jak Bhesey Jak” (Let the wretched old wash away).

“As fresh voyagers towards a new destination we want to embrace the new millennium with a new message of peace and hope”, a delighted and happy Sheikh Hasina announced amid thunderous approval from thousands of people including diplomats as well as a receptive gathering of tribals and non-tribals in the sleepy hill township.

Welcoming the deposit of arms by 739 members of the PCJSS under the leadership of its president Santu Larma and subsequent returning to the normal life the prime minister said that the deposit of arms would usher in a new era in the history of our nation, particularly Chittagong Hill Tracts.

Receiving the arms the prime minister said, “I also accept you with love and affection from the core of my heart”. She pointed out that Khagrachhari stadium has become a part of history and a witness to the historic event. She also directed the concerned authorities to convert the Khagrachhari stadium into a full-fledged sports complex so that it can play a vital role in the flourishing and development of games and sports in this area.

Giving a chronological development of events since assuming office of her government to reach a peaceful solution of the long standing hill tracts problems, the prime minister said the signing of

the peace accord was possible because from the very beginning her government was sincere and discussion were held with PCJSS leaders with open mind.

The prime minister said that the previous governments could not succeed in solving the problems as they considered the issues as “economic” one and even they sometimes used force to solve it. “But the problem was basically a political one”, she said adding, “it was me who for the first time in 1982 declared the problem as political and called upon all to solve it through discussion”.

Referring to the formation of an 11-member National Committee on Chittagong Hill Tracts headed by Chief Whip of Parliament Abul Hasanat Abdullah and its subsequent six meetings with PCJSS leaders, the Prime Minister said the two members from BNP who were included in the national committee intentionally refrained from attending the meetings from the very beginning. They clearly demonstrated their non-cooperation with our efforts of restoration of peace. They evaluated the whole thing from their narrow partisan outlook, she observed.

On the otherhand, the Prime Minister said for the greater interest of the nation her party extended wholehearted support to the committee formed by the then BNP government.” Two MPs from our party—Kalpa Ranjan Chakma and Moshtaque Ahmed Chowdhury attended all the meetings with PCJSS leaders and took active part in the discussion,” she said. Even when the opposition members resigned enmasse from parliament and started movement against BNP government for ensuring people's rights her party's MPs continued to attend the meetings on CHT in the greater national interest.

Referring to the successful move of signing the peace accord on December 2 the Prime Minister said that the world community as well as the whole nation, including the tribals and non-tribals excepting a few self-seekers, welcomed the agreement. She regretted that BNP and a few parties are trying to misguide the people with wrong and incorrect information and they have been trying to create unrest in the country including the hill tracts region. “I sincerely call upon them to join the peace process with us leaving aside the path of anarchism,” she said.

The Prime Minister emphatically said that the peace accord had been signed with full allegiance to the sovereignty, territorial integrity and under the framework of the Constitution of Bangladesh. The rights of all tribals and Bangalees, living in the hill tracts region, have been ensured as those were in past.

The Prime Minister said that the Deputy Commissioners, SPs and other officers and staff members will remain in the three hill districts and work as usual. The Bangalees would continue to remain as the legitimate residents of the cluster villages on their own lands and she reiterated in unequivocal terms that the tribals and Bangalees would co-exist peacefully in the hill tracts and the Bangalees under no circumstances would be removed by force.

Turning back to the success of the peace initiatives, the Prime Minister said her government had succeeded in creating confidence among those tribal refugees who had taken shelter in neighbouring country and as a result 37,996 members of 7267 refugee families have already returned home. At the same time she expressed the hope that the rest of the refugees would be repatriated within the next few days and there would be an end to their miserable life in exile as refugees. With this the words, "tribal refugees" would be removed from our life for ever, she added. She thanked the Indian government for extending cooperation in this regard.

Referring to the massive programmes taken by her government for the development of Chittagong Hill Tracts the Prime Minister said, we have taken immediate, short, medium and long-term plans involving Taka 2,149.17 crore which would be implemented in phases.

She announced that sanction was made to set up a science and technology university in the hilly region.

Elaborating the programmes, she pointed out that besides building physical infrastructures of residential accommodations for chairman, officials and staff of the regional council schemes have also been taken for development of education, health care and other socioeconomic sectors.

Rubber and fruit gardens, agro-related industry, electrification, tele-communications and other means of socio-economic development are the other sectors to be developed under long term programmes. "We have been encouraging the private entrepreneurs for playing an effective role in the economic development of this area."

The Prime Minister said steps had been taken for enrichment of culture of the different tribes in Chittagong Hill Tracts. Besides, steps have been taken to develop tourism and transform Chittagong Hill Tracts into a beautiful and prosperous region.

The Prime Minister said the successful implementation of the peace process requires commitment, sincerity, hard work and dynamic leadership. In this connection she sought support from all tribal and non-tribals living in the hill districts for successful implementation of the accord.

Speaker, members of the council of ministers, MPs, political leaders, chiefs of three services, high civil and military officials, diplomats, heads of different UN and international agencies, vice-chancellors, educationists, intellectuals, editors, senior journalists, cultural activists, eminent citizens, elite and a large number of tribals and non-tribals of Chittagong Hill Tracts attended the historic event.

The Prime Minister later inspected the arms deposited by the Shanti Bahini men. She also talked to them and enquired about their welfare.

The Prime Minister thanked the members of the Army, civil administration, police, BDR, Ansar, and the political and tribal leaders who have worked relentlessly for the success of this historic programme. Before ending her 40-minute speech the Prime Minister called upon all tribal and non-tribals irrespective of political affiliation to come forward for the development of the country and the people. "Let us take a fresh vow to build 'Sonar Bangla' as dreamt by our great leader Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman whose message of freedom and peace we carry today," she said.

The Bangladesh Observer

February 11, 1998

**'I am happy after arms surrender',
says Shantu**

Special Correspondent

KHAGRACHHARI, Feb. 10:— Chairman of Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma said today that he felt very happy about the peace treaty and subsequent handing over of arms by Shanti Bahini members to the Government today.

Giving his reaction to some journalists at the Khagrachhari Stadium after handing over his arms to Prime Minister Sheikh Hasina, he said: "I am feeling happy today after the handing over of arms".

He dodged to reply a question whether the Shanti Bahini had been abolished with the surrender of arms by its members.

Responding to another question he hoped that the Government would implement the peace treaty fully.

The Liaison Committee Convener Hangsadhaj Chakma, who acted as the coordinator between the PCJSS and the Government, told some journalists that he was very happy today.

Giving his reaction, he said that as a citizen of the country, he discharged his responsibility to bring peace in the Hill Tracts region in the greater interest of the country.

Responding to a question he said that implementation of the peace treaty depended on both the PCJSS and the Governments.

The Bangladesh Observer

February 11, 1998

Highlights of PM's speech

KHAGRACHHARI, Feb. 10:— Following are the highlights of the speech delivered by Prime Minister Sheikh Hasina on the historic occasion of deposit of arms by the Parbattya Chattagram Janasanghati Samity (PCJSS) here today putting an end to the quarter century old bloody confrontation and fratricidal hostility in Chittagong Hill Tracts, reports BSS.

—The deposit of arms would usher in a new era in the history of the nation, particularly Chittagong Hill Tracts.

—The people of all walks of life irrespective of caste and creed-tribals and non-tribals will enjoy the benefit of this peace process.

—After returning to the normal life the PCJSS members would contribute to the national development.

—The accord has been signed with full allegiance to the country's sovereignty, territorial integrity under the constitution of Bangladesh.

—The rights of all tribals and Bangalees, living in the hill tracts region, have been ensured as they were.

—The Deputy Commissioners, Superintendents of Police and other officials and staff will remain in three hill districts like in the past.

—The Bangalees would continue to remain as the legitimate inhabitants of the cluster villages in their own lands.

—The inhabitants of the cluster villages would be rehabilitated along with the members of the PCJSS.

—Tribals and Bangalees would coexist peacefully in the hill tracts and Bangalees under no circumstances would be removed by force.

—A package of 20 incentives were declared for the repatriated refugees.

—One university of science and technology would be established at the hilly region.

—Massive programmes involving Taka 2,149.17 crore would be spent under short, mid-and long term programmes for the rehabilitation and of the people of hill districts and their development.

—Awami League cooperated whole heartedly with the peace process initiated by BNP government under Col (retd) Oli Ahmed committee.

—BNP, which have two members in the present national committee on CHT headed by Chief Whip Abul Hasanat Abdullah, did not cooperate with the peace efforts rather they looked into the whole thing from their narrow partisan outlook.

—37,996 members of 7267 refugee families so far returned to their own homeland under the peace process.

The Bangladesh Observer

February 11, 1998

Peace at last, says Holzman

Special Correspondent

Heads of foreign missions, diplomats and representatives of international organisations who witnessed the formal arms surrender by the Shanti Bahini guerillas at Khagrachhari Stadium on Tuesday felt encouraged with the end of the two decades old insurgency in Chittagong Hill Tracts and a peaceful solution of a bloody tribal-non tribal conflicts.

To them the long cherished arms surrender by the Shanti Bahini leader Jyotirindra Bodhipriya Larma, known as Shantu Larma, and his 739 uniformed guerillas to Prime Minister Sheikh Hasina was not a mere official ceremony but the beginning of a new era of peace and stability in the country's one tenth area, ravaged by fratricidal hostilities and bush war.

It was a long arduous day for them as they had to wake up early morning to fly to Khagrachhari and return to the capital in the evening witnessing a historic event that convinced them of the peaceful implementation of the much talked about Chittagong Hill Tracts peace accord signed between the Government and the Shanti Bahini on December 2 last year. Their presence at the arms surrender ceremony demonstrated their government's support to the CHT peace accord.

Giving his instant reaction to this correspondent at the end of the arms surrender ceremony, US Ambassador John C. Holzman beamed to say peace at last. He was happy to witness the beginning of a new chapter of human rights in Bangladesh, the cause his country is now pressing globally.

The Ambassador of the State of Palestine Mohammad Shahta Zarab who is now the Dean of Diplomatic Corps in Bangladesh said "I happy. Peace ends conflicts and hostilities". He encouraged his fellow diplomats to take the journey to Khagrachhari and be a witness to the historic event.

Indian High Commissioner Deb Mukharje hoped that the end of insurgency in CHT would ensure the return of the tribal refugees from the camps in the Indian state of Tripura. He asserted India always wants peace, stability and development in Bangladesh.

To High Commissioner of Islamic Republic of Pakistan Karam Elahi, the arms surrender ceremony was a pleasant experience. He believed there was no alternative to peace to end insurgency.

Sri Lankan Ambassador S.B. Atugoda who has seen Tamil insurgency hindred the rapid growth of his country was happy to witness the end of decades old tribal insurgency in Bangladesh.

Ambassador of the Netherlands Dick Den Haas said that his country supported the peace accord from the beginning. He assured of Hague's assistance to the development of CHT infrastructure following the peace accord.

In total 30 heads of diplomatic missions and International Agencies flew to Khagrachhari to watch the arms surrender ceremony held peacefully in presence of over 50,000 tribal and non-tribal people at the Khagrachhari Stadium despite the day-long hartal programme of the main opposition party BNP and its allies in Chittagong Division.

The Bangladesh Observer

February 12, 1998

Shantu Larma goes back to his sanctuary Chittagong Office

CHITTAGONG, Feb. 11:— The Chairman of the Parbattya Chattagram Jana Sanghati (PCJSS) Jyotirindriya Bodhipriya Larma alias Shantu Larma along with four close associates returned back to their sanctuary at Daduckchhari on Tuesday night.

The four of his ardent followers who went back with him were Sudha Sindhu Khisha, Rakta Utpal Tripura, Gautam Chakma and Ushaton Talukder.

Shantu Larma with his family members will formally surrender on February 28, the last day of surrender of the Shanti Bahini men.

Those Shanti Bahini men who ceremonially laid down their arms at the stadium on Tuesday will stay at different transit camps in Khagrachhari until the process of amnesty is completed and the cases filed against them are withdrawn. The payment of Taka 50,000 in cash to each of the surrendered SB men is also in progress.

The next phase of arms surrender will take place on February 16 at the Baghaichhari High School ground in Rangamati district followed by Bardam High School ground in Khagrachhari on February 22.

The Bangladesh Observer

February 12, 1998

Peace treaty hailed

**Australian aid for
CHT uplift assured**

Australian Foreign Minister Alexander Downer has called the CHT accord "truly historic" and "unprecedented" and said his government will provide financial assistance for the development of the Chittagong Hill Tracts, report UNB.

"We want to consolidate the peace process in the CHT by extending our assistance to development of the region...It will be a useful contribution from our part," he told a Press conference at the airport prior to his departure for Sydney on Wednesday afternoon.

Foreign Minister Abdus Samad Azad also addressed the crowded conference while State Minister for Foreign Affairs Abul Hasan Chowdhury and acting Foreign Secretary Aminul Islam were present.

Downer, who came here for a one-day visit, said Australia which has got expertise in the agriculture sector may provide assistance for the agricultural development project in the CHT and said, "It'll be a good starting."

The Australian Foreign Minister announced an initial fund of 200,000 dollar to support the Government's plan for human rights commission in Bangladesh.

He also pledged 500,000 dollar for some 21,000 Rohingya refugees encamped in Bangladesh.

Downer offered additional scholarships for 24 Bangladeshi students and training for two cricket players in Australia this year.

Describing his talks with the Prime Minister and other Bangladeshi leaders as "very productive and most successful", he said Australia has focussed its attention on Bangladesh and other South Asian countries and had declared 1997 as the Year of South Asia.

Downer said he had a good discussion on bilateral matters, particularly trade and investment in Bangladesh.

During his stay here, Downer witnessed an accord signing ceremony transferring the license to explore coal deposits in northern Bangladesh from Australian company BHP Ltd to Asia Energy Corporation Ltd.

Bangladesh's economy, he said, will benefit from this agreement.

Earlier, Foreign Minister Abdus Samad Azad termed Downer's visit "very important and highly significant" and said both Dhaka and Canberra maintains an excellent bilateral relations.

He said his official talks with the Australian Foreign Minister were very useful covering bilateral matters as well as regional and international issues.

"We focussed on the expansion of economic, trade and investment ties with Australia," Azad told newsmen.

He said Australia has responded positively to join the development programmes in the Chittagong Hill Tracts.

The Bangladesh Observer

February 14, 1998

Canada to help develop CHT

Canadian government will extend all possible assistance for the development of the Chittagong Hill Tracts, says UNB.

"Our government will do whatever possible for the development of the CHT region", Canadian Ambassador in Dhaka Nicholas Hr Etheridge and when he called on Prime Minister Sheikh Hasina.

Appreciating the Prime Minister for successful completion of the CHT peace accord, he said it was a unique occasion because without assistance from outside a rebel group could be brought to the negotiation table.

The Canadian envoy said the treaty will not only contribute to bringing peace in Bangladesh but also in the region as a whole.

During the meeting, the Prime Minister mentioned various steps undertaken to rehabilitate the exmembers of the Shanti Bahini.

She pointed out that a massive development programme, including immediate, short, medium and long-term ones, have been taken for the development of the region.

The Bangladesh Observer

February 14, 1998

CHT accord

arms surrender hailed

Staff Correspondent

A joint meeting of the Advisory Committee and the Executive Committee of Muktijodder Chetona Mancha hailed the government for signing Peace Agreement with PCJSS and completing arms surrender process by Shanti Bahini members.

The meeting called upon the government to release a commemorative stamp on this occasion. The meeting also finalised its programme to observe Ekushey February.

Abu Osman Chowdhury, one of the sector commanders of Liberation War presided over the meeting which was held on the swimmingpool premises of Dhaka Stadium on Wednesday afternoon.

The meeting decided to place floral wreaths at the Central Shahid Minar on Ekushey February and to hold a discussion meeting on February 22 in observance of Language Movement.

The Bangladesh Observer

February 14, 1998

Peace council hails Govt, PCJSS

Bangladesh Peace Council (BPC) hailed the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) for taking courageous steps for ending the arms conflicts in CHT through the process of arms deposits of the former Shanti Bahini under the historic peace accord, a BPC Press release said on Friday, says BSS.

BPC adopted a resolution in this regard at a general meeting held on Thursday with its Chairman Amina Begum in the chair.

The resolution said, the sovereignty, regional integrity and security will be ensured by signing of the CHT peace accord. The accord will further expedite socio-economic development of the hilly area through establishment of peace and stability and human rights, the resolution added.

The Bangladesh Observer

February 16, 1998

545 SB men lay

down arms today

Chittagong Office

CHITTAGONG, Feb. 15:— A total of 545 Shanti Bahini men will formally lay down their arms to the government in the second phase of surrender at Baghaichari High School Ground of hill district Rangamati tomorrow (Monday).

These tribal guerillas will bring in more than 500 weapons during their ceremonial surrender.

Before giving up their weapons, the armed-cadre members (Shanti Bahini) of the PCJSS will gather at Uluchari transit camp, three miles south of Baghaichari thana-headquarter. They will be transported to the venue Baghaichari High School ground under heavy security for their surrender of arms.

At the surrendering ceremony. Home Minister Rafiqul Islam, Bir Uttam will be the chief guest while Dipankar Talukder MP, Chairman of the Task Force and Bir Bahadur MP will remain present as special guests.

The Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) will be represented at the second phase of surrender by Sindhu Khisha and Rakta Utpal Tripura. The Liaison Committee member Mathura Lal Chakma will also attend the ceremony.

Major Pele, Commander of SB's southern region will be the first to hand his weapon over to the Home Minister. And then the rest of the Shanti Bahini men clad in their olive green uniform will deposit the arme one by one.

Following their surrender, each of the guerilla will get Taka 50,000 as per the CHT agreement. With the amount, they will start their live anew.

The Bangladesh Observer

February 18, 1998

Opposition urged to return to JS

CHT treaty consistent

with Constitution: PM

Staff Correspondent

Prime Minister Sheikh Hasina renewed her call to the opposition to shun the path of chaos, violence and bloodshed and return to the House to contribute to peace and development of Chittagong Hill Tracts.

She was replying to a question posed by Awami League member Jalal Uddin Talukdar in Parliament on Monday.

We had enough of bloodshed in CHT during the past 21 years. She urged the opposition to renounce its party politics and work for peace and development of the Chittagong Hill Tracts.

She confessed 937 persons were killed in sanguinary bush battle in CHT during the past 21 years.

Responding to a barrage of supplementaries the Prime Minister stated the government was required to spend over 105,94,49,000 Taka in defence of three hill districts until the peace accord was concluded.

She outright rejected the opposition allegation that the peace agreement was signed under pressures from outside and claimed it was signed in a manner so to make it consistent with the constitution.

There are place in the world including India, Pakistan, Burma, Sri Lanka and Ireland plagued by ethnic problem. Our success lies in the fact that we have been able to restore peace through peaceful negotiation and without any interference from outside.

She told a questioner that her administration had received encouraging response from donors and developing partners for the development of the CHT.

In reply to a question the Prime Minister said the exact amount required for development of the hill district was yet to be assessed. She stated a cell had been set up in the Planning Commission to draw up a comprehensive plan for development of the CHT. She further stated the government had taken up short-term, mid-term and long-term plans for Chittagong Hill Tracts.

The Bangladesh Observer

February 18, 1998

Clinton hails CHT accord

US President Bill Clinton has welcomed the peace accord "between Bangladesh government and the people of Chittagong Hill Tracts" to put an end to a long-running conflict in the country's south eastern hill areas, according to a message received from Washington on Tuesday night, reports BSS.

In a letter of felicitation to Prime Minister Sheikh Hasina on February 11, the US President said, "I read with particular interest that your government has concluded a peace accord with the people of Chittagong Hill Tracts. Please accept my congratulations at ending this unfortunate and long-running conflict."

Recalling Prime Minister Sheikh Hasina's invitation to visit Bangladesh, President Clinton said he would consider visiting Bangladesh seriously. He said, "current plans call for us to visit South Asia later this year. As our plans develop, Ambassador Holzman will be in contact with your staff."

President Clinton also congratulated Prime Minister Sheikh Hasina's son Joi on his graduation from the University of Texas. He said, "I know the pride you must take in his accomplishment."

The US President said it was point of pride to him and to all American that Joi and so many others from abroad chose to attend US institutions of higher learning.

The US Assistant Secretary of State Karl F Inderfurth handed over President Clinton's letter to Prime Minister Sheikh Hasina to the Bangladesh Ambassador in the US K Shahabuddin at a dinner held on the occasion of the President's Day.

While handing over the letter Mr. Inderfurth also congratulated the Bangladesh Prime Minister and her country on entering into a treaty with the hill people. He said it would ensure peace in the region ending a long-standing conflict there.

Under Secretary of State for Political Affairs Thomas Pickering, who was present on the occasion, also expressed his happiness over the peace treaty. He said foreign investors including those from the United States would be greatly attracted to the resource-rich hill area.

The Bangladesh Observer

February 23, 1998

443 more SB men lay down arms

DIGHINALA, Khagrachhari, Feb 22:— The third batch of the former Shanti Bahinimen today laid down their weapons ceremonially to return to normal life at this small township, 25 kilometres from the Khagrachhari hill district headquarters, says BSS.

Chief Whip and Chairman of the National Committee on the Chittagong Hill Tracts Abul Hasanat Abdullah received the weapons from 443 members of the now defunct Shanti Bahini, the armed wing of Parbatya Chatragram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

Minister without portfolio Kalpa Ranjan Chakma, State Minister for Information Prof Abu Sayeed, parliament members Dipankar Talukdar and Ashiqur Rahman, liaison committee chief Hangshadhaja Chakma, PCJSS leaders, senior civil and army officials were present.

"Major" Chotumoy Chakma alias Major Clever led the former bush fighters in depositing their arms by handing over his AK-47 rifle to the Chief Whip. Abdullah in return offered him a bouquet of white roses as patriotic songs were sung. Leader of the group major Chandra Shekhar Chakma alias Major Taposh was present.

Hundreds of members of the tribal community including relatives of the former Shanti Bahinimen and Bangalis thronged the venue of the ceremony in an open field here to welcome back the former guerillas back to normal life.

Dozens of pigeon and coloured balloons were freed in the air to mark the occasion.

"I welcome all of those who have already deposited their weapons. I hope the remaining ones would return to normal life laying down their arms in time", said the Chief Whip, who signed the landmark peace agreement on behalf of the government on December 2 last.

The Bangladesh Observer

February 25, 1998

Letter to PM

Albright hails CHT accord

The United States continued to hail Bangladesh Government's peace accord on the Chittagong Hill Tracts, reports BSS.

The US Secretary of State Ms Madeleine Albright, in a recent letter addressed to Prime Minister Sheikh Hasina which was handed over by the US Ambassador in Dhaka, Mr John C Holzman, welcoming the peace accord stated. "I have been pleased to note the positive coverage which has greeted your Government's efforts to implement the historic Chittagong Hill Tracts peace accord. As we have stated publicly, the United States welcomes the peace agreement between your Government and the tribal insurgents in the Chittagong Hill Tracts." Ms Albright said her Government is hopeful that with good-will on all sides, the peace accord can be fully implemented so that the people of the Hill Tracts region may be able to enjoy peace and economic prosperity.

Reiterating the importance the United States attached to developing strong and friendly relations with Bangladesh, Ms Albright expressed her own desire to work closely with Bangladesh Prime Minister to further strengthen the ties between the two countries. "I would like to reiterate the importance which the United States places on its strong and friendly relationship with Bangladesh. I look forward to working with you to further strengthen the ties that unite our two countries," she said.

The Bangladesh Observer
February 27, 1998
**Last batch of tribal
refugees comes today**
Staff Correspondent

The last batch of the tribal refugees returns to Chittagong Hill Tracts (CHT) today (Friday) from the camps in the Indian state of Tripura while the fifth and the final phase of arms surrender by the tribal insurgents will be completed on March 5 as part of the implementation of CHT peace accord signed between the Government and the tribal leaders on December 2 last year.

With the homecoming of the last batch of the tribals from the Tripura camps, the outstanding issue of the repatriation of refugees from India comes to an end. So far 59,239 tribal refugees of 11,194 families, mostly from Chakma tribe, returned to CHT under the repatriation and rehabilitation programmes of the government. The repatriation started in February, 1994 and it resumed last March when the present Government offered a package for rehabilitation.

Tribal refugee leader Upendra Lal Chakma and his family members will return home with the last batch of the refugees

through Tabalchhari Transit Point under Matiranga Thana in Kagrachhari District this (Friday) morning. The local administration and tribal people will greet the last batch of the refugees from Tripura camps. Leaders of Tripura Government will see off the tribal refugees at the Indian border.

Minister without Portfolio Kalpa Ranjan Chakma, MP, Chairman of the Task Force on Tribal Refugee Rehabilitation Dipankar Talukdar, MP, Khagrachhari Local Government Chairman Shamiran Dewan and Chittagong City Corporation Mayor and Member of the National Committee to end CHT insurgency Alhaj ABM Mohiuddin Cowdhury will welcome the last batch of tribal refugees at Tabalchhari.

With the repatriation of the tribals to CHT, the refugee camps in Tripura will be dismantled resolving a prolonged problem between the two neighbouring countries.

Meanwhile, with the laying down of arms by the last batch of tribal insurgents at Dudukchhara on March 5, the new area of peace and coexistence between the tribals and non-tribals at the insurgency-torn three hill districts gets impetus.

The Bangladesh Observer
February 28, 1998
Seminar on CHT
**Peace accord great
success for AL govt**
Chittagong Office

CHITTAGONG, Feb. 27:— The speakers at a seminar on the Chittagong Hill Tracts here today observed that the recently concluded peace accord on the CHT was a great success for the present Awami League Government within the framework of country's constitution ensuring social and economic justice for the hilly people.

"It was signed with an honest intention to bring about peace in an important part of the country," they claimed adding, the people may now judge and Parliament can decide what are the changing needs with the changing time.

The day-long seminar titled Chittagong Hill Tracts Peace Accord, constitutional, Economical and Anthropological Review was sponsored by the Chittagong University Teachers Association (CUTA). The inaugural function held at Shilpakala Academy auditorium was presided over by CUTA President Prof. Anwarul

Aziz Arif. The Vice Chancellor of Chittagong University Professor Abdul Mannan inaugurated the seminar which was divided into three separate sessions, marked with hot and cold speeches.

The first (morning) session that dwelt on the "constitutional review of the CHT peace accord" was presided over by former Chittagong University Vice-Chancellor Professor Alamgir Mohammad Shirajuddin. The key-note paper was presented by Prof. Shah Alam, Dean of law faculty of Chittagong University.

Among the discussants were Justice K.M. Sobhan, Dr. Kamal Hossain, Barrister Amir-ul-Islam, Advocate Khondoker Mahbub Uddin Ahmed, Dr. Mizanur Rahman, Prof. Fazle Hossain, Prof. Abdur Noor and Dr. Abul Kalam Azad.

The second session on the CHT peace accord; it's anthropological review was presided over by Professor Anupam Sen of Chittagong University. The key-note paper was presented by Prof. Mohammad Mahbub Ullah. The discussants included Prof. Anisuzzaman, Prof. Hamida Banu, Prof. Ahmed Fazle Hassan Chowdhury, Prof. Hasanuzzaman Chowdhury, Journalist Abul Momen, Prof. Siddique Ahmed Chowdhury and Dr. Prasanta Tripura.

The third session on the CHT accord: it's political economic review was presided over by Prof. Muhammad Sekander Khan, Prof. Joyti Prakash Dutta presented the key-note paper. The main discussants were Prof. Anisur Rahman, Prof. Mozaffar Ahmed, Prof. Rehman Sobhan, Prof. Muniruzzaman Meah, Prof. Mostofa Chowdhury, Major General (retd) Syed Mohammad Ibrahim, Prof. M. Badiul Alam, Prof. Harendra Kanti Dey, Prof. Moynul Islam and Prof. Mahfuzul Huq Chowdhury.

The Gano Forum President Dr. Kamal Hossain called for holding a referendum before implementation of the CHT peace accord. He said, "The present constitution has made no scope for a such sort of peace accord."

The constitutional expert Barrister Amir-Ul-Islam said the peace accord on the CHT did not go beyond the constitutional framework, rather it was done on the basis of existing format of the local government institutions. "Our constitutional concept of local government has already achieved the concept of a progressive and dynamic flexibility depending on the political, economic, social, cultural and historical reality, he opined.

Prof. Muniruzzaman Meah underscored the need for a consensus decision of all political parties to bring about lasting peace in Chittagong Hill Tracts.

The Bangladesh Observer

March 5, 1998

Last batch of Shanti Bahini men

Lay down arms today

Chittagong Office

CHITTAGONG, Mar. 4:— A total of 209 Shanti Bahini men will lay down their arms in the fourth and final phase of their ceremonial surrender at border hamlet Daduckchhari of Panchhari Thana under hill district Khagrachhari tomorrow (Thursday).

These guerrillas will formally give up themselves along with their senior leaders of the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

The prominent PCJSS leaders who are going to surrender are: Sudhasindhu Khisa, Raktautpal Tripura, Gautam Chakma, Rupayun Dewan, Tapas Chakma and Madhavi Lata Chakma.

However, with the surrender of last batch of 209 Santi Bahini men, the number of surrendered Shanti Bahini men will total 1933. With this, the guerrilla outfit-Shanti Bahini will get disbanded ending two decades- old-bush-war in CHT.

The Shanti Bahini men who laid down their arms and returned to their normal life in past three phases of surrender on February 10, 16 and 22 totaled 1724 as per the peace accord signed between the Government and PCJSS on December 2 last.

The arms surrender by the insurgents began on February 10 with the laying down of arms by Parbatya Chattagram Jano Sanghati Samity (PCJSS) Chief Jotirindra Bodhipriya Larma to Prime Minister Sheikh Hasina.

While the Civil Aviation and Tourism Minister Eng Mosharraf Hossain will be the chief guest, Chittagong City Mayor AMB Mohiuddin Chowdhury will be the special guest Kalparanjan Chakma, Minister without portfolio and senior civil and military officials are also expected to attend the surrender ceremony.

Emerging out of their jungle hideout tomorrow morning, the last batch of Shanti Bahini men first took refuge in a transit camp built by the BDR personnel. At the camp, they will deposit their arms and ammunition to the Minister Kalparanjan Chakma.

After that, they will walk down to a place where the ceremonial surrender will finally take place.

The Bangladesh Observer

March 5, 1998

**‘PCJSS has no right to
represent hill people’**

As the last group of Shanti Bahini insurgents lay down their arms today (Thursday), factions of three CHT organisations said Jano Sanghati Samity has no legal right to represent the hill people, reports UNB.

"Leaders of the PCJSS have lost their rights to represent the hill people by signing the accord of com- promise", said leaders of the three organisations in a joint statement in Dhaka on Wednesday.

They said Shantu Larma has made his own fortune by selling out the interests of the hill people. "They surrendered only for Tk 50,000", the statement said.

The signatories to the statement are Prosit Khisa, General Secretary of Pahari Gano Parishad, Dipti Shankar Chakma, President of Pahari Chhatra Parishad and Somari Chakma, General Secretary of Hill Women Federation.

The three organisations are believed to work as open platforms of the PCJSS while Shanti Bahini as its armed wing.

The Bangladesh Observer

March 6, 1998

**Last batch of SB men lay down arms
CHT insurgency ends**

KHAGRACHHARI, Mar. 5:— The 23-year-old armed insurgency in the CHT came to an end today with the completion of surrendering arms by the Shanti Bahini guerillas, says UNB.

A total of 222 tribal insurgents surrendered their arms in the fourth and last phase of the arms surrender at the frontier village of Dudukchhari today as per the CHT peace accord signed on December 2.

Guerilla leaders including Sudhasindhu Khisha, Rakatatpul Tripura, Goutam Chakma, Ushathan Talukder, Debashish Chakma, Rupayan Dewan, Jogodeesh Chandra Chakma and lone woman leader Madhabi Lata Chakma also laid down their arms.

Civil Aviation Minister Engineer Mosharraf Hossain received the first arms from Jogodeesh Chandra Chakma. Later, other insurgents handed over their arms to him, marking the formal end to two decades old insurgency.

The 222 Shanti Bahini guerillas surrendered some 55 different types of weapons and 57,763 round of ammunition to the authorities.

Earlier, in the last three phases, a total of 1725 guerillas handed over arms since February 10, when Prime Minister Sheikh Hasina formally received the arms from PCJSS Chief Shantu Larma at Khagrachhari stadium.

Addressing the function, Engr. Mosharraf said the accord has been signed, between the PCJSS and the National Committee on the CHT, ensuring the socio-economic and political rights of the people of this region.

With the peaceful ending of the arms surrender, Mosharraf expressed the hope that the peace would restore in the hill tracts.

The Minister said the peace accord was signed within the ambit of the Constitution, upholding the county's sovereignty. He urged the people to remain vigilant against those who are opposing the accord. The PCJSS Chief Jotinra Bodipriya Larma alias Shantu Larma, who was present at today's arms surrender ceremony told newsmen, "We have signed the accord for establishing a permanent peace in the region".

The PCJSS Chief said he would extend his all out cooperation for implementation of the peace accord.

Terming the Chittagong Hill Tracts as a backward area. Shantu Larma called for improving the law and order situation in the hill districts.

Shantu called on all to come forward and extend their cooperation to establish peace in the CHT.

In reply to a question about his future plan, Shantu Larma said the PCJSS will emerge as a political party in the CHT its members will be engage in the development process in the

Chief Whip Abul Hasnat Abdullah, Minister Kalparanjan Chakma, State Minister for Information Prof Abu Sayeed, Task Force Chairman Dipankar Talukder MP, Chittagong City Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, Bir Bahadur MP, Chief of Army Staff Lt Gen Mostafizur Rahman, DG of BDR Maj Gen Azizur Rahman, Khagrachhari Hill Parishad Chairman Samiran Dewan, Rangamati Hill Parishad Chairman Ching Chu Rouza and Bandarban Hill Parishad Chairman Thoaisa Prou and other high civil and military officials were present at the function.

BSS adds: Chairman of Parbattya Chhattagram Jana Sanghati Samity and Supreme Commander of now defunct Shanti Bahini

Shantu Larma left his hideout for Khagrachhari town to start a new life from today.

"This is my last day here, I am not staying here after this occasion", he told BSS before the deposit of weapons by the last batch of PCJSS men here.

Asked to comment on the event, Larma said "of course it is a happy occasion and I must feel good".

Larma, the younger brother of slain PCJSS Founder MN Larma, is one of the key-figures of the organisation since its inception in 1973. He later became the Chief of PCJSS in late 1970s after the assassination of his brother in a factional fight.

Senior PCJSS leader Sudhasindhu Khisha said he is also spending his last day today in Dudukchhari, once known to be a stronghold of PCJSS.

Khisha, a close associate of Shantu Larma added "one major task has been ended and now I will dedicate myself in the service of the people through realisation of the accord".



চিত্রে অস্ত্র সমর্পণ



শান্তি বাহিনীর একটি দল প্রবেশ করছে। বাগদা দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে ভাগ্যকে অভিনন্দন জানায় শান্তি বাহিনীর সদস্যরা।

—মহেশ্বর হোসেন খান

শান্তি বাহিনীর আনুষ্ঠানিক অস্ত্রসমর্পণ আজ

■ বাগড়াভাঙিতে উৎসবের আমেজ ■ প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র গ্রহণ করবেন ■ প্রথম দফায় ৭৩৯ জন

শান্তি বাহিনীর সার্বভৌমত্বের প্রথম দফায় অস্ত্রসমর্পণ করছে। দুপুর ১১টা ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জোড়হস্তে তুলে দেওয়া হবে অস্ত্র। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন।

সংবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজ 'শান্তি বাহিনী'র অস্ত্রসমর্পণ

শান্তি বাহিনীর সার্বভৌমত্বের প্রথম দফায় অস্ত্রসমর্পণ করছে। দুপুর ১১টা ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জোড়হস্তে তুলে দেওয়া হবে অস্ত্র। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই যুগের সশস্ত্র তৎপরতার অবসান

শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ আজ শুরু

শান্তি বাহিনীর সার্বভৌমত্বের প্রথম দফায় অস্ত্রসমর্পণ করছে। দুপুর ১১টা ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জোড়হস্তে তুলে দেওয়া হবে অস্ত্র। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন।

ভোরের কাগজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

The Daily Janakantha

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজ শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ শুরু

শান্তি বাহিনীর সার্বভৌমত্বের প্রথম দফায় অস্ত্রসমর্পণ করছে। দুপুর ১১টা ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জোড়হস্তে তুলে দেওয়া হবে অস্ত্র। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন। অস্ত্রসমর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ

দুই দশকের সংঘাতের অবসান হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে আনন্দময় সমর্পণ অনুষ্ঠান

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

ভোরের কাগজ

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

সন্তু লারমা জমা দিলেন এসএমজি, শেখ হাসিনা হাতে তুলে দিলেন সাদা পোলাপের তোড়া

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দৈনিক ইত্তেফাক

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ

দুই দশকের সংঘাতের অবসান হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে আনন্দময় সমর্পণ অনুষ্ঠান

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের নগর অঙ্গনশিক্ষা

দু'যুগের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের অবসান

শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

শান্তি বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্রসমর্পণ করা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

739 Shanti Bahini men surrender arms

[illegible]

Coexist peacefully in CHT, work unitedly for uplift:PM

of the American people. The fact that the American people are not only the most powerful but also the most generous in the world is a source of great pride and a source of great responsibility. It is a responsibility that we must not shirk. It is a responsibility that we must not neglect. It is a responsibility that we must not ignore. It is a responsibility that we must not forget. It is a responsibility that we must not lose sight of. It is a responsibility that we must not let slip. It is a responsibility that we must not let go. It is a responsibility that we must not let fall. It is a responsibility that we must not let fade. It is a responsibility that we must not let die. It is a responsibility that we must not let live.

দ্য বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮



কটিাতীর দিয়ে ঘেরা ক্যাম্প। বাকনসের তার আর সয় না। অল্পসমর্পণকারী প্রিয়জনকে নিতে এসেছেন একজন। গতকাল তোলা ছবি।
—মাহবুব হোসেন নবীন

তারা ফিরছেন বাড়িঘরে
স্বাভাবিক জীবনে

□ সন্তু লারমার জমা দেয়া অল্প যাবে জাদুঘরে

□ প্রতিশ্রুত ৫০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে

সাপের সনদওয়ার ও সুন্দর কাড়ি দে, বাগদাড়াই
 দেবে। শাহি বাবিনীর অঙ্গসম্পত্তিরা সমস্পর্কিতভাবেই
 অতাকাল ফিরে গেছেন তাদের বাড়িঘরে। প্রথম বছর
 অঙ্গসম্পর্কিতভাবেই ঘণ ২৪ জন সনদ সকল ফিরে
 গেছেন নিজ নিজ পরিবারের। অঙ্গ ও সোপা পুণ্ডের নামদার
 সোপা হোয়াবে। সোপা থেকে কেবলমাত্র সনদ লম্বা

ন সনদ। তারা অঙ্গ তাদের নিজ নিজ বাড়িঘরে চলে যাবেন।
 বাবিনীর জীবনের প্রথম বাবা গতকাল বাগদাড়াই সনদের ৫১
 জন, মহালাড়ি থানা ১^ম ২৫ জন, সিংলালা থানা ১১ জন এবং
 জন, মারিগাড়া ১^ম ১৮ জন, পানচড়ি ৮ জন এবং
 রাঙামাটিতে বাবাইঘরি ৫ জনকে ৩৩ বাবা এবং ৬৩ জনের
 বাড়িঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নিজ নিজ পরিবারের কাছে।

সংবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বাঘাইছড়িতে দ্বিতীয়
দফা অস্ত্রসমর্পণ আজ

বাঘাইছড়ি থেকে সুনীল কান্তি
দেঃ প্রবর্তা চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির
সম্পন্ন শ্রুত শান্তি বাহিনীর অস্ত্র জমাদানের
২য় পর্বের অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাজস্বাধী
জেলার বাঘাইছড়ি থানা এলাকা এখন
উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। আজকের
অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর ৫৪২ জন নেতা-
কর্মী অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে
ফিরে আসবেন।

বাঘাইছড়ি থানা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এলাকা নতুন সাজে সেজেছে। এ বিদ্যালয়ের মাঠে আজকের আনুষ্ঠানিক অস্ত্র জমাদানের সফল প্রতীতি গতকাল সন্ধ্যার আগেই শেষ করা হয়েছে।

অন্যদিকে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন। সেখানে এখন বন্ধুবান্ধব,

আত্মীয়স্বজনের মেলা বাস্তবে। আজ সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যেই শক্তি বাহিনীর সদস্যরা সার্বিকভাবে বায়ান্ধু ছিঁড়ি উক্ত বিদ্যালয়ের পূর্ব প্রান্তের গেটে এসে পৌঁছালে তাদের যথাতথ্য জানাবেন উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্ধার পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপকবর তালুকদার এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য বীর বাহাদুর এমপি। সাথে থাকবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির সদস্য মৃণুদা লাল চাকমা ও বিখ্যাত চাকমা। এখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি বাহিনী সদস্যদেরকে সকালের ৮টা পরিশেষন করা হবে। এরপর সকাল ৮টা থেকে দীপকবর তালুকদার এমপি ও বীর বাহাদুর এমপি ক্রমান্বয়ে অস্ত্রশুল্লা গ্রহণ করবেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তা পরীক্ষা করে সরাসরি বায়ান্ধু ছিঁড়ি পূঃ ১১ কঃ ৬

সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

আজ বাঘাইছড়িতে শান্তিবাহিনীর দ্বিতীয় দফা অস্ত্রসমর্পণ

হরি কিশোর চাকমা, বাঘাইছড়ি থেকে :
পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্যদের আত্মনিয়ন্ত্রণা-
ন্থকগণের সংগ্রামের নামে দীর্ঘদিন সশস্ত্র
তৎপরতায় লিপ্ত শান্তিবাহিনীর আলো ৫৪৫
যোদ্ধা আজ অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে
ফিরে আসছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি
বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আজ বাঘাইছড়িতে
দ্বিতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ।

প্রথম দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান হয় গত ১০ ফেব্রুয়ারি বাগদাদ জেনারেল স্টেডিয়ামে দুদুকা ১ হাজার ২৮৪ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণের আওতায় আসবেন। শান্তিবাহিনীর বাকি ৬৪৯ জন আগামী ২২ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বাগদাদ জেনারেল বাদাসা উচ্চ বিদ্যালয় ও দুদুকাছড়ি এলাকায় অস্ত্র সমর্পণের মধ্যদিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন।

আজ সকাল ৮টায় শুরু হবে অস্ত্র
সমর্পণের অনুষ্ঠান। এলকে বাঘাছড়ি
উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের চারদিকে ভৈরি করা
হয়েছে প্যাভেল। স্কুল মাঠসহ রাস্তার দুপাশে
বেরেঙের পতাকা বানানোর ফেস্টুন টাঙানো
হয়েছে। থানা সদর থেকে বাঘাছড়ি উচ্চ-
বিদ্যালয় মাঠ এবং শান্তিবাহিনীর অবস্থানস্থল
বাঘাছড়ি গ্রাম পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটারের
অগ্রশর্ত রাস্তাটিকে কোথাক ২টি ভদ্রা কন্যা

আবার কোথাও মাটি কেটে গাড়ি চলাচলের
উপযোগী হবে গড়ে তোলা হয়েছে।

শান্তিবাহিনীর শর্ত সেক্টর হ্রাসের পরে
পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলের
'বি' কমান্ড পোস্টের চার কোম্পানির ৪৪৫
জাতিবাহিনীর সদস্য কাজে বরাবর
রক্ষিত ইসলামের কাছে অস্ত্র সমর্পণ
করেন। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব
সাক্ষাৎকৃত অনুষ্ঠান বাদ যেতে পারে।
শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সাক্ষাৎকৃত অস্ত্র
আয়োজনের পক্ষপাতি নয় বলে জানা
গেছে। তবে রায়পুরা থেকে ৮০ জন শিল্পী
ইতিমধ্যে বাধ্যইতি এনে পৌঁছেছেন।
সাক্ষাৎকৃত অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অস্ত্র
সমর্পণের ঐতিহাসিক ক্রটি সম্পর্কে জনস্বার্থ
সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকারি পক্ষের
আলোচনা চলছিল ইতিপূর্বে লেখা পড়ল।

এদিকে আজকের অস্ত্র সর্ম্পক অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর দক্ষিণ অঞ্চলের কমান্ডার মেজর পেলে, মেজর বাতায়নসহ শান্তিবাহিনীর বেশ কিছু দুর্বল কমান্ডার অস্ত্র সর্ম্পক করবেন বলে জানা গেছে। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অত্যাধুনিক অস্ত্রও জমা পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮



The members of the Shanti Bahini at the second phase deposited the weapons at Baghaichhari High School ground at Rangamati district on Monday. —OBSERVER

দ্য বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর আরো সাড়ে ৪শ' সদস্যের অস্ত্রসমর্পণ

বরাদ্দ থেকে ফিরে সুনীল কান্তি কন্ঠরঙ্গন চাকমা হাতে অস্ত্রশস্ত্র ও মে/মোঃ জহুরুল আলম ৪ তৃতীয় গোলবারান্দ হস্তান্তর করেন সকালবেলায়। পরোয়া গভর্নাল জনসংহতি সমিতির আরো ৪শ' ৪৩ জন নেতা-কর্মী দীঘিনালায় ১শ' গোলবারান্দগুলো পুথক করে রাখেন। ১০টি অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গোলবারান্দ বরাদ্দমের অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে দস্তর-জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে বিহীন মন্ত্রী কন্ঠরঙ্গন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ, উপজাতীয় এসেছেন।

সংবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮



গতকাল চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর নিকট শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করেন। পাশে সভায়মান তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ। ছবিঃ পিআইডি

শান্তি বাহিনীর আরও ৪৪৩ জন সদস্যের অস্ত্র সমর্পণ

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তি বাহিনীর তৃতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ সম্পন্ন

চুক্তি বিরোধী কিছুসংখ্যক পাহাড়ির বিক্ষোভ
ইটপাটকেল নিষ্ক্ষেপ □ আহত ২০

আজিম উল হক/হরি কিশোর চাকমা/জাহাঙ্গীর আলম রাজু, দীঘিনালা থেকে ফিরে : হাজার হাজার পাহাড়ি-বাজালি জনতার উপস্থিতিতে গতকাল এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর ৪৪৩ জন সদস্য ১৯০টি অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এদিকে গতকাল অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে শান্তিচুক্তিবিরোধী কিছুসংখ্যক পাহাড়ি নাগরিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে নিরাপত্তাবাহিনী সদস্যদের বাধাদান এবং উভয়পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিষ্ক্ষেপে সেনাবাহিনীর একজন মেজরসহ পুলিশ, বিডিআর ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশ কজন আহত হয়। আহতদের কারো অবস্থাই গুরুতর নয় বলে জানানো হয়েছে।

খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে দীঘিনালা থানার বড়দাম দীঘির পাড়ে গতকাল জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর উপস্থিতিতে তৃতীয় দফার এ অস্ত্র সমর্পণ পর্ব সম্পন্ন হয়। শান্তি বাহিনী লিডার চতুর্নাম পুথক চাকমা ক্রেবার আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর কাছে একটি একে-৪৭ রাইফেল জমা দিয়ে এ অস্ত্র সমর্পণ পর্বের সূচনা করেন। এ সময় চীফ হুইপ ক্রেবারকে একে-৪৭ রাইফেল জমা দিলে গোলাপ উপহার দিয়ে তাকে বরণ করে নেন। এর পরপরই শান্তি বাহিনীর ১১০ জন সশস্ত্র সদস্য একে একে চীফ হুইপের কাছে অস্ত্র জমা দেন। মন্ত্রী কন্ঠরঙ্গন চাকমা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ, টাক ফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তাদুকদার এ সময় শান্তির প্রতীক সাদা করুতর উড়িয়ে দেন।

ভোরের কাগজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

জনকণ্ঠ ১১

বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতায় শান্তি বাহিনীর তৃতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ সম্পন্ন চুক্তি বিরোধীদের বিক্ষোভ সংঘর্ষ

জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ভিত্তিতে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তৃতীয় দফা অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান রবিবার সকালে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা থানার বড়দাম দীঘির পাড়ে সম্পন্ন হয়েছে। ৪৫ মিনিটের স্থায়ী অনুষ্ঠানে শান্তি বাহিনীর মেজর চতুর্নাম পুথক হাঙ্গা ওরফে ক্রেবারের নেতৃত্বে আরও ৪শ' ৪৩ জন সদস্য ১শ' ১০টি অস্ত্র ও ১ লাখ ১৮ হাজার ৯শ' ৫৪টি গুলি জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে।

জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর কাছে জনসংহতি সমিতির অন্যতম ক্যান্ডিডার মেজর ক্রেবার একটি একে-৪৭ রাইফেল জমা দেন। এ সময় চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ তাকে সাদা গোলাপের একটি তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। এর পর চীফ হুইপ, মন্ত্রী কন্ঠরঙ্গন চাকমা ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ শান্তির প্রতীক করুতর উড়ান। এর আগে সকাল থেকে

১ হাজার ৭শ' ২৫ জন শান্তি বাহিনীর সদস্য ৮শ' ১৪টি অস্ত্র জমা দিয়েছে।

শান্তিচুক্তি বিরোধীদের বিক্ষোভ

শান্তিচুক্তি বিরোধী পাহাড়ীরা রবিবার দীঘিনালায় বড়দাম দীঘির পাড়ে অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। সকাল ১০টার দিকে বড়দাম হাইড্রেল গ্রাঙ্গপে স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পের বাইরে শান্তিচুক্তি বিরোধী মুষ্টিমেয় কিছু পাহাড়ী বিক্ষোভ ও কালো পতাকা প্রদর্শন করলে চাকর পক্ষে পাহাড়ীরা এতে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এতে বাধা দিলে চুক্তি বিরোধীরা ইটপাটকেল নিষ্ক্ষেপ করে। এতে ধাওয়া পাটাধাওয়ায় সেনাবাহিনীর মেজর নজরুল ইসলামসহ পুলিশ বিডিআর ও চুক্তি বিরোধী পাহাড়ী হায়েজনালা নিলে গ্রাম ২০ জন আহত হয়। আহতদের ট্রানজিট ক্যাম্পে স্থাপিত চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পরে অনুষ্ঠান শুরু হলে চুক্তি বিরোধী পাহাড়ী হায়েজনালা অনুষ্ঠানস্থলে এসে কালো ব্যানার, পোস্টার দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ব্যানারে কালো, গোলাপ চুক্তি মানি না, গুলি খায়তপান চাই, চুক্তির অধিকার চাই, অনুপ্রবেশকারীদের

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

শান্তিবাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ॥ আনন্দমুখর পরিবেশে সর্বশেষ দলের অস্ত্র সমর্পণ



দুদুকাড়িতে শান্তি বাহিনীর সাদা পতাকা হাতে এক অস্বাভাবিক
—মণিপুরের বৈষ্ণব বাদ্য

মহাসিন চৌধুরী/জিতেন বড়ুয়া, দুদুকাড়ি থেকে

সর্বশেষ দলের অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে গতকাল
বৃহস্পতিবার জনসংঘেই সমিতির সশস্ত্র বিজ্ঞাপন
শান্তিবাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটল। ভারতের
সীমান্তবর্তী বঙ্গ অঙ্গোচিত দুদুকাড়ির একটি পাহাড়ী উপায়
প্রায়শ্চিত্ত আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে জনসংঘেই সমিতির সশস্ত্র
বিজ্ঞাপন হাই কমন্ডের নেতৃবৃন্দ, মহিলা ও দুদুকাড়িসহ ২৮
২২ জন অস্ত্র সমর্পণ করে। জনসংঘেই সমিতির আহ্বায়ক
জ্যোতিবিন্দু বোদি বিয় লারমা কর্তৃক সস্ত্র লারমার
উপস্থিতিতে এদিন কমান্ডার জাদীশ চন্দ্র চাকমা নেতৃত্বে
সর্বশেষ দলটি অস্ত্র জমা দেয়। প্রধান অতিথি বেনারসী
বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী মোশারফ হোসেন
(১১ নম্বর ৫-এর ক্রম দেওয়া)

পাহাড়ে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে
আসুক এটাই এই মুহূর্তের
কামনা ॥ সন্তু লারমা

দুদুকাড়ি, ৫ মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)। — জনসংঘেই
সমিতির আহ্বায়ক জ্যোতিবিন্দু বোদি বিয় লারমা কর্তৃক সস্ত্র
লারমা বেনারসী, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিযুক্ত সমগ্র দেশের
জনগণের স্বার্থে। এতে কমন্ডার সন্তু লারমা বেনারসী
(১১ নম্বর ৫-এর ক্রম দেওয়া)

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মার্চ ১৯৯৮

Last batch of SB men lay down arms CHT insurgency ends

KHAGRACHHARI, Mar 5:—
The 23-year-old armed insurgency in
the CHT came to an end today with
the completion of surrendering arms
by the Shanti Bahini guerrillas, says
UNB.

A total of 222 tribal insurgents
surrendered their arms in the fourth
and last phase of the arms surrender
at the frontier village of Duduk-
chhari today as per the CHT peace
accord signed on December 2.
Guerrilla leaders including Sudha-
sindhu Khisha, Kakatipul Tripura,
Goutam Chakma, Ushathan Tuluk-
der, Debashish Chakma, Rupayan
Dewan, Jogdeesh Chandra Chakma
and lone woman leader Madhabi
Lata Chakma also laid down their
arms.

Civil Aviation Minister Engineer
Mosharruf Hossain received the first
arms from Jogdeesh Chandra Chak-
ma. Later, other insurgents handed
over their arms to him, marking the
formal end to two decades old in-
surgency.

The 222 Shanti Bahini guerrillas
surrendered some 55 different types
of weapons and 57,763 round of
ammunition to the authorities.

Earlier, in the last three phases, a
total of 1725 guerrillas handed over
arms since February 10, when Prime
Minister Sheikh Hasina formally re-
ceived the arms from PCJSS Chief
Shantu Larma at Khagrachhari sta-
dium.

Addressing the function, Eng
Mosharruf said the accord has been
signed, between the PCJSS and the

National Committee on the CHT,
ensuring the socio-economic and
political rights of the people of this
region.

With the peaceful ending of the
arms surrender, Mosharruf expressed
the hope that the peace would
restore in the hill tracts.

The Minister said the peace accord
was signed within the ambit of the
Constitution, upholding the coun-
try's sovereignty. He urged the peo-
ple to remain vigilant against those

who are opposing the accord.

The PCJSS Chief Jotinri Bodip-
riya Larma alias Shantu Larma, who
was present at today's arms surren-
der ceremony told newsmen "We
have signed the accord for estab-
lishing a permanent peace in the
region".

The PCJSS Chief said he would
extend his all out cooperation for
implementation of the peace accord.
See Page 12 Col. 5



The last batch of Shanti Bahini men surrendered arms to Civil Aviation and
Tourism Minister Engineer Mosharruf Hossain at Dudukchhari in Khagrach-
hari district on Thursday.

Total workforce
estimated at

দ্য বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ মার্চ ১৯৯৮